ভাসিলি ইয়ান

চেঙ্গিজ খান



ভাসিলি ইয়ান

চেঙ্গিজ খান



লেখক ভাসিলি ইয়ান (১৮৭৫-১৯৫৪) একদা তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন, "আমি তিনটি কোলাহল ভালোবাসি — সমুদ্রের কোলাহল, স্কুলের কোলাহল আর ছাপাখানার যন্ত্রের কোলাহল — আমি এতে পরম সুখ উপভোগ করি।" বলা যেতে পারে যে এই বাক্যটির মধ্যেই ভাসিলি ইয়ানের সমগ্র জীবনকথা বিবৃত: তিনি ছিলেন একাধারে স্কুলশিক্ষক, ভ্রমণরসিক, শিশু ও কিশোরদের পত্রিকার প্রকাশক এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের অসাধারণ লেখক।

ভাসিলি ইয়ান দীর্ঘ জীবনের অধিকারী ছিলেন —প্রায় আশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর জীবনের অর্ধাংশ অতিবাহিত হয় জার আমলে, অপরার্ধ — সোভিয়েত পর্বে। ইয়ান লেখকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন অক্টোবর বিপ্লবের পর অর্থাৎ এমন বয়সে যখন ন্যূনতর উৎসাহী ব্যক্তিরা লেখনী সরিয়ে রাখেন। প্রাচীন ফিনিসিয়া, ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার এবং স্পার্টাকাসকে নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করেন।

'চেঙ্গিজ খান' (১৯৩৯), 'বাতু' (১৯৪১-১৯৪২) এবং 'শেষ সায়রের সন্ধানে' (১৯৫৪) নিয়ে গঠিত তাঁর উপন্যাস-ত্রয়ী চিরায়ত সোভিয়েত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। উপন্যাস-ত্রয়ীর প্রথম খণ্ড 'চেঙ্গিজ খান' লেখকের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানগর্ভ ও ভাবগভীর সৃষ্টিগুলির অন্যতম। 'চেঙ্গিজ খান' উপন্যাসটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত, বহু বিদেশী ভাষায় তা অনূদিত হয়েছে।

উপন্যাস-ত্রয়ীর মূল অভিপ্রায় বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক তাঁর 'আত্মজীবনী'তে বলেছেন: ''যে কোন লুণ্ঠনকারীদলের আক্রমণ, জনগণকে দাসে পরিণত করার অভিলাষ এবং মৃত্যু, দুর্দশা ও ধ্বংসের তাণ্ডব সূচনার বিরুদ্ধে নির্বিরোধী যে সব জাতি নির্ভীকভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তাদের বীরত্বের কথা আমি আমার গ্রন্থগুলোতে বলার চেষ্টা করেছি।... একমাত্র অপূর্ব সৃজনী শ্রম, স্বাধীনতাপ্রেমী সকল জাতির শান্তিপূর্ণ সহযোগিতাই মানবজাতির সুখের জামিন।''

ভাসিলি ইয়ান

চেঙ্গিজ খান

উপন্যাস

'রাদুগা' প্রকাশন

মস্কো

অনুবাদ: অরুণ সোম

অঙ্গসজ্জা: ভ. আ. নস্‌কোভ

В. Ян

ЧИНГИЗ-ХАН

На языке бенгали

Yan V.

GENGHIS KHAN. A NOVEL.

in Bengali

দ্বিতীয় সংস্করণ

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Я $\frac{70302-023}{031(01)-83}$ 263 – 83

4702010200

সূচী

মুখবন্ধ ৭
পাঠক, সালাম! ১৫

প্রথম খণ্ড

বিশাল খরেজম — শান্ত জনপদ

প্রথম অধ্যায়

দরবেশের আলখাল্লায়

প্রথম পরিচ্ছেদ। সোনার বাজপাখি ১৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। যাযাবরের ছাউনিতে ২৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। স্তেপের ঘোড়সওয়ার ২৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। হাকিমের ন্যায়বিচার ৩৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ঈপ্সিত দুয়ার ৩৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। শাহী বৃত্তান্তের মুনশী ৪২

দ্বিতীয় অধ্যায়

খরেজমের শাহ্ — পরাক্রান্ত ও ভয়ঙ্কর!

প্রথম পরিচ্ছেদ। প্রাসাদে প্রভাত ৫৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। মহামতি ইস্কান্দারের উদ্দেশে 'নুবা' ৬০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। উগ্রচণ্ড ৬৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। সেলাই করা ছায়া ৭১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ। দিল দরিয়া ৭৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। সুলতানা তুর্কান খাতুনের ষড়যন্ত্র ৮১
সপ্তম পরিচ্ছেদ। হারেমের বন্দিনী ৮৭
অষ্টম পরিচ্ছেদ। 'বিষাদের দূত', হর্ষের বারতা ৯২
নবম পরিচ্ছেদ। বিরাগভাজনের কুঞ্জবনে ১০০

তৃতীয় অধ্যায়

ইরগিজ নদীর লড়াই

প্রথম পরিচ্ছেদ। কিপচাক স্তেপে অভিযান ১১০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। অজ্ঞাত গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষ ১১৮

চতুর্থ অধ্যায়

সীমান্তে শত্রু

প্রথম পরিচ্ছেদ। মোঙ্গল বাহিনীর আক্রমণ প্রস্তুতি ১২৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। প্রাচ্য নৃপতির দূত ১৩১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। নৈশ আলাপন ১৩৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। দূতমুখে চেঙ্গিজ খান বৃত্তান্ত ১৩৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ। মোঙ্গল খান সমীপে বার্তা ১৪৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। চেঙ্গিজ খানের বিনিদ্র রজনী যাপন ১৫১
সপ্তম পরিচ্ছেদ। কুলান খাতুনের ছাউনিতে ১৫৬
অষ্টম পরিচ্ছেদ। মোঙ্গল খানের কর গণনা ১৬১
নবম পরিচ্ছেদ। কারাভান গায়েব ১৬৪
দশম পরিচ্ছেদ। দূত অবধ্য ১৬৬
একাদশ পরিচ্ছেদ। চেঙ্গিজ খান ক্রুদ্ধ ১৬৯
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। সমুচিত পত্র ১৭৪

পঞ্চম অধ্যায়

অজ্ঞাতপূর্ব জাতির আক্রমণ

প্রথম পরিচ্ছেদ। রক্ষণ নেই যার, মরণ ঘটে তার ১৮১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। কুরবান কিজিক হল সওয়ার ১৮৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। যুদ্ধারম্ভ ১৯৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। অসির ধার — যোদ্ধার রক্ষাকবচ ১৯৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ। দুর্ধর্ষ তিমুর মালিক ২০৪
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। মরুভূমির বুকে মোঙ্গল বাহিনী ২০৭
সপ্তম পরিচ্ছেদ। অবরুদ্ধ বুখারায় ২০৯
অষ্টম পরিচ্ছেদ। বিনা যুদ্ধে বুখারার আত্মসমর্পণ ২১৫
নবম পরিচ্ছেদ। "কী মধুর কেরলেন স্তেপ।" ২১৯

দ্বিতীয় খণ্ড

মোঙ্গল শাসনের কশাঘাত

প্রথম অধ্যায়

ঝটিকাহত খরেজম

প্রথম পরিচ্ছেদ। অস্ত্র বর্জনের বিপদ ২৩১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। সমরখন্দের নগর প্রধানদের বেইমানি ২৩৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। নিরাশ্রয় খরেজম শাহ ২৪১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। আবেস্কুন সাগরের দ্বীপে ২৪৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ। কুরবান কিজিকের গৃহযাত্রা ২৫৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। পরিবারের সন্ধানে কুরবান ২৫৮
সপ্তম পরিচ্ছেদ। সুলতানা তুর্কান খাতুনের পলায়ন ২৬২

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশাল খরেজম সাম্রাজ্যের অবসান

প্রথম পরিচ্ছেদ। যুদ্ধং দেহি জালাল উদ-দিন ২৬৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। সিন্ধুনদের লড়াই ২৭৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। মুহরী হল হাজি রহিম ১৭৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 'কালো ঘোড়ার সওয়ার' ২৮১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ। হাজি রহিমের কথন ২৮৬
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। গুরগঞ্জের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ ২৯৯
সপ্তম পরিচ্ছেদ। রূপকথার উপসংহার সন্ধানে কারা কন্চার ৩০৩
অষ্টম পরিচ্ছেদ। গুরগঞ্জ দখলের উপায় — তার বিনাশসাধন ৩১০
নবম পরিচ্ছেদ। 'চিরবিস্মৃতির কারামিনারে' কারা কন্চার ৩১৩
দশম পরিচ্ছেদ। বালক বাতু খান সকাশে হাজি রহিম ৩২২

তৃতীয় অধ্যায়

কাল্‌কা নদীর লড়াই

প্রথম পরিচ্ছেদ। চেঙ্গিজ খানের হুকুমনামা ৩২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 'মহামান্য' সমীপে নিবেদন ৩২৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 'শেষ সাগরের' খোঁজে ৩৩৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। আলান ও কিপচাক জাতির দেশে ৩৩৫
পঞ্চম পরিচ্ছেদ। কাল্‌কা সন্নিকটে তাতার শিবিরে ৩৩৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। তাতারদের কবলে ভবঘুরে প্লোস্‌কিনিয়া ৩৪৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ। কিয়েভে বিপদ্‌সংকেত ৩৫০
অষ্টম পরিচ্ছেদ। সুবুদাই বাহাদুরের পরিকল্পনা ৩৬৫
নবম পরিচ্ছেদ। নীপার তীরে মোঙ্গল বাহিনী ৩৬৭
দশম পরিচ্ছেদ। স্তেপের বুকে উরুস ও কিপচাকদের যাত্রা ৩৭১
একাদশ পরিচ্ছেদ। তাতারদের ফাঁদ ৩৭৬
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। সুবুদাই বাহাদুরের যুদ্ধ-প্রস্তুতি ৩৭৮
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। যুদ্ধারম্ভ ৩৮৪
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। মরণপণ সংগ্রাম ৩৮৯
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। হাড়ের ওপর ভোজের পিঁড়ি ৩৯৭

চতুর্থ অধ্যায়

চেঙ্গিজ খানের অবসান

প্রথম পরিচ্ছেদ। গৃহ অভিমুখে ৪০২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। জনৈক ভিক্ষুর সঙ্গে চেঙ্গিজ খানের পত্রালাপ . . ৪০৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। আমাকে অমর কর! ৪১২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। মোঙ্গলদের নিজ ভূমে প্রত্যাবর্তন ৪২২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ। অভিযানরত অবস্থায় মৃত্যুবরণে চেঙ্গিজ খানের সংকল্প . ৪২৪

উপসংহার

প্রথম পরিচ্ছেদ। যে পথ দিয়ে গিয়েছিল তারা ৪৩৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। কোথা সেই কোলাহলমুখর সমরখন্দ? ৪৪৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। লৌহপিঞ্জরে ৪৪৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। শেষ অঙ্ক ৪৫০

মুখবন্ধ

আজ থেকে অর্ধশতকেরও বেশি আগেকার কথা: তরুণ সাংবাদিক, ইতিহাসবিদ, প্রাচ্য ভাষাবিশারদ ভাসিলি ইয়ান (ইয়ান্‌চেভেৎস্কি) পারস্যের দেশ্‌তি লুৎ — 'ভয়াল মরু' নামে পরিচিত সুবিশাল লবণাক্ত মরুভূমি পর্যটন করেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভাবী লেখক পল্লী ও নগরের অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ দেখে বিস্মিত হন। এই সব পল্লীতে ও নগরে একটি অধিবাসীরও সাক্ষাৎ মেলে না। কেবল ক্বচিৎ চোখে পড়ে আরব আর বেলুচদের বিচরণভূমি, বাদুড়ের ডানার মতো ছড়ানো কালো পশমের তাঁবু।...

এক সন্ধ্যায় বিরতির সময় শ্বেতশ্মশ্রুধারী এক রাখাল ধ্বংসস্তূপের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বিষণ্ণমনে মুসাফিরকে বলল:

"ভেবো না ফিরিঙ্গী যে আমাদের জায়গাটা বরাবরই এমন ফাঁকা আর এরকম দুর্দশার মধ্যে ছিল। আমাদের দেশ এক কালে ধনী ছিল, লোকজনে গম্‌গম্‌ করত। বেজায় লোভী বিজয়ীরা দলে দলে এই ভূমির ওপর দিয়ে গেছে, নিরীহ রাখাল আর চাষীদের খুন করে রক্তবন্যায় সমস্ত ডুবিয়ে দিয়ে গেছে। জমি প্রচুর রক্ত শুষেছে, তারপর শোকে, আতঙ্কে কুঁকড়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে। বিধবা আর শিশুদের চোখের জলে জমিতে নোনা ধরেছে।... এখান দিয়ে গেছে মহাবীর ইস্কান্দার, 'দুনিয়া কাঁপানো' ভয়ঙ্কর চেঙ্গিজ, বাবর, নাদির শাহ আর তৈমুর লঙের দলবল।... এই প্রান্তর ভেদ করে গেছে এক বিশাল পথ — শোক-দুঃখ আর চোখের জলে ভেজা পথ।..."

বলাই বাহুল্য, পিটার্সবুর্গের গ্রন্থাগারে, লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে অধ্যয়নকালে ইতিহাসবিদদের অসংখ্য রচনায় বিজয়ীদের হাতে প্রাচীন সভ্যতার শোচনীয় অবসানের নানা বিবরণ যিনি পাঠ করেছেন শিক্ষায় ইতিহাসবিদ সেই ভাসিলি ইয়ানকে প্রবীণ রাখালের এই বিলাপ

নতুন কোন তথ্যের সন্ধান দিল না। তথাপি সে সম্পর্কে পড়া এক কথা আর হাজার বছর আগে সংঘটিত অকল্পনীয় আঘাতের পরিণাম নিজের চোখে দেখতে পারা আরেক কথা। 'ভয়াল মরুর' রূপ ও দৃশ্য এক পরিণত মানসকেই আলোড়িত করেছিল।

অতি শৈশবেই ইতিহাসের প্রতি ভাবী লেখকের ঝোঁক ছিল। গ্রীক ও লাতিন ভাষার পরম বিশেষজ্ঞ, বহু গ্রীক গ্রন্থকারের অনুবাদক পিতার প্রভাব পুত্রের ওপর পড়ে। সে কথা স্মরণ করে ইয়ান বলেছেন: "আমি প্রায়ই দূর অতীত সম্পর্কে পিতার মুখে কাহিনী শুনতাম। বিশেষ করে তিনি ভালোবাসতেন 'ইলিয়ডের' বীর আর ওডেসিউসের ভ্রমণের গল্প বলতে।" স্টীভেন্‌সন পাঠের নেশা বালককে পেয়ে বসে। ব্রাজিল ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ১৩ বছর বয়সেই সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এক পাল-তোলা জাহাজে চেপে বসে।... সে যাত্রায় তার যাওয়া হয়ে উঠল না বটে, কিন্তু 'দূর দেশ ভ্রমণের প্রেরণাদায়িনী দেবীর' প্রতি তাঁর প্রেম সারা জীবন থেকে যায়।

১৮৯৮ সনে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে ভাসিলি ইয়ান ন্যাপস্যাক পিঠে বেঁধে রাশিয়া ভ্রমণে নির্গত হলেন। দু' বছর ভ্রমণের পর তিনি পত্রিকার সংবাদদাতা হয়ে ইংলণ্ড যান এবং সেখানে সাইকেলে তিনি ঐ দেশের গোটা দক্ষিণাঞ্চল পর্যটন করেন।

রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের পর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ ভাষাবিদ মধ্য এশিয়ার এক ছোট শহরে বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানে কূপ পরিদর্শকের কাজ নেন। ঘোড়া কিনে তিনি তার পিঠে চেপে ১৯০১ সনে কারা-কুম মরুভূমি অতিক্রম করেন এবং খিবা ও বুখারা পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে তিনি ইরান ও বেলুচিস্তানে যাত্রা করেন এবং ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত যান।... এখানেই কোন এক জায়গায় 'ভয়াল মরুর' জনৈক অধিবাসীর সঙ্গে ভাসিলি ইয়ানের স্মরণীয় সাক্ষাৎকার ঘটে এবং তার কাছ থেকে লেখক তার জন্মভূমির দুর্ভাগ্যের বিবরণ শোনেন। এখানেই অতীতের ভয়াল ছায়া নিয়ে গ্রন্থ রচনার চিন্তা তাঁর মাথায় খেলে। তবে সে চিন্তা বাস্তবে রূপ নেয় বহু বছর বাদে — অক্টোবর বিপ্লবের পর।

১৯০৫—১৯১৭ সনে বিখ্যাত রুশ সংবাদদাতা ভাসিলি ইয়ান একাধিক বার মধ্য এশিয়া, মাঞ্চুরিয়া, বলকান অঞ্চল, মিশর, তুরস্ক

ইত্যাদি দেশ পরিভ্রমণ করেন। অক্টোবর বিপ্লবের পর পর ১৯১৮ সনে লেখক রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। নবীন প্রজাতন্ত্রের সর্বক্ষেত্রে সংস্কৃতিবান লোকজন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েন। ইয়ান কোন কাজেই পিছপা হলেন না: বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার কাজ, অর্থনীতিবিদ, নাট্যকার এবং নতুন বিপ্লবী থিয়েটারের পরিচালক — আর প্রতিটি জীবিকায়ই তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উদ্যম দেখিয়েছেন।

১৯২৩ সন থেকে ইয়ান মস্কোয় বসবাস করতে থাকেন। এখানেই ঐতিহাসিক বিষয়ের ওপর তার গভীরতাসম্পন্ন সৃজনী কর্মের সূত্রপাত। একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর রচিত কাহিনী 'ফিনিশীয় জাহাজ', 'স্পার্টাকাস', 'রবার্ট ফুলটন', 'উরালের লোহা পেটাইকর', 'টিলার আগুন'।

১৯৩৯ সনে ভাসিলি ইয়ান তাঁর বিশাল উপন্যাস-ত্রয়ীর প্রথম অংশ 'চেঙ্গিজ খান' সমাপ্ত করেন। ১৯৪১-৪২ সনে প্রকাশিত হয় 'বাতু' এবং ১৯৫৫ সনে ত্রয়ীর শেষ অংশ — 'শেষ সাগরের সন্ধানে'। মোঙ্গল বিজয় অভিযানকারীদের নিয়ে লেখা তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস তিনটি যেমন আয়তনের দিক থেকে তেমনি সাহিত্যিক তাৎপর্যের বিচারে লেখকের প্রধান সৃষ্টি।

অতীতের 'রক্তপিপাসু দানব' চেঙ্গিজ খানের রূপ লেখককে বহুদিন আগেই 'মর্মপীড়া দেয়'। এক আত্মজীবনীমূলক বৃত্তান্তে ভাসিলি ইয়ান তাঁর সৃজনী বীক্ষণাগারের রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। "এশিয়ার বড় বড় বিজেতার মধ্যে চেঙ্গিজ খানকেই কেন আমি বেছে নিলাম এবং কিসের ভিত্তিতে তার রূপ গড়ে তুলেছি?

"এখানে দায়ী হল দৈবচক্র: আমি চেঙ্গিজ খানকে দেখেছিলাম স্বপ্নে। স্বপ্নে দেখলাম সে তার ছাউনির প্রবেশ-পথের মুখে বসে আছে। ছাউনিটা ছিল সাধারণ কোন ধনী যাযাবরের ছাউনির মতো — রঙবেরঙের ছোট-বড় নানারকম গালিচায় মোড়া। চেঙ্গিজ খান তার বাঁ পায়ের গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে, দু' হাতে ডান হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসে আছে। সে আমাকে তার পাশে বসার আমন্ত্রণ জানাল, তারপর আমরা কথাবার্তা চালাতে লাগলাম। হঠাৎ সে বলে বসল, আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে নামবে।

" 'তোমার শক্তি যে আমার চেয়ে বেশি?'

" 'তাতে কী আছে? দেখাই যাক না,' সে শান্তভাবে উত্তর দিল।

"আমরা এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর বদল করতে করতে রুশ কায়দায় 'জাপটাজাপটি' কুস্তি জুড়ে দিলাম। এমন সময় আমি অনুভব করলাম যে চেঙ্গিজ খানের কঠিন আলিঙ্গনে আমার পিঠ বেঁকে যাচ্ছে, শিরদাঁড়া প্রায় ভাঙে ভাঙে। 'কী করা যায়? কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়?' আমি স্বপ্নের মধ্যে ভাবলাম। 'এখনই আমার শেষ, মৃত্যু আর কালো অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে?' কিন্তু একটা সুখকর ভাবনা আমার মনে জাগল: 'চালাকিতে আমার সঙ্গে পারতে হচ্ছে না। এটা ত নিছকই স্বপ্ন, আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জেগে উঠতে হয়।' আমি চেষ্টা করে জেগে উঠলাম। সেই মুহূর্ত থেকে চেঙ্গিজ খানের রূপ আমার কাছে জীবন্ত হয়ে দেখা দিল।

"জাগ্রত অবস্থায়ই আমি চেঙ্গিজ খানের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে মনস্থ করলাম এবং তার যুগ সম্পর্কে কঠোর অধ্যয়ন শুরু করে দিলাম।"

'চেঙ্গিজ খান' উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার যে সমস্ত আকরগ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন তাদের সবগুলোর হিসাব দেওয়া কঠিন। তার মধ্যে আছে প্রাচীন মোঙ্গল, চৈনিক ও পারসিক ঘটনাপঞ্জী, রশীদ উদ্-দিন, ইবন আল-আসির ও নেসাভি রচিত বিবরণী এবং আরও বহু রচনা; আছে বার্তোল্দ, বেরেজিন, ভ্লাদিমিরৎসেভ, দ্য' ওস্সোঁ ও হাওয়ার্ডের মতো রুশ ও ইউরোপীয় বিদ্বজ্জনের রচনা। তাই বলে ভাসিলি ইয়ানের এই উপন্যাস আদৌ ঐতিহাসিক আকরগ্রন্থের চর্বিত চর্বন নয়। এ গ্রন্থ একাধারে ইতিহাসবিদ ও শিল্পীর মৌলিক সৃষ্টি।

উপন্যাসের অভিপ্রায় গ্রন্থকার নিজেই নির্দিষ্ট করে বলেছেন। তিনি লিখেছেন: "চেঙ্গিজ খানের ছিল একটি বদ্ধমূল চিন্তা, অভিযান-মোহগ্রস্ত স্বপ্ন — নির্মম উপায়ে, বিন্দুমাত্র করুণা না দেখিয়ে পশুশক্তির সাহায্যে নানা জাতির উচ্ছেদ ঘটিয়ে দুনিয়াকে বশীভূত করার অভিলাষ। সে সকলকে বুঝিয়েছিল দুনিয়ার সর্বত্র সে শৃঙ্খলা কায়েম করতে চায়। কিসের শৃঙ্খলা? কল্যাণের, প্রেমের, পরম সত্যের? না! সে নিজেই বলেছে: 'আমি সর্বত্র কবরের নিস্তব্ধতা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, দুনিয়ার বুক থেকে শহর উচ্ছেদ করতে চাই, যাতে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে সবুজ, মুক্ত স্তেপ, চরে বেড়ায় মোঙ্গলদের ঘোড়ার দল, দাঁড়িয়ে থাকে যাযাবরদের নীরব আস্তানা — যেখানে দুগ্ধবতী মোঙ্গল নারীরা তাদের নধর, প্রফুল্ল

শিশুদের স্তন্য দান করবে'।"... রক্তাক্ত উপায়ে কাজে পরিণত চেঙ্গিজ খানের এই চিন্তা "মানবজাতির উচ্চতম আদর্শের বিরোধী বলে বিনাশের মুখে পতিত হয়," — গ্রন্থকার মন্তব্য করেন।

ভাসিলি ইয়ান তাঁর গ্রন্থ রচনা শুরু করেন তিরিশের দশকে, এমন এক সময়ে যখন নূতন এক বিজেতার — জার্মান ফ্যাশিবাদের কালো মেঘ ইউরোপের দেশগুলোর ওপর পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। বিশ্বের, ইউরোপের এবং নিজের দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লেখকের ভাবনা-চিন্তা তাঁর উপন্যাস-ত্রয়ীর পরিকল্পনায় প্রতিফলিত না হয়ে পারে নি।

এটা আকস্মিক নয় যে গ্রন্থকার বলতে গেলে তাঁর সমসাময়িকদের উদ্দেশ্য করেই উপন্যাস সমাপ্ত করেছেন এক বিচক্ষণ কাহিনীকারের বাণী দিয়ে — যার জন্মভূমি সমৃদ্ধ খরেজম বিজেতাদের আক্রমণে ধরণীর বুক থেকে মুছে গেছে: "খরেজমের সকল অধিবাসী যদি দৃঢ়তা সহকারে, ঐক্যবদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসার তরবারি উত্তোলন করিত, যদি আপন আপন প্রাণের মায়া পরিত্যাগপূর্বক মাতৃভূমির শত্রুবর্গের উপর আক্রমণ করিত তাহা হইলে উদ্ধত মোঙ্গলগণ এবং তাহাদিগের লোহিতশ্মশ্রুধারী অধিপতি ষণ্মাসও খরেজমে তিষ্ঠিতে পারিত না, তাহাদিগকে চিরকালের জন্য আপন স্তেপভূমিতে পলায়ন করিতে হইত।... মোঙ্গলগণ যে বিজয় অর্জন করে তাহার কারণ উহাদিগের বক্র তরবারির শক্তি ততটা নহে যতটা হইল প্রতিপক্ষের মধ্যে মতভেদ, তাহাদিগের নমনীয় মনোভাব এবং ভীরুতা।"... ইউরোপে যারা বলপ্রয়োগ ও লুণ্ঠনের 'শৃঙ্খলা' প্রতিষ্ঠা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল বিশ্বপ্রভুত্বের আর এক নতুন দাবিদার হিটলারী নাৎসীদের অভ্যুদয়ের প্রতিও এই কথাগুলো ইতিহাসের রায়দানের মতো শোনায়।

লেখক শত্রুর বিরুদ্ধে স্বদেশবাসীর বিজয় দেখেছেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫৪ সনে। মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি তার উপন্যাস-ত্রয়ীর শেষ খণ্ড 'শেষ সাগরের সন্ধানে' সম্পূর্ণ করে যান।

প্রায় দু' দশকের কঠিন শ্রমের ফসল ভাসিলি ইয়ানের উপন্যাস-ত্রয়ী 'মোঙ্গল অভিযান' রুশ ইতিহাসের শোকাবহ অধ্যায় চিত্রণকারী এক বিশাল ও বর্ণাঢ্য চিত্রপট। 'চেঙ্গিজ খান' খণ্ডে উপন্যাস-ত্রয়ীর রুশ অধ্যায়টি স্পর্শ করা হয়েছে মাত্র। উপন্যাসটির মাত্র একটি আখ্যানাংশে — কাল্‌কা নদীর ঐতিহাসিক লড়াইয়ে কিয়েভ রুসের সঙ্গে মোঙ্গল যাযাবরদের সঙ্ঘর্ষ বর্ণিত হয়েছে।

উপন্যাস-ত্রয়ীর অন্য দু'টি খণ্ডে রুশ প্রসঙ্গ বৃদ্ধি পেয়েছে। আদ্রিয়াতিক সাগর পর্যন্ত যার বাহিনী গিয়েছিল সেই বাতুর অভিযান বর্ণনা প্রসঙ্গে ভাসিলি ইয়ান রুশ জনগণের পুরুষোচিত সংগ্রামের বিরাট তাৎপর্য উদ্ঘাটন করেছেন —১৩৮০ সনে কুলিকোভো প্রান্তরের এই যুদ্ধে রুশীদের বিজয় হয়। শেষ খণ্ডে মহান রুশ কবি পুশকিনের যে বাণী উদ্ধৃত হয়েছে সমগ্র উপন্যাস-ত্রয়ী পুরোপুরিভাবে তার উজ্জ্বল শিল্পমণ্ডিত দৃষ্টান্ত রূপে গৃহীত হতে পারে: "রাশিয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল সৌভাগ্য... তার অনন্ত প্রসারিত প্রান্তর মোঙ্গলদের শক্তিকে গ্রাস করে এবং ইউরোপের ঠিক প্রান্তদেশে তাদের বিজয় অভিযানের গতি রোধ করে দেয়; বর্বরদের পক্ষে রণাঙ্গনের পশ্চাদ্ভাগে রুশদেশকে পরাধীন করে ধরে রাখার স্পর্ধা হল না। খণ্ড-বিখণ্ড ও মৃতকল্প তার সদ্যসূচিত শিক্ষালোক তাকে রক্ষা করল।"...

ভাসিলি ইয়ানের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নের তেমনি বিদেশের পাঠকসমাজে বিপুল সমাদর লাভ করে। 'চেঙ্গিজ খান' রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়, ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, ফিনল্যাণ্ডে, আর্জেণ্টিনায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং আরও বহু দেশে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। জনৈক সোভিয়েত সমালোচকের ভাষায়: "শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি কোনরকম মিথ্যা মোহ না রেখে অসত্যের প্রতি সম্পূর্ণ আপসহীন মনোভাব নিয়ে লিখিত এই গ্রন্থ সোভিয়েত চিরায়ত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি রাখে।"

ভাসিলি ইয়ান

চেঙ্গিজ খান

পাঠক, সালাম !

"আকাশে বাজপাখি — অসহায় ডানা বিনা। মাটিতে মানুষ — অক্ষম ঘোড়া ছাড়া।

যা ঘটে, তার কারণ আছে। রশির গোড়া টানলে, তার শেষ পাওয়া যায়। বিশ্বচরাচরের প্রান্তরে সঠিক পথ ধরে অগ্রসর হলে মুসাফির তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে, আর ভুল-ভ্রান্তি ও অন্যমনস্কতা তাকে টেনে নিয়ে যাবে বিনাশের নোনা জমিতে।

সমৃদ্ধ জনপদ বিধ্বংসী আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাব, প্রবল পরাক্রান্ত অধিপতির বিরুদ্ধে নির্যাতিত জনগণের অভ্যুত্থান অথবা মাতৃভূমির উপর অদৃষ্টপূর্ব ও বর্বর কোন জাতির হামলা — এমন অসাধারণ কোন ঘটনা পর্যবেক্ষণের ভাগ্য যদি কারও হয়ে থাকে, তবে তার উচিত সে সব বিষয় কাগজে-কলমে ব্যক্ত করা। আর কলমের আঁচড়ে কথার মালা গাঁথার বিদ্যা তার জানা না থাকলে নিজের স্মৃতিকথা বলতে হয় কোন অভিজ্ঞ লিপিকরকে, যাতে লিপিকর পৌত্র-প্রপৌত্রাদির শিক্ষার জন্য সেই কথনকে পুঁথির স্থায়ী পাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারে।

বিস্ময়কর ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি নীরব, তার দশা সেই কৃপণের মতো — যে মৃত্যুর শীতল কর তার শিয়র স্পর্শ করছে দেখে ধনরত্ন পুঁটলি বেঁধে মরুভূমির বুকে পুঁতে রাখে।

খাগের আগা শানিয়ে তা কালিতে ভেজানোর পরও কিন্তু আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম। বহু জাতির নির্মম উৎসাদনকারী চেঙ্গিজ খান ও তার নৃশংস সেনাবাহিনীর কথা হুবহু ব্যক্ত করার উপযুক্ত ভাষা ও শক্তি আমার আছে কি?.. উত্তর মরু প্রান্তর থেকে আগত সে বন্যদের হামলা ছিল ভয়ঙ্কর — বাহিনীর পুরোভাগে টগবগিয়ে চলে তাদের পিঙ্গলশ্মশ্রুধারী অধিপতি, অক্লান্ত অশ্বের সওয়ার

হয়ে মাভেরান্‌নগর ও খরেজমের* শান্তিপূর্ণ উপত্যকার উপর দিয়ে ছুটে চলে উন্মত্ত সৈন্যের দল, যাত্রাপথের পেছনে পড়ে থাকে হাজার হাজার খণ্ডবিখণ্ড মৃতদেহ, পলকে পলকে জন্ম নেয় নিত্যনব সন্ত্রাস, আর লোকেরা বলাবলি করতে থাকে: "দগ্ধ জনপদের ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে দিগন্ত কি মুক্ত হবে, না কি এখানেই মহাপ্রলয়ের শুরু?.."

চেঙ্গিজ খান সম্পর্কে এবং মোঙ্গলদের অভিযান সম্পর্কে আমি যা কিছু জেনেছি ও শুনেছি, অনেকেই সে সব কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। বহুদিন আমার দ্বিধা ছিল। এখন অবশ্য আমি ভেবে দেখলাম যে আমার নীরবতায় কোন লাভ নেই। তাই সমগ্র মানবজাতির জীবনে, বিশেষ করে চাষীদের শান্তিপূর্ণ জীবনে যে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে, যার তুলনীয় কোন কিছু দুনিয়ায় কোন দিন, কোন রাতেরই অভিজ্ঞতায় নেই, সেই বৃহত্তম বিপর্যয়ের কথা, দুর্ভাগ্যপ্রপীড়িত খরেজমের কথা লিখব বলে আমি মনস্থ করেছি।

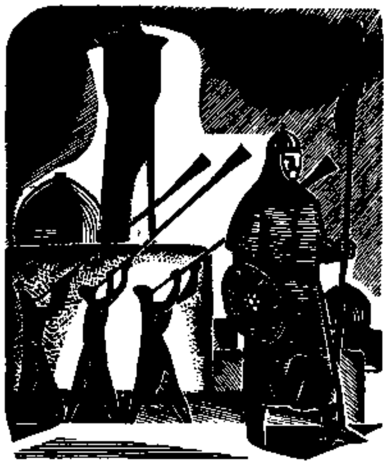
আর কথা না বাড়িয়ে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমার বিবৃত সমস্ত ঘটনা যে সত্যি সত্যিই ঘটেছিল প্রাচীনেরা তা সমর্থন করবেন।

অধ্যবসায়ী ও ধৈর্যবান ব্যক্তি সূচিত কর্মের শুভ পরিণতি দেখতে পাবেন, জ্ঞানপিপাসুরা জ্ঞানের সন্ধান পাবেন।"

---

* মাভেরান্‌নগর — আমু-দরিয়া ও সির-দরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলের নাম। 'তুর্কিস্তান' কথাটি তখনও জানা ছিল না। খরেজম — আমু-দরিয়ার নিম্ন অববাহিকায় অবস্থিত রাজ্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরল সাগর থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিশাল এলাকা খরেজম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ছিল।

প্রথম খণ্ড



বিশাল খরেজম-শান্ত জনপদ



প্রথম অধ্যায়

দরবেশের আলখাল্লায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সোনার বাজপাখি

> আমাদের নিবাস এই ধরণী এক বিপর্যস্ত জরাজীর্ণ বিবর্ণ বসনের মতো। এ যেন চতুর্দিক থেকে অনন্ত সাগরমালা বিধৌত একটি দ্বীপ।
>
> (প্রাচীন আরবী পাঠ্যগ্রন্থ থেকে)

অকালে বসন্ত নেমে এলেও কারা-কুমের বিশাল প্রান্তরের ঊষর বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে তুষার ঝড়ের কামাই নেই। যে কয়টি শীর্ণবক্র ফাঁকা ফাঁকা ঝোপঝাড় বালি ভেদ করে উঠেছে, মত্ত বায়ুপ্রবাহে তারা আছড়ে পড়ছে। পেঁজা বরফ মাটির ওপর ঘূর্ণী তুলেছে। গম্বুজাকৃতি ছাদে ঢাকা মাটির কুটিরের দেয়াল ঘেঁসে এলোমেলোভাবে জমায়েত হয়ে রয়েছে

গোটা দশেক উট। কারাভানের লোকজন কোথায় গেল? চালকেরা ভারী বোঝাগুলো নামিয়ে মাটিতে সার বেঁধে রাখে নি কেন?

উটগুলো তুষারমাখা ঝাঁকড়া মাথা তোলে, তাদের বিষণ্ণ কাতর আর্তনাদ বাতাসের হুহুঙ্কারের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। দূরে ঘণ্টি বেজে ওঠে।... উটগুলো সেই দিকে মুখ ফেরায়। দেখা গেল এক কৃষ্ণকায় গর্দভ। পুচ্ছদেশ আঁকড়ে ধরে তার পেছন পেছন ক্লান্ত পদক্ষেপে চলেছে এক শ্মশ্রুধারী। লোকটার পরিধানে দরবেশের দীর্ঘ আলখাল্লা, মাথায় চোঙ্গা তাজ আর তার ওপর মক্কা থেকে হজ-ফেরত যাত্রীর মতো সাদা ফেটি বাঁধা।

"আগে চল্, আগে চল্! আর কয়েক পা এগোলেই তোর ভাগে খড় জুটবে। এই দ্যাখ, প্রাণের বন্ধু বকির, কাদের দেখা পেয়ে গেলাম আমরা! যেখানে উট, সেখানে উটের মনিবেরা বিশ্রাম নিচ্ছে, চাকর-বাকরেরা ইতিমধ্যে আগুন জ্বালিয়েছে। আগুনের কাছে, যেখানে দশ জনে জড়ো হয়েছে, সেখানে কি আর বাড়তি একজনের জন্য এক মুঠো জাউ জুটবে না? এই যে, এখানে কে আছে? ইমানদার কেউ থাকলে সাড়া দাও!"

কোন সাড়া মিলল না। কারাভানের দলপতি-উটের গলার ঘণ্টি কেমন যেন ভাঙা ভাঙা আওয়াজ তুলল।

গাধাটাকে আরও কিছু দূর তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আপাদমস্তক বরফের গুঁড়োয় আচ্ছন্ন মুসাফির ধীরে ধীরে নীচু মাটির ঘের দেওয়া ডেরাটার চারদিক ঘুরে দেখল। নানারকম নক্সা খোদাই করা দরজাটা খুঁটি ঠেকিয়ে বন্ধ করা। কুটিরের পেছন দিকে বালির ঢিবিতে ঘেরা জমির ওপর বহু যত্নে কালো ও সাদা নুড়ি পাথরে সাজানো সারি সারি নীরব সমাধি দাঁড়িয়ে আছে।

"এই শান্ত উপত্যকার চিরনিদ্রিত সম্মানিত অধিবাসীরা, আপনাদের সংবর্ধনা জানাচ্ছে দরবেশ হাজি রহিম বাগদাদি।" মুসাফির উলুখাগড়ায় ছাওয়া চালার নীচে গাধা বাঁধতে বাঁধতে অস্ফুটস্বরে বলল। "এই নির্বাক দলটির পাহারাদার কোথায়? কুঁড়ে ঘরের ভেতরে আছে কি?"

রুটির টুকরো গুঁড়ো করে রঙচঙে থলেয় পুরে দরবেশ থলেটা গাধার মুখে এঁটে দিল।

"আমার প্রাণের বন্ধু, আমাদের যেটুকু খাবার অবশিষ্ট ছিল তা তোকে

দিয়ে দিলাম। তোর দরকার বেশি। রাতে যদি আমরা হিমে জমে না যাই, তাহলে কাল তুই আমাকে আরও দূরে বয়ে নিয়ে যাবি। ঐশ্বর্যময়ী আরবভূমির খেজুর গাছের নীচে যে উত্তাপ পেয়েছি তার স্মৃতিই আমার শরীরে তাপ দেবে।"

দরবেশ খুঁটিটা সরিয়ে ফেলে দোর খুলল। কুটিরের মাঝখানে, যেখানে সচরাচর আগুন জ্বলে, সেখানে নেভা কাঠকয়লা ছাইয়ে ঢাকা পড়ে আছে। ছাদটা গম্বুজের আকারে ওপরের দিকে উঠে গিয়ে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ধোঁয়া বেরোবার জন্য ফাঁক রাখা হয়েছে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে চারটি লোক।

"আপনাদের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি!" দরবেশ বলল। তার কথার কোন জবাব এলো না। দরবেশ আরও এক পা এগিয়ে গেল। উপবিষ্ট মূর্তিগুলোর নিশ্চলতা, তুষারীভাব ও পাণ্ডুর চেহারা চোখে পড়ামাত্র সে ঝটিতি দরজার দিকে পা বাড়াল, লাফিয়ে বাইরে চলে এলো।

"হাজি রহিম, বিড়বিড় করা তোমায় সাজে না। চারটি লাশ অপেক্ষা করে রয়েছে, কে ওদের কাফনে জড়াবে। তুমি নিঃস্বই হও আর ক্ষুধার্তই হও তোমার এখনও শক্তি আছে, তুমি এখনও মহাবিশ্বের অন্তহীন পথে ভ্রমণ করতে পার।... পাশে গোটা একটি কারাভান বেওয়ারিস অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ইচ্ছে করলেই আমি ধনসম্পদের বোঝাসমেত এই উটগুলোর মালিক হতে পারি। কিন্তু সত্যসন্ধানী দরবেশের কিছুই দরকার নেই। সে দরিদ্র রয়ে যাবে, গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে আরও দূরে এগিয়ে যাবে। তবে বেচারি পশুপালকেও করুণা করতে হয় বৈকি।"

দরবেশ উটগুলোকে নিরীক্ষণ করে দেখল, তাদের বাঁধন আলগা করে দিল, তাদের সার বেঁধে সাজিয়ে হাঁটু মুড়ে বসিয়ে দিল। বোঝাগুলোর মধ্যে যবের থলি খুঁজে পাওয়া যেতে সেখান থেকে কয়েক মুঠো করে সে প্রতিটি উটের সামনে ছড়িয়ে দিল।

"কেউ যদি জিজ্ঞেস করে হাজি রহিম সারা জীবনে কোন ভালো কাজ করেছে কিনা তাহলে এই উটগুলো সমস্বরে গেয়ে উঠতে পারে: 'কনকনে ঝড়ো হাওয়ার দিনে দরবেশ আমাদের খাবার দিয়েছে, আমরা তাই ঠাণ্ডায় মরে যাই নি'।"

সারারাত দরবেশ তার গর্দভের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে উলুখাগড়ার গাদায় শুয়ে থাকে, গাধাটা গাদার মধ্যে পা ডুবিয়ে চুপচাপ ঝিমোয়। ভোরে হাওয়ায় মেঘ উড়ে যেতে পূবে সূর্য দেখা দিল।

কবরের ওপর থেকে গোলাপী কিরণ লাফিয়ে উঠছে দেখে দরবেশ উঠে দাঁড়াল।

"পথে নামা যাক, বকির, চল্ এগোই!"

অবশিষ্ট যবের থলি গাধার ওপর চাপিয়ে দরবেশ কুটিরের ভেতর উঁকি মারল। দেয়ালের ধারে উপবিষ্ট চারটি মূর্তির জায়গায় এখন মাত্র একটি রয়ে গেছে। খোলা বাদামী চোখজোড়া ঘোলাটে ও নিস্পন্দ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

"বাকি লাশগুলো গেল কোথায়? কবরে গিয়ে শুয়ে পড়ল নাকি? না, হাজি রহিমের আর এখানে থাকার প্রবৃত্তি নেই; সে যাবে আরও দূরে, খরেজম শহরে, যেখানে আছে বহু সুখী প্রাণ, যেখানে অবিরাম জ্ঞানীদের বচনামৃত ঝরে।"

"ইমানদার, আমাকে সাহায্য কর!" ভাঙা গলার ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ শোনা গেল। উপবিষ্ট লোকটির ঢেউ খেলানো দাড়ি নড়ে উঠল।

"কে তুমি?"

"মাহ্‌মুদ..."

"তুমি কি খরেজম থেকে?"

"আমার সোনার বাজে আছে..."

"ওঃ!" দরবেশের অবাক হওয়ার পালা। "ইমানদার লোকে কি মরার সময় তার বাজপাখির কথা ভাবে? জল খাও!"

অসুস্থ লোকটি অতি কষ্টে দরবেশের কুমড়োর খোল থেকে কয়েক ঢোক জল খেল। তার বিভ্রান্ত দৃষ্টি দরবেশের দিকে নিবদ্ধ হয়ে রইল।

"ভয়ঙ্কর জখম করে গেছে আমাকে... কারা কন্‌চারের দস্যুরা।...* আমার তিন জন সঙ্গী খতম হয়ে গেছে, কে যেন দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, আমরা তাই বেরোতে পারি নি।... ইমানদার হয়ে যদি

---

* কারা কন্‌চার — কালো খঞ্জর।

ইমানদারকে বিপদে ফেলে যাও ত খুন করার চেয়ে বড় পাতক হবে... — মাজহারি শরিফে* তা-ই বলা হয়েছে।...”

জ্বরবিকারে লোকটার দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল, অনুনয়ের ভঙ্গিতে দরবেশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে অসহায়ভাবে কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ল।

হাজি রহিম আহতের পশমী পোশাক টেনে খুলে ফেলল। বুকের ওপরের একটা কালচে ক্ষত থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছিল।

“রক্ত বন্ধ করা দরকার। কী দিয়ে বাঁধা যায়?”

মেঝেয় একটা মোটা গোছের নিখুঁত পাকানো সাদা পাগড়ি পড়ে ছিল। দরবেশ সেটার পাক খুলতে বসে গেল।

পাগড়ির মিহি মসলিনের ভাঁজ থেকে একটা ডিম্বাকৃতি সোনার ফলক খসে পড়ল। দরবেশ সেটাকে তুলল। তাতে সূক্ষ্মভাবে খোদাই করা আছে ডানামেলা এক বাজপাখি, সেই সঙ্গে রাস্তা ধরে চলা পিঁপড়ের সারির মতো কতকগুলো উদ্ভট অক্ষরে কী যেন লেখা।

দরবেশ ভাবনায় ডুবে গেল, আরও ভালো করে আহতের দিকে তাকিয়ে দেখল।

“এই লোকটির ওপর ভবিষ্যতে প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষী সঙ্ঘর্ষের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই হল তাহলে জ্যান্ত মড়ার রহস্য,” দরবেশ ফিস্‌ফিস্ করে বলল। “এটা হল মহাপরাক্রান্ত তাতার খান-ই-খানান-এর পয়জা**। এটাকে সযত্নে রক্ষা করা দরকার। আহত লোকটা তার হুঁশ ও শক্তি ফিরে পেলেই আমি এটা ওকে ফেরত দেব।” এই বলে দরবেশ সোনার ফলকটাকে তার চওড়া কটিবন্ধের ভাঁজে লুকিয়ে রেখে দিল।

পাগড়ির মিহি মসলিন দিয়ে আহত লোকটার বুকের ক্ষত বাঁধতে

---

* মাজহারি শরিফ — 'কোরান' মুসলিমদের কাছে এই নামে পরিচিত।

** পয়জা — চেঙ্গিজ খানের হুকুম খোদাই করা ধাতুর অথবা কাঠের ফলক। মোঙ্গল শাসিত এলাকার ওপর দিয়ে অবাধ গমনের ছাড়পত্র হিশেবে পয়জার প্রচলন ছিল। পয়জার অধিকারী বিরাট সুযোগ-সুবিধা লাভ করত: স্থানীয় শাসন বিভাগ তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে, অশ্ব, পথপ্রদর্শক ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে বাধ্য থাকত।

বেশ সময় লেগে গেল। তারপর দরবেশ কুটিরের বাইরে এসে একটি উটকে উঠিয়ে দোর গোড়ায় নিয়ে এলো। উটটাকে হাঁটু মুড়ে বসিয়ে সে আহতকে বয়ে আনল, লোমের পাকানো দড়িতে বেঁধে তাকে উটের দুই রোমশ কুঁজের মাঝখানে বসিয়ে দিল।

সূর্য যখন বালির টিলাগুলোর ওপরে উঠল তখন দরবেশ গলা বরফের মধ্য দিয়ে স্তেপের প্রায় অলক্ষিত পায়ে-চলা-পথ ধরে চলল। তার পিছু পিছু গাধা খুট্-খুট্ করে খুর ফেলে চলে, আর গাধার পেছনে পা ফেলে জোড়া কুঁজওয়ালা বিশাল উট। উটের ওপর বাঁধা আহত লোকটি অসহায়ের মতো এদিক-ওদিক দুলতে থাকে।

"আগে চল, বাকির! শিগ্গিরই পৌঁছুব গুরগঞ্জে*, যেখানে তোর প্রচুর শুকনো ঘাস জুটবে। এখানে বিপদ আছে। টিলার ওপার থেকে দস্যু কারা কন্চার লাফিয়ে পড়বে, তোর প্রভুকে গোলাম করে ফেলবে আর তোর গায়ের কালো চামড়া খুলে নেবে। শিগ্গির, এখান থেকে পালাতে হবে!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাযাবরের ছাউনিতে

খরেজম শাহের** জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ জালাল উদ্-দিন মেংবুরানি কারা-কুমের বালুকাভূমিতে শিকার করছিল। বাছা বাছা ঘোড়ায় চেপে দু'শ' বেপরোয়া ঘোড়সওয়ার তার সঙ্গী হয়েছে। ওরা তামিল করতে এসেছে শাহের গোপন হুকুম — জালাল উদ্-দিন যাতে খরেজমের সীমানার বাইরে গা ঢাকা দিতে না পারে সেই দিকে নজর রাখছে। ঘোড়সওয়াররা স্তেপের ওপর অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে বুনো ছাগল ও গাধাগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে টিলার সারির দিকে — যেখানে চাকর-বাকরেরা

---

* গুরগঞ্জ — আমু-দরিয়ার নিম্ন অববাহিকায় অবস্থিত, খরেজমের রাজধানী, পরবর্তীকালে মোঙ্গলদের হাতে বিধ্বস্ত।

** খরেজম শাহ — ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় খরেজমের শাসক, অন্যতম পরাক্রান্ত মুসলিম অধিপতি।

আগে থেকেই সাদা চুড়োয় ঢাকা কালো রঙের তাঁবু খাটিয়ে সমস্ত শিকারীর জন্য ভোজের আয়োজন করছে।

বসন্ত তার প্রথম বিরল পুষ্পগুচ্ছ বালির ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে, চোখ ধাঁধানো আলোয় ভাসমান তুষারের শেষ কণাটুকুও দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। শিকারের তৃতীয় দিনে আকাশ হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এলো। উত্তর দিকের কিপচাক স্তেপভূমি* থেকে ঠান্ডা হাওয়া ছাড়ল, তুষারের ঘূর্ণিঝড় উঠল।

মিশকালো রঙের তেজী আর্গামাক ঘোড়ায় চেপে একটা আহত মর্দা ছাগলের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে জালাল উদ-দিন তার সঙ্গী-সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সে দেখতে পেল যে ছাগলটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে কান খাড়া করে সন্তর্পণে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। শিকার একেবারে হাতের সামনে, কিন্তু জন্তুটা তার খুদে বাঁকানো শিং জোড়া ঝাঁকিয়ে আবার স্তেপ বরাবর ছুটল। একরোখা, ক্রোধান্ধ খানও সামনে উদ্যত কালো লেজের ঝাপ্টানি লক্ষ্য করে তার ঘর্মাক্ত তেজীয়ান ঘোড়ার কদম ছুটিয়ে দিল।

ছাগলটা শেষকালে তীরবিদ্ধ হল, তাকে ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা হল। ইতিমধ্যে ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে, পথ তুষারে ছেয়ে গেছে। জালাল উদ-দিনের বুঝতে বাকি রইল না যে সে পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং ঝড় কয়েক দিন ধরে চললে সে মারাও যেতে পারে। লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টানতে টানতে সে হাওয়ার বিরুদ্ধে চলতে লাগল। রাত হয়ে এলো। শেষকালে অবসন্ন খান ঘোড়ার গায়ের আচ্ছাদনের ভাঁজ খুলল, ঘোড়াটাকে ঢেকে দিল এবং প্রায় সর্বাঙ্গ বরফে আচ্ছন্ন হয়ে সারা রাত বসে রইল।

সূর্য উঠল, হাওয়া পড়ে এলো। বরফ গলতে লাগল, বালির ঢিপিগুলোর মাঝখান দিয়ে জলধারা বয়ে চলল। দূরের দিকে তাকাতে তাকাতে জালাল উদ-দিন পথ-নির্দেশ ধরনের একটা স্তূপ দেখতে পেল — শুকনো ডালপালা ও হাড়গোড় দিয়ে তৈরি ঢিপি। সাগরের মতো একাকার প্রান্তরের মধ্যে এটা পথের দিশারী। খান সেই দিক লক্ষ্য

---

* কিপ্চাক স্তেপভূমি — নীপার থেকে শুরু করে পূব দিকে সেমিরেচিয়ে (সপ্তনদ) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল তুর্কী বংশোদ্ভূত অসংখ্য যাযাবর জনগোষ্ঠী কিপচাকদের বাসভূমি।

করে চলল। বালির ঢিপিগুলোর শ্রেণীর মাঝখানে কাদামাটির উপত্যকায় চারটি দুর্দশাগ্রস্ত ঝুলপড়া ছাউনির স্থান হয়েছে।

কুকুরের তর্জন-গর্জন শুনে তাঁবু থেকে এক বুড়ো তুর্কমেন যাযাবর বেরিয়ে এলো। কাঁধে ফেলা ছাগলের চামড়ার আলখাল্লা সামলে নিয়ে সে সসম্ভ্রমে অশ্বারোহীর দিকে এগিয়ে এলো, আপ্যায়নের ভঙ্গিতে ঘোড়ার লাগাম স্পর্শ করল।

"আমার এ ঘর যদি তেমন দরিদ্র বলে মনে না হয়, তবে আসতে আজ্ঞা হোক হুজুর!" বহুমূল্য পরিচ্ছদ, ভারী রেশমের রক্তিম সালোয়ার, উপরন্তু একমাত্র সুলতানেরই উপযুক্ত বাহন মিশকালো রাজকীয় অশ্ব দেখে বিস্মিত বৃদ্ধ বলল।

"সালাম! তোমার কাছে যব আছে? আমি দুনো দাম দেব।"

"মরুভূমিতে শস্য টাকাকড়ির চেয়ে দামী। তবে দামী মেহমানের জন্য মিলবে বৈকি। যবের বদলে আপনার ঘোড়াকে বাছাই গম খাওয়ানো হবে।..."

পাশের ছাউনি থেকে হাতে ঘোরানো যাঁতার ঘর্ঘর আওয়াজ আসছিল — মেয়েরা গম পিষছে।

"এই কে আছ, শোন! ঘোড়াটা ধর!"

তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো দুই তরুণী — টকটকে লাল কামিজের প্রান্তদেশ তাদের পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলছে, বুকের অলঙ্কার ও মুদ্রা টুংটাং বাজছে, মাথায় ঈষৎ স্বচ্ছ অবগুণ্ঠনের আঁচলে তাদের মুখ ঢাকা। ওরা দু'দিক থেকে ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল।

খান তাঁবুতে প্রবেশ করল। ভেতরে গরম। মাঝখানে ধুনোজাতীয় কিছু জ্বালানো হয়েছে — সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে। দেয়ালের কাছে কম্বলের ওপর কে একজন চিৎ হয়ে পড়ে আছে। কালো দাড়ির আড়ালে তার রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখ এবং বুকের ওপর ভাঁজ করে রাখা দু'টি হাত দেখে বুঝতে বাকি থাকে না যে লোকটি আসন্ন মৃত্যু পথযাত্রী। থেকে থেকে দমকা নিঃশ্বাস পড়ছে — অবসন্ন দেহপিঞ্জরে যেন মরিয়ার লড়াই চলছে।

রোগীর পায়ের কাছে বসে আছে এক শ্মশ্রুধারী দরবেশ, মাথায় চোঙ্গা তাজ আর তার ওপর সাদা ফেটি বাঁধা — হাজির* চিহ্ন। তার

* হাজি — মক্কায় হজ অর্থাৎ তীর্থ সমাপনকারী।

অর্ধনগ্ন দেহে চাপানো রয়েছে রঙ বেরঙের তালি মারা এক ঢিলে আলখাল্লা।

"সালাম আলেইকম্!" এই বলে জালাল উদ-দিন অসুস্থ লোকটির পাশে পাতা কম্বলের ওপর শুয়ে পড়ল। চোখ অবধি অবগুণ্ঠনে ঢাকা এক বাঁদী এসে খানের পা থেকে সবুজ রঙা ভিজে জুতো জোড়া খুলে দিল। জালাল উদ-দিন বাঁকা তরবারি-আঁটা চামড়ার কটিবন্ধটা খুলে নিজের পাশে রাখল।

"আপনি কে?" সে দরবেশকে জিজ্ঞেস করল। "আপনার পোশাক দেখে ত মনে হয় দূর দূর দেশ ঘুরেছেন।"

"আমি দুনিয়া ঘুরে ঘুরে মিথ্যার সমুদ্রে সত্যের দ্বীপ খুঁজে বেড়াই।..."

"দেশ কোথায়? যাচ্ছেনই বা কোথায়?"

"আমার নাম হাজি রহিম, লোকে আমাকে বাগদাদিও বলে, কেন না আমি বাগদাদে পড়াশুনা করেছি। সবচেয়ে খ্যাতিমান, মহাত্মা ও জ্ঞানী-গুণী লোকেরা ছিলেন আমার গুরু। আমি বহু বিদ্যা অধ্যয়ন করেছি, প্রাচীন পহ্লবী ভাষায় লেখা আরব, তুরস্ক ও পারস্যের বহু লোককাহিনী পড়েছি। কিন্তু অনুশোচনা এবং গভীর পাপবোধ ছাড়া আমার অল্পবয়সের আর কোন চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না।..."

জালাল উদ-দিন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করল।

"তা কোথায় চলেছেন, এবং কেন?"

"আমি পাঁচ সমুদ্রের মাঝখানে এই যে চেপ্টা দুনিয়াটা আছে, তার ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াই, নগর, মরূদ্যান ও মরুভূমি ঘুরি, খুঁজে ফিরি সেই মানুষ, যার ভেতরে জ্বলছে দুর্বার উদ্দীপনার আগুন। আমি চাই অসাধারণকে দেখতে, সত্যিকারের বীর ও সত্যাশ্রয়ীকে শ্রদ্ধা জানাতে। এখন আমি চলেছি গুরগঞ্জের দিকে। শুনেছি সে নাকি খরেজমের এবং তামাম দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর ও ধনী শহর, লোক বলে সেখানে সাক্ষাৎ মিলবে যেমন অপূর্ব জ্ঞানী-গুণী লোকের, তেমনি সেই সব অতি নিপুণ কারিগরের যাঁরা তাঁদের মহৎ শিল্পকর্মে নগরকে অলঙ্কৃত করেন।..."

"আপনি সেই সব বীরের খোঁজ করছেন, যাঁরা তলোয়ারের আগা দিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে নিজেদের কীর্তিগাথা লিখে যান?" এই বলে জালাল উদ-দিন বেশ চিন্তামগ্নভাবে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু বীরদের কীর্তিগাথা কি এমন আগুনঝরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবেন যাতে

তরুণ-তরুণীরা আপনারে গান গায়, যাতে বাহাদুর ঘোড়সওয়ার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে কিংবা বৃদ্ধেরা কবরের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে তা আবৃত্তি করে?"

দরবেশ কবিতায় জবাব দিল:

সঙ্গীতে রুদাকি* মানি যশস্বী ও ধনী,
আমিও অপূর্ব বাণী কম নাহি জানি।
কাব্যগুণে অন্ধকবি জিনেছেন বিশ্বচরাচর।
অগ্নিকুণ্ড ঘিরি স্তেপে জটলার প্রতি গীতি মোর...

খান যে ছাগলটা শিকার করেছিল গৃহকর্তা সেটাকে নিয়ে ছাউনিতে ঢুকল। ইতিমধ্যে চামড়া ও নাড়িভুঁড়ি ছাড়িয়ে সাফ করা হয়ে গেছে।

"আপনার খানা তৈরি করার জন্য কিছুটা গোস্ত মেয়েদের দেবেন কি?"

"সকলেই খান! সবটা নিয়ে নিন!" জালাল উদ-দিন উত্তর দিল। "আমি কোন মনিবের হয়ে শিকার করতে আসি নি। আমি নিজেই মনিব, বেগের ছেলে, তাই শিকার মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা আমার নেই।..." এই বলে সে খাপ থেকে একটা সরু ছুরি বার করে ছাগলের পিঠের দিক থেকে কয়েকটা পাতলা মাংসের টুকরো কেটে নিল, টুকরোগুলোকে একটা তীক্ষ্ম শিকে গেঁথে অগ্নিকুণ্ডের ওপর সেঁকতে লাগল।

গৃহকর্তা ছাগলের ধড়টা মেয়েদের হাতে তুলে নিজে অতিথির পাশে বসে পড়ল। দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সে সবিনয়ে প্রশ্ন করল:

"আপনার তবিয়ত ভালো ত? কমজোরি বোধ করছেন না ত? গা গরম করেছেন? আপনার পিতা-মাতা কুশলে আছেন ত?"

খান নিজেও প্রথামত কুশল প্রশ্নাদি করার পর জিজ্ঞেস করল:

"যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলবেন কি এটা কার ছাউনি এবং আমি কোথায় আছি?"

---

* রুদাকি — বুখারা থেকে আগত নবম দশকের বিখ্যাত ফারসী কবি।

"নেস্‌সা* শহরের দিকে কারাভান চলার যে বড় রাস্তাটা গেছে তার সামান্য দূরে আমার ছাউনি, আর আমি হলাম কোরকুদ চোবান**, বিশাল স্তেপভূমিতে পথহারা এক সামান্য যাযাবর।''

ছাউনির বাইরে কুকুর সজোরে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। চিৎকার-চেঁচামেচি, বিলাপ ও কান্নার রোল শোনা গেল। ঘোড়ার খুরের টগবগ আওয়াজ কাছে এসে থেমে গেল। কে যেন রুক্ষ কণ্ঠে হাঁক পড়ল:

"তাঁবুতে কে আছে? সাড়া দাও বলছি কোরকুদ চোবান!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্তেপের ঘোড়সওয়ার

বুড়ো উঠে বাইরে চলে গেল। কথাবার্তা তেমন শোনা যায় না।

"ও এখানে এসেছে কেন?" ভাঙা গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে ঘোড়সওয়ার বলল। "ওর শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে নাকি?"

"ওরা তিন জনেই আমার মেহমান।"

''ওদের ঐ পোড়া কপালে আল্লাহ যে কী লিখন লিখেছেন তা দেখাব!''

"ওদের ছুঁতে পারবি না, বলছি! তা তোর এই নতুন গোলাম পাঁচটা কোত্থেকে এলো?"

"এরা ওস্তাদ কারিগর: তামার কারিগর আর অস্ত্রকার। কারাভানের সঙ্গে যাচ্ছিল। ইচ্ছে ছিল কারাভানটার 'দাড়ি ছেঁটে দেব'। তা কোত্থেকে শয়তান হাজির করল শ' দুয়েক ঘোড়সওয়ার — কোন এক নামজাদা বেগের জন্য শিকারের পেছনে তাড়া করছে। উটগুলোকে ছেড়ে দিতে হল, যারা চালাচ্ছিল তারা সব এদিক-ওদিক চম্পট দিল, আমি ছুটে এই পাঁচটি হুনরীকে ধরলাম। এখন এদের নিয়ে যাচ্ছি মের্ভে, ওখানে ভালো দরে বেচব।"

---

* নেস্‌সা — বর্তমান আশখাবাদের কাছাকাছি এককালের শক্তিশালী প্রাচীন দুর্গনগরী। পরবর্তী কালে তা মোঙ্গলদের হাতে বিধ্বস্ত এবং বালিগর্ভে সমাধিস্থ হয়। ১৯৩১ সনে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন।

** কোরকুদ চোবান — রাখাল কোরকুদ।

"আল্লাহ তোর সহায় হোন!"

গৃহকর্তা নতুন অতিথিকে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকল।

আগন্তুকটি তরুণ, দীর্ঘদেহী, সিধে তার দুই কাঁধ এবং কটিদেশ অতি ক্ষীণ। পাশ থেকে দামী সবুজ ছাগচর্মের খাপে ঝুলছে দীর্ঘ কন্‌চার-তরবারি। উঁচু সরু গোড়ালির ওপর উটের নরম চামড়ার তৈরি সবুজ বুট, ভেড়ার চামড়ার গোলাকার উঁচু টুপি এবং কালো চাপকানের বিশেষ ধরনের ছাঁট দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে লোকটা তুর্কমেন। চোয়ালের ওঠা হাড় এবং গাঢ় রঙের দৃঢ়ত্বব্যঞ্জক মুখ থেকেও তার সমর্থন মেলে।

"আগুনের কাছে এসে বস!" গৃহকর্তা আমন্ত্রণ জানাল।

আগন্তুক কিন্তু গালিচার ওপর বসল না, প্রবেশপথের সামনে দাঁড়িয়েই রইল। তার চোখ বিস্ফারিত হল, পেঁচার মতো গোল গোল আকার ধারণ করল।

"তুমি কে?" জালাল উদ-দিন চোখ না তুলেই প্রশ্ন করল।

"স্তেপের লোক।"

"পশু চরাও, না অন্য কোন ব্যবসা আছে?"

"আমি কারাভানওয়ালা সদাগরদের দাড়ি ছাঁটি।"

স্তেপের অধিবাসীদের রীতি অনুযায়ী এ জাতীয় উত্তর অমার্জিত। আগুনের ধারে অপরিচিতদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় সবাই সমান — এমন কি গায়ে দরিদ্র পোশাক থাকলেও, লোকে তখন নিজেদের মধ্যে শারীরিক অবস্থা, পশুপালের অবস্থা, পথের দূরত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে শিষ্ট প্রশ্নাদি করে। বোঝাই যাচ্ছে যে তুর্কমেন বিবাদের ছুতো খুঁজছে।

জালাল উদ-দিন একবার চোখ তুলে দৃষ্টি নামিয়ে ফেলল, কেবল তার মুখের কোণে খানিকটা কুঞ্চন দেখা দিল। মরুভূমির এক তুচ্ছ যাযাবরের সঙ্গে কিনা একজন খানদানি লোক ঝগড়া-ঝাঁটি বাধাতে যাবেন!

"কর্তা বললে যে তুমি নাকি গুরগঞ্জের পথ খুঁজছ?" তুর্কমেন একটুখানি চুপ করে থেকে বলল। "আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি।"

জালাল উদ-দিন সাহসী বটে, কিন্তু তার ঘোড়া পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এখানে সে নিরাপদ, আতিথেয়তার নিয়ম তাকে রক্ষা করছে। আর পথে এই তুর্কমেনটি তার পেছনে শিকারের মতো ধাওয়া করবে, যেমন সে নিজে কিছু আগে ধাওয়া করেছিল শিকারের পেছনে।

জালাল উদ-দিন তাই উত্তর দিল:

"এখন আমি গুরগঞ্জ যাচ্ছি না।"

"আমাদের দুঃখের দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার মুখে এই যে লোকটি কাতরাচ্ছে, এ কে?"

"দস্যুদের হাতে ঘায়েল হয়েছে," দরবেশ বলল। "সম্ভবত বেপরোয়া কারা কন্চারের কাজ। লোকে বলে, মরুভূমির এই চিতার হাতে নাকি কারও নিস্তার নেই।"

"আপনি কি ভাবেন যে কারা কন্চারের ওপর অন্যেরা লুঠতরাজ করে নি?"

দরবেশ উত্তর দিল:

"স্তেপের বুকে ভ্রমণের বায়ুতাড়িত বাদামের খোলা এই আমি ভাবার কে?"

"কারা কন্চারের বাস জলহীন দুর্গম নোনা জমিতে। ও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে — বালির বুকে ডুবে থাকা গিরগিটির মতো কিংবা উলুখাগড়ার বনে পিছল সাপের মতো। ওর কাছে কেউ পৌঁছুতে পারে না, অথচ ওর গতি সর্বত্র।"

"ডাকাতি করা যার পেশা সে চমৎকার পরিণামের পথ তৈরি করছে: গুরগঞ্জের দেয়ালের ওপর শূলের আগায় ফুঁড়ে তার শির সকলের ঊর্ধ্বে উঠবে," যে শিকে মাংসের টুকরো সেঁকা হচ্ছিল তা উল্টে-পাল্টে দিতে দিতে জালাল উদ-দিন নিস্পৃহভাবে বলল।

"কারা কন্চার রাতের ছায়া, দুর্বৃত্তের নাগাল সে ধরে ফেলে," তুর্কমেন বলে চলল। "কারা কন্চার প্রতিহিংসার খঞ্জর, রোষের বর্শা, প্রতিশোধের তরবারি। কারা কন্চার আজ নিঃসঙ্গ, তার ছেলে নেই, ভাই নেই। এমন এক দিন আসবে যে দিন তার নিষ্প্রাণ দেহ ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে, আর যেখানে তার ছাউনি আছে সে জায়গা শূন্য পড়ে থাকবে। চমৎকার! না?"

"দুঃখের কথা," জালাল উদ-দিন বলল।

"অথচ কারা কন্চারের ছিলেন বৃদ্ধ পিতা, ছিল সাহসী ভাই, স্নেহমাখা বোন। কিন্তু শাহ মুহম্মদের যখন শতখানেক ঘোড়ার দরকার হয় তখন তিনি কিপচাক যোদ্ধাদের নিয়ে আমাদের ছাউনিতে আসেন আর একশ' ঘোড়ার জায়গায় আমাদের তিন শ' বাচ্চা ঘোড়া নিয়ে যান। মেয়েদের কাছ থেকে রুপোর অলঙ্কার ছিনিয়ে নেন এই অজুহাতে যে

কোন এক জায়গায় কোন্ যাযাবরেরা নাকি এক হোমরাচোমরা খানের ওপর ডাকাতি করেছে। আর শাহের যেখানে প্রাসাদে তিনশ' বিবি আছে সেখানে তিনি তাঁর কিপচাক বাহিনীর জোরে নিয়ে যান আমাদের সেরা সুন্দরী গুল জামালকে, যাকে পাওয়ার জন্য একশ' বাহাদুর ঘোড়সওয়ার পাল্লা দিয়েছে। শাহ্ তাকে গায়ের জোরে একশ' এক নম্বর বিবি করে নিজের প্রাসাদে আটকে রেখেছেন। এটা কি ভালো?"

"এটাও দুঃখের কথা,'' জালাল উদ-দিন শান্তভাবে বলল। "কিন্তু একশ' ঘোড়সওয়ার যে ছাউনি থেকে সেরা সুন্দরীকে নিয়ে যেতে দিল এবং তাকে উদ্ধার করল না এটা মোটেই ভালো নয়।"

"ছাউনিতে তখন আমাদের ঘোড়সওয়াররা ছিল না। কিপচাকেরা চালাক, জানে কখন আমাদের এখানে আসতে হয়।"

"ওহে বাহাদুর ঘোড়সওয়ার, আমার কথা শোন,'' জালাল উদ-দিন বলল। "তুমি বলছ যে তোমার বাবা ছিলেন, ভাই ও বোন ছিল? তারা আর নেই কেন?"

"আমার বুড়ো বাবাকে শাহের জল্লাদেরা ধরে নিয়ে গিয়ে গুরগঞ্জের চকে তাঁর আপাদমস্তক পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কেটেছে। আমার ভাইয়েরা পুবে ও পশ্চিমে ফেরার। বোনদের কিপচাক ঘোড়সওয়াররা ধরে নিয়ে গেছে। এটা কি ভালো?"

"এটাও ভালো নয়," জালাল উদ-দিন বলল।

"দুনিয়ায় কোথায় আমার যাওয়ার আছে? আমার এখন কীই বা করার আছে?"

জালাল উদ-দিন উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল:

"তোমার হাতের চক্চকে তলোয়ার যদি নিজের জাতকে রক্ষার জন্য ঝলকাতে পারে, যদি কারাভান চলার পথে কৌতুক ছেড়ে দিয়ে করার মতো কিছু করতে চাও এবং আমাদের সবুজ পতাকার সমর্থক হতে পার তাহলে গুরগঞ্জে আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব কীভাবে সুনাম পাওয়া যায়।"

"তাহলে শোন বেগ," তুর্কমেন জামার হাতায় ঠোঁট মুছতে মুছতে ক্ষিপ্তভাবে বলল। "আমি গুরগঞ্জে এলেই শাহের গুপ্তচর 'জাসুস'রা শেয়ালের মতো আমার পেছন পেছন ছুটবে, কিন্তু আমি ধরা দেব না, বরং লড়াই করে জান দেব। এর কি দরকার আছে?''

"তা হবে না," জালাল উদ-দিন বলল। "গুরগঞ্জের পশ্চিম ফটকের দিকে গেলে উঁচু উঁচু ঝাউ গাছে ছাওয়া এক বাগিচা দেখতে পাবে। দারোয়ানদের জিজ্ঞেস করবে: এটা কি তিল্লালার নতুন প্রাসাদ ও বাগিচা? মালিকের কাছে আমাকে নিয়ে চল! — এই বলে এ কাগজটা দেখাবে।''

জালাল উদ-দিন তার জাফরান রঙা পাগড়ির ভাঁজ থেকে এক চিলতে কাগজ বার করল, মধ্যমাঙ্গুলি থেকে মোহর দেওয়া সোনার আঙটি খুলল। আগুনের শিষের ওপর ধরে মোহরের ছাপ ভুসো করে তুলল, তারপর কাগজের এক প্রান্ত থুতু দিয়ে ভিজিয়ে মোহর চেপে ধরল। কাগজের ওপর অপূর্ব নক্সা করে লেখা ভুসোমাখা নামের ছাপ ফুটে উঠল। কাগজটা পুরিয়া করে পাকিয়ে একটা ভাঁজ করল। হাঁটুতে রেখে পাট করে নিয়ে তুর্কমেনের হাতে দিল। তুর্কমেন সেটাকে ঠোঁটে ও কপালে ঠেকিয়ে কোমরবন্ধনীর সঙ্গে ঝোলানো চকমকি রাখার কৌটোয় পুরল।

"আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি বেগ, আমি আসব। সালাম!" এই বলে তুর্কমেন দরজার পর্দার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গৃহকর্তা চুপচাপ ওকে অনুসরণ করল। ছাউনির বাইরে, যেখানে আগুনের ওপর এক বিশাল তামার কড়াই টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছিল, সেখানে বরফগলা ভিজে মাটির ওপর ছিন্নভিন্ন বসন পরনে পাঁচটি ক্রীতদাস বসে ছিল। ওদের সকলের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, প্রত্যেকের গলায় ফাঁস, সেগুলোর প্রান্তদেশ চুলের তৈরি ফাঁসদড়িতে বাঁধা। গোলামদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এক উঁচু বাদামী রঙের ঘোড়া — তার বাঁকা ঘাড়ে রুপোর গলাবন্ধ, লাগাম টান-টান করে জিনে বাঁধা। বন্দীদের ফাঁসদড়ির প্রান্ত জিনের সঙ্গে জড়ানো।

তুর্কমেন ঘোড়ায় চেপে বসল।

"আগে বাড়, কাফের-জানোয়ারের দল! পেছিয়ে পড়েছিস কি কেটে টুকরো টুকরো করে জানোয়ারের পচাগলা লাশের মতো পথের পাশে ফেলে রেখে যাব।"

ক্রীতদাসের দল উঠে একে অপরের পেছনে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল। তুর্কমেন চাবুক হাঁকাল, দেখতে দেখতে সবাই টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। গৃহকর্তা ছাউনিতে ফিরল।

"মেহমান হুজুর, দূরে প্রায় শ'খানেক ঘোড়সওয়ার দেখা গেছে, ওরা এদিকেই আসছে।"

"জানি, ওরা হল খরেজম শাহের ঘোড়সওয়ার, আমাকে খ‍ুঁজছে। আচ্ছা, যে লোকটির সঙ্গে আমি এই মাত্র কথা বললাম, সে কে?"

"এ হল," বলেই গৃহকর্তা গলার স্বর নামিয়ে ফেলল, যেন তার আশঙ্কা আছে যে তুর্কমেন ফিরে আসতে পারে, বলল, "এ হল কারা-কুমের চিতা, কারাভান চলার পথের আতঙ্ক, দাগী দস্যু কারা কন্‌চার, আল্লাহই ওর কাজের বিচার করবেন!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাকিমের ন্যায়বিচার

যাযাবরের তাঁবু ছেড়ে জাইহুনের* নিম্ন অববাহিকায় যেখানে জনবহুল খরেজমের নগর ও পল্লীর অবস্থান, সেখানকার এক মরূদ্যান লক্ষ্য করে হাজি রহিম উত্তর বরাবর মরুভূমির সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথ ধরে দু'দিন চলতে থাকে। তার গর্দভটি মন্থর গতিতে চলে, পেছন পেছন সমান তালে পা ফেলে উট — পিঠে অসুস্থ বণিক, তখনও তার জ্ঞান ফেরে নি। দরবেশ আরবী ও ফারসী গান গাইতে থাকে, শেষ পর্যন্ত কখন যে খরেজমের মসজিদের রঙিন গম্বুজমালা দেখতে পাওয়া যাবে এই আশায় দূরের দিকে নিরীক্ষণ করে।

তিন দিনের দিন বালির ঢিবিগুলোর মাঝবরাবর সংকীর্ণ পথ প্রশস্ত হয়ে পাথুরে মালভূমির ওপর উঠতে থাকে। সেখান থেকে চোখে পড়ল উদ্যান, উপবন ও সবুজ মাঠের ছকে ছাওয়া এক সমৃদ্ধ, আনন্দোচ্ছল সমভূমির দৃশ্য। সর্বত্রই গাছপালার ফাঁকে নজরে পড়ে সমতল ছাদে ঢাকা ঘর-বাড়ি, ধোঁয়ায় কালো ছাউনির ইতস্তত সারি এবং ধনী কিপচাক খানদের কেল্লার মতো চার কোনায় বুরুজ বসানো অট্টালিকাশ্রেণী। কোথাও কোথাও তীক্ষ্ন মিনারগুলো হুবহু বর্শার মতো বেরিয়ে আছে, তাদের পাশেই ঝক্‌ঝক্ করছে মসজিদের গম্বুজের বহুরঙা টালি। জলপূর্ণ চষা জমির টুকরোগুলো বিশাল বিশাল দর্পণের মতো চক্‌চক্

---

* জাইহুন — ত্রয়োদশ শতকে আমু-দরিয়া নদীর নাম।

করছে। জমিতে যারা কাজ করছে তারা অর্ধনগ্ন, তাদের পরনে জীর্ণ বস্ত্র, পায়ে শেকল বাঁধা।

দরবেশ টিলার ওপর থমকে দাঁড়াল।

"বেহশ্‌ত হওয়ার মতো দেশ বটে!" সে ফিসফিস করে বলল, "অথচ তা হয়ে দাঁড়িয়েছে যন্ত্রণা ও অশ্রুর উপত্যকা। পনেরো বছর আগে আতঙ্কে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে অপরাধীর মতো এখান থেকে পালিয়েছি। সে দিন স্বয়ং প্রধান ইমাম যে যুবককে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন আজ রোদে পোড়া এই দরবেশকে দেখে কে তাকে চিনতে পারবে? আগে চল্‌, বকির, আমরা রাত কাটাতে চলেছি রাজধানীরও রাজধানী, দুনিয়ার তামাম শহরের সেরা ধনী শহর সেই গুরগঞ্জের ফটকের সামনে, যেখানে রাজত্ব করছেন খরেজম শাহ্‌ মুহম্মদ, প্রবল পরাক্রান্ত, পরন্তু অশেষ দুর্বৃত্ত মুসলমান অধিপতি।..."

দরবেশ আবার পা বাড়ায়। পথে আরও ঘনঘন দেখা যেতে থাকে বিশাল সুদীর্ঘ শিঙওয়ালা বলদ-জোতা দু'চাকার গাড়ি, পথচারীর দল, ঝলমলে ঘোড়ার পিঠে সুসজ্জিত ঘোড়সওয়ার আর হাড় জিরজিরে গাধায় চেপে রোদে পোড়া চাষী। চার দিক থেকে শোনা যায় গাভীর হাম্বারব, ভেড়ার ডাক, চালকদের হাঁকি-ডাক।

প্রথম পল্লীতেই লম্বা লম্বা সাদা রঙের লাঠিসোঁটা হাতে লোকজন দরবেশকে ছেঁকে ধরল।

"তুই কে রে? যদি কপর্দকহীন দরবেশই হবি ত পেছন পেছন এই উটটা কেন? হাকিমের কাছে চল্‌ দেখি, তোর গর্দান না নিয়ে ছাড়বেন না।"

দরবেশকে মাটির উঁচু দেয়ালে ঘেরা এক চত্বরের মধ্যে নিয়ে আসা হল। চওড়া গালিচা বিছানো দাওয়ায় পায়ের ওপর পা তুলে ডোরা-কাটা জোব্বা গায়ে এক ঋজু শীর্ণ বৃদ্ধ উপবিষ্ট। যে কেউ তার সামনে আসুক না কেন বিশাল তুষারশুভ্র উষ্ণীষ, পরিপাটি আঁচড়ানো পক্বশ্মশ্রু, কঠিন মর্মভেদী দৃষ্টি এবং মন্থর গতিভঙ্গি তাকে শিহরিত করে তোলে। সবাই তার সামনে লুটিয়ে পড়ছিল। পাশেই তার হুকুমের অপেক্ষায় হাতে খাগের কলম বাগিয়ে ঝুঁকে পড়ে বসে ছিল এক যুবক কলমচী।

"কে তুই?" হাকিম জিজ্ঞেস করল।

"পরমারাধ্যা জননীর এই অধম সন্তানের নাম হাজি রহিম অল

2*

বাগদাদি, বাগদাদের পবিত্র শেখদের ছাত্র। আমি সুদীর্ঘ পথ পর্যটন করি, বৃথাই খুঁজে ফিরি সমাধির শীতল অন্ধকার গর্ভে নিহিত ইমানদারদের পদচিহ্ন।"

বৃদ্ধ অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করে দরবেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

"তা উটের ওপর এই অসুস্থ লোকটি কে? ওর মাথায় পাগড়ি নেই কেন? ও কি সত্যিকারের মুসলমান, না কাফের? লোকে বলছে যে তুই ওকে জখম করেছিস, ওর সমস্ত সম্পত্তি লুটপাট করে বেচে ফেলেছিস? সত্যিই না কি?"

দরবেশ আকাশের দিকে দু' হাত তুলে বলল:

"হে সর্বদর্শী বেহেশ্‌ত, আমার একমাত্র রক্ষক! মিথ্যে গুজব ছাড়া আর কিছুই যার শ্বাস-প্রশ্বাসে নেই সেই গালগল্পবাজের খুরে দণ্ডবৎ! আমার মেহনত ও দুঃখের সে কী বুঝবে!"

হাকিম অর্থব্যঞ্জকভাবে তর্জনী ওপরে তুলে চাপা গলায় বলল:

"এই অসুস্থ লোকটা সম্পর্কে কী জানিস ঠিক করে বল্।"

দরবেশ তখন লুণ্ঠিত কারাভান দেখতে পাওয়ার কথা এবং আহতকে বাঁচানোর জন্য তার চেষ্টার কথা বলল।

বৃদ্ধ তার রুপোলি দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল:

"এই আহত লোকটা হয়ত খুব বড় দরের লোক হবে, হয়ত বা তার হাত সূর্য অবধি নাগাল পায়। আমি নিজে একবার তাকে দেখতে চাই।" চটিতে পা গলিয়ে হাকিম দাওয়া থেকে নেমে উটের দিকে চলল। গ্রামবাসীরা তাকে ঘিরে ধরে, সকলের চেষ্টা গলাবাজিতে একে অপরকে টেক্কা দেওয়া।

"আমরা এই অসুস্থ লোকটাকে চিনি। এ হল গুরেগঞ্জের ধনী বণিক মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌। এই ত উটের গায়ে ছেঁকা দিয়ে ওর চিহ্ন আঁকা আছে। মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচের দু'-তিনশ' উট বোঝাই কারাভান তাভ্‌রিজ ও বুলগারে*, এমনকি বাগদাদ শরিফ অবধি যায়।"

---

* তাভ্‌রিজ — উত্তর ইরানের একটি বড় শহর। বুলগার — কামা ও ভোলগা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত সমৃদ্ধ বাণিজ্য ও শিল্পপ্রধান নগর, ভোলগা অঞ্চলবর্তী বুলগারদের রাজধানী।

অধিবাসীদের কথা শুনে হাকিম একটু চুপ করে রইল, ঠোঁট কামড়াল, তারপর ভারিক্কি চালে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল, আর কলমচী তা লিখে নিল।

"যেহেতু অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিবর্গ জ্ঞাপন করিতেছে যে অসুস্থ ব্যক্তি গুরেগঞ্জের সুযোগ্য বণিক মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌ সেই হেতু আমার আদেশ, তাহাকে যেন সযত্নে উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে অপসারণপূর্বক আমার গৃহে রাখা হয় এবং বলবর্ধক ঔষধির সাহায্যে তাহাকে দ্রুত সুস্থ করিয়া তুলিবার জন্য জনৈক ভিষককে ডাকিয়া পাঠানো হয়। আহত ইমানদারের তত্ত্বাবধান করিয়া দরবেশ যে সৎকর্মের পরিচয় দিয়াছে তাহার জন্য সে তাহার বাঞ্ছিত পথে গমন করিতে পারে এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত বণিক তাহাকে পুরস্কৃত করিবে। উষ্ট্র যেহেতু দরবেশের নহে সেই হেতু যতক্ষণ পর্যন্ত উহার মালিক সুস্থ না হইয়া উঠিবে ততক্ষণ উহা আমার হেফাজতে থাকিবে। বিচারের রায় প্রদান এবং উহাতে ছাপ বসাইবার ব্যয় বাবদ দরবেশের কৃষ্ণকায় গর্দভটি আমার অধিকারে রহিল।''

"লিখেছ?" হাকিম কলমচীকে জিজ্ঞেস করল।

কলমচী চাপা গলায় বলল:

"হুজুর হক্‌ কথা বলেছেন!"

হাকিম যোগ করল:

"জ্ঞানী দরবেশ, আমার এই দীন ভাণ্ডার থেকে একটি দিরহাম গ্রহণ কর।"

হাজি রহিম তাম্রমুদ্রাটি নিয়ে কপালে ঘষল, ঠোঁটে ঠেকাল। তারপর হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলল:

''হে ন্যায়বিচারক হাকিম, আপনার জ্ঞান অপরিসীম! আপনি আমাকে আহত ও উটের তত্ত্বাবধান থেকে মুক্ত করেছেন, মুক্ত করেছেন গর্দভের তত্ত্বাবধান থেকে — ওর পিঠে চেপে আমার কোথাও যাওয়া চলবে না, অবশ্য তাকে আর খাওয়াতেও হবে না। তুচ্ছাতিতুচ্ছ মৃতপ্রায় এই আমি হলাম গিয়ে মুক্তহস্ত থেকে অন্ধ-নাচারের ভিক্ষাপাত্রে গড়িয়ে-পড়া হাল্‌কা মুদ্রার মতো। আপনার বদান্যতা যদি আপনার দাড়ির রূপোর মতোই সাচ্চা হয় তাহলে এই তামার দিরহাম মুদ্রাটি সোনার দিনারে পরিণত হবে।"

হাজি রহিম মুঠি খুলল। হাতের তালুর ওপর চক্‌চক্‌ করছে স্বর্ণমুদ্রা — দিনার।

"হুজুর, সত্যি বলছি, যে মাটিতে আপনার পা পড়বে সেখানে কখনও অজন্মা দেখা দেবে না।"

হাজি রহিম হাত মুঠো করে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে শাসনকর্তা ও তার চারপাশের লোকজন হতবাক হয়ে কখনও এ-ওর দিকে, কখনও দরবেশের বদ্ধমুষ্টির দিকে তাকায়, মুখ তাদের হাঁ হয়ে যায়।

"আমি ওকে একটা তামার কালো দিরহাম দিয়েছি। এটা আমার বেশ মনে আছে। অথচ তোমরা সবাই এই মাত্র ওর হাতে সোনার দিনার দেখলে," কর্তা বলল। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর প্রকৃতির প্রবীণ ব্যক্তির কাছ থেকে যা কেউ আশাই করতে পারে নি, হাকিম সেই রকম ক্ষিপ্রবেগে দরবেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত চেপে ধরল।

"সোনার দিনারটা দে বলছি! ঐ দিয়ে তোকে বিচারের খরচ মেটাতে হবে।" ·

হাজি রহিম মুঠি খুলতে কর্তা খপ করে মুদ্রাটি ধরল, কিন্তু দেখা গেল এটা সেই তামার দিরহাম। গম্ভীর চালে হাকিম ফুঁ দিয়ে নিজের দু' কাঁধ ঝেড়ে মহা সমারোহে দাওয়ায় উঠে পড়ল।

হাজি রহিম গাধার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার ঝোলাটা তুলে নিল, কাঁধে ফেলে কোন দিকে দৃকপাত না করে গুরগঞ্জের দূর পথ ধরল। যেতে যেতে গলা ছেড়ে দরবেশের বাণী উচ্চারণ করল:

"ইয়া হু-উ! ইয়া হক্‌! লা ইলাহি ইল্লা হু-উ!"*

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঈপ্সিত দুয়ার

"সবই রয়ে গেছে সেই বহু বছর আগেকার মতো," গুরগঞ্জের এক নির্জন গলির মাটির তৈরি উ'চু দেয়ালে হেলান দিয়ে হাজি রহিম ভাবল। "খুবানি ও তুঁত গাছের সারির মধ্যে সমতল ছাদে ছাওয়া সেই একই

* দরবেশদের সচরাচর উচ্চারিত এই আরবী বাণীটির অর্থ হল: 'হাঁ, তিনিই, তিনিই পরম সত্য, তিনি ছাড়া আর কোন আল্লাহ নেই!'

ছোট ছোট ঘর-বাড়ি, ফিরোজা আকাশে একই রকম ভাবে পাক খেয়ে চলেছে পারাবত শ্রেণী, আর তারও কিছু ওপরে আর্তকণ্ঠে ধীরে ধীরে ঘুরছে বাদামী রঙের চিলের ঝাঁক।... সেভাবেই বেড়ার ওপর ঝুলে আছে ফুটন্ত বাবলার সাদা সাদা ডাল আর তার নীচে ঢাকা পড়ে আছে সেই ক্ষুদ্র ঈপ্সিত দুয়ারটি। দুয়ারের ধূসর ক্ষয়িত কাঠের গায়ে সুনিপুণ হাতে কাটা কারুকর্মের দাগ এখনও চোখে পড়ে। এক সময় এই দুয়ার থেকে বেরিয়ে আসত একটি মেয়ে — পরনে তার গোলাপী বসন, কমলারঙা আবরণ। সে কোথায়? তার কী দশা হল?"

দুয়ার খুলে গেল, বেরিয়ে এলো এক কিশোরী — পরনে জাফরানী আবরণে ঢাকা দীর্ঘ গোলাপী পোশাকে। হাতে কোদাল। ঈষৎ উদ্‌গত গণ্ডাস্থি ও সামান্য তির্যক্ চক্ষু, পোশাকে পরার ঢং ও জাফরানি ওড়নার বাঁধনরীতি দেখে অভিজ্ঞ ব্যক্তির বুঝতে বাকি থাকে না যে মেয়েটি তুর্কী উপজাতির। গুন্‌গুন্ করে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে সে বাগিচার আল পরিষ্কার করল, মাটির দেয়ালের ফোকর দিয়ে জল বার করে দিল।

অকস্মাৎ মেয়েটি চট্‌পট্ সোজা হয়ে স্বল্পপরিসর তামাটে করতলে চোখ আলো থেকে আড়াল করল, রাস্তার শেষপ্রান্তে তাকাল।

সেখানে কে যেন দরাজ সুরেলা গলায় গাইছিল:

> নিশা ঘোর, আঁখিপাতে নিদ নাহি আসে,
> রাতভোর চেয়ে দেখি তারকা আকাশে।
> তরুণী চন্দ্রিমা যবে আঁকে শীর্ণ শিখা,
> মনে জাগে তার সেই ভ্রূধনু ভঙ্গিমা।
> এ কি মোর ভবিতব্য? ললাটের লিখা?
> সাধ হয় ভেদ করি ভবিষ্য মহিমা...

গলির ভেতরে দেখা গেল এক তরুণ অশ্বারোহীকে। তার পরিধানে গাঢ় সবুজ রঙের চাপকান, কটিদেশে রঙচঙে আঁটসাঁট বন্ধনী জড়ানো। ভেড়ার চামড়ার টুপি ডান দিকের ভুরুর ওপর কাত করে নামিয়ে সে দুলকি চালে কালো রঙের তেজীয়ান ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসছিল। অশ্বারোহী ঘোড়ায় কশাঘাত করে জোর কদমে ছুটল। কিশোরীর কাছাকাছি এসে সে এক ঝট্‌কায় ঘোড়ার লাগাম টানল।

মেয়েটি কোদাল ফেলে দিয়ে দৌড়ে আঙিনার ভেতরে ঢুকে সজোরে দোর বন্ধ করে দিল। অশ্বারোহী তার টুপি মাথার পেছন দিকে সরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে গলি ধরে এগিয়ে চলল।

দুয়ার খানিকটা ফাঁক হল, কিশোরী উঁকি মারল। লাজুক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে কোদালটা তুলে নিয়ে আবার উধাও হল।

হাজির সাদা ফেটি লাগানো ছুঁচাল টুপি মাথায় এবং বিচিত্র বর্ণের আলখাল্লা পরনে শ্মশ্রুধারী, রৌদ্রদগ্ধ দরবেশ তার দীর্ঘ যষ্টির আঘাতে ঠক্‌ঠক্‌ আওয়াজ তুলে অন্ধের মতো রাস্তা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে উঠল। এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে সে দুয়ারের গায়ে বেধে-থাকা গোলাপী কাপড়ের টুকরো সন্তর্পণে খুলে নিয়ে জামার নীচে লুকিয়ে রাখল।

"হ্যাঁ," বিড়বিড় করে সে বলল, "সবই এখানে আগের মতো রয়ে গেছে: সেই একই গাছ, আরও উঁচু ও ঘন হয়েছে মাত্র, সেই একই দুয়ার — কেবল একটু কালো হয়েছে আর বেঁকেচুরে গেছে — এই যা।... আর মেয়েটি দেখতে সেই মেয়েটির মতো, যাকে আমি ষোল বছর বয়সে ভালোবেসেছিলাম, তবে এ সে নয়। তা হলে বহু বছর আগে যে এখানে খুবানির ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, যে ছিল শ্যামলা আর খুবানির মতোই মিঠে সে কোথায়?!! সব তেমনই রয়ে গেছে, এমনকি ঐ ওখানে পুরনো মিনারের ওপরে আগের মতোই বাজপাখিগুলো চক্রাকারে উড়ছে। কেবল হাজি রহিমই আর সে রকম নেই।..."

দরবেশ যষ্টি দিয়ে দুয়ারে আঘাত করল। পুরনো বেড়ার দরজার ওপাশে বার্ধক্যজড়িত কাশির আওয়াজ শোনা গেল। চৌকাঠে আবির্ভাব হল এক শীর্ণকায় ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধের। তার মাথায় তুষারশুভ্র উষ্ণীষ।

"ইয়া-হু-হু! ইয়া-হক্‌!" দরবেশ আওড়াল।

বৃদ্ধ অবিরাম অশ্রুভারে পরিপূর্ণ রক্তাক্ত চোখ মেলে লক্ষ্য করে গেঁজ থেকে চামড়ার পুরনো থলি বার করল। রক্তশূন্য মোমের মতো আঙ্গুল দিয়ে হাতড়ে সেখান থেকে বার করল এক কালো রঙের পাতলা মুদ্রা।

"আলায়কুম সেলাম!" দরবেশ মুদ্রাটি ললাটে ও ওষ্ঠাধরে ঠেকিয়ে বলে উঠল। "এ বাড়িতে কে থাকে? কার মঙ্গলের জন্য আমি একেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাব?"

"এ বাড়িতে আমি থাকি, তবে বাড়ি আমার নয়, কর্মকার কারা

মাক্‌সুমের। বড় বাজারে সবাই নামজাদা কর্মকার কারো মাক্‌সুম ও তার অস্ত্র তৈরির কামারশালা জানে। ইমানদারকে ভিক্ষে দিতে সে আপত্তি করে না।"

"হে অঘটন ঘটন পটীয়ান, ভাগ্যের আশিসে আপনি কোন নামে অভিহিত?"

" 'অঘটন ঘটন পটীয়ান' — এমন বড় নাম আমাকে দিও না। আমি শাহের মুনশি বুড়ো মির্জা ইউসুফ, কেবল কবির ভাষায় যোগ করতে পারি:

> সারা জীবন কাটিয়ে দিলাম পশুর মতো ভার বয়ে,
> ছেলেমেয়ের গোলাম আমি, বন্দী নিজের পরিবারে,
> পুঁজিপাটা যেটুক আছে বলতে পারি কর গুনে —
> থাকার মধ্যে নিঃস্ব কুটির, দুঃখ সে ত লক্ষ-কোটি।
> সে দুখ থেকে পার যে পাব এমন কোন নেই ভরসা!.."*

"না, না! আপনি ঠিকই অঘটন ঘটন পটীয়ান," দরবেশ বলল "আপনি একটি কালো দিরহাম দান করেছেন, আর শরিফ মেজাজে দান করেছেন বলেই দিরহাম সঙ্গে সঙ্গে পুরোপুরি খাঁটি সোনার দিনারে পরিণত হয়েছে।"

দরবেশের পাখির থাবার মতো করতলের কালো গহ্বরের দিকে বৃদ্ধ উঁকি মারল — সেখানে পড়ে আছে উঁচু উঁচু অক্ষর খোদাই করা সোনার দিনার।

"ধর্মগ্রন্থে যে সব অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে আমি আমার দীর্ঘ জীবনে তা স্বচক্ষে দেখি নি। দরবেশ, হয় তুমি অঘটন ঘটাতে পার, না হয় বাজারের বাজিকরের মতো তুমি আধা অন্ধ বুড়োকে নিয়ে তামাসা করতে চাও।"

"আপনি এই দিনার যাচাই করে দেখতে পারেন। আপনার চাকরকে বাজারে পাঠান, সে আপনাকে ঝুড়ি ভর্তি ভাজা কাবাব, সেদ্ধ সেমুই, মধু ও মিষ্টি খরমুজা এনে দেবে। তখন হয়ত দূর বাগদাদ থেকে এই যে দীন মুসাফিরটি সোজা এখানে এসেছে তাকেও সে সম্পদের কিছুটা ভাগ দেবেন?"

---

* নবম শতকের ফারসী কবি কিসাইয়ের কবিতাবলী থেকে।

“তুমি তা হলে বাগদাদ শরিফ থেকে এসেছ? তাহলে আমার বাড়ি এসো, সেখানে কী কী দেখেছ বল, আর আমিও তোমার আজব দিনারের ক্ষমতা যাচাই করব।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শাহী বৃত্তান্তের মুনশী

...আমাদের বাসস্থানের মধ্যে সুদূর ব্যবধান, পথ দীর্ঘ ও দুর্গম; তথাপি সে আমার উদ্দেশে যাত্রা করল।

(ইব্‌ন-হাজম, একাদশ শতক)

হলুদ কৃষ্ণসার চর্মের জুতোয় পা ঘষটাতে ঘষটাতে বৃদ্ধ আঙিনা পার হয়ে দাওয়ায় উঠল।

“আমার পেছন পেছন চলে এসো, মুসাফির!”

বৃদ্ধকে অনুসরণ করে দরবেশ যে ঘরটিতে এসে প্রবেশ করল। তার মেঝে ইঁটের, আর দেয়াল বরাবর সরু সরু গালিচা বিছানো। কুলঙ্গির তাকগুলোতে আছে দু'টি রুপোর কলসি ও কাচের ইরাকী ফুলদানী। কায়দা করে রঙচঙা কাঠের গুঁড়ি পর পর বসিয়ে ঘরের যে গম্বুজ তৈরি করা হয়েছে তার মাঝখানে ধূম নির্গমনের ছিদ্র আছে। ঘরের মাঝখানে একটি চতুষ্কোণ গহ্বরের মধ্যে জ্বলন্ত কয়লাসমেত কটাহ ধূমায়িত হচ্ছে। পেছনের দেয়াল বরাবর রয়েছে তিনটে লোহা বাঁধানো খোলা সিন্দুক, আর সেগুলোর মধ্যে চোখে পড়ে হলুদ চামড়ায় বাঁধানো বড় বড় পুঁথি।

দরবেশ তার যষ্টি ও লটবহর দোর গোড়ায় রাখল। পায়ের চটি খুলে রেখে সে হাঁটু মুড়ে বৃদ্ধের পাশে গিয়ে বসে পড়ল।

“বেস্ত জানকিজা!” খন্‌খনে গলায় বৃদ্ধ হাঁক দিল।

একটি ছেলে এসে ঢুকল — তার গায়ে গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা জোব্বা, মাথায় নীল রঙের পাগড়ি। সে কুর্নিশ ঠুকে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

“এই সোনার দিনারটা ধর। বুড়ো সাক্‌লাবকে এটা দিয়ে বলবি:

'সাক্‌লাব নানা, বাজারে যে সারিতে রুপোর ও সোনার মুদ্রা ভর্তি পেটরা নিয়ে হিন্দু পোদ্দাররা বসে থাকে সেখানে যাও। ঐ পোদ্দাররাই আবার লাট্টু ও পাশা খেলার ঘুঁটি বিক্রি করে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে পাকা দাড়িওয়ালা কাউকে বেছে নিয়ে মুদ্রাটার দাম যাচাই করে জেনে নিও এটা পুরো ওজনের খাঁটি সোনার দিনার কিনা।' যদি হিন্দু পোদ্দার বলে যে দিনার জাল নয়, তাহলে ও যেন এটাকে রুপোর দিরহামে বদল করে নেয়। রুপো পাওয়ার পর সাক্‌লাব যেন সেই সারিতে যায় যেখানে মুসাফিরদের জন্য খানাপিনার ব্যবস্থা আছে, সেখান থেকে, এখন এই মাননীয় সত্যসন্ধানীর মুখে যে যে জিনিসের কথা শুনবি সেগুলো কিনতে হবে।"

"বান্দাকে কী কিনতে বলেন?" ছেলেটি দরবেশকে জিজ্ঞেস করল।

দরবেশ ছেলেটির দিকে তাকাল। তার কোমল মুখাবয়ব অদ্ভুতরকম পরিচিত বলে ঠেকল। কোথায় সে ওকে দেখেছে? দরবেশ বলল:

"বান্দা ঝুড়ি নিয়ে যাক, এমন সব জিনিস কিনুক যা বহু বছর বাদে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে সে কিনত। বান্দা নিজেই বাছুক।''

বৃদ্ধ ছেলেটিকে ইশারায় নিজের কাছে ডেকে এনে কানে কানে বলল:

"সাক্‌লাব বাজার থেকে ফিরে রোজকার মতো যেন ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকে সটান এখানে না এসে আমার পুরনো জোব্বাটা পরে আসে। আর তুই ওকে দিনার দিয়ে দোয়াত-কলম ও কাগজ নিয়ে এখানে ফিরে আসবি। তোকে এখন এর মুখের জবান লিখতে হবে।"

ছেলেটা চলে গেল, কিছুক্ষণ বাদেই কাগজ ও লেখার সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে এলো।

''মুসাফির, এবারে প্রথমে তোমার নাম বল, বল তোমার বংশ পরিচয় কী এবং কী করেই বা তুমি বাগদাদ শরিফে গিয়ে পড়লে?"

"আমার নাম হাজি রহিম অল বাগদাদি। আমার জন্ম বস্‌রার কাছাকাছি এক গ্রামে। আমি আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তার আগে অন্য যে ব্যাপারটি আমার মনকে উতলা করে তুলেছে সে সম্পর্কে কিছু বলার অনুমতি দিন।"

"বল, বল," বৃদ্ধ বলল।

''বাগদাদে একটা বড় মাদ্রাসায় খুব নামজাদা দানিনশমন্দদের কাছে আমি পড়াশুনা করেছি। আমার সঙ্গে যে সব পড়ুয়া ঐ জ্ঞানী-গুণীদের

সান্নিধ্যে আলোর সন্ধানে প্রবৃত্ত হয় তাদের মধ্যে সদা বিষণ্ণ ও স্বল্পবাক এক যুবক কঠোর অধ্যাবসায়গুণে বিশিষ্টতা লাভ করে। আমি যখন তাকে বললাম যে মুসাফিরের যষ্টি হাতে আমি বিখ্যাত গুরগঞ্জ, বুখারা শরিফ ও পরম রমণীয় সমরখন্দে যাত্রার জন্য কোমর বেঁধেছি তখন সে আমাকে যে কথাগুলো বলল তা হল এই: 'হাজি রহিম অল বাগদাদি, তুমি যদি খরেজম শাহদের সমৃদ্ধ শহর গুরগঞ্জে যাও তা হলে বাজার থেকে পশ্চিম ফটকমুখী মূল সড়ক ছেদ করে তৃতীয় যে গলিটি গেছে সেখানে গিয়ে অস্ত্রের কারিগর ও ব্যবসায়ী কারা মাক্‌সুমের বাড়ি খুঁজে বার করো, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ও শ্রদ্ধেয়া মাতা জীবিত আছেন কিনা খবর নিও। আমি বাগদাদে কী কী করছি তার বর্ণনা দিও। তুমি বাগদাদে ফিরে এসেই তাঁদের সম্পর্কে যা যা জানতে পারলে আমাকে জানিও।' আমি তাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে পথ ধরলাম। কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব ঘটনার বায়ুপ্রবাহ ও পরীক্ষার বজ্রবিদ্যুৎ আমাকে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে নিক্ষেপ করে। আমি হিন্দুস্তানের ঝলসানো রোদে ঘুরেছি, তাতারিয়ার* দূর মরুপ্রান্তর অতিক্রম করেছি, তাতারদের হামলা থেকে চীন সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে মহাপ্রাচীর তোলা হয়েছে সে পর্যন্ত গেছি; আমি উদ্দাম সাগরের উপকূল পরিদর্শন করেছি, তুষারাচ্ছন্ন খাড়া তিয়েন-শান পর্বতমালায় আরোহণ করেছি আর সর্বত্রই মুসলমানদের** দেখা পেয়েছি। আমার বাগদাদের বন্ধু গুরগঞ্জের যে রাস্তার কথা বলেছিল সেখানে পৌঁছুনোর আগে এইভাবে বহু বছর কেটে গেল। আমি সেই বাড়ি ও তুষারশুভ্র বাবলা গাছে ছাওয়া দুয়ার খুঁজে পেয়েছি, আর শেষ পর্যন্ত, হে অঘটন ঘটন পটীয়ান্‌, কথাবার্তা বলছি আপনার সঙ্গে — যাঁর নিশ্চয়ই মনে আছে সেই তরুণের কথা, যে এই আঙিনায়েই বাস করত এবং পনেরো বছর আগে গুরগঞ্জ পরিত্যাগ করেছে?"

---

* তাতারিয়া — তুর্ক গোত্রের যে সব যাযাবর গোষ্ঠী সাধারণভাবে তাতার নামে পরিচিত ছিল তাদের বাসভূমি বর্তমান মঙ্গোলিয়া ও পশ্চিম চীনের ভূখণ্ড উক্ত নামে অভিহিত হত।

** মধ্য এশিয়া থেকে আগত সোগ্‌দা জাতিবর্গ, তাজিকরা তাদের পরবর্তী বংশধর। এরা ছিল অপূর্ব হস্তশিল্পী ও উদ্যোগী ব্যবসায়ী, সুপ্রাচীনকাল থেকেই মধ্য এশিয়া থেকে চীন পর্যন্ত বাণিজ্যপথের সর্বত্র এদের বাণিজ্য ও শিল্প বসতি ছিল।

"সেই তরুণের নামটি কী?" বৃদ্ধ কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করল।

"জ্ঞানের সেই উচ্চ প্রাসাদে আবু জাফর অল খরেজমি নামে তার পরিচয়।"

"এই নামটি কোন সাহসে উচ্চারণ করলি, হতভাগা!" বৃদ্ধ মির্জা চেঁচিয়ে উঠল, তার অধরপ্রান্ত ফেনায় ছেয়ে গেল। "সে মহা পাপিষ্ঠ, তা তুমি জান? ঐ অল্প বয়সেই সে নিজেকে ও তার পিতা-মাতাকে কলঙ্কিত করেছে আর তার রক্তসম্পর্কের সকলকে প্রায় বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে।"

"কিন্তু ওর বয়স ত খুব কম ছিল। এমন কী করার সামর্থ্য তার ছিল? কাউকে খুন করেছে, না কোন নামজাদা বেগের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছে?"

"দুঃখের বিষয়, এই দুর্বৃত্ত আবু জাফর ছেলেবেলা থেকেই অসাধারণ গুণী ও অধ্যাবসায়ী বলে পরিচিত ছিল। কোরান শরিফের আবৃত্তি, তার সূক্ষ্ম ভাষার সৌন্দর্য ও গভীর অর্থ আয়ত্ত করার চেষ্টায় অন্যান্য পড়ুয়ার সঙ্গে সেও আমাদের সেরা মুরশিদদের কাছে পাঠ নিত। সবটাতেই সে কৃতিত্ব দেখায়, ফিরদৌসি, রুদাকি ও আবু সাইদের অনুকরণে সে বেশ যুতসই বয়েৎ বাঁধতে থাকে। তবে তার সে সব বয়েতে অন্যদের শেখার মতো কিছু থাকত না, সেগুলোর উদ্দেশ্য ছিল নেহাৎই চপলমতিদের মন হরণ করা।..."

বৃদ্ধ গলা নামিয়ে বলতে থাকে:

"এই হতভাগা ছেলেটার মাথায় স্বাধীন চিন্তা পেয়ে বসে। বুড়ো বুড়ো আলিম ও ইমামদের সঙ্গে তর্ক করতেও সে পিছপা হত না, আর এইভাবে অন্যান্য সরলবিশ্বাসী শ্রোতাকে বিভ্রান্ত করে দিত। শেষ পর্যন্ত ইমাম যখন একদিন মন্তব্য করলেন: 'তুই বেহশ্তের পথে যাচ্ছিস না, জাহান্নামের আগুনে ডুবতে চলেছিস,' — তার উত্তরে আবু জাফর উদ্ধত স্বরে বলল: 'আমার কাছ থেকে তফাৎ যান, বেহশ্তে আমাকে ডেকে কাজ নেই! আপনি যখন মালা জপা, উপাসনাস্থল ও সংযমের কথা বলেন তখন আমি ভাবি মহম্মদের মসজিদে যাওয়া অথবা ঘণ্টাধ্বনি মুখরিত ঈশার মঠে যাওয়া, কিংবা মুসার ভজনালয়ে যাওয়া — এসব একই নয় কি? আমি সর্বত্র ঈশ্বরকে খুঁজেছি, কিন্তু তাঁকে পাই নি। ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর তাদেরই কল্পনা, যারা তাঁর নামে বেসাতি করে। আমার

আলোক, আমার পথপ্রদর্শক — আবু আলি ইব্‌ন সিনা*।' তখন পবিত্র ইমামদের অভিশাপ তার উপর এসে পড়ল, তাঁরা ওকে ধরে আনার হুকুম দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল শহরের চকে নিয়ে গিয়ে ওর বিষাক্ত জিভ ও দুই হাত কেটে দেওয়া, যাতে সে আর কখনও তার দুর্নীতিগ্রস্ত কবিতা লিখতে না পারে। কিন্তু সাপের মতো কৌশলে আবু জাফর পালাল। প্রথম প্রথম সবাই ভাবল যে ওর বাবা করুণাবশত অপরাধী ছেলেকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। তাই ইমামদের কাছে ব্যাপারটা জানতে পেরে খরেজম শাহ মুহম্মদ নিজে আদেশ দিলেন বাবাকে ধরে এনে পোকা-মাকড় ভর্তি জিন্দানে** আটক করে রাখতে আর তার গলায় শেকল বেঁধে ফলক ঝুলিয়ে দিতে, যাতে লেখা থাকবে 'আজীবন ও আমরণ'। শাহের আরও আদেশ এই যে বাবা মারা গেলে আবু জাফর স্বেচ্ছায় ফিরে না আসা পর্যন্ত তার বদলে তার নিকটতম আত্মীয়কে কারারুদ্ধ করা হবে।"

"বাবা কি এখনও কারাগারে?" নীচু গলায় দরবেশ জিজ্ঞেস করল। তার বিস্ফারিত চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করে উঠল, মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

"জিন্দানের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, অন্ধকার ও ভয়ঙ্কর পোকা-মাকড়ের উপদ্রব সহ্য করতে না পেরে বাবা মারা যায়। খরেজম শাহের হুকুম অনুযায়ী জল্লাদেরা তার ছোট ছেলে তুগানকে ধরে নিয়ে গেছে, ঐ একই শেকল গলায় পরিয়ে তাকে সেই পাতাল ঘরেই আটকে রেখেছে।"

"কী অন্যায় কথা!" দরবেশ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল।

"এই তুগান ছেলেটার জন্য আমার বড় দুঃখ হয়," বৃদ্ধ বলে যেতে লাগল। "ওকে নিয়ে আমার অনেক ঝক্কি গেছে। তুগান যাতে ওর বয়ে

---

* আবু আলি ইবন্‌ সিনা — একাদশ শতকের বিশিষ্ট দার্শনিক, বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। ইউরোপে তিনি আভিৎসেন্না নামে পরিচিত। ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস জ্ঞাপন ও স্বাধীন চিন্তার দাবি জানানোর অভিযোগে তাকে ইস্পাহানের কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র ও অল কিমিয়ার উপর বহু গ্রন্থের রচয়িতা এবং মুসলিম প্রাচ্যে স্বাধীন চিন্তার অন্যতম নির্ভীক যোদ্ধারূপে পরিচিত। লাতিন ভাষায় অনূদিত তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্র কোষ 'চিকিৎসাবিষয়ক অনুশাসন' মধ্যযুগে ইউরোপীয় চিকিৎসকদের প্রধান পথ-নির্দেশক বলে গণ্য হত।

** জিন্দান — ভূগর্ভস্থ কারাগার।

যাওয়া বড় ভাইয়ের পথ না ধরে তার জন্য আমি ওকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করি। তুগান আমার কাছে লেখাপড়া শেখে, কিন্তু কারিগরি ও যুদ্ধজাতীয় তামাশার দিকে বেশিরকম ঝোঁক দেখতে পেয়ে আমি ওকে তালিমের জন্য কর্মকার কারা মাক্সুমের কাছে দিলাম, কারা মাক্সুম ওকে খুব ভালো ভালো অস্ত্র তৈরির বিদ্যা শেখাতে লাগল। এখন আমার ঘরে তুগানের জায়গা নিয়েছে ছোট একটি অনাথা, এক বাঁদীর মেয়ে বেস্ত জানকিজা। দেখা যাচ্ছে লেখাপড়ায় এবং নানা কবিতা ও গান মনে রাখার ব্যাপারে মেয়েটির অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের দৃষ্টিও কমে আসছে, চোখের সামনে সব কিছুরই দুটো দুটো করে মূর্তি ভেসে ওঠে, আর আকাশে একটা চাঁদের জায়গায় তিনটে চাঁদ দেখে থাকি। বেস্ত জান্কিজা হয়েছে আমার সহকারী ও মির্জা। ও আমার আলাপ-আলোচনা লেখে, পুথি নকল করে। এই যে তোমার সামনে কলম হাতে বসে রয়েছে।"

দরবেশ তখন বুঝতে পারল যে নীল উষ্ণীষধারী এই লিপিকরই হল সেই বালিকা যে কিছুক্ষণ আগে কোদাল হাতে দুয়ার থেকে বেরিয়েছিল।

দরবেশ তার দিকে এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে চোখ নামিয়ে ফেলল। তার নিজের যখন ষোল বছর বয়স ছিল তখন এখানেই অন্য যে বালিকাকে সে দেখেছিল তার সম্পর্কে আর জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। উদ্বেগের ভাব কাটিয়ে দরবেশ সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল:

"অঘটন ঘটন পটীয়ান আপনি নন ত কে? আপনি এই ছোট মেয়েটিকে পড়া ও লেখার সুচারু বিদ্যা শিখিয়েছেন, আর তারপর সে কিনা মাথার চারদিকে এমনভাবে জড়িয়ে পাগড়ি বাঁধতে শিখেছে যা কেবল মির্জাদেরই আয়ত্তে। আপনার বাড়ি দেখছি জ্ঞানের পরিপূর্ণ আধার।"

বৃদ্ধ তার দু' হাতের শীর্ণ আঙ্গুলগুলো পরস্পরবদ্ধ করে দরবেশের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

"এখন তোমার কথা বল, আরও বহু দূর পর্যটনের ইচ্ছে আছে না কি?"

দরবেশ তার ঝাঁকড়া মাথা নাড়িয়ে কালো জ্বলজ্বলে চোখের দৃষ্টি বৃদ্ধের দিকে নিবদ্ধ করল।

"আমার পিতা — ক্ষুধা, যার তাড়নায় আমি মরুভূমির পথে পথে

ঘুরি। আমার মাতা — অভাব, নবজাতকের জন্য স্তন্য না থাকার শোকে যার দু' চোখ অশ্রুপ্লাবিত। আমার শিক্ষাদাতা — জল্লাদের তরবারির আতঙ্ক। তবে আমি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি: 'দুঃখ করো না দরবেশ, তোমার যোগ্য কাজ তুমি সব সময়ই করেছ'।"

বৃদ্ধ মির্জা মাথা ঝাঁকাল।

"তুমি জ্ঞানে সমৃদ্ধ, যে কোন বিচারক কিংবা স্থানীয় শাসনকর্তা তার মির্জা হিশেবে তোমাকে লুফে নেবে। আর আমিও এই মুহূর্তে তোমাকে শাহের কিতাব মহলের মির্জা করে দিতে পারতাম। সেখানে মাত্র একটি করে এমন সব দুর্লভ পুথি আছে যেগুলোর নাম অবধি কারও জানা নেই। পুথিগুলো নকল করা দরকার, যাতে মানুষের হাতছাড়া হয়ে না যায়। তুমি পথে পথে ঘুরতে যাবে কেন? ভ্রমণ, ধুলিকণা, কর্দম, পদে পদে নুড়ির আঘাত — এসব কি সত্যিই তোমাকে আকর্ষণ করে?"

দরবেশ চাপা গলায় বলল:

"কথায় বলে: 'নিজের তাঁবু বিচিত্রবর্ণের গালিচায় সাজাতে বাধা কোথায়?' কিন্তু 'যখন বীরদের রণহুঙ্কার উঠেছে তখন গায়কের গীতে কী কাজ?' 'অশ্ব যখন রণক্ষেত্রে ধাবমান তখন কি আমি প্রস্ফুটিত গোলাপের শয্যায় শয়ান থাকতে পারি?"*

বৃদ্ধ একেবারে অবাক হয়ে না বোঝার ভঙ্গিতে দু' হাত ছড়াল।

"কোন যুদ্ধের কথা বলছ? মুসলমান অধিপতিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রবল পরাক্রান্ত সুলতানের বিপদ কে ঘটাতে পারে? অন্যের সমর শিবিরের আগুন তখনই লেলিহান হয়ে ওঠে যখন তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করতে চান।..."

'পুব দিক থেকে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিস্রোত আসছে, আর তাতে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল।

"না, না! খরেজম শাহের কোষে যতক্ষণ তরবারি আছে, ততক্ষণ মাভেরান্নগরের উপত্যকায় ও গোটা খরেজম রাজ্যের সীমানায় সব শান্ত থাকবে।"

---

* দশম শতাব্দীর কবি ইব্রাহিম মন্তোসিরের কাব্য থেকে।

ঘরে নিঃশব্দ চরণে প্রবেশ করল বৃদ্ধ ক্রীতদাস — তার পায়ের ভারী শিকল কোমরবন্ধনীর সঙ্গে আটকানো। তার হাতে আজব দিনার দিয়ে কেনা খাবার-দাবার বোঝাই ঝুড়ি।

বৃদ্ধের অবসন্ন শরীরে তার দেহের তুলনায় নিতান্তই খাটো একটি ডোরাকাটা জোব্বা জড়ানো। তার দীর্ঘ কাঁচাপাকা চুলের রাশি ঘাড় পর্যন্ত ঝুলছে। গালিচার ওপর রেশমি রুমাল বিছিয়ে সে রুটি ও বাদামের চাট্‌নি রাখল, একে একে নামিয়ে রাখল পাত্র ভর্তি মধু, পেস্তা, আখরোট, কিশমিশ ও অন্যান্য মিঠাই।

"এই বুড়ো গোলামের সঙ্গে একটু কথা বলার অনুমতি দেবেন কি?"

"বল, মাননীয় মুসাফির।"

"হে তাত, তোমার জন্ম কোথায়?" দরবেশ ক্রীতদাসকে জিজ্ঞেস করল।

"অনেক দূরে, রাশিয়ার মাটিতে। আমি আমার বাবার সঙ্গে বাস করতাম মস্ত বড় নদী ভোলগার ধারে — এখানে যাকে বলা হয় ইতিল। বাবা ছিল জেলে। একেবারে ছোট বয়সে আমাদের প্রতিবেশী সুজ্‌দালের রাজার ঘোড়সওয়ারদের হাতে আমি বন্দী হই। আমরা যাকে রাজা বলি আপনারা তাকেই বলেন খান বা বেগ। আমাদের রাজারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করে আর যে জেতে সে পরাজিত রাজার রাজ্য থেকে মেয়েপুরুষ ও ছেলেমেয়েদের বন্দী করে নিয়ে যায়। তারপর রাজা সবাইকে গোরু-ভেড়ার মতো বিদেশে বিক্রি করে। এইভাবে রাজা আমাকে ও আমার বোনকে বুলগার বণিকদের কাছে বিক্রি করে, তারা আমাদের নিয়ে আসে কামা নদীর ধারে তাদের বাণিজ্য শহর বিলিয়ারে, আর সেখান থেকে সব বন্দীকে, তাদের সঙ্গে আমাকেও মরুভূমির ভেতর দিয়ে তাড়িয়ে এখানে, গুরগঞ্জে নিয়ে এসেছে। বোনকে যে কোথায় বিক্রি করল জানি না। বহু আগের ব্যাপার। এখন আমার সাদা চুলের গোছাগুলো বুড়ো ছাগলের লোমের মতো ঝুলছে, তবু নদীর উঁচু পাড়ে আমার জন্ম গ্রামটি দেখার সাধ জাগে। আমি তুর্কমেন ও ফারসী ভাষায় কথা বলতে শিখেছি। আমাদের অন্য বন্দীরা এখানে না থাকলে আমি আমাদের মাতৃভাষাই বিলকুল ভুলে যেতাম। দেশের লোকদের সঙ্গে প্রায়ই যখন বাজারে দেখা-সাক্ষাৎ হয় তখন নিজের ভাষায় বাত-চিতের সুযোগ পাওয়া যায়। এখানে তারা অনেক, চলার সময় তাদের পায়ের শেকল বাজে।"

"তোমার নাম কী?" দরবেশ জিজ্ঞেস করল।

"এখানে লোকে আমাকে সাক্‌লাব বলে ডাকে, কিন্তু আমাদের যারা বন্দী আছে তারা আগের মতোই আমাকে 'স্লাভ্‌কো দাদু' বলে। বেআদবি মাফ করবেন," এই বলে সে দরবেশের উদ্দেশে আভূমি নত হয়ে শ্রদ্ধা জানাল, "শুনেছি যে আপনি দূর দূর দেশ ভ্রমণ করেন, আর সাধু-সন্তের মতো তামার দিরহাম থেকে সোনার দিনার তৈরি করতে পারেন। মুক্তিপণ দিয়ে আমাকে আমার মালিকের কাছ থেকে কিনে নেওয়া ত আপনার পক্ষে অতি সামান্য ব্যাপার। আমাকে কিনে নিন, আমি বিশ্বাসের সঙ্গে, মনপ্রাণ দিয়ে আপনার সেবা করব। আপনি হয়ত আমাদের দেশে, রাশিয়ায়ও যাবেন, তখন আমাকেও সঙ্গে নেবেন।"

"তুমি আমার গোলামকে ফুসলাতে এসেছ?" কর্তা ভুরু কুঁচকে বলল।

"গোলাম নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব কোন দুঃখে?" দরবেশ বলল। "আমি নিজেই ত কাঙাল, মুষ্টিভিক্ষায় আমাকে জীবন ধারণ করতে হয় — তাও আবার যদি কোন দরাজ হাত দয়া করে দেয়।"

"তাহলে এখানে এই দূর বিদেশেই আমাকে শেষ শয্যা পাততে হবে?" সাক্‌লাব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে বলল, তারপর গলা চড়িয়ে বলল, "মেহরবানি করে আমাদের দস্তরখান* চেখে দেখুন!" গালিচার ওপর সন্তর্পণে পা ফেলে সে তামার চিলম্‌চী ও নক্সাকাটা গাড়ুতে করে জল এনে দিল।

মির্জা ইউসুফ ও দরবেশ চিলম্‌চীর ওপর হাত ধুয়ে ফুল তোলা তোয়ালেতে হাত মুছল, নিঃশব্দে খেতে শুরু করল। সমস্ত রকম খাদ্যসামগ্রীর আস্বাদ গ্রহণের পর দরবেশ কৃতজ্ঞতামূলক শিষ্ট সম্ভাষণ জানিয়ে স্থান ত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করল।

জনশূন্য রাস্তায় অনেকক্ষণ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে পুরনো দুয়ারটার দিকে তাকিয়ে রইল।

"এই যে বাড়িটা, যেখানে এক ভালোমানুষ বৃদ্ধ কোন এক সময় আমাকে খাগের কলম ধরতে ও প্রথম অক্ষর লিখতে শিখিয়েছিল, তা

---

* দস্তরখান — আতিথিসৎকার। ভোজের জন্য মাটিতে বিছিয়ে দেওয়া সুসজ্জিত চাদরকেও বোঝায়।

আর আমি দেখতে পাব না। কেবল তার সঙ্গে একটু বেশি সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে, আমার সেই একান্ত আপন ও প্রিয় কণ্ঠস্বর শুনতে গিয়ে আমি তার পেছনে আমার একমাত্র স্বর্ণদিনারটি খোয়াতে ইতস্তত করি নি।... এখন আবার পথে!"

বিচিত্র অতিথি যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, মির্জা ইউসুফ অনেকক্ষণ সে দিকে চেয়ে রইল। বেস্ত জানকিজা ঘরে ঢুকে বলল:

"শোন, ভালোমানুষ মির্জা ইউসুফ নানা। আমার মনের মধ্যে সাপের মতো যে চিন্তাটা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে তা এই যে আমাদের স্বাধীন মতাবলম্বী যে আবু জাফর পালিয়ে গিয়েছে এই হাজি রহিম অল বাগদাদির সঙ্গে তার চেহারার খুব মিল আছে, কেবল ও দাড়ি রেখেছে, রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে, তোমার পক্ষে তাকে দেখে আগের সেই ছেলেকে চিনতে পারা কঠিন বটে।..."

"চুপ, নইলে আমাদের বাড়ির ওপর দুর্ভাগ্য নেমে আসবে! ধর্মপ্রাণ ইমামরা যাকে অভিশাপ দিয়েছেন সেই নাস্তিকের সঙ্গে আমিই কি বাক্যালাপ করতাম? এই ক্ষণিকের অতিথির কথা আর কখনও আমার সামনে উচ্চারণ করিস না। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন দেয়ালের প্রতিটি ফোকরে বিদ্বেষ গাঁথা হয়ে আছে, আমাদের মুখ কি নিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করছে তা আড়ি পেতে শুনছে। কি দিন, কি রাত সব সময় মনে রাখতে হবে কবির সেই বাণী: 'নীরবতা পরাক্রান্ত, বাদবাকি আর সবই হল দুর্বলতা'।"*

"তাই বলে বন্ধু-বান্ধবের কাছেও চুপ করে থাকতে হবে? সেই একই মহাকবি কি বলেন নি: 'কেবল সুহৃদ বাদে অপরের কাছে কর রসনা সংযত'? সারা জীবন চুপ করে থাকা — না! বরং গান গেয়ে, হাসি-ঠাট্টা করতে করতে মরব!"

"চুপ, চুপ!" বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠল। "হে আল্লাহ, আমার সহায় হও! আমি নিঃসঙ্গ! রাত দীর্ঘ, পরাক্রান্ত খরেজম শাহের কাহিনী এখনও শেষ হয় নি। আমি তার কাছ থেকে গৌরবজনক কীর্তির প্রতীক্ষায় রয়েছি, অথচ দেখছি কেবল মৃত্যুদণ্ড, কোন মহৎ কীর্তিই

---

* একাদশ শতকের ফারসী কবি আবু সাইদের কাব্য থেকে।

চোখে পড়ছে না। আমার আশঙ্কা, নায়ক হয়ে পড়বে এক শূন্যগর্ভ প্রস্তরমূর্তি, যে মূর্তির গর্ভে বিরাজ করে সোনালি কীট, যেখানে বিচরণ করে বিষাক্ত মাকড়সার দল।... আল্লাহ, আমার দিকে মুখ তুলে চাও, আমাকে আলো দেখাও!..”



দ্বিতীয় অধ্যায়

খরেজমের শাহ্‌-পরাক্রান্ত ও ভয়ঙ্কর!

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাসাদে প্রভাত

রাজার চাকরীর দুটি ধারা:
এক ত আছে রুটির আশা,
আবার ভয় — প্রাণ না যায়।

(সাদী, ত্রয়োদশ শতক)

প্রত্যুষের আধা অন্ধকারে তিন প্রবীণ ইমাম গুরেগঞ্জের সঙ্কীর্ণ রাস্তা ধরে চলেছে। আগে চলছে এক ভৃত্য, তৈলাক্ত কাগজে মোড়া মিট্‌মিটে লণ্ঠন হাতে। ইমামরা তাদের প্রশস্ত গাত্রবাসের দীর্ঘ প্রান্ত উঁচু করে ধরে জলের কুল্‌ কুল্‌ ধ্বনি মুখরিত নালা পার হল।

অন্ধকারে কখনও লঙ্কা, আদা ও জায়ফলের খোলা দোকানপাটের কাছাকাছি হতে অনুভব করা যাচ্ছিল মশলাপাতির তীব্র সুগন্ধ, আবার

কখনও বা ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম, জিন ও জুতোয় ঠাসা দোকানের সারির পাশ দিয়ে যেতে যেতে ইমামেরা পাচ্ছিল চামড়ার কটু গন্ধ। চকে আশতেই একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর তাদের গতি রোধ করল:

"থাম! রাতে কোন কাজে বেরিয়েছ?"

"পরম শক্তিমানের কৃপায় আমরা ধর্মযাজক, বড় মসজিদের ইমাম, ফজরের নামাজের জন্য বাদশাহের প্রাসাদে চলেছি।"

"চুপচাপ এগিয়ে যাও!"

প্রাসাদের উঁচু ফটকের সামনে এসে তিন ইমাম থামল। দ্বারে আঘাত করে লাভ নেই, সেটা ঔদ্ধত্যও বটে। ফটক আপনা-আপনি ঈষৎ উন্মুক্ত হল। কয়েক জন অশ্বারোহী অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে চকের মাঝখান দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। 'ধর্ম ও ন্যায়ের মহামহিম ও পরম বিচক্ষণ রক্ষাকর্তার' ফরমান নিয়ে এই দূতেরা ছুটছে এমন সব গন্তব্যস্থলের দিকে যার কথা প্রেরণকারী ছাড়া আর কারও জানা নেই।

প্রবীণেরা পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে, একটা বড় ডোবা পার হয়ে বাইরের ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়ল। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের চারদিকে শাহের সৈন্য-সামন্ত ঘোরা-ফেরা করছে। আগতদের মোল্লা বলে চিনতে পেরে প্রহরী দু' জন সরে গিয়ে তাদের পথ করে দিল। তিন জনে কয়েকটি ছোট ছোট প্রাঙ্গণ পার হল। নিদ্রাজড়িত প্রহরীরা লোহার চাবির গোছায় ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ তুলে ভারী ফটক খুলছিল।

অবশেষে পাল্লা আঁটা দরজা দেখা গেল। দরজার দু'পাশে বর্শায় হেলান দিয়ে লোহার বর্ম ও শিরস্ত্রাণে সজ্জিত দুই যোদ্ধা নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এক ভৃত্য এগিয়ে এলো। তার হাতের মাটির প্রদীপে বসানো সলতে শীষ তুলছিল। ভৃত্য প্রদীপটি অনেকখানি ওপরে তুলে বলল:

"আমির উল্‌ মুমিনিন এখনও আসেন নি।"

"আমরা অপেক্ষা করব," ইমামের দল উত্তর দিল। তারা চটি খুলে গালিচার ওপর উঠল, তারপর চার কোণায় তামার পাত আঁটা চামড়া বাঁধানো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুঁথি সামনে খুলল।

"গতকাল চার জন বিদ্রোহী খান জামিন হিশেবে শাহের কাছে তাঁদের নাবালক ছেলেদের পাঠিয়েছেন। শাহ ভোজের আয়োজন করেছেন। বারোটা ভেড়া আগুনে ঝলসানো হয়েছে," এক ইমাম বলল।

"আজ আবার কী ফন্দি বার করে কে জানে?" দ্বিতীয় জন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল।

"সবচেয়ে বড় কথা হল সব ব্যাপারে তার সঙ্গে এক মত হওয়া; তর্ক করা চলবে না," তৃতীয় জন দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল।

খরেজম শাহ মুহম্মদ স্বপ্ন দেখল: সে যেন স্তেপভূমিতে এক টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, আর চার দিকে, যত দূর দৃষ্টি যায় হাজার হাজার জনতার ভিড়। অস্তগামী সূর্যের পিঙ্গল রশ্মিরাগে আকাশ জ্বলছে। সূর্য এখনও চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে বৈচিত্র্যহীন বালুকাচ্ছন্ন প্রান্তরের মধ্যে দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে।

"বাদশাহ দীর্ঘায়ু হোন, বাদশাহ জিন্দাবাদ!" দূরে দূরে প্রান্তের জনতাশ্রেণী থেকে সেই নিনাদ গুরু গুরু ধ্বনি তোলে। লোকে ধীরে ধীরে পৃষ্ঠদেশ নত করে, সাদা সাদা পাগড়ির আড়ালে তাদের মুখ ঢাকা পড়ে যায়।

গোটা জনতা তার দণ্ডমুণ্ডের কর্তার সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ে। যতদূর চোখ যায় কেবল জোব্বা আর জোব্বা — যেন চির বিক্ষুব্ধ খরেজম সাগরের* তরঙ্গ।

"বাদশাহ জিন্দাবাদ!" দূরতম নিনাদের রেশ প্রতিধ্বনির মতো শোনায়, তারপর সব চুপচাপ। সূর্য আড়ালে চলে যায়, নীলাভ গোধূলিতে ও নীরবতায় স্তেপ ডুবে যায়। নিভন্ত আলোয় শাহ দেখতে পায় আনত পৃষ্ঠদেশগুলো টিলার গা বেয়ে তার দিকে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে।

"আর নয়, তফাৎ যাও!" শাহ হুকুম দিল। কিন্তু পিঠগুলো চার দিক থেকে এগিয়ে আসে — কমলা রঙের কোমরবন্ধনী জড়ানো ডোরাকাটা জোব্বায় ঢাকা পিঠ আর পিঠ। শাহের মনে হল সবারই বুকের কাছে লুকানো আছে ধারালো ছুরি। জনতা তার দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকে খুন করতে উদ্যত। শাহ ছুটে এসে সামনের একজনকে পদাঘাত করে, লোকটির জোব্বা পাখির মতো উড়ে সরে যায় — ভেতরে কেউ নেই। অন্য জোব্বাগুলোও শাহ পদাঘাতে দূরে সরিয়ে দেয় — সেগুলোর ভেতরও ফাঁকা।

---

* আরল সাগরকে ত্রয়োদশ শতকে খরেজম সাগর বলা হত।

"কিন্তু ওদের মধ্যে একজন আছে! আমার এই যে হৃৎপিণ্ড সজীব রয়েছে, স্পন্দিত হচ্ছে কেবল খ্যাতিমান খরেজম শাহ বংশের কল্যাণ ও মহিমা প্রচারের জন্য, তাকে ছুরিকাবিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সে লুকিয়ে পড়েছে।"

"আর নয়! শাহের হুকুম — তফাৎ যাও!" গলার আওয়াজটা ভাঙা ভাঙা, কানে যায় কি যায় না, — সঙ্গে সঙ্গে সব অদৃশ্য হয়ে যায়। চার দিক জুড়ে বিরাজ করে স্তেপ — নির্জন, ধূসর ও নির্বাক। তৃণগুল্মের রুক্ষ কান্ডগুলো মুমূর্ষু আকাশের গায়ে আঁচড়ের মতো। শাহ এখন মরুভূমিতে একা, সম্পূর্ণ একা, অশ্ববিহীন। আর এখানেই কোথায় যেন, খুবই কাছাকাছি, ধূসর টিলাগুলোর একটার পেছনে, বেগুনী রঙের এক গহ্বরে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে সেই একক, একমাত্র লোকটি যে তাকে হত্যা করতে চায়।... সকলেই তার মৃত্যু কামনা করে, কিন্তু একজন মাত্র তাকে হত্যা করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। কে সে?

দূরে জনতার চিৎকারের প্রতিধ্বনি ওঠে:

"জালাল উদ-দিন দীর্ঘায়ু হোন! খরেজম শাহের সাহসী পুত্র ও ওয়ারিশ জালাল উদ-দিনের জয় হোক!"

"আমার কথা ভুলে গিয়ে ওরা ইতিমধ্যেই আমার ছেলের হাতে চুমু খেতে যাচ্ছে? এ হতে দেওয়া চলে না, আর নয়! আমার পথের সামনে যেই দাঁড়াক না কেন তাকে পিষে মারব, — সে বাগদাদের খলিফা হোক বা আমার উদ্ধত পুত্রই হোক! আর নয়!..

আধা ঘুমন্ত অবস্থায়ও শাহ তার পাশে খস্‌খস্ আওয়াজ শুনতে পেল, মুখের ওপর অনুভব করল একটা শীতল স্পর্শ। আতঙ্কে ও বাঁচার নিদারুণ আকাঙ্ক্ষাবশত সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে লাফিয়ে উঠল। শাহ চোখ মেলে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে ঘরের অন্ধকার কোনাগুলো খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।

দেয়ালের বিশাল চুল্লী* থেকে পোড়া কয়লার তাপ আসছে। চুল্লীর পাশে কে একজন বসে রয়েছে। স্তেপের এই বন্য মেয়েটিকে গতকাল নিয়ে আসা হয়েছে। মেয়েটি আতঙ্কে চোখমুখ ঢেকে পিছিয়ে গেল।

---

* দ্বাদশ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় ঘর গরম করা হত হয় ছাদে একটি ছিদ্রপথ রেখে ঘরের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে অথবা দেয়ালের ভেতরে চুল্লী করে।

"কে তুই?"

"আল্লাহ আকবর। আমি গুল জামাল, মরুভূমির তুর্কমেন মেয়ে। গতকাল সন্ধেবেলা আপনাকে ঘুমন্ত অবস্থায় এখানে ধরাধরি করে আনা হয়েছে, আর আপনি যেমন শুলেন অমনি ঘুমে ঢলে পড়লেন। আপনাকে দেখে আমার ভয় করছিল, ঘুমের মধ্যে আপনি এমন ভয়ঙ্কর রকম ঘড়্ঘড়্ করছিলেন ও কাতরাচ্ছিলেন যেন ঠিক মারা যাচ্ছেন। আপনাকে নিশিতে পেয়েছিল। এ'রা অন্ধকারে তাঁবুর ওপর উড়ে বেড়ান আর যাদের মনে খুন করার ইচ্ছে বাসা বাঁধে তাদের যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য তাঁবুর ওপরের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢোকেন।"

"তোর হাতে কী ছিল?" এই বলে শাহ তার ছোট হাত দুটো ধরে চাপ দিল।

"আঃ লাগে! ছাড়ুন!"

"তোর হাতে কী ছিল দেখা।"

"আমার হাতে কিছু নেই, কিছু ছিল না। যদি চান ত যে দোয়েল পাখি গোলাপের প্রেমে পড়েছিল তাকে নিয়ে আমাদের স্তেপের গান আপনাকে গেয়ে শোনাই। নাকি পারস্যের সেই যে রাজকুমার আয়নায় চীনের রাজকন্যার মুখ দেখতে পেয়েছিল তার রূপকথাটা বলব?"

"কোন রূপকথার দরকার নেই — গোলাপ নিয়েও নয়, রাজকুমার নিয়েও নয়।... আঃ!... এই ত তলোয়ারের খাপ খুঁজে পেয়েছি। বাদশাহের ঘরে ছুরি নিয়ে ঢুকেছিস কেন?"

"ছাড়ুন আমাকে! জানেন ত কথায় বলে: 'ঘোড়াকে মেরো না, বন্ধু হারাবে'।..."

গুল জামাল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে সরে গেল।

"কী সাঙ্ঘাতিক! তুই আমাকে খুন করতে চাস! তোকে দেখে আমার ভয় হচ্ছে।"

মেয়েটা দরজার নীচু পাল্লা দিয়ে ছুটে বের হতে গিয়ে যে দু'টি দাসী আড়ি পেতে সব শুনছিল তাদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

শাহ ঘনঘন নিশ্বাস নিতে নিতে চুল্লীর দিকে এগিয়ে গেল। বুষের মতো স্ফীত তার দুই চোখে টকটকে আগুন দপদপ করে উঠল। একটা নলখাগড়ার বেত দিয়ে সে তামার পাত্রে আওয়াজ করল। দরজার পাল্লা

ভেদ করে ছাগ শ্মশ্রুধারী এক বৃদ্ধ ভৃত্য প্রবেশ করেই সাষ্টাঙ্গে শাহের সামনে পড়ল।

"এই মেয়েটিকে সন্ধেবেলায় আমার গালিচা মহলে পাঠিয়ে দিস। উকিল* ও খাস উজির** কি এখানে?"

"হে মহানুভব, সকলে আপনারে অপেক্ষায় রয়েছেন, খবরকর্তা*** আর তিন জন ইমামও।"

"খান জালাল উদ-দিন কি এখনও আসে নি?"

"তখ্তের অবলম্বনকে এখনও দেখা যাচ্ছে না।"

"অপেক্ষা করুক। গোসলখানায় আমার কাছে দাড়িতে কলপ লাগানোর জন্য হাজমকে আর পিঠ দলাই-মলাইয়ের জন্য চাকরদের পাঠিয়ে দে।"

খরেজম শাহ্ পাশের কামরায় চলে গেল। বৃদ্ধ ভৃত্য বালিশ ও তুলোর লেপ গুছিয়ে দেয়ালের কুলঙ্গিতে তুলে রাখছিল, তার দেহ শীর্ণ ও ন্যুব্জ, রক্তবর্ণের দুই চোখে অবিরাম নির্গত জলভার। গালিচার ওপর চকচকে কী একটা দেখা গেল। বৃদ্ধ ঝুঁকে পড়ে যা তুলল তা হল হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা তীক্ষ্ন শানিত একটি খঞ্জর।

"এটা তুর্কমেনী ছোরা... ওঃ, এই তুর্কমেনী ছুঁড়ীগুলো! বিষাক্ত কারা-কুর্ত মাকড়সার কামড়ের মতো ওদের ক্রোধ থেকেও সতর্ক থাকতে হয়। এক্ষুনি উকিলকে দেব, না লুকিয়ে রাখব? আরে তাড়ার কী আছে?"

শাহ ঢিলে রেশমী শালোয়ারের দড়ি কষে বাঁধল, মাংসল উদরদেশে ডোরাকাটা চাদর জড়াল, কটিবন্ধে রুপোর খাপে ঢাকা ছোরা গুঁজল, কাঁধের ওপর ফেলল কিংখাবের কাজ করা নকুলের চামড়ার দীর্ঘ আংরাখা। কুলঙ্গি থেকে শাহ্ সযত্নে বার করল পরিপাটিভাবে পাকানো শ্বেতবর্ণের উষ্ণীষ, অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সেটা তার অর্ধপলিত দীর্ঘ কেশদামের ওপর আঁটল।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছুরির শীতল হাতল চেপে ধরে শাহ দরজার কাছে কান পাতল।

* উকিল — প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক।

** খাস উজির — রাষ্ট্রীয় দপ্তর ও সকল আমলার প্রধান।

*** খবরকর্তা — রাষ্ট্রীয় ডাক বিভাগের প্রধান।

"সাবধানী সব সময় আক্রমণ ঠেকানোর জন্য তৈরি। প্রাসাদের অলিগলির অন্ধকারের মধ্যে আমার পরম শত্রু বাগদাদের খলিফার পাঠানো ইসমাইলি* আততায়ীর হাতের ছুরি আচমকা আমাকে বিঁধতে পারে।..."

"উকিল, তুমি কি এখানে?" শাহ মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল।

"আমি অনেকক্ষণ যাবৎ হুজুরের অপেক্ষায় আছি।"

শাহ কাঠের খিল ঠেলে দরজা ফাঁক করল। দু'টি তৈলাক্ত প্রদীপের মিটমিটে আলোয় অন্তরঙ্গ পার্শ্বচরদের ঈষৎ আলোকিত মূর্তিগুলো অবনত দেহে দাঁড়িয়ে ছিল।

রাতে জমে যাওয়া শক্ত চটির মধ্যে খালি পা দুটো গলিয়ে মুহম্মদ পরবর্তী কামরায় প্রবেশ করল। সেখানে ভৃত্যেরা অপেক্ষা করছিল। একজন ধরল মাটির প্রদীপ, দ্বিতীয় জন — রুপোর গামলা, তৃতীয় জন — বদনা। পাথরের মেঝেতে এক বিবরে জলধারা চুঁইয়ে চুঁইয়ে জলাশয় গড়ে উঠেছে, শাহ তারই কাছে উজু সারছে আর এই ভৃত্যদের কাজ হল তাকে সে ব্যাপারে সাহায্য করা। চতুর্থ ভৃত্যটি প্রসারিত হস্তে বাড়িয়ে দিল রেশমী নক্সাতোলা এক দীর্ঘ তোয়ালে এবং হুজুরের মাংসল পায়ে পরিয়ে দিল পশমের বুটিদার মোজা।

খরেজম শাহ যখন এই কাজে ব্যস্ত, ততক্ষণে উকিল সর্বশেষ সমাচার বলে যেতে লাগল:

"বাইরে অত্যন্ত ঠাণ্ডা। সাদা তুষারকণায় সব ঢেকে গেছে।... তিন জন ইমাম রাজপ্রাসাদে এসেছেন, আপনার আজ্ঞার অপেক্ষা করছেন।... জল্লাদদের সর্দার জাহান পহলবানও আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছে।... গতকাল সন্ধ্যায় বুলগার থেকে তিন শ' উট বোঝাই দামী বুলগেরীয় ছাগচর্মের জুতো ও একশ' বন্দী উরুসের এক বিরাট কারাভান এসে পৌঁছেছে। শ' দুয়েক ক্রীতদাস পথে মারা গেছে, যদিও তিলের তেল দিয়ে জোয়ারের জাউ তাদের প্রায় প্রতিদিনই খাওয়ানো হয়েছে। ইতিপূর্বে আর একটি কারাভান তুর্কমেন দস্যুরা লুট করেছে। সম্ভবত এটা কারা কন্‌চারের কাজ।"

---

* ইসমাইলি — ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন আততায়ী ও গুপ্ত হত্যাকারী সম্প্রদায়। পরবর্তীকালে মোঙ্গলদের হাতে এরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

"এই তুর্কমেন যাযাবর আস্তানাগুলোকে আমি চুরমার করে দেব! তবে আমার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে বাগদাদ ফেরৎ তীর্থযাত্রীরা। বাগদাদ থেকে এসেছে এমন আরব দরবেশ কি আর কম আছে? ওরা সবাই বাগদাদের খলিফার গুপ্তচর, সবাই আমার অনিষ্ট কামনা করে।"

"কোন অধমেরা আমির উল্ মুমিনিনের ক্ষতি কামনা করতে পারে?"

"এই হয়েছে মুসলমানদের হাল!"

সাজগোজ শেষ করে শাহ্ রোজকার মতোই প্রথমে দরদালান দিয়ে, তারপর পাথর বাঁধানো সিঁড়ি বয়ে চলল। উকিল আর খোজা মশাল হাতে আগে আগে চলল, দরজা খুলল। শাহ্ পাথরে তৈরি প্রাসাদ মিনারের চুড়োয় গিয়ে উঠল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহামতি ইস্কান্দারের উদ্দেশে 'নুবা'

যুদ্ধ প্রাকার বরাবর এক সমতল চত্বরের ওপর অর্ধবৃত্তাকারের দাঁড়িয়ে ছিল সাতাশ জন কিশোর খান — গুর, গজ্নী, বাল্খ, বামিয়ান, তের্মেজ ও অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্তাদের পুত্র। এই কিশোর ও বালকদের শাহ কঠোর প্রহরায় তার প্রাসাদে জামিন হিশেবে ধরে রেখেছে যাতে তাদের পিতারা, সামন্ত খানেরা বিদ্রোহের তরবারি উত্তোলনের চিন্তা মাথায় না আনতে পারে। ছেলেদের সকলের হাতে ছিল ঢাক এবং ঝুমঝুমি লাগানো খঞ্জনী।

সেই সঙ্গে ছিল বড় বড় শিঙা, সানাই ও তামার করতাল হাতে যন্ত্রীরা। এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল খরেজম সেনাবাহিনীর প্রধান প্রধান সেনানায়ক।

শাহের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি উঠল:

"আমির উল্ মুমিনিন, কাফেরদের বিভীষিকা, অপরাজেয় বাদশাহ দীর্ঘজীবী হোন!"

শাহ অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল।

"তিমুর মালিক কোথায়?"

"এইখানে জাহাঁপনা।"

অভিযানে মুহম্মদের বিশ্বস্ত সঙ্গী দীর্ঘদেহী সদা প্রফুল্ল তিমুর মালিক দু'টি ছেলেকে হাতে ধরে সামনে এগিয়ে এলো: একটি হল শাহের কনিষ্ঠ পুত্র — তার সর্বশেষ পত্নী জনৈক কিপ্‌চাক খানের কন্যার গর্ভে জাত, অপরটি শাহের পৌত্র — জালাল উদ-দিন ও তার তুর্কমেন পত্নীর সন্তান। তিমুর মালিক ছেলে দু'টিকে শাহের সামনে দাঁড় করাল। শাহ পুত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে সস্নেহে গালে চিমটি কাটল। আর পৌত্রকে কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করল:

"খান জালাল উদ-দিন কোথায়?"

"আব্বা বাজপাখি নিয়ে শিকারে গেছে," ছেলেটি বলল। সাদা পাগড়ির আড়াল থেকে তার কালো চোখ দু'টি সতর্ক দৃষ্টি মেলল।

"তিমুর মালিক! খান জালাল উদ-দিনের খোঁজে চার দিকে ঘোড়-সওয়ার পাঠাও! তুর্কমেনরা কারাভানের ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ওরা আমার ছেলেকেও আক্রমণ করতে পারে।"

"আদেশ পালিত হবে, হজরত!"

ওপরে, যেন মেঘের আড়াল থেকে শিশু কণ্ঠের মতো মিহি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল:

"যে জাগ্রত সে আশীর্বাদধন্য! যে অতন্দ্র সে সুখী!"

দূর পর্বতশ্রেণীর আড়াল থেকে উঁকি মারা সূর্যের গোলাপী রশ্মিমালায় আকাশচুম্বী মোমবাতির মতো উন্নত মিনারের শীর্ষদেশ আলোকিত হতে থাকে। শহরের সব দালান তখনও কুয়াশার অন্ধকারে ডুবে আছে।

তরুণ খানদের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ সে খরেজম শাহের হাতে ঢাক তুলে দিল। মুহম্মদ উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল:

"মহামতি ইস্কান্দারের* জয়! বিশ্ববিজয়ী বীরের জয়! ইরান থেকে জাইহুন ও জারাফশানের** তীর পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ইস্কান্দারের অধীন।

---

* মহামতি ইস্কান্দার — ম্যাসিডোনিয়ার মহাবীর আলেকজাণ্ডার।

** জারাফশান — গিসার পর্বতশ্রেণী থেকে সমরখন্দের দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত "স্বর্ণনদী"। এর জল সমরখন্দ ও বুখারার শস্যক্ষেত্রে জলসেচের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইস্কান্দার আমাদের আদর্শ, আমাদের শিক্ষাগুরু! তাঁর গৌরব কীর্তন করে তিন বার জোরালো 'নুবা'* সঙ্গীত বাজাব।"

খঞ্জনী ও ঢাক গমগম করে উঠল। তামার করতাল ঝনঝন আওয়াজ তুলল। বড় বড় শিঙার ভাঙা গর্জনে, বাঁশির পিঁ পিঁ সুরে চার দিক মুখরিত। ম্যাসিডোনিয়ার বীর সন্তানের সম্মানে সকলে তিন বার ঝঙ্কার ও গুরু গুরু ধ্বনি তুলল। সব শান্ত হয়ে যাবার পরও যখন ফাঁপা প্রতিধ্বনি প্রাসাদের উন্নত বুরুজে অনুরণিত হচ্ছিল তখন তিমুর মালিক উচ্চ কণ্ঠে বলল:

"আমরা মহামতি রুমি** ইস্কান্দারের প্রতি যোগ্য সম্মান দেখিয়েছি। তাঁর দেহাবশেষ শান্তি লাভ করুক। তাঁর যা কিছু করার ছিল স্বল্প জীবনে তিনি সে কাজের অর্ধেক মাত্র সমাধা করতে পেরেছেন। এখন আমাদের নতুন ইস্কান্দার হলেন মহামতি মুহম্মদ — যোদ্ধা ও সেনানায়ক মুহম্মদ, মহিমান্বিত খরেজম সাম্রাজ্যের স্রষ্টা মুহম্মদ! মুসলিম জাহানের পরাক্রান্ত অধিপতি শাহ মুহম্মদ আলা উদ-দিনের রাজত্বকাল আল্লাহের রহমতে সম্প্রসারিত হোক। আমাদের মহামতি শাহের সম্মানে তিন বার 'নুবা' সঙ্গীত বাজাই!"

শান্ত বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করে আবার গমগম করে উঠল খঞ্জনী, করতাল ও ঢাকের আওয়াজ, আবার বড় বড় শিঙা ভয়ঙ্কর আওয়াজ তুলল।

কঠিন, ভয়ঙ্কর ও চিন্তামগ্ন মুহম্মদ প্রশস্ত দুই কাঁধ টান-টান করে যুদ্ধ প্রাকারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল; তার তুষারশুভ্র উষ্ণীষের নীচে যেন বিরাট বিরাট ভাবনা আবর্তিত হয়ে চলেছে।

"তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! যাও!" খরেজম শাহ বলল।

একের পর এক সকলে বুকের ওপর দু' হাত ভাঁজ করে ছোট ছোট পদক্ষেপে শাহের সামনে এগিয়ে আসে; তার গাত্রাবাসের প্রান্তে ঠোঁট ঠেকিয়ে পিছন ফিরে সিঁড়ির অন্ধকার গহ্বরে মিলিয়ে যায়।

সবশেষে দু' হাতে রাজ পরিবারের শিশু দু'টির হাত ধরে প্রস্থান করে তিমুর মালিক।

---

* নুবা — ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজান্ডারের মহিমা কীর্তনকারী কুচকাওয়াজ সঙ্গীত। খরেজম শাহ মুহম্মদ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রাসাদে এর প্রচলন করে।

** রুমি — গ্রীক।

"আব্বা আমার জন্য জ্যান্ত বুনো ছাগল আনবেন বলেছেন," শাহের পৌত্র বলল।

"কুচুটে কোথাকার, তোর ঐ ছাগল আর তোকেও গিলে খাওয়ার জন্য বাদশাহ আমাকে শিকারী চিতাবাঘ উপহার দেবেন!.."

শাহ প্রাকারের ওপর কনুই ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। নীচে সমতল ছাদের এলোমেলো স্তূপ। অনেকগুলো নীচু দালানে নিয়ে প্রাসাদ — সেগুলো আবার অলিগলি দিয়ে এক বেঢপ বিশাল দালানের সঙ্গে যোগ করা। তার চার দিকে আছে পাহারার জন্য তৈরি পেটমোটা গড়নের বুরুজ শ্রেণীযুক্ত প্রাচীন প্রাকার। আলোকের রেখাঙ্কিত আকাশের পটভূমিকায় বর্শা হাতে নিশ্চল প্রহরীদের মূর্তিগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট।

শাহ তাকিয়ে ছিল দূরে — ঘুম ভাঙা বিশাল শহরের দিকে, যেখানে ছোট ছোট বাড়ির সমতল ছাদগুলোর ওপর ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। তারপর তার চোখ এসে ঠেকল প্রাসাদের একটি ক্ষুদ্র আঙিনার ওপর, যেখানে উঁচু উঁচু প্রাচীন ঝাউ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে একটা ধবধবে ছাউনি। এই ছাউনির নীচে আছে তার হারেমের নতুন মুক্তা, শ্যামবর্ণা তুর্কমেনীয় মেয়ে গুল জামাল, যে সকালে তার কাছ থেকে পালিয়েছিল: মেয়েটি প্রাসাদের অন্ধকার প্রশান্তির সঙ্গে রফা করতে নারাজ, স্তেপে যেরকম জীবনযাত্রায় সে অভ্যস্ত সাধারণ তুর্কমেনীয় মেয়েরা যেমন তাঁবু থেকে নির্গত ধোঁয়ার নিঃশ্বাস নিয়ে জীবনধারণ করে সেইভাবে বাস করার জন্য সে ছাউনি দাবি করে। স্বর্গোদ্যানের অন্যান্য "গোলাপের" সঙ্গে হারেমে একত্রে বসবাসের অভিরুচি তার নেই। কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় তা সে এখনও জানে না! সাধে কি শাহ জননী তুর্কান খাতুন ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না!

"এত বড় বুকের পাটা! প্রভুর গায়ে হাত তোলা! গালিচা মহলে আমার সাধের তুষার চিতা যখন ওর ওপর লেলিয়ে দেব তখন ও কেমন কাতরায়, কুঁকড়ে যায় তা দেখতে হবে!.."

নীচে, বুরুজের পাদদেশ থেকে চিৎকার শোনা গেল। ভোরের নিস্তব্ধতায় কথাগুলো স্পষ্ট, পরিষ্কার ভেসে এলো:

"হে ইমানদারেরা, শুনে রাখ! শাহ মুহম্মদ ইসলামের বিধি থেকে

ভ্রষ্ট হয়ে ধর্মদ্রোহী শিয়া* মতবাদ গ্রহণ করেছে। সে ধর্মদ্রোহী পার্সীদের সমাদর করে, কাফের কিপচাকরা তার পার্শ্বচর। তার পিতা শাহ তাকাশ ছিলেন সম্মানীয় তুর্কমেন, অথচ মুহম্মদ তুর্কমেনদের দূর-ছাই করে। ওকে বিশ্বাস করো না!''

"ওটা কে ঘেউ-ঘেউ করে? উকিল, এ তোমার কেমন শৃঙ্খলা রক্ষা?"

উকিল শাহের সামনে আভূমি নত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল:

"মিনারের জিন্দানে দরবেশ শেখ মৈজ উদ-দিন চেঁচাচ্ছে। না বেড়ি, না কারাগারের অন্ধকার — কিছুতেই তার ভয়-ডর নেই। আপনার অগাধ মনস্বিনী জননী তুর্কানে খাতুন তাকে বিশেষ কৃপার দৃষ্টিতে দেখেন। অথচ ও বাদশাহের বিরুদ্ধে বেয়াড়া কথা উচ্চারণ করে। গতকাল শহরের সব দরবেশ মাঠে জমায়েত হয়ে জিন্দান থেকে এই বাওয়ারা শেখ মৈজ উদ-দিনকে বার করে আনার জন্য এখানে আসবে বলে ঠিক করেছে।''

মুহম্মদ উকিলের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল:

"আহাম্মক! এক্ষুনি জল্লাদ সর্দার জাহান পহলবানকে জানাও যে আমি এই রাজদ্রোহীর ভার তার শক্ত হাতে তুলে দিলাম।... আর হ্যাঁ, ও যেন তাড়াতাড়ি করে, যাতে উন্মাদ দরবেশগুলো এসে এটাকে ছাড়িয়ে না নিয়ে যেতে পারে।"

খরেজম শাহ বুরুজ থেকে নেমে আম দরবারে গেল। ঘরের দেয়ালগুলো লাল বনাতে ঢাকা। এখানে প্রবীণ তিন ইমাম শাহের জন্য অপেক্ষা করছিল। চটি জোড়া দোরগোড়ায় খুলে রেখে শাহ ঘরের মাঝখানে গিয়ে গালিচার ওপর বসে পড়ল। মেঝের কোটরে, যেখানে জ্বলন্ত কয়লার কড়াই রাখা ছিল সেই গরম জায়গাটার ওপর আলতো করে একটা রেশমী লেপ বিছানো ছিল। শাহ সেই লেপের নীচে পা ঢুকিয়ে দিল।

''এগিয়ে আসুন, তসরিফ রাখুন আমার শিক্ষাদাতারা!''

ইমাম তিন জন গালিচার প্রান্তদেশে হাঁটু মুড়ে বসে ছিল, এবারে তারা নিম্নস্বরে আরবী ভাষায় কৃতজ্ঞতাসূচক বাণী উচ্চারণ করে পাশে এসে বসল, তারাও লেপের নীচে পা ঢাকা দিল।

''বলুন,'' শাহ বলল। ''মুসলিম জাহানের পরম পরাক্রান্ত প্রভু আমি

---

* মুসলিম জগৎ দু'টি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত — সুন্নি, যার প্রবক্তা তুর্ক-ওসমানীরা এবং শিয়া, যার প্রধান অনুসারী পারস্য বা ইরানের অধিবাসীরা।

বাগদাদের খলিফাকে আমার অধীনতা স্বীকার করতে বলে ঠিক করেছি কিনা বলুন। আর খলিফা যদি আমার বশ্যতা স্বীকার না করে সে ক্ষেত্রে আমার কী করা উচিত তাও বলুন।"

ইমামেরা তাদের সঙ্গে যে সব বড় বড় প্রাচীন পুঁথি এনেছিল সেগুলো খুলল, পালাক্রমে কোরান থেকে শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করে একথাই প্রমাণ করে দিল যে খরেজম শাহ মুহম্মদ আল্লাহের পরই দুনিয়ার সর্বোচ্চ মালিক, তিনি সর্বদাই ন্যায়পরায়ণ এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ, প্রতিটি বাণী — পবিত্র।...

ঘরে অন্ধকার। ছাদের একেবারে কাছাকাছি দেয়ালে জাফরিকাটা গোলাকার ঘুলঘুলি ভেদ করে মৃদু আলো প্রবেশ করতে থাকে। কাঁসার দীপাধারে রাখা তৈলাক্ত দীপ কম্পিত আলোকশিখা বিস্তার করে। ইমামেরা পুঁথির দিকে না তাকিয়েই আরবী ভাষায় শ্লোক আবৃত্তি করে যায়।

শাহের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল ভারিক্কি গোছের খিদমদ্‌গার — শাহী খানার প্রধান ব্যবস্থাপক। গালিচার ওপর নিঃশব্দ চরণে ভৃত্যেরা নড়াচড়া করছে, একটি মাত্র কথায় অথবা ভ্রূভঙ্গিতে সে তাদের হুকুম দেয়। দ্বিতীয় কর্মচারী — খানসামার কাজ হল বড় বাবুর্চির কাছ থেকে রুপোর পাত্রে খানা এনে পরিবেশন করা। দরজার আড়াল থেকে শাহের কৃপাদৃষ্টির প্রতীক্ষায় পাত্রমিত্ররা উঁকিঝুঁকি মারে।

এক কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস লেপের ওপর চওড়া জলচৌকি পেতে দিল, ক্রীতদাসটির নাকে রুপোর আংটা ঝুলছে। খিদমতগার নিপুণ ভঙ্গিতে চৌকির ওপর রেশমী চাদর — দস্তরখান বিছিয়ে দিল। পরিবেশনকারী শাহের সামনে নুন ও ভেড়ার চর্বি দেওয়া গরম চায়ের পেয়ালা সমেত বারকোশ নামিয়ে রাখল। একে একে রাখল চর্বির টুকরোর পুর দেওয়া কড়া ভাজা পাতলা চাপাটির স্তূপ, গলানো ঘি, ননী ও মধুর পাত্র।

ইমামদের কথা শুনতে শুনতে শাহ চাপাটি খায়, আর একের পর এক পেয়ালা উজাড় করে চলে। কড়াইয়ের আগুন ও চায়ের উষ্ণতায় শরীর গরম হলে পর শাহ যথাসময়ে স্থাপিত তাকিয়ায় হেলান দিয়ে নাসিকা গর্জন শুরু করে দিল। সম্রাট যে জ্ঞানী ইমামদের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট, এটা তারই লক্ষণ। সকলে নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করল। দস্তরখান সমেত

জলচৌকি অদৃশ্য হল, কর্মচারী এবং ভৃত্যেরাও আড়ালে চলে গেল। কেবল কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস ইসলামী দুনিয়ার মহামতি শাসকের নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় দুয়ারের কাছে আলগোছে বসল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উগ্রচণ্ড

বড় চকে শাহের প্রাসাদের পার্শ্ববর্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন উঁচু 'চিরবিস্মৃতির কারামিনার' গুরগঞ্জের সকলের কাছেই পরিচিত।

লোহার কাঠামোয় মোড়া নীচু দরজায় বিশাল তালা ঝুলছে। ঐখানে ইঁটের দেয়ালে খাটো মরচে ধরা বর্শা হেলান দিয়ে রেখে সিঁড়ির ওপর বসে থাকে প্রহরী, তার কাঁধ থেকে আলগাভাবে চাবির গোছা ঝোলে। প্রহরীর সামনে মাটির ওপর এক টুকরো আসন পাতা — পথচারীরা সেখানে রাখে তাদের দানসামগ্রী: দইয়ের বাটি, চাপাটি, পিঁয়াজের আঁটি, সামান্য কয়েকটি তামার মুদ্রা।... যারা একটু বেশি উদার, প্রহরী কখনও কখনও তাদের ওপর সদয় হয়ে জিন্দানের আরও কাছাকাছি এসে বন্দীদের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দেয়।

কারামিনারের নীচের দিকে গরাদ দেওয়া গোলাকৃতি কালো কালো গহ্বর। পাতাল ঘর থেকে শোনা যায় অস্ফুট আর্তনাদ। পথচারীদের পদধ্বনি শোনা যাওয়া মাত্র কুঠুরির আর্তনাদ তীব্র হয়ে ওঠে, ফাঁক থেকে কঙ্কালসার হাতগুলো বেরিয়ে এসে বাইরের বাতাস আঁকড়ে ধরে। মাথার চার দিকে ফিকে নীলরঙা ফেটি জড়ানো, ডোরা কাটা জোব্বা পরনে সাধারণ লোক এবং বিশাল তুষারশুভ্র উষ্ণীষ মাথায় মোল্লা প্রহরীকে মুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে চুপচাপ দেয়ালের ফাঁকের কাছে আসে, গরাদ ভেদ করে যে ক্ষীণ ও মলিন হাতগুলো প্রসারিত হয় তাদের পরিবেশন করে রুটির টুকরো। তখন চেঁচামেচি আরও বাড়ে, জানলা পর্যন্ত পেঁছুনোর সাধ্য যাদের হয় নি তাদের গালাগাল শোনা যায়।

"যারা অন্ধকারে আছে তাদের দাও!"

"একটা পুরনো জামা দাও না! পোকা-মাকড়ে আমাকে খেয়ে ফেলেছে।"

"ওঃ! হো-হো! তুই আমার চোখে খোঁচা দিয়েছিস!"

গলির এক পাশ থেকে জনতার কোলাহল শোনা গেল। চকের দিকে দরবেশদের দল এগিয়ে আসে — তাদের মাথায় চোঙ্গা টুপি, হাতে দীর্ঘ যষ্টি। তারা সমস্বরে উচ্চ কণ্ঠে মোনাজাত আবৃত্তি করে; তাদের পিছু পিছু ছোটে কৌতূহলী লোকজন। দরবেশরা কারাগারের দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তালা ভাঙার উদ্দেশ্যে তার ওপর পাথর ও লাঠি দিয়ে আঘাত করতে থাকে। কেউ কেউ কুঠুরির ঝরকার মধ্যে উঁকি মেরে চিৎকার করে:

"শেখ মৈজ উদ-দিন বাগদাদি! বেঁচে আছ কি? হে সত্য ও ন্যায় ধর্মের শহীদ, আমরা তোমাকে সম্মান জানাতে এসেছি! এক্ষুনি আমরা তোমাকে মুক্ত করব!"

পাতাল ঘরের গভীর তলদেশ থেকে টানা টানা চিৎকার ভেসে আসে, সকলে চুপ করে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে।

"যারা জাতিকে দাবিয়ে রেখেছে সেই নৃশংস খানদের ওপর আল্লাহের অভিশাপ পড়ুক! খলিফার বিরুদ্ধে যে তলোয়ার ধরে আল্লাহের রোষ তার ওপর পড়ুক! সমস্ত জল্লাদ ও দস্যু ধ্বংস হোক!"

দরবেশদের চাপে কোণঠাসা প্রহরী প্রাসাদে ছুটে গেল। ইতিমধ্যে সেখান থেকে কিপচাক অশ্বারোহীদল ধেয়ে আসে। তারা বেত্রাঘাতে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়, দরবেশরা চিৎকার করতে করতে চত্বরের এদিক-ওদিক ছিটকে পালিয়ে যায়।

ঊর্ধ্বে, প্রাসাদের প্রবেশ তোরণের মাথায়, যুদ্ধ প্রাকারশ্রেণীর মাঝখানে কয়েকটি লোককে দেখা গেল। কমলা রঙের ডোরাকাটা জোব্বা গায়ে দীর্ঘদেহী এক পুরুষ তাদের সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে। অন্যেরা নিঃশব্দে বুকের ওপর দু' হাত ভাঁজ করে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে তার হুকুমের প্রতীক্ষা করে। প্রাসাদের তোরণের ওপর খরেজম শাহের আবির্ভাব মানেই অলক্ষণ চিহ্ন, অর্থাৎ কারও ভাগ্যে মৃত্যুদণ্ড আছে।

ফটক থেকে জোড়ায় জোড়ায় বেরিয়ে আসে প্রহরীদল — শাহের জল্লাদ বাহিনী — লোকগুলোর দেহ হৃষ্টপুষ্ট, পেশীবহুল, তাদের পরনে কাঁধ অবধি হাতা গুটানো নীল রঙা জামা, লাল নক্সা কাটা হলুদ রঙের ঢিলে সালোয়ার। বিরাট বিরাট খোরাসান তরবারি কাঁধে তারা

আগুয়ান জনতাকে ঠেলে দিয়ে চত্বরের চার দিকে শৃঙ্খলাকারে দাঁড়াল। সর্বশেষে আসে প্রধান জল্লাদ 'উগ্রচণ্ড', দীর্ঘদেহী, গ্রীবাদেশের হ্রস্বতার দরুন ঈষৎ আনত, কৃশকায়, কুখ্যাত ঘাতক মাহমুদ জাহান পহলবান — তার দুই হাত দেহ থেকে অনেকখানি ব্যবধানে রচনা করে রয়েছে। তার জোব্বা হলুদ রঙের কৃষ্ণসার চর্মের সালোয়ারের নীচে গোঁজা এবং চওড়া কোমরবন্ধনীতে আঁটো করে বাঁধা। কাঁধের ওপর ঝুলছে গালিচার থলি। এতে করে সে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিকারের মাথা শাহের কাছে নিয়ে যাবে।

চত্বরের মাঝখানে রয়েছে চৌকো কালো গহ্বর, উঁচু একটি মঞ্চ আর মঞ্চের কাছেই দাঁড় করানো চারটি থামের ওপর বসানো আছে ফাঁসিকাঠ। দু'টি আধা উলঙ্গ ক্রীতদাস তাদের হাত-পায়ের শেকলে ঝনঝন আওয়াজ তুলে বেতের এক বিরাট ঝুড়ি টানতে টানতে মঞ্চের কাছাকাছি এনে রাখল।

কারা প্রহরী লোহার বেড় দেওয়া নীচু দরজার তালা খুলে দিল। জল্লাদ-সর্দার কয়েক জন স্যাঙাত নিয়ে মাটির নীচের কুঠুরিতে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে ভয়ঙ্কর চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল, তারপর সব চুপ চাপ। জল্লাদেরা কুঠুরি থেকে পনেরো জন বন্দীকে টেনে আনল। একটি মাত্র শেকল দিয়ে তাদের সকলের ডান পা বাঁধা।

কয়েদীদের সর্বাঙ্গ কাদায় মাখা, দেহ কোনক্রমে জীর্ণ বস্ত্রে ঢাকা, দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায় থাকার ফলে তাদের দীর্ঘ চুল-দাড়িতে জটা ধরেছে, উজ্জ্বল সূর্যের আকস্মিক আলোর ঝলকে চোখ কুঁচকে তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে পায়ে পায়ে চত্বরের ওপর দিয়ে চলে। কারাগারের দরজা সশব্দে বন্ধ হল। আবার ভারী তালা পড়ল, পাতাল ঘর থেকে আবার অবিরাম চিৎকার ভেসে আসে।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীদের হাতে-পায়ে বেড়ি বাঁধা, দু'পাশে চলে পাহারাদারদের সারি। কয়েদীদের একজন — ঝাঁকড়া চুলওয়ালা এক জটাধারী থুড়থুড়ে বুড়ো হোঁচট খেয়ে আরও দু'জনকে নিয়ে পড়ে গেল। প্রহার করে তাদের মাটি থেকে তোলা হল, তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল বধ্যভূমির দিকে। মঞ্চের ওপর তাদের হাঁটু মুড়ে ঘাড় নীচু করে বসিয়ে দেওয়া হল। একজন জল্লাদ আসামীর চুলের মুঠি ধরে, আর জল্লাদ-সর্দার দুই হাতে তরবারি ধরে এক কোপে মাথা কেটে ফেলে, তারপর নির্বাক জনতাকে তুলে দেখিয়ে ঝুড়িতে ছুঁড়ে দেয়।

জনতার মধ্যে গুঞ্জন ওঠে: "বন্দীদের মধ্যে দরবেশদের প্রধান শেখ মৈজ উদ-দিন বাগদাদি কে?" ক্ষুধায় ও রোগে শীর্ণকায় কয়েদীদের মধ্যে চেহারার কোন তফাৎ বোঝার উপায় ছিল না। চতুর্দশ ব্যক্তির শির ভূলুণ্ঠিত হওয়ার পর গোটা চত্বর জুড়ে তীব্র আর্তনাদ উঠল।

"বাদশাহ বলছেন! বাদশাহের ফরমান!"

সকলে প্রাসাদের ফটকের ঊর্ধ্বদেশ চত্বরের দিকে ফিরে তাকায়। ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান খরেজম শাহ রঙিন রুমাল আন্দোলন করে। এর অর্থ: "মৃত্যুদণ্ড বন্ধ কর! শাহ অপরাধীকে ক্ষমা করছেন!"

রক্তবর্ণের বস্ত্রখণ্ডে দীর্ঘ তরবারি মুছতে মুছতে জল্লাদ-সর্দার হাঁক দিল, "কামারকে ডেকে আন!"

আসামীদের মধ্যে পঞ্চদশ জন ছিল মির্জা ইউসুফের চেলা তুগান। নেহাৎই ছোট এই ছেলেটা কী ঘটেছে তা বুঝে উঠতে না পেরে চোখ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

"এত বড় দয়ার জন্য বাদশাহের সামনে মাথা নোয়া!" এই বলে জল্লাদ প্রাসাদের দিকে ছেলেটির মুখ ঘুরিয়ে দিল, মাটিতে ঘাড় নুইয়ে ধরল। কামার তৈরি হয়েই ছিল, সে তুগানের পায়ের শেকল ভাঙতে লাগল।

"দাঁড়া! চললি কোথায়? এখনও শেষ করি নি!" কামার চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু তুগান যখন দেখল যে সে আর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের শেকলে বাঁধা নয় তখন সে মঞ্চ থেকে জনতার মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। পেছনে হৈ হৈ উঠল, কিন্তু তুগান ঘাড় নীচু করে নগরবাসীর ভীড় ঠেলে পথ কেটে চলল, তার চেষ্টা হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে দূরে সরে যাওয়া।

কারামিনারের কাছের চত্বরটি খালি হয়ে গেল। প্রহরী তার মরচে ধরা বর্শায় হেলান দিয়ে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল।

দেয়াল বরাবর একটি ছোট মেয়েকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তার চোখের ওপর ওড়না নামানো। মেয়েটি জিন্দানের নীচের ফাঁকের কাছে এসে সতর্কভাবে ডাকল:

"তুগান! অস্ত্র কারিগর তুগান!"

ফাঁকের ভেতর থেকে কঙ্কালসার হাত বেরিয়ে এলো, কে যেন ভাঙা ভাঙা গলায় উত্তর দিল:

"তোর তুগানের মাথা কখন কাটা গেছে! আমাদের খেতে দে, আমরা ওর জন্য প্রার্থনা করব 'খন'।"

মেয়েটি ঝরকা চেপে ধরে মরিয়ার মতো চেঁচিয়ে ওঠে:

"তুগান, সাড়া দাও, বেঁচে আছ?"

সুড়ঙ্গ থেকে নতুন করে প্রচণ্ড আর্তস্বর ভেসে আসে:

"যা নিয়ে এসেছিস, আমাদের দিয়ে যা! তোর তুগানের এখন আর কিছু দরকার নেই! সে এতক্ষণে বেহশ্‌তের বাগিচায় বসে পরগম্বরের সঙ্গে তরিবত করে পোলাও খাচ্ছে।"

মেয়েটি ঝরকা থেকে বার করা হাতে রুটি ও খরমুজা তুলে দিয়ে প্রহরীর কাছে এলো।

"নজর নানা, সত্যিই কি তুগান বলে ছেলেটি মারা গেছে?"

"মারা গেছে বলেই ত মনে হয়, কেন না অন্যদের সঙ্গে ওকেও ফাঁসির জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।" এই বলে প্রহরী হাত দিয়ে চত্বরটা দেখিয়ে দিল।

এক বৃদ্ধ দরবেশ এগিয়ে এসে প্রহরীর হাতে কয়েকটি মুদ্রা গুঁজে দিয়ে তার কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল:

''যাদের প্রাণদণ্ড হল তাদের মধ্যে আমাদের ধর্মপ্রাণ শেখ মৈজ উদ-দিন বাগদাদিকে দেখা গেল না কেন? তাঁর প্রাণদণ্ড কি স্থগিত রাখা হল, না কি খরেজম শাহ তাঁকে ক্ষমা করলেন?"

প্রহরী মুদ্রাগুলো গেঁজের মধ্যে লুকিয়ে রেখে বিড়বিড় করে বলল:

''শেখ গালাগাল দিয়েছিলেন বলে জাহাঁপনা তার ওপর ভয়ংকর রেগে গিয়ে দরবেশরা এসে উদ্ধার করার আগেই জলদি-জলদি তাঁর গর্দান নেওয়ার হুকুম দিয়েছেন।''

"কিন্তু উনি এখনও জীবিত?.."

"না! আসামীদের পাতাল ঘর থেকে বার করে আনার সময় জল্লাদ সর্দার জাহান পহলবান নিজে ধর্মপ্রাণ শেখকে মেরে ফেলেছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেলাই করা ছায়া

> পথে কারও দেখা পেলে আগ বাড়িয়ে মিষ্ট ভাষে তুষ্ট করো তাকে: কেবা জানে সাক্ষাৎ আর হবে কি না।
>
> (প্রাচ্যদেশীয় প্রবাদ)

ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে তুগান গিয়ে পড়ল এক ফাঁকা রাস্তায় — যার চার দিকে নিরেট মাটির দেয়ালের সারি। রাস্তা ধরে সে খালের ধারে এসে পেঁছুল।

উঁচু দুই তীরভূমির মাঝখান দিয়ে ধীরগতিতে বয়ে চলেছে ঘোলাটে কালো জল। নানা রকম গাঁট, কুটোকাটা, খড়ের আঁটি ও গাদাগাদি ভেড়ার পালে বোঝাই হয়ে দীর্ঘ, কদাকার নৌকোর সারি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

"এমন এক নৌকোয় চেপে বিদেশে চলে গেলে হয়।... কিন্তু আমার পরনে ছিন্নভিন্ন জামা, সর্বাঙ্গে কাদা আর ঘা — এমন অবস্থায় কে আমাকে নিয়ে যাবে!"

পাড় থেকে খানিকটা দূরে চকচক করছে হলুদরঙা বালুচর। তুগান যেখানে আশ্রয় নিল, পোশাকটা জলে ধুয়ে নিল, গা হাত পা রগড়ে পরিষ্কার করল, রোদে গা গরম করল, বিশ্রাম করতে করতে নিজের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ডুবে গেল।

"ফাঁসিকাঠ থেকে ছাড়া পাওয়া দাগী আসামীর ঠাঁই কোথায়? কে কাজে নেবে? শহর ছোট, লোক অনেক, আর প্রত্যেকেই এক থালা ভাতের জন্য অর্থ উপার্জন করতে চায়।..." তুগান তার পায়ের দিকে তাকাল, সেখানে ভারী লোহার আংটার সঙ্গে এখনও ঝুলছে সেই ফলক যার ওপর খোদাই করে লেখা আছে 'আজীবন ও আমরণ'। "বুড়ো ইউসুফ মির্জা কারাগার থেকে বেরিয়ে আসা দাগী আসামীর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেও রাজি হবেন না; একমাত্র বেস্ত জানকিজা সহানুভূতি দেখালেও দেখাতে পারে। তবে কোন সাহসে সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ রোগীর মতো দগদগে ঘা নিয়ে সে তার সামনে দেখা দেবে?.."

"যে করেই হোক আমাকে আমার মনিব কারা মাক্‌সুমের কাছে ফিরতেই হবে। উনি এই লোহার আংটাটা খুলতে সাহায্য করবেন।"

তুগান দীর্ঘ রাস্তা ধরে চলতে শুরু করল, পথের দু' পাশে সারি সারি দোকান, দোকানের মুখে গালিচায় ঢাকা সিঁড়ির ওপর বিক্রেতারা বসে আছে। মালপত্র খোলা দরজার ওপর ঝুলছে, স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে দেয়াল বরাবর তাকের ওপর।

ওপর থেকে ঝোলানো মাদুর-সতরঞ্চিতে ঢাকা পড়ে থাকার ফলে রাস্তায় আধা অন্ধকার দেখা দিয়েছে। চোখ ধাঁধানো সূর্যের রশ্মি বাঁকা রেখায় পড়ে কখনও আলোকিত করে তুলছে গোলাপী ও সবুজ রেশমের কারুকাজ করা হলুদ জুতো জোড়া, কখনও আলোকিত করে তুলছে রুপোর মিনা করা অক্ষরে কোরানের বাণী লেখা লোহার একটি গোল ঢাল কখনও বা ডোরা কাটা থান। ব্যবসায়ীরা সেগুলো উলটে-পালটে খরিদ্দারদের দেখাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ যাযাবর — মাথায় নেকড়ের চামড়ার গরম টুপি আর আছে উজ্জ্বল, রঙবেরঙের পোশাক পরনে মেয়েদের দল।

মালিক কারা মাক্‌সুমের কামারশালাটি হল কামারের দোকানগুলোর শেষ সারিতে। চার দিক থেকে কানে আসে হাতুড়ির ঠকঠক ও লোহার পাতের ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ। এখানে কামারেরা তৈরি করছে অস্ত্রশস্ত্র: বাঁকা তলোয়ার, ছোট ছুরি, বর্শার ফলা।

পারস্যদেশীয় ও উরুস ক্রীতদাসেরা কাজ করে — তাদের পরনের বস্ত্র বলতে একমাত্র সালোয়ার, দেহের সামনের দিকে যে চামড়ার খণ্ডটি ঝোলানো আছে তা আগুনের ফুলকিতে শতছিদ্র। নেহাইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে তারা ছোট ছোট হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে তামার গামলার গায়ে সুন্দর সুন্দর নক্সা তুলছে। অন্যেরা ঘড় ঘড় শব্দে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে ভারী হাতুড়ি দিয়ে লোহার গরম করা অংশের ওপর ঘা মারছে। কালিঝুলি মাখা বাচ্চা ছেলেরা হাপরের পাশে দাঁড়িয়ে দড়ি টেনে হাপরের কয়লা তাতায়, কাঠের বালতি হাতে জলের জন্য ছোটাছুটি করে।

মালিক কারা মাক্‌সুম স্থূলদেহী, তার কাঁধ চওড়া, সাদা দাড়ির প্রান্তদেশে লাল কলপ লাগানো। আসন পেতে মাটির রোয়াকের ওপর

বসে সে কর্মীদের ওপর হম্বিতম্বি করতে থাকে এবং পথচারীদের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দেয়। তার পাশে দু'টি ক্রীতদাস: যেটির বয়স কম তার কপালে গরম লোহা পুড়িয়ে দাগ দেওয়া — এটা হল পালানোর চেষ্টা করার জন্য শাস্তি; অপরটি বৃদ্ধ — তার কালিঝুলিমাখা মুখ ভাবলেশহীন। এরা দু' জনে মিলে ছোট ছোট হাতুড়ি দিয়ে এক গোছা লোহার তারের ওপর সমান তালে ঘা মেরে চলছে। তাদের কাজটা অত্যন্ত দামী — ফলা আগুনে না পুড়িয়ে 'ঠাণ্ডা পদ্ধতিতে' জওহর নামে বিখ্যাত নক্সা কাটা দামাস্কাস ইস্পাত তৈরি করা।

"তুই এখানে এসেছিস কী করতে? ফিরে যা বলছি!" মালিক চিৎকার করে উঠল। "তুই কি ভেবেছিস, আমি আমার কামারশালায় জিন্দান ফেরত একটা দাগী আসামীকে বহাল রাখব?"

"দয়া করে একটা হাতুড়ি দিন, আমি নিজেই লোহার আংটাটা ভাঙব।..."

"ঐ দাগী হাত দিয়ে আমার হাতুড়ি নোংরা করার জন্য দিচ্ছি আর কি! যা বলছি হতভাগা, নইলে সাঁড়াশীর ছেঁকা লাগিয়ে দেব!"

অযথা অপমানের জন্য রাগে ফুলতে ফুলতে তুগান সরে পড়ল। ঠিক করল যে দিক দু' চোখ যায় সেই দিকে যাবে। তার বিক্ষিপ্ত চোখের দৃষ্টি দেয়ালের ধারে উপবিষ্ট দরবেশের ওপর গিয়ে পড়ল। মাথার ওপর টাঙানো সতরঞ্চির চাঁদোয়া ভেদ করে সূর্যের রশ্মি সব রঙের কাপড়ের ফালি জুড়ে সেলাই করা তার বিচিত্র আলখাল্লাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

দরবেশ অস্ফুট স্বরে বিড় বিড় করে মোনাজাত আওড়াতে আওড়াতে ফ্যাকাসে নীল, বাদামী ও সবুজ তালির ওপর একটা বড় ছুঁচ দিয়ে গোলাপী কাপড়ের ফালি সেলাই করছিল।

তুগান অপমানে ও নৈরাশ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে। তার কালো ছায়া দরবেশের হাঁটুর ওপর পড়ে লাফাতে থাকে।

"দেখছ বাছা," দরবেশ বলল, "আমি আমার আলখাল্লায় নতুন তালি লাগানোর সময় তালির ওপর তোমার ছায়া পড়ে। তালির সঙ্গে সঙ্গে তোমার ছায়াও আমি সেলাই করে ফেলেছি। এখন তুমি আমার সঙ্গে কঠিন বাঁধনে বাঁধা, আর ছায়ার মতোই আমার পেছন পেছন ঘুর ঘুর করবে।"

তুগান ছুটে গিয়ে দরবেশের পাশে বসল।

"সত্যি বলছেন, না ঠাট্টা করছেন? আমি আপনার সেবা করব, যা আদেশ দেবেন তা-ই করব, কেবল আমাকে দূরে ঠেলে দেবেন না!"

দরবেশ মাথা নাড়ল।

"এই দাম্ভিক মালিক কীভাবে তোমাকে তাড়িয়ে দিল তা আমি নিজের কানে শুনলাম। দুঃখ করার কী আছে? দুনিয়াটা কী ছোট? আমার সঙ্গী হও! চল, এখান থেকে আমরা 'বুখারা শরিফে' চলে যাই। যেখান থেকে তাড়িয়ে দেয় সেখানে কখনই থেক না, আর যে তোমাকে ডাকে অসন্দিগ্ধ মনে তার সঙ্গে চল।... এখন তুমি দরবেশের আল্লখাল্লার সেলাইয়ে বাঁধা হয়ে গেছ, তোমার নতুন যাত্রা শুরু হল। আমার ছোট ভাইটি, আমার সঙ্গে এসো!"

দরবেশ লাঠি ঠক ঠক করতে করতে এগিয়ে চলল, আর তার পেছন পেছন খোঁড়াতে খোঁড়াতে শ্লথ গতিতে চলল ক্লান্ত তুগান। কয়েকটি কামারশালা পার হয়ে দরবেশ রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে চত্বরের ওপর কালিঝুলিমাখা এক ভ্রাম্যমান কামার তার হাতে চালানো হাপরের পাশে বসে কাজ করছিল। লোকটা টান টান চামড়ায় মোড়া জীবন্ত কঙ্কালবিশেষ। কিন্তু বহনযোগ্য ছোট নেহাইয়ের ওপর হাতুড়ি ও সাঁড়াশী নিয়ে তার সরু সরু হাত অভ্যস্ত ভঙ্গিতে কাজ করে যাচ্ছিল, জলভর্তি কাঠের পাত্রে একের পর এক সমান তালে দ্রুত এসে পড়ছিল কামারের হাতে তৈরি ছোট ছোট কালো পেরেক।

"ধন্য ওস্তাদ! ছেলেটাকে কোন রকম জখম না করে এই লোহার আংটাটা খুলে দিতে পারবে?"

"দুটো কালো দিরহাম দিলে পারব," কামার আংটার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল। "বাদশাহ তার কয়েদখানার শেকলের জন্য ভালো মজবুত লোহাই লাগান। এর সঙ্গে আরও একটা রুপোর দিরহাম যদি দাও ত এই লোহা দিয়ে চমৎকার ছুরি বানিয়ে দিই।"

দরবেশ গেঁজে থেকে থলি বার করে বুড়োকে রুপোর মুদ্রা দেখাল।

"তা করে দাও না।... তবে হ্যাঁ দেখছ ত আংটার ওপর লেখা আছে 'আজীবন ও আমরণ'? ছুরিটা এমনভাবে তৈরি করবে যাতে তার ওপর এই লেখাটা থেকে যায়।"

"করে দেব সেরকম ছুরি," বুড়ো বিড়বিড় করে বলল, তারপর তুগানকে ঠেলা মারল। "নেহাইয়ের ওপর পা রাখ!.." চাপা গলায় যোগ করল:" 'আজীবন ও আমরণ' শাহ্ আর তার জল্লাদদের সঙ্গে লড়াই কর!.."

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দিল দরিয়া

দরবেশ হাজি রহিম লাঠি ঠকঠক করতে করতে গুরগঞ্জের বিশাল সদর বাজারের রাস্তা ধরে চলতে থাকে।

এখানে আছে সুনিপুণ হাতে খোদাই করা কারুকার্যমণ্ডিত ঘষামাজা, আগুনের মতো ঝকঝকে তামার তৈজসপত্র, গামলা, বারকোশ ও ঘড়ার সারি সারি দোকান। আছে মোমবাতি রাখার জন্য তামার ওপর নক্সা কাটা পিলসুজ ও মৃৎপাত্রের, পিরিচ ও পেয়ালার দোকানের সারি। আছে এমন সব দোকান, যেখানে সারি সারি শোভা পাচ্ছে চীন দেশীয় সাদা ও নীলরঙা হালকা বাসনপত্র এবং ইরাকের কাচের তৈরি এমন সব থালাবাটি যেগুলোতে টোকা দেওয়া মাত্র পরিষ্কার আওয়াজ ওঠে।

বিশেষ কতকগুলো সারি থেকে ভেষজ ও আতর তৈরির জন্য ব্যবহৃত দামী নির্যাস সৌরভ বিস্তার করছে। ঐ দোকানগুলোতেই আবার তান্‌গুৎ লতা, রেড়ির তেল ও গোলাপ নির্যাসের মতো দামী দাওয়াই বিক্রি হয় আর বিক্রি হয় একাধারে গায়ের চামড়া, দাঁতের মাড়ি ও পাকস্থলীর পক্ষে উপকারী 'গোসল' নামে গুঁড়ো সাবান — ক্ষারযুক্ত জলজ গুল্মের চূর্ণ। এখানে পাওয়া যায় গোসলখানায় গা ধোয়ার উপযোগী মূল্যবান সুগন্ধ সাজিমাটি, পারস্যদেশীয় সবুজ মলম — যা চোখের পলকে চুল তুলে দেয়, পাওয়া যায় চুল মজবুত করার জন্য বুখারার তৈরি মাথার তেল, তিব্বতীয় মৃগনাভি, হিন্দুস্তানের গন্ধদ্রব্য, সিদ্ধির মতো মাদকদ্রব্যের কালো কালো গুলি।

রঙচঙে জনতার কোলাহলবন্যায় বাজার প্লাবিত। ভিড় ভেদ করে চলতে চলতে হাজি রহিম এক-একটি দোকানের সামনে থেমে পড়ে,

যেন ভিক্ষে পাওয়ার আশায়, কিন্তু আসলে সে কোন একজনের খোঁজে প্রতিটি বিক্রেতাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে।

বিভিন্ন কাপড়-চোপড় ও পশমী বস্ত্র স্তূপ করে রাখা সারিগুলোর মধ্যে যখন সে গিয়ে পড়ল, তখন পায়ের ওপর পা তুলে যে সব ভ্যারিক্কি বণিক বসে ছিল তারা তার দিকে তামার মুদ্রা ছুঁড়ে দিয়ে বলল:

"ঝামেলা না করে আগে বাড়!"

তাদের ভয় এই বুঝি দরবেশ তার নোংরা হাতে রূপোলি 'সিমচুজ' রেশমের থান ছুঁয়ে ফেলে কিংবা ছুঁয়ে ফেলে তাদের মহামূল্যবান সোনালি কিংখাব — যা প্রবল পরাক্রান্ত ও সম্ভ্রান্ত বেগের সামনে উপযুক্ত নজরানা হতে পারে।

হাজি রহিম যার খোঁজ করছিল এই সারিতে তার মতো একজনকে দেখতে পেল। লোকটি অন্য বণিকদের মাঝখানে অনেকগুলো রেশমী তাকিয়ার মধ্যে ডুবে বসে ছিল। সমরখন্দের কাগজের মতো ফ্যাকাশে তার কৃশ মুখাবয়ব, কোটরগত কালো দু'টি চোখ থেকে বোঝা যায় যে সে কোন রোগ থেকে সদ্য ভুগে উঠেছে। দু' পাশে উপবিষ্ট বণিকেরা বিশেষ সম্ভ্রম দেখিয়ে তার সঙ্গে বাক্যালাপ করছিল, তারা রীতিমতো পাল্লা দিয়ে বাদামের তক্তি, পিঠে, মধুতে জ্বাল দেওয়া বাদাম ও পেশতা খাওয়ার জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করছিল। বণিকের পরনে দামী হালকা ছাই রঙা পশমী পোশাক, মাথায় রেশমের রঙিন পাগড়ি। তার হাতে চীনদেশীয় নীল পেয়ালায় চা। তর্জনীতে জ্বল জ্বল করছে আশমানী রঙা বিশাল ফিরোজা — স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তা ধারণ করা হয়েছে।

দরবেশ দোকানের সামনে এসে থামল। বণিকেরা তার ভিক্ষাপাত্রে কয়েকটি মুদ্রা ছুঁড়ে দিল, দরবেশ কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইল।

"ঝামেলা না করে পথ দেখ!" বণিকেরা বলল। "তোমাকে যা দেওয়ার দেওয়া হয়ে গেছে।"

অবশেষে অসুস্থ বণিকের চোখ তার ওপর পড়ল। তার কালো দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল।

"আমার কাছে কী চাও?" সে জিজ্ঞেস করল।

"শুনেছি আপনি ক্ষমতাবান লোক, কারাভানের সঙ্গে দুনিয়া ঢুঁড়ে

অনেক কিছু দেখেছেন," হাজি রহিম বলল। "আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন কি?"

"যদি আমার কাছ থেকে ধর্ম গ্রন্থের ব্যাখ্যা চাও তাহলে বলি, আমার চেয়ে জ্ঞানী-গুণী, বিদ্বান আলিম ও সাধু সন্ত ইমামেরা আছেন। আমি হলাম বণিক, কেবল গোনাগাঁথা করতে আর পশমী কাপড় মাপতে জানি।"

"যথেষ্ট হয়েছে দরবেশ! এবারে ঝামেলা না করে সরে পড় ত!" বণিকেরা চেঁচিয়ে উঠল। "আমরা ত আমাদের ভাঁড়ার থেকে তোমাকে যা দেওয়ার দিয়েছি," এই বলে তারা এবারে কাশকুলে* কিছু বাদামের তক্তি ও বাদাম ছুঁড়ে দিল।

"না, আমি আপনার উত্তরের অপেক্ষা করছি, কেন না মাননীয় বণিক, আমার প্রশ্নের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আছে।"

"বল!"

"ধরুন আপনার এমন এক বিশ্বস্ত, অনুরাগী বন্ধু আছে যে আপনার দুঃখের ও পথকষ্টের ভাগীদার হয়েছে, যে আপনার সঙ্গে অনাহারে কাটিয়েছে, প্রচণ্ড উত্তাপ ও তুষারঝড় সহ্য করেছে।... আপনি কি তার মূল্য দেবেন?"

"এমন বন্ধুর মূল্য কে না দেয়?" বণিক বলল। "তারপর, বল।"

দরবেশ তখন সকলকে উদ্দেশ করে বলল:

"আপনাদের পরিমণ্ডলী উজ্জ্বল থাক, আপনাদের প্রভাত আনন্দোজ্জ্বল হোক, পানীয় মধুর হোক! একবার দৃকপাত করবেন তার দিকে যে ছিল ধনী, অমায়িক ও পরম পরিতৃপ্ত, যার ছিল সুখী গৃহকোণ ও প্রস্ফুটিত উদ্যান, অক্ষয় ভোজপাত্র। কিন্তু রুষ্ট ভাগ্যের কশাঘাত, বিপর্যয় ও ঈর্ষার নিদারুণ স্ফুলিঙ্গের আক্রমণ থেকে আমি রেহাই পেলাম না। বিপদের কালো ছায়া আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার হাত শূন্য হল, আমার আঙিনা সংকীর্ণ হয়ে গেল, বাগিচা শুকিয়ে গেল, ভোজের আসরের বন্ধুদের আমোদ-প্রমোদ বন্ধ হল। সেই সঙ্গে সবই বদলাল। আমার মনোকষ্টের অবধি রইল না, খিদেয় আমার পেট ও পিঠের চামড়া এক হয়ে গেল, নিদ্রার অভাবে

* কাশকুল — দরবেশের ভিক্ষাপাত্র, সচরাচর নারকেলের মালা থেকে তৈরি।

আমার বিবর্ণ মুখে আর লাবণ্য সঞ্চারিত হল না। কিন্তু আমার এক বন্ধু রয়ে গেল। পর্যটনের সময়, যখন গুহা ছিল আমার বাসগৃহ, প্রস্তরখণ্ড — আমার শয্যা, যখন আমার খালি পায়ে কাঁটা বিঁধতে লাগল, তখনও সে আমাকে ছাড়ে নি। বন্ধু আমার সঙ্গে চলল বাগদাদ শরিফে, ধর্মপিপাসুদের পূত নিকেতন মক্কায়। সব সময় সে আমার শ্রম লাঘব করেছে, আমার মাল বহন করেছে, ঠাণ্ডা রাতে আমার গা গরম করে রেখেছে। কিন্তু সৌভাগ্যের দিন পিছেই পড়ে রইল, আর এলো না। সমৃদ্ধ খরেজম ভূমিতে পৌঁছুনোর সময় আকস্মিক দুর্ভাগ্যের বজ্রাঘাত বন্ধুকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল, এখন নিঃস্বতা আমার নিত্য সহচর, রাতে মাথা গোঁজারও ঠাঁই নেই।...”

অসুস্থ বণিক জিজ্ঞেস করল:

“তা, বন্ধুকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিল কেন? সে যখন পয়গম্বরের জন্মভূমি ঘুরে এসেছে তখন সে মাথায় হজ ফেরত হাজির লক্ষণ হিশেবে সাদা ফেটি বাঁধতে পারে। তোমাকে, আর তাকেই বা কে কোন সাহসে অপমান করে?”

“আমাদের বিচ্ছেদের কারণ এক বণিক।”

“তার কথা আমাকে বল।”

“আমি চরম হতভাগ্য বটে, কিন্তু পথে আরও হতভাগ্যকে পেলাম — সে হল এক বণিক, দস্যুরা তাকে আহত করে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে গেছে। আমি যা পারি তাই করলাম, তার ক্ষত বাঁধলাম, ঠিক করলাম গুরগঞ্জ অবধি বয়ে নিয়ে যাব। ... তার সোনার বাক্স সযত্নে রেখে দিলাম।...”

বণিক মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, এবারে শিহরিত হয়ে দরবেশকে থামিয়ে দিল:

“আর বলতে হবে না! বণিকের কী হল তা আমাদের কারও আর এখন অজানা নেই। সেই বণিক তোমার সামনে! আমার বহু দিনের ইচ্ছে ছিল তোমাকে খুঁজে বার করে কৃতজ্ঞতা জানাব। তা তোমার বন্ধুটি কে? দুঃখের পীড়া থেকে আমি তাকে উদ্ধার করলেও করতে পারি।”

“একমাত্র আপনিই আমাকে আমার বন্ধু ফিরিয়ে দিতে পারেন। সাদা ফেটি বেঁধে নিজেকে হাজি বলে জাহির করার মতো ক্ষমতা তার নেই,

কেন না শয়তানের মতো তার একটি লেজ ঝুলছে। সে হল আমার গর্দভ। যার কাছে আপনি চিকিৎসার জন্য ছিলেন সেই লোভী হাকিম আমার গাধা কেড়ে নিয়েছে। আর একটি গাধা যদি আমাকে দেন তাহলে আমার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।"

"তুমি তোমার গাধা পাবে। আমি হাকিমের কাছ থেকে ওটা কিনে নিয়েছি, সে এখন এখানে উঠোনে আছে। শুনতে পাচ্ছ ওর ডাক? — তোমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। তবে এটা কমই হল। এখন দোকান থেকে তোমার যা খুশি বেছে নিতে পার: ভালো ভালো পোশাক, দামী ছাগলের চামড়ার জুতো, কাপড় — যা তোমার দরকার, নাও।"

"আমি দরবেশ। আমার মোটা কম্বলের আলখাল্লা আছে, এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তবে আপনার এই দরাজ দিলের সুযোগ গ্রহণ করে বলছি আপনি যেন আমার সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছায়াটাকে পোশাক পরিয়ে দেন। ছায়া সর্বত্র আমাকে অনুসরণ করে, তার এমন কিছুই নেই যাতে নিজের শীর্ণ দেহটি ঢাকতে পারে।"

বণিকেরা হেসে উঠল।

"বেশ মস্করা করছ হে দরবেশ! তোমার ছায়াকে পোশাক পরানো আবার কী করে সম্ভব?"

"এই ত সে আপনাদের সামনেই দাঁড়িয়ে!" এই বলে দরবেশ দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দীনহীন বালক তুগানকে দেখিয়ে দিল।

অসুস্থ বণিক হাতে তালি বাজাল।

"হাসান," যে ভৃত্যটি সামনে এগিয়ে এলো তাকে সে বলল, "দোকানের ভেতরে, যেখানে তৈরি পোশাক বিক্রি হয় এই ছেলেটাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে দূরের যাত্রীকে যেমন যেমন পোশাকে সাজাতে হয় তেমনভাবে জামা-কাপড় পরিয়ে দে।"

"সব কিছু দেব?"

"ওকে আপাদমস্তক — 'সোরতা-পাই' সাজিয়ে দিবি, জোব্বা, জামা, সালোয়ার, মোজা, জুতো, কোমর বাঁধুনি, পাগড়ি — সব দিবি। আর তুমি, মাননীয় 'জাহানে গেশ্‌তে' — বিশ্ব পর্যটক, আজ সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে আসবে। আমার বাড়ি কী করে খুঁজে পাবে তা হাসান তোমাকে বলে দেবে।"

ভৃত্য দরবেশ ও হতভম্ব তুগানকে দোকানের ভেতরে নিয়ে গেল — সেখানে পুরুষদের, মেয়েদের ও শিশুদের নানারকম পোশাক ঝুলছিল। ভৃত্য হাসান সেরা সেরা জিনিস পছন্দ করে নিতে বললেও দরবেশ কেবল সেই জিনিসগুলোই দেখিয়ে দিল যেগুলো মজবুত এবং পথযাত্রার উপযোগী। মাথায় নীল রঙের পাগড়ি জড়িয়ে গুরগঞ্জের কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলের মতো পোশাকে তুগান দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই হাসান দরবেশের হাতে একটা চামড়ার থলি দিয়ে বলল:

"আমার মালিক মাননীয় মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ এই পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রাও আপনাকে দেওয়ার জন্য আদেশ করেছেন — যাতে পথে আপনার কোন কিছুর অভাব না হয়। তা ছাড়া মালিকের উঠোনে আপনার গাধাটিকে জিন চাপিয়ে রাখা হয়েছে। যে কোন সময় আপনি ওটাকে নিতে পারেন। আপনি বোধহয় মালিকের খুব উপকার করেছেন। এমন দিল দরিয়া তাকে কমই দেখতে পাওয়া যায়।"

সন্ধ্যায় হাজি রহিম বণিক মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচের বাড়ি এলো। বিশাল বাগিচার মাঝখানে ঢাকা এক কুঞ্জে বণিক তার জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা এক পেয়ালা সোনালি চা পান করার পর ভৃত্য দূরে সরে যেতে বণিক চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল:

"কোন সোনার বাক্সের কথা আজ বলছিলে?"

দরবেশ তার কোমরের গেঁজ থেকে বাক্স, খোদাই করা সোনালি ফলক বার করে মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌কে দিল। বণিক খপ্ করে সেটা তুলে নিয়ে তার জামার নীচে বুকের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল।

"আমার কথা মনে রেখ," সে বলল, "যাই ঘটুক না কেন, দুনিয়া যদি রসাতলেও যায়, আমি আছি একথা জানা মাত্র ভরসা রেখে আমার বাড়ি আসতে পার। সব সময়ই আমার সাহায্য পাবে। গুরগঞ্জে তুমি কী করবে?"

"আগামীকাল এখান থেকে বুখারায় চলে যাচ্ছি। এখানে থাকতে আমার ভয় করে — এখানে মাথার ওপর সব সময় খাঁড়া ঝুলছে, যার ওপর তা এসে পড়বে সে দোষী কি নির্দোষ সে বিচারটুকু পর্যন্ত নেই। না, তার চেয়ে ভালো মুসাফিরের লাঠি ও দূরের পথ।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুলতানা তুর্কান খাতুনের ষড়যন্ত্র

> তুর্কান খাতুনের মতো বুদ্ধিমতী রমণীর নেতৃত্বে সামরিক (কিপচাক) অভিজাত মহলের প্রভাব অচিরেই সিংহাসনের মর্যাদা টলিয়ে দিল। কিপচাকেরা মুক্তিদাতার নাম ধরে আসে, কিন্তু অধিকৃত ভূখণ্ডের ওপর অবাধ ধ্বংসলীলা সাধনের এবং নিজেদের নৃপতিকে জনসাধারণের ঘৃণার পাত্রে পরিণত করার ক্ষমতা তাদের ছিল।
>
> (ভ. বার্তোল্‌দ, আকাদমিশিয়ান)

সিংহদ্বারের পাল্লা খুলে গেল। দানাপানি খাওয়া তেজীয়ান ঘোড়ায় চেপে জোড়ায় জোড়ায় অশ্বারোহী বেরিয়ে আসতে থাকে — তাদের মাথায় ভেড়ার চামড়ার সাদা টুপি, পরনের লাল ডোরাকাটা ঢিলে জামার ওপর বাঁকা তলোয়ারের স্বর্ণদীপ্তি।

জমকালো স্বর্ণাভরণে সাজানো স্ফীতবক্ষ এক বাদামী ঘোড়ার পিঠে গম্ভীর ও দৃপ্ত ভঙ্গিতে আসীন বিপুলকায় খরেজম শাহ মুহম্মদ। তার সাদা রেশমী উষ্ণীষ হীরকমালায় ঝলমল করছে। শাহের গাঢ় নীলরঙা কিংখাবের আংরাখা, বহুমূল্য পাথরে খচিত কোমরবন্ধনী ও তলোয়ার সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

খরেজম অধিপতির অনুসরণ করে দুই তরুণ অশ্বারোহী। রুপোলি গলাবেষ্টনী আঁটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণের তেজীয়ান তুর্কী ঘোড়ার ওপর কায়দা করে বসে আছে এক শ্যামকান্তি, তেজস্বী যুবাপুরুষ — তুর্কমেন রমণীর গর্ভজাত পুত্র, শাহের উত্তরাধিকারী জালাল উদ-দিন। তার পাশে পাশে মন্থর গমনে চলছে দীর্ঘ কালো কেশরওয়ালা বুটিদার ঘোড়া, তার কেশর ছোট ছোট বিনুনীর আকারে পাকানো; এর পিঠে বসে আছে কিংখাবের আংরাখা পরনে একটি ছোট ছেলে — কিপচাক রাজকুমারীর গর্ভজাত শাহজাদা, শাহের প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র।

তারও পেছন পেছন রক্তবর্ণের নানা ঝালরে সাজানো ঘোড়ায় দুলতে দুলতে আসে খরেজমের উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরা।

শাহের হাজার অশ্বারোহীর বাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি অংশ বাজারের সদর রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে যেতে কৌতূহলী জনতাকে কশাঘাতে ছত্রভঙ্গ করে দিতে থাকে। শাহের রিসালার অপর অর্ধাংশ বাদশাহী মিছিলকে অনুসরণ করে।

যারা সামনাসামনি পড়ে যায় তারা সকলেই নতজানু হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকায়। ইসলামের সুবিশাল ভূমির অধিপতিকে কাছাকাছি থেকে দেখার অধিকার তাদের নেই। চামড়ার দীর্ঘ তূরীর ভয়ঙ্কর ভাঙা ভাঙা আওয়াজ এবং ভেরীর গুরুগুরু শব্দ শোনা মাত্র বণিকেরা দোকান থেকে তড়িঘড়ি গালিচা বার করে রাস্তার আবর্জনার ওপরেই শাহের চলার পথে বিছিয়ে দেয়।

শাহ মুহম্মদ তার প্রশস্তি ও আনুগত্যসূচক ধ্বনিতে অভ্যস্ত। তার ভাবলেশহীন দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে পড়ে বাদামী ঘোড়ার খুরের সামনে আনত অসংখ্য ডোরাকাটা পিঠের ওপর। ফুলো ফুলো মুখে কোন কিছুর আভাস পাওয়ার উপায় নেই। উষ্ণীষের শুভ্রতা তার কৃষ্ণবর্ণের দীর্ঘ শমশ্রুকে বিশেষভাবে উজ্জ্বল আভাযুক্ত করে তুলছে।

শাহ জননী সুলতানা তুর্কান খাতুনের প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের সামনে, পথের দু' পাশে দাঁড়িয়ে ছিল বাছা বাছা কিপচাক যোদ্ধা — তাদের অঙ্গে খরেজমের সেই বিখ্যাত জালি লৌহবর্ম যা ভেদ করে তীর প্রবেশ করতে পারে না, মাথায় নাক বরাবর ফলক ঝোলানো শিরস্ত্রাণ, হাতে দীর্ঘ নমনীয় বর্শা।

"অপরাজেয় শাহ মুহম্মদ দীর্ঘজীবী হোন, রাজত্ব করুন।" সৈন্যদের উল্লাসধ্বনি জনতার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেটে পড়ল। লোকে অলিগলি থেকে ছুটে আসে, ছাদে ও মাটির দেয়ালের ওপর উঠে জড় হয়।

মুহম্মদ অবাক হল এই দেখে যে অন্যান্য দিনের চেয়ে কিপচাক সৈন্যরা সংখ্যায় রীতিমতো ভারী, তার নিজের গোটা রক্ষিবাহিনীর তুলনায় কয়েক গুণ বেশিই হবে। এদের কেন জড় করা হয়েছে? এটা কি কোন ফাঁদ? সময় থাকতে ফিরে যাওয়াই ভালো নয় কি? না, এই সন্দেহ কেন! না, নিজের মা কি ছেলের জন্য ফাঁদ পাততে পারে? সে নিজেই না তার পিতা শাহ তাকাশের মৃত্যুর পর নিজে যে সব ক্ষমতা ভোগ করে জননীকেও তার অধিকারিণী করে দিয়েছে? তার মাতৃকুল কাংলির কিপচাক যোদ্ধারাই না তার সকল অভিযানে যোগ দিয়েছে,

আস্তানায় ফিরেছে এমন প্রচুর পরিমাণ শিকার নিয়ে যা তাদের পিতৃপুরুষ কখনও স্বপ্নেও দেখে নি? এগিয়ে চল!

ঘোড়া ফটকের সামনে থমকে দাঁড়াতে মুহম্মদ তার গায়ে কশাঘাত করে দুই লাফে ভেতরের অঙ্গনে গিয়ে পড়ল।

আনুষ্ঠানিক পোশাক পরনে প্রবীণ কিপচাকের দল এসে ঘোড়ার লাগাম ধরল। খরেজম শাহ জিন থেকে লাফিয়ে মখমল বিছানো পথে নামল। বয়স হওয়া সত্ত্বেও ঋজু ও শক্তসমর্থ শাহ সিঁড়ি বয়ে সূক্ষ্ম নক্সা কাটা থামে ঘেরা রোয়াকে উঠে পড়ল, তার পর আনত পৃষ্ঠের সারি অতিক্রম করে প্রাসাদের স্নিগ্ধ শান্তির মধ্যে প্রবেশ করল। তার সামনে এসে দাঁড়াল এক নিগ্রো — নাকে ঝুলছে সোনালি আংটি।

"সম্রাজ্ঞী আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। মহামান্যকে সেলাম!" নিগ্রো পর্দা সরিয়ে দিয়ে গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

"দুনিয়ার মহামান্য অধিপতি! আমির উল্ মুমিনিন! ইসলামের তরবারি!"

শাহ কয়েক পা এগিয়ে গেল। কাঠের ঝকঝকে দেয়াল আর কয়েকটি জাফরি কাটা জানলায় ঘেরা ঘরের আধা অন্ধকারে একটি ছোটখাটো মূর্তি সোনালি কিংখাবের দীপ্তি বিস্তার করছিল। তার দু' পাশে অর্ধচন্দ্রাকারে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নতজানু হয়ে রয়েছে বিশ জন গণ্যমান্য কিপচাক খান। মুহম্মদ বুকের ওপর দু' হাত ভাঁজ করে মাথা নত করল, ছোট ছোট পদক্ষেপে দ্রুত জননীর কাছে এসে নীচু গলায় বলল:

"সালাম, তুর্কান খাতুন, সদ্‌গুণের আলো, ন্যায়বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা!"

কিংখাবের ভাঁজগুলো আন্দোলিত হল। উটপাখির পালকের ঝালর লাগানো গোলাকার উষ্ণীষ প্রায় ভূমি স্পর্শ করল, তারপর আবার উঠল।

"হতভাগিনী, অসুখী বিধবা, তোমার জননী দুনিয়ার প্রবল পরাক্রান্ত অধিপতিকে অভিনন্দন জানায়। পাশে আসন গ্রহণ করে আমার সম্মান ও আনন্দ বর্ধন কর।"

মুহম্মদ সোজা হয়ে দাঁড়াল, চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল তার সামনে এক ক্ষুদ্রাকৃতি মুখাবয়ব — পুরু করে সাদা প্রলেপ ও রঞ্জকে ঢাকা, তার খোঁচা খোঁচা কালো দু'টি চোখে লাল আগুনের শিখা কাঁপছে। তুর্কান খাতুন পায়ের ওপর পা তুলে বারকোশ আকৃতির আসনে, আটকোনা

তখ্‌তে বসে ছিল। দেশের শাসক হিশেবে মুহম্মদের বসার কথা তার জননীর পাশে, কিন্তু সিংহাসনে জায়গা ছিল না। তুর্কান খাতুনের কিংখাবের পোশাকে গোটা জায়গা ঢাকা পড়ে গেছে, তাই শাহকে পাশের গালিচার ওপর বসতে হল। তুর্কান খাতুনও এটাই চেয়েছিল, নিজের কিপচাকদের কাছে তার দেখানোর ইচ্ছে ছিল যে খরেজম শাহের আসন তার নীচে।

মুহম্মদ করতল ঊর্ধ্বে প্রসারিত করে প্রার্থনা উচ্চারণ করল, দাড়িতে আঙ্গুলের ডগা বুলাল। যারা বসে ছিল তারা সকলেই নীচু গলায় প্রার্থনা পুনরাবৃত্তি করল।

তুর্কান খাতুন ধীর, মৃদু স্বরে কথা বলতে শুরু করলে তার মাথা কাঁপার সঙ্গে তাল রেখে কিংখাবের স্তূপ আন্দোলিত হতে থাকে, উষ্ণীষের পালক কেঁপে কেঁপে ওঠে।

"আমার কীর্তিমান পুত্র, আমার প্রিয় পুত্র, তোমাকে ডেকেছি একসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাপারের ফয়সালা করার উদ্দেশ্যে। ব্যাপারগুলো আমাদের বিখ্যাত খরেজম শাহ বংশের সুখ ও মঙ্গল এবং, তোমার অনুগত কিপচাক খানদের ভাগ্য নিয়ে। আমাদের তখ্‌ত, আমাদের শাসনক্ষমতা ও আমাদের বন্ধুদের রক্ষা করা দরকার!"

ঘরে কোন সাড়া-শব্দ নেই। কেবল বাইরে থেকে জানলার জাফরি ভেদ করে ভেসে আসে দূরাগত উচ্চ নিনাদ: "খরেজম শাহ দীর্ঘজীবী হোন!"

"আমার মনস্বিনী জননী, আদেশ হোক!"

"আমার দীনহীন কুঁড়ে ঘরে পর্যন্ত জনরব এসে পৌঁছেছে যে তুমি দূর দূর দেশে নতুন অভিযানের জন্য প্রস্তুত। তুমি আবার তোমার জমকাল ঘোড়ায় চেপে লড়াইয়ের ময়দানে ছুটবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান কার কপালে কী লিখেছেন তা সময়ের আগে কে পাঠ করতে পারে? লড়াইয়ের ময়দানে সত্যধর্মের জন্য শহীদ হয়ে বেহশতের বাগিচায় যদি তোমার গতি হয় তা হলে এখানে তোমার শক্তিমান হাতের অভাবে বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে — আল্লাহ আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন! আমাদের দাম্ভিক নাতি জালাল উদ-দিন আমাদের কিপচাকদের সকলকে জবাই করার মতলবে তুর্কমেনদের সঙ্গে কানাকানি করছে। তাই ভেবে দেখা দরকার, সময় থাকতে

খরেজম ভূমি শাসনে জালাল উদ-দিনের বদলে আর কাউকে নিয়োগ করা ঠিক কি না।"

"ঠিক কথা! হীরের মতো দামী!" উল্লাসে ফেটে পড়ল কিপচাক খানেরা।

সুলতানা কথার জের টেনে বলল, "সেই কারণে, আমার প্রিয় পুত্র, আমাদের কিপচাক বংশের জ্ঞানী খানদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি সমস্ত কিপচাকের এই সর্বসম্মত অনুরোধ তোমাকে জানাব বলে মনস্থ করেছি যে তুমি তোমার কনিষ্ঠ পুত্রকে, তোমার প্রিয় পত্নী কিপচাক খানজাদীর সন্তান কুতব উদ-দিন উজলা শাহকে মসনদের ওয়ারিশ বলে নির্দেশ কর আর জালাল উদ-দিনকে একেবারে দূর অঞ্চলের শাসনভার দিয়ে পাঠিয়ে দাও, — সে যেমন তোমার পক্ষে তেমনি আমাদের পক্ষে অনবরত বিপদের কারণ!"

শাহ মুহম্মদ কী বলবে তার অপেক্ষায় সকলে চুপ। শাহ চিন্তামগ্নভাবে নীরবে কম্পিত আঙ্গুলে তার রেশমী দাড়ি পাকাতে থাকে।

"এতে যদি তুমি অমত কর তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সব কিপচাক খরেজম ছেড়ে তাদের স্তেপভূমিতে চলে যাবে আর আমি একেবারে নিঃস্বের মতো তাদের সঙ্গে মুসাফিরি ধরব।..."

মুহম্মদ এখনও ইতস্তত করছে দেখে তুর্কান খাতুন মাথা ঘোরাল। পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল তার তালুকের নায়েব মুহম্মদ বেন সালিক। লোকটা আগে ছিল গোলাম, সুন্দর চেহারার জন্য সুলতানা তাকে ঐ পদে তুলেছে। ছোট হাতের ভঙ্গির অর্থ বুঝতে পেরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে তৎক্ষণাৎ জরির পোশাক পরা সাত বছরের একটি ছেলেকে হাতে ধরে নিয়ে ফিরল।

"এই হল তোমাদের মসনদের নতুন ওয়ারিশ!" তুর্কান খাতুন কর্তৃত্বব্যঞ্জক, তীক্ষ্ন স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। "কিপচাক খান, বেগ, যোদ্ধৃবর্গ ও জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করছি যে খরেজম শাহ একে তার মসনদের অবলম্বন বলে মনে করেন।"

সব খান লাফিয়ে উঠে ছেলেটাকে হাতে ধরে কয়েক বার মাথার ওপরে তুলে ধরল।

"আমাদের রক্তসম্পর্কের কিপচাক সুলতান বেঁচে থাকুন, দীর্ঘজীবী হোন!"

মুহম্মদ উঠে দাঁড়িয়ে ছেলের হাত ধরে তাকে পিতামহী তুর্কান খাতুনের পাশে বসিয়ে দিল।

"বেগেরা, শুনুন!" মুহম্মদ বলল। "আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি আপনাদের ইচ্ছে পূরণ করলাম। এখন আপনারা আমার অভিলাষ পূরণ করুন। আমার পুরনো শত্রু বাগদাদের খলিফা নাসির আবার আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে, আমার অধীন জাতিগুলোকে বিদ্রোহের উস্কানি দিচ্ছে। দুর্বৃত্ত নাসিরকে উৎখাত না করা অবধি খরেজমে কোন শান্তি নেই। তাকে উৎখাত করা গেলে আমাদের মনোনীত এবং আমাদের অনুগত ধর্মনেতা খলিফা হবেন। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত খলিফার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করতে না পারছি, বাগদাদের পবিত্র মাটিতে আমার বর্শা গাঁথতে না পারছি ততক্ষণ আমার স্বস্তি নেই।"

কিপচাকদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছুঁচাল দাড়িওয়ালা অন্ধপ্রায় এক শুকনো বুড়ো বলে উঠল:

"আপনার শক্তিমান হাত যে দিকে নির্দেশ করবে, আমরা সবাই এক জোট হয়ে সে দিকেই আমাদের ঘোড়া ছুটিয়ে দেব। তবে আগে দরকার আমাদের আস্তানাগুলোতে শান্তি ফিরিয়ে আনা, আমাদের আতঙ্কিত স্বজনদের সাহায্য করা। কিপচাক স্তেপ থেকে দূতেরা ছুটে এসেছে। তারা বলছে, পুব থেকে আমাদের দেশের ওপর কাতারে কাতারে ছড়িয়ে পড়েছে অজানা লোকজন — বর্বর কাফের, যারা পবিত্র ইসলাম ধর্মের কথা কখনও শোনে নি। তারা এসেছে পশুপাল, উট ও গাড়ি নিয়ে। ওরা আমাদের পশুচারণের জমি দখল করে নিয়েছে, আমাদের ছাউনিগুলোকে জায়গা থেকে হটিয়ে দিচ্ছে। আর দেরি না করে আমাদের স্তেপে গিয়ে ঐ কাফেরগুলোকে খতম করে ওদের পশুপাল কেড়ে নিতে হবে আর নারী ও শিশুদের দাস হিশেবে আমাদের যোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।"

"সেনাবাহিনী স্তেপের দিকে চালান!" খানেরা চেঁচিয়ে উঠল।

মির্জা কলম হাতে খরেজম শাহের দিকে এগিয়ে এসে তার সামনে নতজানু হয়ে এক টুকরো লেখা কাগজ বাড়িয়ে দিল।

"এটা কী?" মুহম্মদ জিজ্ঞেস করল।

"আপনার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র কুতব উদ-দিন উজলা শাহকে মসনদের উত্তরাধিকার দানের ফরমান। সে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত খরেজমের

শাসনকর্ত্রী এবং বালক উত্তরাধিকারীর অছি হবেন তার পিতামহী তথা আপনার জননী সুলতানা তুর্কান খাতুন। আর উত্তরাধিকারীর শিক্ষাগুরু এবং খরেজমের প্রধান উজির হবেন সুলতানার তালুকের নায়েব মুহম্মদ বেন সালিক।"

"আর তুমি, আমার কীর্তিমান পুত্র, অপরাজেয় খরেজম শাহ মুহম্মদ, আমরা যতদিন শাসন করতে থাকব ততদিন তুমি তোমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে তামাম দুনিয়া ঘুরতে পার, যার সঙ্গে খুশি লড়াই করতে পার," তুর্কান খাতুন বলল।

মুহম্মদ না পড়েই ফরমানে সই করে খাগের কলম জননীকে দিল। তুর্কান খাতুন কলমটা নিয়ে বড় বড় অক্ষরে সযত্নে লিখল:

"তুর্কান খাতুন, পৃথিবীর অধীশ্বরী,
তামাম দুনিয়ার নারীদের সম্রাজ্ঞী।"

শাহ মুহম্মদ তার জ্যেষ্ঠপুত্র জালাল উদ-দিনের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল। পুত্রের মুখোমুখি হওয়ার সাহস তার হচ্ছিল না। তবে সে সেখানে ছিলও না। উকিল খরেজম শাহের কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলল:

"খান জালাল উদ-দিন এত কিপচাক সৈন্য দেখতে পেয়ে বললেন: 'আমি ভেড়া নই যে কিপচাকদের কসাইখানায় ঢুকতে যাব' — এই বলে ঘুরে গিয়ে বায়ুবেগে উধাও হলেন।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হারেমের বন্দিনী

খরেজম শাহের তিনশ' বেগমের মন-মেজাজ শরিফ রাখার ভার ছিল উকিলের ওপর। তাদের আচার-আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং চাপল্যের বিপজ্জনক লক্ষণ প্রকাশ পেলে তা খোদ খরেজম অধিপতির গোচরীভূত করাও তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

শাহের কাছ থেকে তুর্কমেনীয় স্তেপ থেকে ধরে আনা মেয়েটির ভাবনা-চিন্তা, দীর্ঘনিশ্বাস ও চোখের জলের গোপন রহস্য খুঁজে বার

করার হুকুম পাওয়ার পর উকিল নারী মনের জটিল অন্ধিসন্ধির জট খোলার ব্যাপারে পটীয়সী ইলান তোর্চ (সাপের আঁশ) নামে এক গুনিন বুড়িকে ডেকে পাঠাল। সে ছিল একাধারে দৈবজ্ঞ ও মায়াবিনী এবং যেমন মজাদার তেমনি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর গল্পের কথক।

উকিলের ভাসা ভাসা কথা থেকে 'সাপের আঁশ' আঁচ করল যে তার চিন্তার কারণ তিনটি: স্তেপে কোন দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার আছে কিনা যার কথা ভেবে তরুণী গুল জামাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মুক্তিপ্রেমী তুর্কমেনদের সঙ্গে তার কোন যোগসাজশ আছে কিনা এবং যে রাতে সে শাহের সঙ্গে কাটাল্প সে রাতে তার কাছে কোন ছোরা ছিল কিনা।

"সব বুঝেছি," এই বলে 'সাপের আঁশ' হাত পাতল।

উকিল তার হাতে কিছু মুদ্রা ঢেলে দিল।

"এর মধ্যে একটাও ত সোনার দেখছি না?"

"দরকারী খবর আনতে পারলেই সোনার মুদ্রা পাবে।"

বুড়ির দেহ অস্থিচর্মসার, রং কালো, তার দুই কানে বিশাল বিশাল রুপোর মাকড়ি আঁটা। সে হারেমের নতুন মুক্তার আঙিনার দরজা ঠেলে প্রবেশ করল, থমকে দাঁড়াল। কোঁচকানো কালো চোখের দৃষ্টিতে সে উঁচু দেয়াল ঘেরা ছোট আঙিনাটি খুঁটিয়ে দেখে নিল। অন্যান্য বেগমের আঙিনায় সচরাচর যেমন হয়ে থাকে তেমনি এক ধার জুড়ে আছে জানলাহীন এক তলা টানা দালান, তার বারান্দার সামনাসামনি ভাঁজ করা পাল্লা দেওয়া পাঁচটি উন্মুক্ত দরজা। আঙিনার মাঝখান দিয়ে একটি জলের ধারা প্রবাহিত হয়ে বৃত্তাকার জলাশয়ে গিয়ে পড়ছে। দু' পাশে দুই গোলাপ বাগিচায় ফুটন্ত ফুলের সমারোহ। ভেতরের দিকে, দেয়ালের ধারে এক উঁচু ঝাঁকড়া গাছের নীচে সাদা পশমী কাপড় ও রঙবেরঙের দড়ি জড়ানো সুন্দরভাবে সাজানো একটি মাত্র তুর্কমেন ছাউনি।

ডোরা কাটা ঘাগরা ঠিকঠাক করে নিয়ে ইলান তোর্চ জলাশয়ের দিকে চলল। পাথরের সোপানের ওপর গাঢ় শ্যামবর্ণের একটি ছোটখাটো মেয়ে, কালো টানা টানা তার চোখজোড়া। মেয়েটি নীল রঙের কাশগরী বাটিতে ভাত নিয়ে ছোট ছোট রুপোলি পুঁটি মাছগুলোর দিকে একটু একটু করে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। ইলান তোর্চ পাথরের ওপর সটান পড়ে গিয়ে তার রক্তিম বসনের আঁচল চুম্বন করে নীচু সুরেলা গলায় বলতে শুরু করল:

"সালাম প্রাণের গুলরুখ! তোমার ঐ সুন্দর হাত জোড়াকে চুমু খেয়ে, তোমার শরীরের ছায়া ছুঁয়ে ধন্য হই!"

গুনিন বুড়ি মেয়েটির পাশে বসে পড়ল। অভ্যাসবশে অনর্গলস্রোতে স্নেহ, প্রশংসা ও চাটুবাক্যের বন্যা ঝরিয়ে দিল, আর মনে মনে ভাবতে লাগল: "বাদশাহ একে ভালোবাসেন কেন? মেয়েটি ছোটখাটো, খুবানির মতো কালোপানা, শাহের হারেমের অন্যান্য সুন্দরীর জাঁকজমক ও মর্যাদা এর চেহারায় নেই! সত্যি বলতে গেলে কি আমাদের প্রভুদের খামখেয়ালির অন্ত নেই!"

"স্তেপের খবর কী?" গুলে জামাল তাকে বাধা দিয়ে বলল।

"কিছু দিন আগে স্তেপের একজন খান আমাকে নিয়ে যাবার জন্য উট পাঠায়, যাতে আমি তার পিয়ারীর বিরহ যন্ত্রণা থেকে তাকে সারিয়ে তুলি। সেখানে সকলেই তোমার কথা বলাবলি করে, তোমাকে সৌভাগ্যবতী বলে। বলে যে খরেজম শাহ নাকি আর সব বিবির চেয়ে আমাদের তুর্কমেন সুন্দরীটিকে বেশি ভালোবাসেন, তার সর্ব আঙুলে যে সব আঙটি পরিয়ে দিয়েছেন সেগুলোর পাথর থেকে নীলবর্ণের ফুলকি ঠিকরে পড়ে, তার জন্য পারস্য গালিচায় মোড়া সাদা শিবির গড়ে দিয়েছেন আর প্রতিদিন নিজের রসুইঘর থেকে তাকে পাঠান পেশ্‌তার পুর দেওয়া ঝলসানো ময়ূর কিংবা হাঁস।"

"আমি শুধু নামেই বাদশাহের বিবি, আসলে তিনশ' এক নম্বর বিবি! সাধারণ কোন ঘোড়সওয়ারের বৌ হতে পারলে বরং বাঁচতাম। স্তেপের লোকেরা আমাকে হিংসে করে কিন্তু কারা-কুমের ওপর দিয়ে যে বাতাস নানা লতাপাতার গন্ধ বয়ে আনে তার জন্য আমার মন কেমন করে। এখানে শাহের রসুইঘরের অবিরাম ধোঁয়ায় আমার মাথা ঝিমঝিম করে। এই ছাইরঙা দেয়াল, চৌকি মিনার, তার প্রহরী আর পুরনো ঝাউগাছ ছাড়া অন্য কিছুই যদি আমি না দেখতে পাই তাহলে এই সাদা ছাউনি দিয়ে আমার কী হবে? একবার আমি গাছের আগায় উঠে স্তেপের নীল দূরপ্রান্ত দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু খোজারা আমাকে টেনে নামায়। পরে ওরা দোলনার দড়ি পর্যন্ত কেটে দেয়। বল, একে কী সুখ বলে?"

"ওঃ, তোমার যা আছে তার একশ' ভাগের একভাগও যদি পেতাম তাহলে আমি নিজেকে সুখী মনে করতাম। আমাকে ত আর কেউ পেশ্‌তা দেওয়া হাঁসের মাংস দেবে না।"

"এই, মেয়েরা," গুল জামাল চেঁচিয়ে উঠল, "দস্তরখান সাজাও। আর তুই বুড়ি আমার ভাগ্য গোন!"

দুই বাঁদী সাদা ছাউনির দিকে ছুটে গেল। রুপোর মুদ্রায় গাঁথা লাল রঙের ফেটি মাথায় এক তুর্কমেন বুড়ি এগিয়ে এসে মাটিতে বসে পড়ল। স্থির দৃষ্টিতে সে গণৎকারিণীকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

'সাপের আঁশ' পাথরের খণ্ডের ওপর কমলা রঙের রুমাল বিছাল, লাল থলে থেকে এক মুঠো সাদা ও কালো শিমের বীচি ছড়াল। সরু হাড়ের দণ্ড দিয়ে ছড়ানো শিমের বীচির চার দিকে গণ্ডী কেটে লিউলি* বেদে সম্প্রদায়ের ভাষায় দুর্বোধ্য কতকগুলো শব্দ আওড়াল। জ্বলন্ত কালো চোখ ঘুরিয়ে চোখের নীলচে সাদা জ্যালা বার করে সে খনখনে গলায় ফিস্‌ফিসিয়ে বলতে শুরু করল:

"সেকেলে লোকজন আমাকে যেমন শিখিয়েছে সেই মতে শিমের বীচি যা বলছে শোন। স্তেপে আছে এক বাহাদুর ঘোড়সওয়ার — তরুণ তবে বড় বীর বটে। বাঘ দেখে ডরায় না — তার দিকে তীর ছুঁড়ে মারে। দশ জন ডাকাতের মুখোমুখি হয়ে নিজেই প্রথম তাদের ওপর লাফিয়ে পড়ে, সকলকে মেরে-কেটে ফেলে। এই বাহাদুর সওয়ার তোমার বিরহে কষ্ট পাচ্ছে, রাতে ঘুমোয় না, কেবল বাখ্‌শি গায়কের প্রেমের গান শোনে আর আকাশ পানে তাকায়।... ভাবে এই তারাগুলো যেন তার চোখের ইশারা। দেখছি তুমি দীর্ঘশ্বাস ফেলছ! আমি কি ঠিক বলছি না?"

গুল জামাল কেঁপে উঠল। জামার ওপর সেলাই করা সোনার ও রুপোর মুদ্রাগুলো টুংটাং আওয়াজ তুলল। গুল জামাল একটা মুদ্রা নিয়ে ছিঁড়তে গেল, কিন্তু ছেঁড়া গেল না।

"এনে জান, কাঁচি নিয়ে আয়!"

ইল্যান তোর্চ চুপিচুপি কানে কানে বলল:

"তোমার সেই সাদা হাতলওয়ালা ছোট্ট ছুরিটা কোথায়? স্তেপের মেয়ে তুমি, তোমার কোমরে ত সব সময়ই ওটা গোঁজা থাকত।"

গুল জামালের মুখের ওপর উৎকণ্ঠার ছায়া ঘনিয়ে এলো। তুর্কমেন বুড়ি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে ছাউনির ভেতর থেকে পশমী কাপড়ের

---

* লিউলি — আফগানিস্তানের এক যাযাবর সম্প্রদায়।

সঙ্গে লাগানো সুতো কাটার কাঁচি নিয়ে এলো। গুলে জামাল তার জামা থেকে একটা পাতলা স্বর্ণমুদ্রা কেটে নিয়ে তার বাদামী হাতের মুঠোয় চেপে ধরল।

"তুমি আমাকে এইমাত্র এক কাতর ঘোড়সওয়ারের গল্প কেঁদে শোনালে। তার নামটা বলছ না কেন?"

"শিমের বীচি আমাকে সে কথা বলে না। কেবল তোমার মন সেই উতলা প্রেমিকের নাম বলবে।"

"স্তেপের বহু বাহাদুর ঘোড়সওয়ার আমার জন্য ঝগড়া-বিবাদ করেছে, কিন্তু কিপচাকেরা আমাকে জোর করে বাদশাহের হারেমে বয়ে এনেছে। আমাদের, মেয়েদের মন কাকে চায় বুড়োরা কি সে কথা ভুলেও আমাদের জিজ্ঞেস করে?"

"এই বাচালটা কিচির মিচির করে সব গুলিয়ে দিয়েছে," তুর্কমেন বুড়ি ঝাঁজিয়ে উঠে কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল। "বাদশাহের বিবিদের মনে একটাই নাম থাকতে পারে — যিনি রুস্তমের মতো সুন্দর, ইস্কান্দারের মতো সাহসী আমাদের সেই প্রভু মুহম্মদ খরেজম শাহের নাম। আর প্রাসাদের প্রতিটি মেয়ে একমাত্র তার জন্যই জীবনধারণ করে, একমাত্র তার কথাই ভাবে। এই ধূর্ত কুচুটে বুড়ির কথায় কান দিও না গুলে জামাল!"

প্রাঙ্গনের দরজা দিয়ে ঢুকল এক স্থূলদেহী খোজা — তার মাথায় প্রকাণ্ড সাদা উষ্ণীষ; ইশারায় সে গুনিনকে ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে সে হারেমের এই অতি শক্তিমান রক্ষকটির কাছে ছুটে গিয়ে তার সঙ্গে কী যেন কানাকানি করল। ফিরে এসে সে মাটিতে সাষ্টাঙ্গ হয়ে আঙুল দিয়ে গুলে জামালের আঁচল স্পর্শ করে বলল:

"এই হতভাগিনীকে ক্ষমা কর। এখন আবার মসনদের নতুন ওয়ারিশ শাহজাদা উজলাহ্ শাহের মা ভাগ্য গোনার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এক মুহূর্তও শান্ত হয়ে বসার জো আছে না কি!.." এই বলে সে যে মোহরটি পেয়েছিল সেটাকে আরও একবার চুম্বন করল, তারপর খোজার অনুসরণ করে দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেল।

'বিষাদের দূত', হর্ষের বারতা

খরেজম শাহ এক দূরবর্তী নির্জন কুঠুরিতে রাজকার্য নির্বাহ করত। 'দেয়ালেরও কান আছে', — কিন্তু জানলাহীন, দেয়াল জোড়া গালিচায় ঢাকা কূপের মতো এই ঘরে, যেখানে একমাত্র ওপরে, ছাদের রন্ধ্রপথে রাতে তারাদল ঝিলমিল করে সেখানে তেমনটি হওয়ার উপায় নেই। এখানে শাহ নির্ভয়ে জল্লাদ সর্দারের সঙ্গে একান্তে কথা বলত অথবা প্রাসাদের উকিলের কাছ থেকে তার মুসড়ে পড়া অসংখ্য বেগমের নতুন নতুন চাতুরির সংবাদ নিত। এখানে শাহ ফিস্‌ফিস্‌ করে তার হুকুম জারি করত: কোন অসতর্ক খান হয়ত ভোজসভায় তার প্রভুর বিরুদ্ধে উদ্ধত বাণী উচ্চারণ করেছে — তাকে গোপনে টুঁটি টিপে হত্যা করতে হবে, কিংবা কোন বৃদ্ধ কৃপণ বেগ বহুদিন হল শাহের সামনে মোহর নজরানা রাখে নি, অতএব তার তালুকে মুখ ঢাকা ঘোড়সওয়ারের দল পাঠাতে হবে। বহুবারই গালিচা মহলে শাহের গোপন মন্ত্রণার পর প্রভাতে উঁচু মিনার থেকে করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করতে করতে কোন অজানা দেহ নীচে পাথর বাঁধানো রাস্তায় ওপর পড়ে চৌচির হয়ে গেছে। বহুবার অর্ধ চন্দ্রের ঝাপ্‌সা আলোয় জল্লাদেরা নৌকা থেকে খরস্রোতা জাইহুনের গভীর কালো জলে শাহের অবাঞ্ছিত লোকদের বস্তাবন্দী অবস্থায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তারপর প্রশস্ত নদীবক্ষ থেকে ভেসে এসেছে গান:

বসন্তে তব বাগিচায় গায় বুলবুল,
কেয়ারিতে দোলে রক্তবরণ গোলাপ ফুল।

আর দাঁড়িরা ধুয়া তুলবে:

অহো সুন্দরী খরেজম তুমি!

সেই সন্ধ্যায় মুহম্মদ বিষণ্ণ ও স্বল্পবাক অবস্থায় বসে ছিল, আর প্রাসাদের উকিল তার কাছে বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিল কোন কোন লোক আজ দিনের বেলা তার পুত্র খান জালাল উদ-দিনের কাছে আসে:

"লম্বা লম্বা ঠ্যাংওয়ালা তেজী ঘোড়ায় চেপে তিন জন তুর্কমেন

এসেছিল। তাদের একজনের মুখ শালের আড়ালে ঢাকা ছিল। লক্ষ্য করে দেখা গেছে সে তরুণ, সুঠাম, আর তার চোখের দৃষ্টি বাজপাখির মতো তীক্ষ্ম।"

"ওকে আটক করলে না কেন?"

"কাছাকাছি কুঞ্জবনে তার জন্য অপেক্ষা করছিল জনা চল্লিশেক বেপরোয়া বাহাদুর তুর্কমেনদের গোটা একটা দল। তা ছাড়া বাজারে মের্দানের চাখানায় যেখানে সচরাচর তুর্কমেনরা যায় সেখানে আমার লোক বেশ কয়েক বার কারা কন্‌চারের নাম মুখে আনতে শুনেছে।..."

"কারা কন্‌চার, কারাভানের আতঙ্ক!"

"সত্যি কথা হজরত। কিন্তু এটা কি ভাবা যেতে পারে যে ওয়ারিশ খান..."

"সে আর ওয়ারিশ নয়।"

"শাহের জবানে আল্লাহ কথা বলেন! কিন্তু তবু একজন সাধারণ বেগও কারাভান পথের দস্যুর সঙ্গে আলোচনা করার মতো নীচে নামতে পারে এটা ত ভাবাই যায় না।..."

"আমাদের এই বিপজ্জনক সময়ে কিছুই বিচিত্র নয়!"

"জাহাঁপনা কি মনে করেন না যে জালাল উদ-দিন দূরে চলে গেলে যেমন ধরুন না পয়গম্বরের সমাধির প্রতি ভক্তি দেখানোর জন্য পবিত্র মক্কায় গেলে তুর্কমেনদের সঙ্গে তার এই ফিস্‌ফিসানি বন্ধ হত?"

"আমি তাকে হিন্দুস্তানের সীমানায় দূর গজ্‌নীর শাসনকর্তা নিয়োগ করেছি। কিন্তু সেখানেও ও নিজের চার দিকে বিদ্রোহী খানদের জমায়েত করবে, তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চীন অভিযানে নিয়ে যাবে। আর তারপর খরেজম ছুরিতে ফালা ফালা তরমুজের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। না, জালাল উদ-দিন বরং এখানেই আমার আওতায় থাক, যাতে আমি সব সময় ওকে বাজিয়ে দেখতে পারি।"

"বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত!"

"তবে ওহে লেজনাড়া উকিল শুনে রাখ! আমি যদি আর একবার শুনতে পাই যে দস্যু কারা কন্‌চার তার নিজের জায়গার মতো অবাধে গুরেগঞ্জে ঘোরাফেরা করছে তাহলে জালাল উদ-দিনের প্রাসাদের সামনে শূলের ওপর তোমার ঘোলাটে চোখ জোড়াসুদ্ধ মুণ্ডু বসিয়ে রাখা হবে।..."

"আল্লাহ যেন না করেন!" দরজার দিকে পিছু হটতে হটতে উকিল বিড়বিড় করে বলল।

বৃদ্ধ খোজা প্রবেশ করল।

"মহামান্যের হুকুম অনুযায়ী খাতুন গুল জামাল আপনার আবাসে এসেছেন, আপনার আজ্ঞার অপেক্ষায় আছেন।"

শাহ খানিকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়ল।

"ওকে এখানে, গালিচা মহলে নিয়ে আয়।..."

শাহ বারান্দায় বের হল, নীচু হয়ে সঙ্কীর্ণ দরজায় পা বাড়াল, তারপর ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ছোট্ট একটি কুঠুরিতে এক সঙ্কীর্ণ জানলার কাঠের জাফরির সঙ্গে এঁটে থেকে গালিচা মহলে কী হয় তা লক্ষ্য করতে লাগল।

শ্মশ্রুহীন বৃদ্ধ খোজার পৃষ্ঠদেশ ন্যুব্জ, তার ভারী নিম্নাঙ্গের চার দিকে কাশ্মীরী শাল জড়ানো। সে খোদাই কাজে অলঙ্কৃত দরজা খুলে দিল। তার হাতে ধরা ছিল রুপোর পিলসুজ — তাতে চারটি ঝুলকালি মাখা বাতি।

বিচিত্রবর্ণের কাপড় জড়ানো ছোটখাটো মূর্তিটির দিকে চেয়ে সে সমবেদনায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"তাহলে এগিয়ে যাওয়া যাক!" সরু গলায় সে চিঁচি করে বলল।

খোজা ভারী পর্দা ঠেলে সরিয়ে দিল, পিলসুজ তুলে ধরল। যেন ওপর থেকে আঘাত আসতে পারে এই আশঙ্কা করে গুল জামাল নুয়ে পড়ে দ্রুত ভেতরে ঢুকল, দোর গোড়ায় চটি জোড়া ছেড়ে রেখে দু' পা এগিয়ে গেল।

বুখারার লাল গালিচায় আগাগোড়া মোড়া এই সঙ্কীর্ণ ঘরটিকে দেখে মনে হয় খেলাঘর। ছাদ উঁচুতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

খোজা বেরিয়ে গেল। দরজায় চাবি ঘোরানোর ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ হল। অনেক উঁচুতে দেয়ালে শৌখিন জাফরিকাটা অর্ধবৃত্তাকার জানলা আলোয় ঝলমল করছে, — খোজা সম্ভবত ওখানে মোমবাতিটি রেখেছে। বিপরীত দিকের দেয়ালে ঐরকমই একটা জাফরিকাটা জানলা অন্ধকারে ঢাকা। ওখান থেকে কি কেউ উঁকি মারছে?

গুল জামাল কোন এক গালিচা মহল নিয়ে প্রাসাদ সংক্রান্ত কানাঘুষা

শুনেছিল। হারেমের মেয়েরা যা বলেছে তা হল এই যেন সেখানে জল্লাদ জাহান পহলবান নিমকহারাম বলে প্রতিপন্ন বিবিদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করে আর খরেজম শাহ দেয়ালের ওপরকার এক জাফরিকাটা ছোট জানলা দিয়ে তা লক্ষ্য করে। এই গালিচা মহলেই কি সে এসে পড়েছে?

গুল জামাল ঘরটার চার দিকে ঘুরে নিল। মেঝের ওপর কয়েকটা ছোট ছোট গালিচা — সচরাচর নামাজের জন্য পাতা হয়। "সম্ভবত এইরকম কোন গালিচায় জড়িয়েই হতভাগী মেয়েদের দেহ রাতে প্রাসাদের বাইরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়?"

ঘরের কোনায় কতকগুলো রঙবেরঙের রেশমী তাকিয়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে জড় করে গুল জামাল সেই স্তূপের ওপর বসে পড়ল, সজাগ থেকে প্রতিটি খসখস শব্দে চম্‌কে ওঠে।

এমন সময় দরজায় ঝোলানো গালিচা নড়ে উঠল, তার আড়াল থেকে একটা জন্তুর মাথা উঁকি মারল। আধা অন্ধকারের অস্পষ্ট আলোয় তার গোল গোল চোখ সবুজ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ঝিক্‌মিক্ করতে থাকে।

গুল জামাল লাফ দিয়ে উঠে দেয়ালের সঙ্গে লেপ্‌টে দাঁড়াল। হলুদ রঙের ওপর কালো কালো চাকাওয়ালা জানোয়ারটা নিঃশব্দে গুড়ি মেরে ঘরে ঢুকল, মাথা থাবার ওপর রেখে শুয়ে পড়ল। তার দীর্ঘ লাঙ্গুল আন্দোলিত হয়ে মেঝেয় আছড়ে পড়ছিল।

"তুষার চিতা!" গুল জামাল বুঝতে পারল। "মানুষখেকো শিকারী তুষার চিতা! তবে তুর্কমেন মেয়ে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে না!" হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে সে বিছানো গালিচার প্রান্ত আঁকড়ে ধরল। তুষার চিতা গরগর আওয়াজ তুলে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসতে থাকে।

"মা-গো! বাঁচাও!" গুল জামাল চিৎকার করে উঠে গালিচাটা তুলে ধরল। জন্তুটা প্রচণ্ড এক লাফ মেরে তাকে উলটে ফেলে দিল। গুল জামাল জড়সড় হয়ে গালিচার নীচে লুকাল। তুষার চিতা থাবার ঘায়ে পুরু চাদর ফালাফালা করার চেষ্টা করল।

"বাঁচাও! গেলাম!" গুল জামাল চেঁচায়। দরজার ওপর দড়াম্ শব্দ এবং তর্কাতর্কির আওয়াজ তার কানে এলো। লোকজনের কণ্ঠস্বর ও জানোয়ারের গর্জন তীব্র হয়ে উঠল।... তারপর গোলমাল থেমে গেল। কে যেন গালিচা টান মেরে ফেলে দিল।...

তার সামনে দাঁড়িয়ে এক অশ্বারোহীবেশী ছিপছিপে পুরুষ গালিচার প্রান্তে তার খঞ্জর মুছছে, তার মাথায় ভেড়ার চামড়ার কালো টুপি, গালের রগ থেকে থুতনি পর্যন্ত কাটা-ফাড়া। বুড়ো খোজা লোকটার জামার হাতা আঁকড়ে ধরে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

"কোন সাহসে তুই এই নিষিদ্ধ কামরায় ঢুকেছিস? কী কাণ্ডটা তুহ করলি বল ত হতভাগা? কোন সাহসে তুই বাদশাহের পেয়ারের চিতাবাঘকে কেটে ফেললি? প্রভু তোকে এর জন্য শূলে চড়াবেন!"

"থাম মাকুন্দ! না হলে তোরও মাথা কাটব।"

গুল জামাল খানিকটা উঠেই আবার অবসন্ন হয়ে তাকিয়ার ওপর পড়ে গেল। তুষারে চিতাটি ঘরের মাঝখানে এমনভাবে পড়ে ছিল যেন নিজের কাটা মাথা দুই থাবায় ধরে রেখেছে। তার শরীর তখনও কাঁপছিল।

"খাতুন বেঁচে আছ কি?"

"তোমার কি বড়রকম চোট লেগেছে, বীরপুরুষ? তোমার সারা মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।"

"ও কিছু না! মুখ বরাবর কাটা দাগ — যোদ্ধার অঙ্গের ভূষণ।"

রক্ষিদলের প্রধান তিমুর মালিক ছুটে ঘরে ঢুকল। দরজার চৌকাঠে কিছু সংখ্যক সৈন্য এসে ভিড় করে দাঁড়াল।

"কে তুই? প্রাসাদে ঢুকলি কী করে? পাহারাদারদের গায়ে হাত তুললি কোন সাহসে? অস্ত্র দে!"

বীরপুরুষ ধীরে সুস্থে খাপে তলোয়ার পুরে উত্তরে শান্তভাবে বলল:

"তুমি কে? পাহারাদারদের সর্দার তিমুর মালিক বুঝি? সালাম তোমাকে! খরেজম শাহের পক্ষে একটা খুব জরুরী সংবাদ জানানোর জন্য তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার। সমরখন্দ থেকে খারাপ খবর আছে।"

"এই বেতমীজ লোকটি কে?" একটা রাশভারী কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল। খঞ্জরের হাতল স্পর্শ করে লম্বা লম্বা পা ফেলে গালিচা ঘরে শাহ প্রবেশ করল।

"সালাম শাহানশাহ!" বীরপুরুষ বুকের ওপর দু' হাত ভাঁজ করে ঈষৎ আনত হল। তারপর চট্‌পট্ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি

এখানে ঠাট্টা-মস্করায় ব্যস্ত, স্তেপের বনবেড়াল দিয়ে অবলাদের ভয় দেখাচ্ছেন, ওদিকে দুনিয়ায় বড় বড় কাণ্ডকারখানা ঘটে যাচ্ছে। কারাভান যাতায়াতের রাস্তায় সমরখন্দ থেকে এক দূতের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। লোকটা তার ঘোড়াকে এমন জোর ছুটায় যে সেটা মারা যায় আর নিজে সে পায়ে হেঁটে আরও আগে ছোটে যতক্ষণ পর্যন্ত না ধরাশায়ী হয়। সে উদ্ভ্রান্তের মতো বারবার বলে যায় : 'সমরখন্দে বিদ্রোহ। সব কিপচাককে মেরে ফেলে মাংসের দোকানে ঝোলানো ভেড়ার লাশের মতো গাছে গাছে লটকানো হচ্ছে।' বিদ্রোহীদের সর্দার আপনার জামাতা, সমরখন্দের শাসনকর্তা সুলতান ওসমান। সে আপনার মেয়েকেও খতম করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি শতখানেক বেপরোয়া ঘোড়সওয়ার নিয়ে কেল্লা বন্ধ করে বসে আছেন, দিনরাত আঘাত প্রতিহত করছেন। এই যে আপনার মেয়ের চিঠি।..."

খরেজম শাহ লোকটির হাত থেকে লাল পুলিন্দাটা ছিনিয়ে নিয়ে তলোয়ারের আগা দিয়ে তা কেটে খুলে ফেলল।

"বিদ্রোহ করার মজা টের পাওয়াচ্ছি।" আবছা আলোয় চিঠি পড়ার চেষ্টা করতে করতে সে অস্ফুটস্বরে বলল। "সমরখন্দ চিরদিনই ছিল রাজদ্রোহীদের আড্ডা। শোন তিমুর মালিক! কিপচাক বাহিনীগুলোকে এক্ষুনি ডেকে জড় কর! আমি সমরখন্দে যাচ্ছি। আমি হলাম দুনিয়ায় আল্লাহর ছায়া। আমার গায়ে হাত তুলতে যারা সাহসী হয়েছে তাদের সকলকে লটকানোর মতো যথেষ্ট পরিমাণ অশ্বত্থগাছ আর দড়িগাছা সেখানে মিলবে না।... এই মেয়েটিকে তার সাদা ছাউনিতে নিয়ে যাও, একজন হেকিমকে ওর কাছে পাঠিয়ে দাও।... তোমার নাম কী সওয়ার?"

"সে আর জিজ্ঞেস করেন কেন — বিশাল মরুভূমিতে এক সামান্য সওয়ার!"

"তুমি আমার কাছে 'দুঃসংবাদ' বহন করে এনেছ, আর প্রাচীন রীতি অনুযায়ী 'শোকের দূত'কে মৃত্যুদণ্ড দিতে হয়। তায় আবার তুমি আমার প্রিয় চিতাবাঘকে কেটে ফেলেছ। কী শাস্তি যে তোমাকে দেওয়া যায় জানি না।..."

"আমি জানি জাহাঁপনা!" তিমুর মালিক চেঁচিয়ে উঠল। "আজ্ঞা হলে বলি।"

"বল, বীর তিমুর মালিক, আর আমার তরফ থেকে এই বেতমীজ সওয়ারকে তা জানিয়ে দাও।"

"সামরিক ব্যাপারে একদিন, এমনকি এক ঘণ্টা হারানোর অর্থ বিজয় হাতছাড়া হয়ে যাওয়া। এই সওয়ার বিরাট উৎসাহের পরিচয় দিয়েছে এবং মহামান্যের পক্ষে দরকারী ও ভালো একটি চিঠি এনেছে। এতে জানা যাচ্ছে যে আপনার মেয়ে এখনও জীবিত, তিনি বীরত্বের সঙ্গে শত্রুপক্ষের আক্রমণ ঠেকাচ্ছেন, তিনি নিজেই যেন যোদ্ধা। শাহানশাহ, আপনি এখন সমরখন্দে ছুটে যাবেন, আপনার মেয়েকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার মতো সময় এখনও আছে। এহেন উপকারের জন্য শাহ সওয়ারের সাতখুন সাতবার মাপ করছেন। আর নিহত চিতার বদলে খরেজম শাহ পাচ্ছেন আরও দুর্দান্ত অন্য একটি চিতা — এই অসম সাহসী ঘোড়সওয়ারকে, শাহ তাকে এক শ' তুর্কমেন অশ্বারোহী সেনার দলপতি করে দেবেন, তারা এই বীরের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। ওরা আপনার নিজস্ব পাহারাদার বাহিনীর অংশ হবে।..."

খরেজম শাহ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, হীরের আঙটি লাগানো আঙ্গুল দিয়ে তার কালো দাড়ির গোছা মোচড়াল।

"বাজপাখি তার পথ থেকে সরে না, খরেজম শাহ দু'রকম কথা বলেন না," সওয়ার মর্যাদাভরে বলল। "তুর্কমেন মেয়েটিকে কোথায় নিয়ে যেতে আজ্ঞা হয়?"

সওয়ার ঝুঁকে পড়ে ভূতলশায়িনী গুল জামালকে সন্তর্পণে তুলল। চৌকাঠের ওপরে ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে ছিপছিপে, ভ্রূকুটিপূর্ণ এই লোকটি ঠিক যেন সমানে সমানে কারও সঙ্গে কথা বলছে এই ভঙ্গিতে খরেজম শাহকে উদ্দেশ করে বলল:

"আপনার কারাভানের সন্ত্রাসে কারা কনচারের কাছ থেকে আপনাকে সালাম!" এই বলে সে সগর্বে প্রস্থান করল।

শাহ তিমুর মালিকের দিকে তাকাল, ভেবে পায় না লোকটার ওপর রাগ করবে না তাকে ধন্যবাদ জানাবে। তিমুর মালিক হোহো করে হেসে উঠল।

"দারুণ ডাকাবুকো ছোকরা বলতে হয় কিন্তু! অথচ জাহাঁপনা আপনি বলেন কিনা তুর্কমেনদের ওপর ভরসা করা যায় না। এ ধরনের ঘোড়সওয়ারদের বাহিনী নিয়ে আপনি কিন্তু দুনিয়া জয় করতে পারেন।"

কয়েক দিন কেটে গেল। একদিন রাতের অন্ধকারে ফালি চাঁদের সরু কাস্তে যখন মিনারের ওপর ঝুলছে তখন কতকগুলো ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে প্রাসাদের পাশ কাটিয়ে একটা গলির ভেতর ঢুকল, দেয়ালের ওপর যেখানে প্রাচীন অশ্বত্থগাছের শাখাগুলো নুয়ে পড়ে ছিল সেখানে এসে থামল।

কেশগুচ্ছের তৈরি মইয়ের সঙ্গে আঁকশি বেঁধে দেয়ালের আগায় ছুঁড়ে দেওয়া হল। একটি ছায়ামূর্তি তা বেয়ে ওপরে উঠে গেল। সাদা ছাউনির ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছিল, ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। পেঁচার ডাকে সাড়া দিয়ে আগাগোড়া কাপড়ে ঢাকা এক নারীমূর্তি ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলো।

অন্ধকারে শোনা গেল:

''সব তুর্কমেন — ভাই-ভাই! সালাম! খাতুন গুল জামাল সুস্থ ত?''

"আমি তার দাসী। আমরা বিপদে পড়েছি! খরেজম শাহ আজ তিন দিন হল সমরখন্দের বিদ্রোহীদের ঠাণ্ডা করার জন্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে চলে গেছেন। এখন প্রাসাদের ওপর পড়েছে শাহের মা জাহাঁবাজ বুড়ি তুর্কান খাতুনের কড়া নজর। বুড়ি আদেশ করেছে আমাদের 'গুলরুখকে' পাথরের দুর্গমিনারে নিয়ে যেতে, দ্বিগুণ পাহারাদার বসিয়েছে। বলেছে যে গুল জামালকে মরণ পর্যন্ত ঐ মিনারে থাকতে হবে।"

"তুই তার কাছে যাবি। এই রইল খোজার জন্য সোনার দিনার, পাহারাদারদের জন্য আরও দুটো। খাতুন গুল জামালকে বলবি তিনি যেন শাহের মাকে গিয়ে বলেন যে শহরের বাইরে বড় রাস্তার ওপর শেখের যে মাজহার আছে সেখানে প্রার্থনা করার জন্য যেতে চান। প্রার্থনায় বাধা দেওয়ার মতো সাহস তুর্কান খাতুনের হবে না, আর তিনি একবার শহর থেকে বেরিয়ে পড়লে যা করার দরকার তা কারা কন্‌চার করবে।"

ছায়ামূর্তি আবার প্রাচীরের চূড়ায় উঠে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

দাসী ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল:

"তুর্কান খাতুনের চেয়ে হিংস্র ও ধূর্ত দুনিয়ায় আর কেউ নেই! সে যদি কারও জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে চায় তবে সাধ্য কার তার বিরুদ্ধে লড়ে?"

নবম পরিচ্ছেদ

বিরাগভাজনের কুঞ্জবনে

আছে যখন ঘোড়া আমার, আছে যখন অসি,
কুঞ্জবনে ভোজসভাটা হলই না হয় মাটি।

(ইব্রাহিম মুন্‌তাসির, দশম শতাব্দী)

তিমুর মালিক ছিল অভিজ্ঞ যোদ্ধা, বহু লড়াই সে দেখেছে। বিপদে তার শঙ্কা ছিল না। বহুবার শত্রুর তারবারি তার ওপর উদ্যত হয়েছে, বর্শা তার ঢাল ভেদ করেছে, তীর তার বর্মে বিঁধেছে; তুষার চিতা তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, বাঘের হাতে সে পড়েছে, মৃত্যু তার শিয়রে এসে কালো মেঘের আবরণে দু'চোখ আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আর কী-ই বা তাকে ভয় দেখাতে পারে? তাই খরেজম শাহের ক্রোধের পরোয়া না করে সে শহরের উপকণ্ঠবর্তী তিল্লালা কুঞ্জবনের মালিক, খরেজম শাহের বিরাগভাজন পুত্র জালাল উদ-দিনের সঙ্গে দেখা করতে চলল।

বাগানের ঘন কুঞ্জে যুবক খানের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। জালাল উদ-দিন আসনে একা বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন। সে সহজ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে অতিথির দিকে এগিয়ে গেল।

"সালাম, বীর তিমুর মালিক! কিছু বন্ধুকে আমি নেমন্তন্ন করেছিলাম, কিন্তু বেশির ভাগ বন্ধু ইতিমধ্যেই 'দুঃখের সঙ্গে' জানিয়েছে যে অসুস্থতার দরুন আসতে পারছে না। কেবল স্তেপের তিন জন যাযাবর আর আপনি, তিমুর মালিক, সাহস করে দূর গজ্‌নীর বিতাড়িত শাসনকর্তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন; গজ্‌নী অবশ্য আমাকে আর দেখতে হবে না।"

"শাহের ইচ্ছা পবিত্র," তিমুর মালিক আসনের ওপর বসতে বসতে বলল।

জালাল উদ-দিন চিন্তাচ্ছন্নভাবে বলে চলল, "আমি তুর্কমেন মার গর্ভে জন্মেছি, আর সব কিপচাক ওয়ারিশ হিশেবে একজন কিপচাককে চায় — সেটা কি আমার দোষ? কিপচাক তাদের শাহ হোক, কিন্তু সীমান্তে, যেখানে সর্বদাই লড়াই চলছে সাধারণ ঘোড়সওয়ার সেনা করেই না হয় বাবা আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিন। আমি ভালোবাসি তেজী

ঘোড়া, ঝক্‌ঝকে তলোয়ার আর স্তেপের হাওয়া, গালিচায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে বুড়োদের গান ও রূপকথা শোনার প্রবৃত্তি আমার নেই।"

"কিন্তু যুদ্ধ ত আমাদের চতুর্দিকে," তিমুর মালিক বলল। "কিপচাক বেগেরা খরেজম শাহকে অনুরোধ করেছেন তিনি যেন সসৈন্যে তাঁদের স্তেপে রওনা হন। সেখানে পুব দেশ থেকে এক অজানা জাত এসে আমাদের জমি জমা কেড়ে নিচ্ছে, ভালো ভালো চারণভূমি থেকে কিপচাকদের পশুপাল খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।..."

"বাবা ভালো করতেন যদি খরেজম থেকে সমস্ত কিপচাককে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের বাদ দিয়ে রাজ্য শাসন করতেন," জালাল উদ-দিন মন্তব্য করল। "কিপচাকেরা আয়েসী হয়ে পড়েছে, অধঃপাতে গেছে। বিপদের সময় তারা বাবার প্রতি বেইমানি করবে।"

"এমন কথা ভাবছ কেন?" তিমুর মালিক জিজ্ঞেস করল।

"শাহ যখন খরেজমের জনগণকে বিশ্বাস না করে পরদেশী কিপচাকদের ওপর রাজ্য ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার দেন তখন অবস্থাটা হয়ে দাঁড়ায় সেই মালিকের মতো যে তার ভেড়াদের পাহারা দেওয়ার ও পশম ছাঁটার দায়িত্ব তুলে দেয় স্তেপের নেকড়েদের হাতে। দেখতে দেখতে তার না থাকবে পশম না থাকবে ভেড়া, আর সে নিজেও নেকড়ের খাদ্য হবে।"

পাশে এক গোলাম দাঁড়িয়ে ছিল। জালাল উদ-দিন তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। সে এগিয়ে এসে ঝুঁকে দাঁড়াল।

"বহু মেহমানের জন্য আমাদের বিরাট দস্তরখান তৈরি আছে, অথচ মেহমান নেই। পথ আটক করে যে-ই যায় তাকে থামা। তাদের ভেতর থেকে এমন লোকজন খুঁজে বার কর যারা আমার মেজাজ শরিফ করতে পারে। তাদের এখানে নিয়ে আয় আর আমার আদরের ঘোড়াগুলোকেও সামনে হাজির কর: নিমন্ত্রিত অতিথিরা না এলে আমি আমার ঘোড়াদের ও রাস্তার ভিখিরীদের খাওয়াব।..."

"তুমি আমাকে ডেকেছ, এই যে আমি!" এক শান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বাগানের ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক ছিপছিপে তুর্কমেন, তার মাথায় ভেড়ার চামড়ার বিশাল টুপি। সে বুকের ওপর দু' হাত ভাঁজ করে মাথা নোয়াল।

"মরুভূমির চিতা কারা কন্‌চার, তোমাকে দেখে খুশি হলাম। এসো, আমাদের সঙ্গে বস।"

খরেজমের প‍ূর্ব সীমান্তবর্তী কেল্লার রক্ষিবাহিনীর জনৈক সর্দার আলি জান পাঁচ জন ঘোড়সওয়ার সঙ্গে নিয়ে কারাভান চলাচলের বড় রাস্তা ধরে ছ‍ুটে চলছিল। পথে ঘোড়াগ‍ুলোকে খাওয়ানোর জন্য কদাচিৎ একটু-আধটু থামছিল। আলি জানের ভয় ছিল গ‍ুরগঞ্জ অবধি তার এই দ‍ুর্লভ বন্দীটিকে নিয়ে যেতে পারবে কিনা।

পথচারীরা সামনাসামনি হতে থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে কোন ভয়ানক দস‍্যু ধরা পড়েছে। যারা ঘোড়ায় চেপে আসছিল তারা পাশ দিয়ে ছ‍ুটে যেতে যেতে হাত পা বাঁধা লোকটির ম‍ুখের দিকে উঁকি মারে। কিন্তু যারাই কাছাকাছি আসে আলি জান তাদের ওপর কশাঘাত করতে থাকে, কৌত‍ূহলী লোকজন ছিটকে সরে পড়ে।

ইতিমধ্যে তারা দ‍ুটো অগভীর খাল ডিঙোল, লগি ও ডালপালায় তৈরি নড়বড়ে সাঁকো পার হল। দ‍ূরে অশ্বত্থগাছের সারির মাঝখানে ঝলক দিচ্ছে গ‍ুরগঞ্জের মসজিদ ও মিনারের নীল টালি। রাস্তার চৌমাথায় ছয় জন ঘোড়সওয়ার পথ অবরোধ করে দাঁড়াল — লাল টকটকে তাদের আঙরাখা, মিশ কালো ঘোড়ার অঙ্গে সাদা ধবধবে সাজসজ্জা।

“দাঁড়াও, সওয়ারের দল!”

“তফাৎ যাও!” আলি জান হাঁক পাড়ল। “জর‍ুরী কাজে দিওয়ান আর্শের* দিকে চলেছি — আমির উল-ম‍ুমিনিনের নামে বলছি, পথ ছাড়।”

“আরে তোমাদেরই ত আমরা চাই। শাহজাদা জালাল উদ-দিনের হ‍ুকুম, পথ থেকে মোড় ফিরে এখ‍ুনি তাঁর বাগানে হাজির হতে হবে।”

“কোথাও দেরি না করে আমাদের যেতে হবে সোজা গ‍ুরগঞ্জে, আমাদের সেনাপতি তিম‍ুর মালিকের কাছে।...”

সওয়ারেরা তা সত্ত্বেও আলি জানের ঘোড়ার লাগাম শক্ত ম‍ুঠোয় চেপে ধরল।

“তিম‍ুর মালিক নিজেই এখন এখানে, বাগানে, বেগের পাশে বসে আছেন, দ‍ু’ জনেই গান শ‍ুনছেন। মোড় ফের! বলছি কি! হাত পা ছ‍ুঁড়ছ কেন? তোমার বন্দী ত আর টেঁসে যাবে না! তা ছাড়া জালাল উদ-দিন তোমাকে লোমের ভারী জামা উপহার দেবেন, পেট প‍ুরে পোলাও

---

* দিওয়ান আর্শ — রাষ্ট্রীয় দফ্তর।

খাওয়াবেন, এক মুঠো রুপোর দিরহামও দেবেন। আর বেগের পোলাও কী! এমন পোলাও কোথাও আর কখনও খেতে পাবে না!..”

আলি জান ভেড়ার চর্বির প্রীতিকর ঘ্রাণ অনুভব করে নিজের অশ্বারোহীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল:

“থামাও! খামার বাড়িটার দিকে মোড় ফেরা যাক। এখানে আমোদ করা যাবে!”

অশ্বারোহীরা হাত পা বাঁধা বন্দীকে নিয়ে পথ থেকে মোড় ফিরল, উঁচু ফটকের সামনে গম্ভীর মুখে যে সব প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল তাদের অতিক্রম করে প্রথম আঙিনায় এসে পড়ল। গোধূলির আধা অন্ধকারে সারি সারি ছয়টি চুল্লিতে গন্‌গনে আগুন জ্বলছে। পাশে ঘোরাফেরা করছে মেয়েরা, তাদের লাল টক্‌টকে পোশাক চুল্লির লাল আঁচে আগুনের মতো টক্‌টক্ করছে।

সওয়ারেরা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে খুঁটিতে ঘোড়াগুলোকে বেঁধে ফেলল। বন্দী জিনের ওপরই রয়ে গেল। তার ঘোড়াটা খুর দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে থাকে, মাথা ঝাঁকায়, সওয়ারেরা অন্য যে সব ঘোড়ার দিকে খড়ের আঁটি ছুঁড়ে দেয় সেদিকে মুখ বাড়ায়। মেয়েরা ছুটে এসে বন্দীকে ঘিরে ফেলল, তার অদ্ভুত চেহারা দেখে ওরা অবাক।

লোকটা কেশগুচ্ছের দড়িতে ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা। হাতায় লাল নক্সা কাটা নীল রঙের দীর্ঘ পোশাক এবং প্রান্তদেশ ওপরের দিকে মোড়া চেপটা পশমী টুপি দেখে বোঝা যায় সে অন্য কোন গোষ্ঠীর লোক। তার কপালের দু' পাশ থেকে মেষের শিঙের মতো কাঁধের ওপর ঝুলছিল দু'টি কালো কালো পাকানো বেণী। এক বিন্দুতে স্থির নিবদ্ধ তার তেরছা চোখে কেমন যেন বন্য ভাব।

ভিড়ের মধ্য থেকে ফিস্‌ফিস্ শোনা গেল:

“আরে এটা একটা মড়া!”

“না এখনও নিশ্বাস ফেলছে। কাফের মাত্রেরই জান কড়া।”

“আমার পেছন পেছন চল!” ভৃত্য আলি জানকে বলল। “এই কিম্ভূতটাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো।”

আলি জান খুঁটি থেকে বন্দীর ঘোড়ার বাঁধন খুলল এবং সন্তর্পণে বন্দীসমেত ঘোড়াকে নিয়ে চলল ছায়াঘন বাগানের পথ দিয়ে। বাগানে

ঘন সবুজ রঙের গভীর পত্রাচ্ছাদিত এক-একটি বিশাল দেবদারু গাছের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে উঁকি মারছে তরুণ পীচ গাছ।

একটা ছোট কুঞ্জের চার দিকে এক খাতে দ্রুত জলের প্রবাহ পাক খেয়ে চলেছে। তার সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল বারোটি ঘোড়া — ছয়টি মিশকালো আর ছয়টি সোনালি-পিঙ্গল, চিক্কণ রেশমী তাদের গায়ের লোম, ঘাড়ের কেশর পরিপাটি আঁচড়ানো, লাল টক্‌টকে ফিতে দিয়ে বেণী করে বাঁধা। প্রতিটি ঘোড়া নীচু খুঁটির সঙ্গে শেকল দিয়ে আটকানো। তামার থালা হাতে দু'জন ঘোড়সওয়ার ঘুরে ঘুরে হাতে করে ঘোড়াগুলোকে খরমুজার টুকরো খাওয়াচ্ছিল।

ঘোড়াগুলোর সৌন্দর্য, তাদের অগ্নিঝরা চোখ ও মরালগ্রীবা আলি জানকে এমন মুগ্ধ করে ফেলল যে প্রকাণ্ড প্রাচীন দেবদারু গাছের নীচে যে একদল লোক বসে ছিল তা হঠাৎ তার চোখেই পড়ে নি।

পারসিক গালিচায় ঢাকা চাতালটার ওপর রুপোর রেকাবি ও কাচের ইরাকী ফলদানি সাজানো। সেগুলোতে শোভা পাচ্ছে নানা বর্ণের মিষ্টি রুটি, মিঠাই, টাটকা ও শুকনো ফলমূল এবং অন্যান্য মিষ্টি খাবার। অর্ধবৃত্তাকারে কয়েক জন লোক বসে ছিল। আলাদাভাবে বসে ছিল এক শ্যামকান্তি যুবক, তার মাথায় ভারতীয় পাগড়ি, গায়ে কালো চাপকান: সকলেই তার প্রতি বাড়ির কর্তার মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাচ্ছিল। জায়গাটার পাশে কিছু বাদ্যকর তাদের কসরৎ দেখানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল: একদল ছড়ের বাজনা ধরে, অন্যেরা বাঁশী বাজায়, দু'জনে ঢাক পিটিয়ে ভাঙা ভাঙা আওয়াজ তোলে — বেহদ্দ বাজনার উৎকট আওয়াজে বাগান পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

"এদিকে, এদিকে!" এই বলে শ্যামবর্ণের যুবক উত্তেজিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাইও উঠে দাঁড়াল। যুবক অনড় বন্দীর দিকে এগিয়ে গেল। আলি জান বুঝতে পারল যে এই ব্যক্তিটিই শাহজাদা জালাল উদ-দিন।

"তুমি একে ধরেছ? কোথায় পেয়েছ?"

"ওতরারের কাছাকাছি স্তেপে একে পেয়েছি। শক্ত বটে, শিরাগুলোও লোহার মতো, অতি কষ্টে বেঁধেছি!"

"লোকটা কে? কোন জাতের? কী বলে?"

"উত্তর দিতে চায় নি। চুপ করে আছে।"

"ওর মুখে ত জীবনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মারা যাচ্ছে নাকি?"

"জানি না মহানুভব খান। ওকে খরেজম শাহের সামনে জীবন্ত হাজির করার জন্য আমি প্রাণপণে ছুটেছি।"

"ঝাঁকানিতে ওর প্রাণান্ত করে দিয়েছ। ওর কাছ থেকে কথা বার করা দরকার।"

জালাল উদ-দিন হাতে তালি বাজাল। ভৃত্য এসে হাজির হল।

"হেকিম জাবানকে ডেকে আন; সব রকম শিশি আর ওষুধপত্র যেন সঙ্গে করে আনে। বলবি, একটা লোকে মারা যাচ্ছে।"

"জী, এক্ষুনি যাচ্ছি!"

বন্দী চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগল। তার দু'চোখ বিস্ফারিত হল, হাঁ করা মুখ দিয়ে ভাঙা ভাঙা আওয়াজ বেরিয়ে এলো, সে বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করতে করতে চেঁচাতে লাগল।

"ও কী নিয়ে চেঁচামেচি করছে?" জালাল উদ-দিন জিজ্ঞেস করল।

আলি জান বুঝিয়ে বলল:

"ও আপনার ঘোড়া দেখে তারিফ করে বলছে, 'চমৎকার ঘোড়া! সুন্দর ঘোড়া! কিন্তু এগুলো এখানে থাকবে না, সব গিয়ে ঠাঁই নেবে অপরাজেয় চেঙ্গিজ খানের ঘোড়ার পালে। সে একা আপনার ঘোড়ায় চড়ে যাবে'।"

"এই কাফেরের কথা তুমি বোঝ কী করে?"

"এক সময় আমি কারাভান নিয়ে চীনে যেতাম, তাতারদের ছাউনিতে যাতায়াত ছিল। সেখানে আমি ওদের ভাষায় কথা বলতে শিখি।"

"তা এই অপরাজেয় চেঙ্গিজ খানটি কে? সে অপরাজেয় কেন? এই কাফের এমন বেয়াড়া কথা বলে কোন সাহসে?" তিমুর মালিক ক্রুদ্ধ হয়ে বলল। "একমাত্র খরেজম শাহ মুহম্মদই সব জাতির অপরাজেয় প্রভু। বন্দী যদি ফের এমন কথা বলে ত ওকে কেটে খন্ড খন্ড করে ফেলব।"

"নিজের মনে যা বলছে বলুক," জালাল উদ-দিন বাধা দিয়ে বলল, "আর আমাদের কাজ হবে তাতারদের এই অপরাজেয় নেতার বিষয়ে ও যা যা জানে তা ওর কাছ থেকে বার করা।"

বাগানের ঝোপের আড়াল থেকে উঁচু গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কে যেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে আসতে মন্ত্রের মতো আওড়াতে লাগল:

"ইমানদারদের শাসনকর্তার কীর্তিমান ও সাহসী পুত্র, উজ্জ্বল তলোয়ার ও দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর অশ্বপালের মালিক জালাল উদ-দিনের

মতো শৌর্যেবীর্যে আল্লাহ সব মুসলমানকে অলংকৃত করুন! ইসলামের সমস্ত দুশমনের ওপর তাঁর তলোয়ার বজ্রের মতো নেমে আসুক!..”

বাগানের পথ ধরে দীর্ঘ শমশ্রুধারী এক ছোটখাটো লোককে ছুটে আসতে দেখা গেল। তার মাথায় বিরাট পাগড়ি। হাতে তার চামড়ার থলি ও মাটির তৈরি বিশাল বয়াম। তার প্রতিটি গতিসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে কোমরে ঝোলানো তামার যাবতীয় সরঞ্জাম, ছুরি-কাঁচি ও শিশির আওয়াজ ওঠে। জালাল উদ-দিনের সামনে এসে সে আভূমি নত হল।

“আপনার কৃপা অমঙ্গলের গ্রাস থেকে আমাকে ছিনিয়ে এনেছে। আপনার অসীম উদারতা আমাকে আপনার দ্বারপ্রান্তে বয়ে এনেছে। এই মাত্র শুনলাম যে একজন মুমূর্ষুকে বাঁচাতে হবে।...”

জালাল উদ-দিনের হাতের এক ইশারায় হেকিমের বাকচাতুর্যের বন্যা বন্ধ হয়ে গেল।

“হেকিম জাবান! তোমার গলা বিশ্রাম নিক, এই অসুস্থ লোকটাকে একবার দেখ, তোমার যাবতীয় জ্ঞান ও তোমার শিশি-বোতলের সব ওষুধ এর ওপর ব্যবহার করে দেখ। ওকে বাঁচানোর চেষ্টা কর।”

“আমি আপনার সেবক, আমি আপনার গোলাম। আমার প্রভু যা বলেন তা-ই করি!..”

বেঁটে হেকিম কাজে লেগে গেল। ভৃত্যেরা বন্দীর বাঁধন খুলে তাকে ঘোড়া থেকে নামাল। জিনের ওপর তার দুই পা যেমন ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে ছিল সেই ভঙ্গিতে সে আড়ষ্ট হয়ে কোনরকমে দাঁড়িয়ে রইল। পরদেশীর ছোঁয়া লেগে যেতে ঘৃণায় শিউরে উঠে ভৃত্যেরা ফিস্‌ফিস্ করে মোনাজাত আওড়ায়। হেকিমের নির্দেশে তারা বন্দীর গায়ের পোশাক খুলে ফেলে তাকে বিছানো কম্বলের ওপর শুইয়ে দিল। সে মূর্ছা গিয়ে চোখ উল্‌টে বাধ্যের মতো পড়ে রইল।

হেকিম মন্ত্র পড়তে পড়তে রোগীর বুকের ওপর স্বচ্ছ তৈলাক্ত পদার্থ ঢালতে লাগল, একটা হাড়ের হাতা দিয়ে শুকনো ক্ষতের ওপর চালের মতো ছড়ানো পোকা চেঁছে সাফ করতে লেগে গেল।

“পোকা ধরে গেছে।... তবে ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে: ‘আল্লাহ যেমন রোগ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি পরম প্রাজ্ঞ তিনি সেই সব রোগ সারানোর দাওয়াইও বার করেছেন’।”

ক্ষত থেকে রক্ত বের হতে শুরু করলে হেকিম তার ওপর তেল মাখানো তুলো চেপে ধরে সমস্ত শরীর কাপড় দিয়ে জড়ানোর নির্দেশ দিল।

"হে মহানুভব খান! আমার প্রভু!" জালাল উদ-দিনকে উদ্দেশ করে সে বলল। "আমি একজন পরম বিজ্ঞ আরবী চিকিৎসক, চক্ষুরোগ* ও ছানি কাটার বিশেষজ্ঞ; যিনি মচকানো হাড় সোজা করেছেন, যিনি মরণকে ঠেকিয়েছেন সেই যুনানী চিকিৎসক হিপ্পক্রাটিসের কিতাব আমি পড়েছি। আমি আপনার দাসানুদাস, আপনার করুণার ওপর নির্ভরশীল। ওষুধ তৈরির জন্য আমাকে এক কলস পুরনো সরাব দিতে আজ্ঞা হোক। আমার চিকিৎসার পর রোগী কথা বলতে শুরু করবে, একদিন দু'দিন কথা বলবে, তারপর মারা যাবে, কিংবা আল্লাহর কৃপা হলে সুস্থ হয়ে উঠবে।..."

সরাব পাওয়ার পর নানা রকম গুঁড়োর সঙ্গে তা মিশিয়ে হেকিম নিজে সেই ওষুধ পান করল, তারপর রোগীকে পান করাতেই সে জ্ঞান ফিরে পেয়ে কথা বলতে শুরু করল।

বন্দীর চোখমুখ জ্বরবিকারে আরক্ত, সে প্রথমে গান ধরল, চেঁচিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল, তারপর স্বচ্ছন্দে কবিতা পড়ার মতো সুর করে কথা বলতে লাগল। আলি জান মনোযোগ দিয়ে শুনে অনুবাদ করল।

জ্বলন্ত চোখে দূরের দিকে তাকিয়ে বন্দী বলতে থাকে, "সুন্দরী, সুখের নীড় আমার জন্মভূমি। গোলাপী আভা ছড়ানো পাহাড়শ্রেণীর মাঝখানে বালির প্রান্তর আর প্রান্তর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত জুড়ে আছে। কোন নামী দৌড়বাজ ঘোড়ার সাধ্য নেই সে সব প্রান্তরের চার দিকে ছুটতে পারে। উঁচু উঁচু ঘন ঘাসের জমিতে বন্য জন্তুরা গর্জায়, শতবর্ণের হরিণ ছোটাছুটি করে, পাখিরা কলকণ্ঠে গান গায়। ফিরোজা রঙের আকাশে ওড়ে সাদা রাজহাঁস আর পাতিহাঁসের দল।... আমার জন্মভূমি স্তেপে সবার ঠাঁই আছে, কেবল আমার দীনহীন আস্তানারই ঠাঁই হল না।

---

* আরবী বিদ্বৎসমাজে চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্থান সে সময় অনেক উঁচুতে ছিল। 'গোটা মধ্যযুগ জুড়ে ইউরোপীয় চিকিৎসাবিদরা চক্ষুরোগ চিকিৎসার ওপর আরবী গবেষণাগ্রন্থের সমকক্ষ একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করতে পারেন নি। কেবল অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় আমরা আরবীয় রচনাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো অগ্রগতির সূচনা লক্ষ্য করি।' (আকাদমিশিয়ান ই. ইউ. ক্রাচকোভ্‌স্কি)

শক্তিমান জাতগুলো ও তাদের লোভী দলপতিরা আমাদের সবুজ চারণভূমি কেড়ে নিয়েছে, সেখানে এখন চরে বেড়ায় অন্যদের হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া ও ভেড়ার পাল।... আর আমার হতভাগ্য, জীর্ণ আস্তানার জন্য রইল কেবল পাথুরে গোবী ও গিরিখাত। সেখানে ভেড়ার পাল শুকিয়ে যেতে লাগল, ফাঁকা হয়ে গেল, ঘোড়াগুলো রোগা আর দুবলা হয়ে টলে টলে চলতে লাগল। এসবের জন্য দায়ী দাম্ভিক সর্দাররা আর তাদের অধিপতি লাল দাড়িওয়ালা, অপরাজেয় চেঙ্গিজ খান — যে দুনিয়া লুঠতরাজ করার উদ্দেশ্যে মোঙ্গল জাতিকে অন্যান্য দেশে নিয়ে চলেছে।..."

"কোন চেঙ্গিজ খানের কথা ও বলছে?" জালাল উদ-দিন বলল।

আলি জান প্রশ্ন ভাষান্তরিত করে শোনাল। বন্দী বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল:

"তেমুচিন চেঙ্গিজ খানকে কে না জানে! আমি তাকে ছেড়ে চলে এসেছি। গোলামের মতো পিঠ না নুইয়ে যারা তার সামনে দাঁড়ানোর সাহস করে তাদের সে ক্ষমা করে না! সে অবাধ্যদের ওপর প্রতিহিংসা নেয়। কোন সময় যদি কেউ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে সে তার ওপর নির্যাতন চালায়, নবজাত শিশুসমেত তার গোটা বংশ নিধন করে।''

"তুমি কে? চেঙ্গিজ খানের বিরুদ্ধে এমন বুক ফুলিয়ে কথা বলছ কেন?"

"আমি একজন স্বাধীন শিকারী গুরকান বাহাদুর। আমি নিজেই নিজের খান, নিজেই নিজের অস্ত্রধারী-নোকর, আমি চেঙ্গিজ খানের ফৌজ ছেড়েছি, কেন না এই কুৎসিত চেহারার বুড়োটা আমার বাপ ও ভাইয়ের শিরদাঁড়া ভেঙে দেওয়ার হুকুম দেয়, কেন না লাল দাড়িওয়ালা এই অধিপতি সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদের ধরে নিয়ে নিজের বাঁদী করে রাখে, কেন না সে তার রাজকীয় ইচ্ছা ছাড়া দুনিয়ায় আর কোন ইচ্ছা সহ্য করতে পারে না। আমি চলে যাব জগতের শেষ প্রান্তে, যেখানে বাস করে একমাত্র জন্তু-জানোয়ার আর আমার মতো স্বাধীন শিকারী। আমি বাস করব সেখানে, যেখানে খল চেঙ্গিজ খানের অস্ত্রধারী নোকররা পৌঁছুতে পারবে না।"

"চেঙ্গিজ খান এখন কোথায়? কিসের মতলব আঁটছে?" জালাল উদ-দিন জিজ্ঞেস করল।

"চেঙ্গিজ খানের রাজত্ব এখন জলে কানায় কানায় ভর্তি এমন এক হ্রদের মতো যা কোন মতে বাঁধে বাঁধা আছে। চেঙ্গিজ খান পা বাড়িয়েই আছে, তার সৈন্যসামন্ত তলোয়ার শানিয়ে পশ্চিম দেশগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার হুকুমের অপেক্ষা করছে মাত্র। তারা আপনাদের দেশ ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এখানে ছুটে আসবে।"

"এই বাহাদুরটিকে আমরা এখানে আমাদের কাছে রেখে দেব," তিমুর মালিক বলল। "ওকে তুর্কমেন মেয়ে বিয়ে করতে হবে, নির্ভীক কারা কন্‌চারের যাযাবর আস্তানায় ও ছাউনি গাড়বে, স্বাধীন শিকারী হয়ে কারা-কুমে ঘুরে বেড়াবে।"

"কিন্তু এই চেঙ্গিজ খানটি কে?" জালাল উদ-দিন জিজ্ঞেস করল। "এই কথাগুলোতে আমি অস্বস্তি বোধ করছি। এ বিষয়ে ভালো মতো জানতে হয়।"

"মহানুভব খান, আমাকে ক্ষমা কর," তিমুর মালিক উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল। "এই বন্দীকে নিয়ে আমাকে দিওয়ান আর্শে যেতে হবে। এই বেতমীজ চেঙ্গিজ খান সম্পর্কে সব কিছু আমি ওর কাছ থেকে বার করব।"

"মহানুভব হুজুর, আমাকেও ক্ষমা করবেন," আলি জান বলল। "আমার ঘোড়সওয়ারেরা আপনার মিঠে দস্তরখান পেট পুরে খেয়েছে, ঘোড়াগুলোও প্রচুর দানাপানি পেয়েছে। পরম সুখ পেয়ে এখন আমাদের দিল খোশ হল। আমাদেরও এগিয়ে যেতে দিন, এই হতচ্ছাড়া কাফেরটাকে গুরগঞ্জের দুর্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিন।"

"ঠিক আছে!" জালাল উদ-দিন উত্তর দিল। "গোলাম, এই ঘোড়সওয়ারকে ভেড়ার লোমের নতুন জামা দে।"

আলি জান নীচু হয়ে অভিবাদন করে বলল:

"পাখির জন্য চাই শক্ত ডানা, মেহমানদের — সালাম আর গৃহকর্তাকে শ্রদ্ধা জানাই, সওয়ারের চাই পথ!"



তৃতীয় অধ্যায়

ইরগিজ নদীর লড়াই

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিপচাক স্তেপে অভিযান

আফ্রাসিয়াব চেঁচিয়ে বলল: "আমি অভিযানে চলেছি! আমার ঘোড়ার লেজ হেনায় রাঙিয়ে দাও!"

(প্রাচীন পারসিক গাথা থেকে)

ক্রোধোন্মত্ত খরেজম শাহ মুহম্মদ গুরগঞ্জ থেকে সমরখন্দের দিকে ছুটল। স্থির করল শাহের বিরুদ্ধে তরবারি ওঠানোর জন্য জামাতা ওসমান এবং নগরবাসীদের ওপর নির্মম প্রতিশোধ নেবে।

নগর অবরোধ করে মুহম্মদ ঘোষণা করল যে অবাধ্যতার জন্য সদ্যোজাত শিশু পর্যন্ত সকলকে খতম করবে, এমনকি ভিন্‌দেশীদেরও রেয়াৎ করবে না। সমরখন্দবাসীরা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ-ঘাট

রোধ করে বহুক্ষণ লড়ে গেল, অবশেষে খান ওসমান খরেজম শাহের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করল। ওসমান খরেজম শাহের সামনে উপস্থিত হল হাতে তরবারি ও সাদা কাফনের টুকরো নিয়ে — যার অর্থ পূর্ণ বশ্যতাস্বীকার এবং এই তরবারির নীচে মাথা পেতে দণ্ড গ্রহণে সম্মতি। খরেজম শাহ জামাতা ওসমানকে তার সামনে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে দুর্বল হয়ে পড়ল, তাকে ক্ষমা করতে রাজি হল। শহর আত্মসমর্পণ করল, দুর্গে বিদ্রোহীদের হাতে শাহের অবরুদ্ধ কন্যা খান সুলতানা বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ দেওয়ার পর পিতার কাছে ফিরে এলো। স্বামীর প্রতি কোন রকম ক্ষমা না দেখিয়ে সে তার মৃত্যু দাবি করল। রাতে ওসমান প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল। তার সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে এবং তাদের শিশুসন্তানদের পর্যন্ত হত্যা করা হল, যাতে সমরখন্দের শাসনকর্তাদের প্রাচীন কারাখানিদ বংশ* লোপ পায়।

খরেজম শাহের সঙ্গে আগত কিপচাক খানেরা সমরখন্দের অধিবাসীদের ওপর নিষ্ঠুরভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করল। দশ হাজারের বেশি অধিবাসীকে তারা বিনাশ করল, শহরে আরও হত্যা ও লুঠতরাজ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে তাদের ছিল কিন্তু শাহ জননী তুর্কান খাতুন এখানে হস্তক্ষেপ করল। তুর্কান খাতুন নৃশংস বটে, তবে হুঁশিয়ার। কিপচাক খানদের বলে-কয়ে সে হত্যাকাণ্ড থামাল।

অতঃপর সমরখন্দ হল খরেজম শাহের রাজধানী। সমরখন্দে বিশাল প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শুরু হল।

কিপচাক খানেরা খরেজম শাহের কাছে দাবি জানাল পুবের মরুভূমি থেকে যে মেরকিত তাতার গোষ্ঠী এসে কিপচাক আস্তানার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে তাকে ধ্বংস করার জন্য শাহ যেন স্তেপে তার সেনাবাহিনী নিয়ে অভিযান চালায়। শাহ শাসনসংক্রান্ত ঝামেলা ও প্রাসাদ নির্মাণের অজুহাত তুলল। তখন জননী তুর্কান খাতুন তাকে সেই একই অনুরোধ করল।

---

* কারাখানিদ — দশম শতাব্দীতে যখন তুর্কী গোষ্ঠীরা মধ্য এশিয়া আক্রমণ করে সির দরিয়া ও আমু দরিয়ার মধ্যবর্তী কর্ষণযোগ্য ভূমি অধিকার করে সেই সময় সমরখন্দে রাজত্বকারী তুর্কী রাজবংশ। কারাখানিদ বংশের শাসনকাল মাভেরাননগরের পক্ষে ছিল সংস্কৃতিগত পশ্চাদমুখিতা ও খানদের উৎপীড়নের যুগ, যার ফলে প্রায়ই জনসাধারণের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটত। (আকাদমিশিয়ান ভ. বার্তোল্দ)

শৈলশৃঙ্গের অগম্য নীড়ে বসে বহুদর্শিনী শ্যেনপক্ষিণী যেমন দূরে স্তেপের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তার অসহায় শাবকদের আগলায় অতি খল ও হুঁশিয়ার মহিলা তুর্কান খাতুনও তেমনি চির অসন্তুষ্ট জনসাধারণের বিদ্রোহের বিপদ থেকে, কুটিল খানদের বেইমানি ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাদের গোপন হত্যা ষড়যন্ত্র থেকে শাহের মসনদ আগলে রাখত। তার অপরাজেয় পুত্র খরেজম শাহের মানে যে কেউ ঘা দেওয়ার স্পর্ধা করলে সেই বিপদের মুহূর্তে সে তার বিনাশে কৃতসংকল্প হয়ে গুরেগঞ্জের অন্ধকারাচ্ছন্ন অগম্য প্রাসাদ থেকে বিশ্বস্ত কিপচাক বাহিনীকে পাঠাত। তাই খরেজম শাহের সাধ্য কি হুঁশিয়ার জননীর ডাকে সাড়া না দেয়?

পরের বছর বসন্তের গোড়ায় মুহম্মদ গুরেগঞ্জে উপস্থিত হল, সেখান থেকে বিশাল অশ্বারোহী সেনাদল পরিচালনা করে অভিযানে যাত্রা করল। দশ দিন ধরে দশটি বাহিনী শহর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকল। প্রতিটি বাহিনীতে ছয় হাজার করে ঘোড়সওয়ার। মাল বোঝাই অতিরিক্ত ঘোড়াগুলো বহন করে চলল যব, জোয়ার, চাল, তেল-ঘি এবং চামড়ার থলে ভর্তি ঘোড়ার দুধ।

খরেজম শাহ যুদ্ধের জাঁকজমক, রণডঙ্কার ডামাডোল এবং অভিযানের আহ্বানস্বরূপ রণশিঙার কর্কশ নিনাদ পছন্দ করত। হাজার হাজার অশ্বারোহীর অগ্রভাগে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে স্ফীতবক্ষ এক বাদামী ঘোড়া, তার রক্তবর্ণে রঞ্জিত পুচ্ছদেশ আন্দোলিত হচ্ছে, সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে সোনার সাজ, জ্বলজ্বল করছে মণি-রত্ন, পায়ে ঝন্‌ঝন্‌ বাজছে রূপোর ঘুঙুর। এই বাদামী ঘোড়াকে এবং হীরের মালা জড়ানো তুষারশুভ্র উষ্ণীষ মাথায় কৃষ্ণশ্মশ্রুধারী সওয়ারকে খরেজমে কে না জানে!

ইসলামের রক্ষক, সত্যধর্মের স্তম্ভ, কাফেরদের আতঙ্ক এই সওয়ারটি পয়গম্বরের বংশধর, বাগদাদের খলিফা নাসিরের ওপর পর্যন্ত তার নিজস্ব অভিরুচি চাপিয়ে দিতে এবং ক্রোধের বিজলি হানতে কসুর করে নি। এই অশ্বারোহীটি হল খরেজম শাহ আলা উদ-দিন মুহম্মদ — যে তার রাজ্যসীমা বিস্তার করেছে সেই সব মরুভূমি পর্যন্ত যেখানে বিশ্ববিজয়ী বীর ইস্কান্দারেরও পদার্পণ ঘটে নি।

সেনাদলের বিস্তার দশ দিনের পথ। কয়েক হাজার ঘোড়ার এক-একটি

সারিকে বিরামের জায়গায় জলপান করাতে গিয়ে সমস্ত কুয়োর জল নিঃশেষ হয়ে যায়। কেবল একদিন পরে সেগুলোতে আবার জল জমে।

প্রথম দলে চলে জাসুসী সেনা। খরেজম শাহ চলে দ্বিতীয় দলের সঙ্গে। তার সঙ্গে চলে তাঁবু, হাঁড়ি-কড়াই এবং বাদশাহী রসুইয়ের বিপুল রসদ বোঝাই দ্রুতগামী উটের সারি।

সব শেষের দশম দলটিতে চির চঞ্চল ও অবাধ্য তুর্কমেনদের সঙ্গে চলেছে শাহের অধিকারহারা পুত্র জালাল উদ-দিন। কিপচাকদের দম্ভ ও লোভ সহ্য করতে না পেরে তুর্কমেনরা তাদের সঙ্গে প্রায়ই মারামারি বাধিয়ে বসে। তুর্কমেনরা তাদের বিরামস্থলের চারধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আগুন জ্বালে, সন্ধ্যায় তার চারপাশে ফৌজী নাচ নাচে; তারা মাথার ওপর বাঁকা উজ্জ্বল তরবারি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে ফৌজী গান গায়।

খরেজম সাগরের তীর বরাবর যাত্রাপথ। সাইহুন নদী* পার হয়ে সেনাদল সারি চাহানাক নামে এক সঙ্কীর্ণ উপসাগরে উপস্থিত হল। শাহ এইখানে থামার আদেশ দিল। সংবাদ আনার জন্য জাসুসীদের আগে পাঠিয়ে দিয়ে এই ফাঁকে নিজে শিকারী বাজপাখি নিয়ে ফিরোজা রঙের সাগরের তীর ধরে চলল, অবস্থানস্থলে ফিরে এলো শিকারলব্ধ হাঁস ও সারসের স্তূপ নিয়ে।

জাসুসীরা খবর আনল যে ইরগিজ নদীর নিম্ন অববাহিকায় চেলকার হ্রদের মোহানায় মেরকিতদের ঘোড়ার পাল দেখা গেছে। খরেজম শাহ তার সমস্ত বাহিনীর গোছগাছ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর সেনাপতিদের এক পরামর্শসভা ডেকে আক্রমণের পরিকল্পনা বুঝিয়ে বলল। গোটা ফৌজ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। শাহ নিজে মাঝখানের অংশে থেকে শেষ, চূড়ান্ত আঘাত হানবে। বাঁ পাশটির নেতৃত্ব দেবে কিপচাক খান তুরগাই, আর ডান পাশ পরিচালনা করবে খরেজম শাহের পুত্র জালাল উদ-দিন। মুহম্মদ দেখতে চায় তার অবাধ্য ও আত্মবিশ্বাসী পুত্র কেমন যুদ্ধ করে।

গুরগঞ্জ থেকে শাহ জননী তুর্কান খাতুনের পাঠানো মোড়ক নিয়ে ঘোড়ায় ছুটতে ছুটতে এক দূত অবস্থানস্থলে এসে হাজির। উকিল ও মির্জা শাহের পিছু পিছু তার শিবিরে এসে ঢুকল। মুহম্মদ ছোরা

---

* সাইহুন — ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সির দরিয়া নদী এই নামে পরিচিত ছিল।

দিয়ে মোড়কটা কেটে ফেলল। তার ভেতরে ছিল গাঢ় লাল রঙের ছোট্ট একটি রেশমী থলি। থলিটা মাথায় ও ঠোঁটে ঠেকিয়ে খরেজম শাহ তা খুলল। সেখানে পাকানো সরু কাগজের* ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা একটি চিঠি ছিল।

"প্রবল পরাক্রান্ত, দোয়াপ্রাপ্ত আমির-উল্-মুমিনিন, ইনসাফের রক্ষক আলা উদ-দিন মুহম্মদ খরেজম শাহ সমীপেষু, আল্লাহ তোমার রাজ্য রক্ষা করুন! সালাম!

সব মসজিদের সব ইমাম প্রতিদিন সকলের পরম স্রষ্টা ও প্রভুর উদ্দেশে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ করে, তিনি যেন তোমার রাজত্বকাল দীর্ঘ করেন, সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাকে জয়ী করেন! প্রভু যেন তা-ই করেন!

বাজারে বাগদাদের খলিফা প্রেরিত এক দরবেশ ধরা পড়ে। দরবেশ বিশ্বাসপ্রবণ সাধারণ লোকজনের মধ্যে প্রচার করে বেড়াচ্ছিল যে আমাদের প্রিয় শাহ পারসিকদের কাছ থেকে তাদের অশুদ্ধ ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেছেন, তাই আল্লাহ তার দণ্ডবিধান করবেন; এর শাস্তিস্বরূপ ইয়াজুজি ও মাজুজি** নামে পৌত্তলিক জাতিরা এসে আমাদের সাম্রাজ্য ধ্বংস করবে। জল্লাদদের সর্দার জাহান পহলবান এই বাচাল দরবেশকে পাকড়াও করে গরম শিক দিয়ে তার ওপর নির্যাতন চালায়, তারপর জিভ কেটে ফেলে তাকে বাজারের চকে ফাঁসি দেয়।

এই দণ্ডদান দেখে হাজার হাজার লোক ভীত-সন্ত্রস্ত। আর সব ভালো। তোমার সাম্রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি বহু বছর স্থায়ী হোক!

তুর্কান খাতুন,
তামাম দুনিয়ার নারীদের সম্রাজ্ঞী।"

প্রত্যুষে সৈন্যদল জোর কদমে যাত্রা করল, দুই দফা যাত্রায় তারা ইরগিজ নদী পর্যন্ত পেঁছাল।

---

* তখনকার দিনে কাগজ প্রস্তুতের জন্য সমরখন্দের খ্যাতি ছিল, এই কাগজ অন্যান্য দেশেও রফতানি হত।

** ইয়াজুজি ও মাজুজি — অজ্ঞাত জনগোষ্ঠীর নাম, প্রাচ্যদেশীয় রূপকথাগুলোতে প্রায়ই এদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

বসন্তে নবীন অঙ্কুরে স্তেপে সবুজের ঢল নেমেছে। সচরাচর নিংড়ানো ও মৃতপ্রায় প্রান্তরের বালুকার ওপর খুশিতে ঝরে পড়ছে হলুদ, বেগুনী ও রক্তবর্ণের নানা ফুল। সূর্য কখনও চোখ ধাঁধানো ছটায় জ্বলে, কখনও বা জলভরা মেঘের আড়ালে গা ঢাকা দেয়।

ইর্গিজ নদী তখনও হালকা নরম বরফের আস্তরণে ঢাকা। বরফের ওপর দিয়ে জলস্রোত চলকে পড়ছে, মাঝে মাঝে কালো কালো গহ্বর ও জলভাগ দেখা যাচ্ছে, যার ফলে বাহিনী নিয়ে অপর তীরে যাওয়া সম্ভব হল না।

খরেজম শাহ সৈন্যদলকে নলখাগড়ার ঝোপের পেছনে ফাঁকা জায়গায় লুকিয়ে থেকে বরফ ভাঙা পর্যন্ত অপেক্ষা করার হুকুম দিল, অন্যথায় মের্কিতরা তাদের দেখতে পেয়ে স্তেপভূমির আরও গহনে চলে যেতে পারে।

সৈন্যেরা আগুন না জ্বালিয়ে দু'দিন বিশ্রাম করল। দ্বিতীয় দিন রাতে আকাশে এক রহস্যময় আলো দেখা দিল। তপ্ত অঙ্গারের মতো গাঢ় লাল আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করল না, তারাদল দেখা দিল না। প্রত্যূষ পর্যন্ত যেন গোধূলির বিস্তার চলল।* সেনাদলের সঙ্গে আগত শেখ-উল-ইসলাম** ব্যাখ্যা করে বলল যে এটা হল আল্লাহের নিশান — খরেজম শাহ মুহম্মদ যে মহান গৌরবের অধিকারী হতে চলেছেন এই জ্যোতির দ্বারা আল্লাহ তা-ই নির্দেশ করছেন।

নদী বরফমুক্ত হলে জাসুসীরা অগভীর জায়গা খুঁজে বার করল, গোটা ফৌজ অপর তীরে গিয়ে উঠল।

সামনে বিস্তৃত ধু-ধু স্তেপ — মাঝে মাঝে টিলায় আচ্ছন্ন, মৌন ও রহস্যময়ী। অলক্ষিতপ্রায় পায়ে-চলা-পথ ধরে সৈন্যদল পূবের দিকে চলতে থাকে। তারা ইতিমধ্যেই আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আরও ঘনবদ্ধ হয়।

একটি উপত্যকায় শৈলমালার মাঝখানে কালো কালো ছাউনি দেখা গেল। দেখে মনে হয় দ্রুত পলায়নের সময় সেগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে।

---

* তৎকালীন সমস্ত ঘটনাপঞ্জীতেই মেরুজ্যোতি সদৃশ এই প্রাকৃতিক ঘটনার উল্লেখ আছে।

** শেখ-উল-ইসলাম — মুসলিম মোল্লা সম্প্রদায়ের প্রধান।

কম্বল, মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পুরনো গালিচা পথে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। এখানেই পড়ে ছিল একটি লোকের মৃতদেহ, তার দু'কানের ওপর দিকে কালো কালো দুই বেণী, লোকটা পীতবর্ণের, চোখ চেরা-চেরা। তার পা পর্যন্ত ঢাকা বিবর্ণ নীল দীর্ঘ আঙরাখাটি ছিন্নভিন্ন করে কাটা। কিছু দূরে কাত হয়ে পড়ে আছে দুই চাকার এক গরুর গাড়ি।

জাসুসীরা টিলার ওপর উঠেছিল, তারা সেখানে থেকে ইঙ্গিতে পাশের দিক দেখাল। সৈন্যদল অর্ধবৃত্তাকারে বাঁক নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

অশ্বারোহীরা দুলকি চাল নিয়েই ঘোড়াগুলোকে আবার সংযত করল। তাদের সামনে বিছানো রয়েছে এক ধূসর প্রান্তর, আর তার ওপরে যেন এখানে-সেখানে কালো রঙের কাপড়-চোপড় ছড়ানো-ছিটানো। একটা জিন দেওয়া ঘোড়া সওয়ারহীন অবস্থায় মাঠে ইতস্তত ঘুরছে।

"লড়াইয়ের ময়দান!" সৈন্যেরা বলল। "আল্লাহের কৃপায় এদের জীবন শেষ হয়েছে।"

"কিন্তু কে এদের খতম করল? কে আমাদের হাত থেকে শিকার ছিনিয়ে নিয়ে গেল? এদের পশুপাল, ঘোড়া, উট গেল কোথায়?"

সেনাদল মৃতদেহ ছড়ানো মাঠের মধ্য দিয়ে চলল। দূর থেকে যা কাপড়-চোপড় বলে মনে হচ্ছিল, দেখা গেল সেগুলো আসলে তরবারির আঘাতে খণ্ডবিখণ্ড এবং তীর ও বর্শায় বিদ্ধ মৃতদেহ। বিচ্ছিন্নভাবে এবং গণ্ডায় গণ্ডায় স্তূপ হয়ে মৃতদেহ পড়ে ছিল। কোন কোন দেহ থেকে জামা ও জুতো খুলে নেওয়া।

অশ্বারোহীরা মাঠে ছড়িয়ে পড়ে, কেউ হাতায় খসে পড়া তলোয়ার, কেউ বা গোলাকার ঢাল কিংবা বর্শা।

খরেজম শাহ চিন্তামগ্নভাবে আঙুলে কালো দাড়ির গোছা পাকাতে পাকাতে মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যায়। তার পার্শ্বচরেরা অনুচ্চস্বরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে চলে।

"লড়াইটা ভয়ঙ্কর হয়েছিল। হাজার কয়েক মেরকিত ধরাশায়ী হয়েছে। কাউকে রেয়াৎ করা হয় নি, আহতদের সাবাড় করে দেওয়া হয়েছে।..."

এক অশ্বারোহী সৈনিক ছুটে এসে চেঁচিয়ে বলল:

"আমি এক জ্যান্ত মেরকিতকে পেয়েছি। লোকটা কথা বলতে পারে।"

খরেজম শাহ ঘোড়ার কদম ছুটিয়ে দিল। অনুচরবৃন্দ তার পেছন পেছন ছুটল।

মেরকিত টিলার পাদদেশে বসে ছিল। পাশে আলগোছে বসে কিপচাকরা তার ওপর প্রশ্নবাণ বর্ষণ করতে থাকে। লোকটার মাথা কপাল থেকে ঘাড় পর্যন্ত কামানো — রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

খরেজম শাহ ঘোড়া থামাল।

"লোকটা কী বলছে? কোন জাতের? কারা ওদের ওপর চড়াও হয়েছিল?"

মেরকিত কাতরাতে কাতরাতে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে থাকে:

"আমরা বড় জাতির লোক, কিন্তু সে জাতি আর নেই! তার নাম ছিল মেরকিত। আমাদের খান ছিলেন তুক্তু খান।... তিনি তাঁর ছেলে বিখ্যাত শিকারী খলতু খানকে নিয়ে পালিয়ে গেছেন: খলতু খানের চেয়ে নির্ঘাত ও দূর লক্ষ্যে আর কেউ তীর ছুঁড়তে পারত না। দুই খানই সাধারণ যোদ্ধাদের বললেন: 'লাল দাড়িওয়ালা চেঙ্গিজ খানের রোষ থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সঙ্গে পালাও; চেঙ্গিজ খান সঙ্কল্প করেছে মেরকিতদের ঝাড়ে-বংশে উৎখাত করবে।... পশ্চিমে, লবণ হ্রদের পেছনে সাগর পর্যন্ত কিপচাক স্তেপভূমি আছে, সেখানে আমাদেরও ঠাঁই হবে। সেখানে পাওয়া যাবে গরুর পালের জন্য প্রচুর ঘাস ও ঘন নলখাগড়ার বন; সেখানে আমাদের পশুপাল আবার হৃষ্টপুষ্ট হবে, সংখ্যায় বাড়বে। কিপচাকেরা আমাদের আশ্রয় দিতে আপত্তি করবে না, তাদের সঙ্গে এক পাতে খেতে দেবে, এক পাত্র থেকে পান করতে দেবে।...' খানেরা এই কথা বলেন। আমরা আর কী করতে পারি? আমাদের পেছনে মৃত্যু, সামনে মুক্তি ও আনন্দ। কিন্তু আমাদের চিহ্ন শুঁকে শুঁকে ধাওয়া করল দুই হিংস্র কুকুর। সুবুদাই ও তখুচার নোইয়ন নামে এই দুই কুকুরকে লেলিয়ে দেয় লাল দাড়িওয়ালার বড় ছেলে জুচি খান।... আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে লাগলাম।... উদ্দেশ্য ছিল আমাদের ঘোড়ার পায়ের দাগ যেন পাথুরে গোবি ও লাল বালুর মধ্যে হারিয়ে যায়। কিন্তু ঘোড়াগুলো শুকিয়ে গেল, তাদের খুর ফেটে গেল, আগের মতো কদম ফেলার ক্ষমতা আর তাদের রইল না।... ক্রোধোন্মত্ত মোঙ্গলরা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিশ হাজার মোঙ্গল ঘোড়সওয়ার যখন আমাদের আক্রমণ করে বসল তখন বাঁচার আর কোন রাস্তা ছিল না। ইরগিজ নদীতে প্লাবন দেখা দিয়েছে, তার ওপর ভাসছে বরফের চাঁই, কাদা মাটিতে ঘোড়াগুলোর পা বসে গেল।... অত বড় মেরকিত বংশ লোপ পেয়ে

গেল! কেউ মোঙ্গলদের আঘাতে খন্ডবিখন্ড হয়ে এই মাঠে শয্যা নিল, অন্যদের তারা বন্দী করে নিয়ে গেল।... নিজের হলুদ রঙের তাঁবুতে কম্বলের পাহাড়ের ওপর বসে বসে কটা চেঙ্গিজ খান হাসে! মেরকিতদের প্রাচীন গৌরব ধ্বংস হল! বেঁচে রইল কেবল মেরকিত বংশের এক বিশ্বাসঘাতিনী, তরুণী খানজাদী, সুন্দরী কুলান! চেঙ্গিজ খান ওকে তার নতুন বিবি করেছে।...”

কিপচাকেরা চেঁচাতে লাগল:

“ঐ দস্যুদের কাছে আমাদের নিয়ে চল! আমরা ওদের শায়েস্তা করব! ওরা দূরে নেই! পশুপাল আর বন্দীদের নিয়ে বেশি দূর যেতে পারে না। আমরা ওদের কাছ থেকে শিকার ছিনিয়ে নেব।...”

“আমরা শিগ্‌গিরই ওদের নাগাল ধরব!” এই বলে খরেজম শাহ মাঠময় ছড়িয়ে যারা খন্ডবিখন্ড মেরকিতদের দেহ থেকে পোশাক টেনে টেনে খুলছিল সেই অশ্বারোহী সৈনিকদের ডেকে জড় করার জন্য শিঙাবাদকদের হুকুম দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অজ্ঞাত গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষ

“মহাবীর রুস্তমকে জাল কী বলেছিলেন জান কি? — ‘শত্রুকে নগণ্য ও অক্ষম ভাবা ঠিক নয়’।”

(প্রাচীন পারসিক গীতি থেকে)

সেনাদল সারা রাত চলল। কেবল ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়ানোর জন্য পথে দু'বার কিছুক্ষণের জন্য থামে।

সকালের দিকে স্তেপ কুয়াশায় ছেয়ে গেল। দলগুলো পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। নেকড়ে ও শেয়ালের ডাকের অনুকরণে তীক্ষ্ণ করুণ আর্তনাদ তুলে জাসুসীরা একে অপরকে সাড়া দিতে লাগল।

ঠান্ডা হাওয়া এসে কুয়াশার ছিন্নভিন্ন কুন্ডলীগুলোকে দূরে করে দিল। দিগন্তের কাছে আকাশের সোনালি রেখায় টিলার সারি সারি

চুড়ো দেখা গেল। সেগুলোর নীচে মিট্‌মিট্‌ করছে অসংখ্য আগুনের শিখা, ক্রমে স্পষ্ট হতে লাগল অশ্বারোহীদের দল, উটের সারি এবং বিশাল বিশাল উঁচু উঁচু চাকার ওপর মাল বোঝাই গাড়ি।

এটা কোন এক অজানা গোষ্ঠীর শিবির। খরেজম শাহের ফৌজ যে এগিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে তা ওদের নজরে পড়েছে। কুয়াশার অপসৃয়মাণ আবরণ ফুঁড়ে তিরিশ জন অশ্বারোহীর আবির্ভাব ঘটল। তারা দশ জন দশ জন করে তিন ভাগে দাঁড়িয়ে পড়ল। সূর্যের প্রথম তির্যক্‌ রশ্মিতে তাদের নীল রঙের দীর্ঘ পোশাক, লোহার বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ঝলমল করে উঠল। অশ্বারোহীদের ঘোড়াগুলো আকারে ছোট, হৃষ্টপুষ্ট তাদের পায়ের গোছা ও গ্রীবাদেশ দীর্ঘ। সম্মুখ সারির দশ জনের দলটির সঙ্গে উঁচু তুর্কমেনীয় ঘোড়ায় চেপে চলেছে শ্বেতশ্মশ্রুধারী এক মুসলমান, তার মাথায় সাদা পাগড়ি, গায়ে হলুদ ফুলের নক্সা তোলা লাল টক্‌টকে চামড়ার পোশাক। বৃদ্ধের পাশে পাশে চলেছে এক ঘোড়সওয়ার — হাতে বর্শা, বর্শার আগায় শ্বেতবর্ণের অশ্বপুচ্ছ।

"সালাম!" বৃদ্ধ চেঁচিয়ে বলল। "আমিও একজন মুসলমান! আপনাদের প্রধান সেনানায়কের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন!''

"আমাদের ফৌজে বহু সেনানায়ক আছেন, তবে নেতৃত্ব দেন একজনই — দুনিয়ার সন্ত্রাস, ইসলামের তরবারি খরেজম শাহ আলা উদ-দিন মুহম্মদ।"

বৃদ্ধ ঘোড়া থেকে নামল। বুকের ওপর দু' হাত ভাঁজ করে ঈষৎ আনত হয়ে যেখানে নির্বাক সুসজ্জিত খানদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে জাঁকাল ঘোড়ার ওপর খরেজমের শাহ শোভা বর্ধন করছিল সেখানে এগিয়ে গেল।

"পূবদেশীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি চেঙ্গিজ খানের পুত্র, মোঙ্গল সেনাদলের অধিপতি মহামান্য নোইয়ন* জুচি খান তাঁর দোভাষী আমাকে আজ্ঞা করেছেন পশ্চিম সাম্রাজ্যের পরাক্রান্ত অধিপতি আলা উদ-দিন মুহম্মদকে সংবর্ধনা জানাতে — আল্লাহ আপনার রাজত্বকাল শতাধিক বর্ষ বৃদ্ধি করুন! তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।"

"সালাম!" শাহ বলল।

---

* নোইয়ন — সামন্ত রাজা।

"খান জ়ুচি জানতে চেয়েছেন কেন শাহের নির্ভীক ফৌজ সারা রাত এমন দ্রুত বেগে মোঙ্গল ফৌজকে অনুসরণ করে চলছে।"

বৃদ্ধ উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু শাহ্ তার কালো দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে মোঙ্গল দূতের দিকে জ্বলন্ত চোখের অনিমেষ দৃষ্টি ফেলে নীরব হয়ে রইল।

"খান জুচি একথাও বলতে হুকুম করেছেন যে তাঁর পিতা অপরাজেয় অধীশ্বর চেঙ্গিজ খান তাঁর আদেশ অমান্যকারী বিদ্রোহী মেরকিতদের শায়েস্তা করার জন্য সেনানায়ক সুবুদাই ও তখুচারকে আজ্ঞা করেছেন। তাদের উচ্ছেদ করে মোঙ্গল সেনাদল নিজেদের স্তেপে ফিরে যাবে।..."

বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে শাহের স্থির কঠিন মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলে চলল:

"কম্বলের ছাউনিতে যে সব জাতি বসবাস করে তাদের সকলের প্রভু চেঙ্গিজ খান মুসলমান সেনাদলের সঙ্গে দেখা হলে তাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে আমাদের সকলকে আজ্ঞা করেছেন। বন্ধুত্বের প্রতীক রূপে খান জুচি লুটের জিনিসের এবং দাস হিশেবে বন্দী মেরকিতদের এক অংশ মহামান্য শাহের সেনাবাহিনীকে উপঢৌকন দেওয়ার প্রস্তাব করছেন।"

এই কথা শোনা মাত্র শাহ ঘোড়ায় চাবুক মারল। বাদামী রঙের ঘোড়া লাফিয়ে উঠল, মুহম্মদ শক্ত মুঠোয় তার লাগাম কষে ধরল। শাহ্ তখন যে বিখ্যাত বাণীটি উচ্চারণ করল এবং তার দরবারের মুনশী মির্জা ইউসুফ যা তৎক্ষণাৎ 'শাহের অভিযানকালীন কীর্তি ও সঙ্ঘর্ষের বিবরণ এবং বাণী সঙ্কলনে' লিপিবদ্ধ করল তা এই:

"তোমার প্রভুকে গিয়ে বল: চেঙ্গিজ খান তোমাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছে বটে, কিন্তু আল্লাহ আমাকে অন্য আদেশ দিচ্ছেন — তোমাদের ফৌজকে আক্রমণ করতে! জঘন্য কাফের, তোদের উচ্ছেদ করে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহের অনুগ্রহলাভের যোগ্য হতে চাই!.."

হতচকিত দোভাষী খরেজম শাহের উক্তির মর্মোদ্ধার করার চেষ্টায় পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু মুহম্মদ ইতিমধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে দ্রুত সারিবদ্ধ সেনাদলের দিকে ঘোড়ার মুখ ফেরাল।

দোভাষী মোঙ্গল ঘোড়সওয়ারদের কাছে ফিরে এসে ঘোড়ার ওপর উঠে বসল, মোঙ্গলদের গোটা দলটা তাদের ফৌজের দিকে চলল। ধীর গতিতে কয়েক পদক্ষেপ চলার পর ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে পুরোদমে নিজেদের শিবিরের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

যুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠল।

বৃদ্ধ মুসলিম মোঙ্গল শিবিরে ঘোড়া ছুটিয়ে পেঁছুতে না পেঁছুতে সেখান থেকে ধীরে ধীরে খরেজম শাহের বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সেনাদল পৃথক হয়ে বেরিয়ে এলো, টিলার ঢালুতে এসে থামল।

খরেজম শাহ খানদের হুকুম দিল:

"সৈন্যদলকে ডান পাশ, বাঁ পাশ ও মধ্য ভাগ — এই তিন অংশে ভাগতে হবে। দু'পাশের কাজ হবে মোঙ্গলদের শিবির দখল করা, যাতে কেউ সেখান থেকে গলে না যেতে পারে। মধ্য ভাগ, যেখানে আমি থাকছি, হবে অতিরিক্ত শক্তি। যেখানেই ঠেকা দেওয়া ও চূড়ান্ত আঘাত হানার দরকার হবে সেখানে আমি এই সৈন্যদল চালাব। শত্রুরা আমাদের ওপর সরাসরি আক্রমণ করবে না। আর যদি করে ত আরও ভালো: পাঁকাল লোনা জলাভূমিতে তারা আটকে যাবে।''

শাহ টিলার চূড়ায় উঠল। বহু দূরে বিস্তৃত স্তেপ — আসন্ন যুদ্ধের প্রান্তর। শাহ ঘোড়া থেকে নেমে গালিচার ওপর আসন নিল। দস্তরখানজী রেশমের কারুকাজ করা রুমাল বিছিয়ে দিল, বড় বড় থালায় পরটা, কিশমিশ ও শুকনো খরমুজা এনে সাজিয়ে রাখল। সে বাটিতে বাটিতে ঘোড়ার দুধ ঢেলে সামরিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে শাহের সঙ্গে অভিযানে আগত তরুণ বেগদের পরিবেশন করল।

রসদের বোঝা সমেত দ্রুতগামী উটগুলো হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। অভিযানে অবসন্ন খরেজম শাহের শক্তি উদ্ধারের জন্য দস্তরখানজী চাকর-বাকরের সঙ্গে একেবারে বাছা বাছা খাবার-দাবার এবং সোনার কলসী ও পিরিচ টেনে নামাতে লেগে গেল।

ডান পাশের নেতৃত্ব দিচ্ছিল খরেজম শাহের বিরাগভাজন পুত্র জালাল উদ-দিন। মিশকালো ঘোড়া এক লাফে তাকে বালির ঢিবির মাথায় পেঁছে

দিল। যুবক খান ছোটখাটো হাতে তার কালো চেরা চেরা চোখ সূর্য আড়াল করে যুদ্ধের প্রান্তর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

"কারা কন্‌চারকে ডাক!" এক অশ্বারোহীকে সে হাঁক দিয়ে বলল।

লাল কামিজ পরনে শক্তসমর্থ গোছের তরুণ তুর্কমেন কদম ছুটিয়ে টিলার নীচে নেমে গেল, তারপর ফিরে এলো এক লিকলিকে ঘোড়সওয়ারকে নিয়ে — তার মাথায় ভেড়ার চামড়ার টুপি, গায়ে কালো রঙের আলখাল্লা। জালাল উদ-দিনের সামনে এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে সম্মান দেখিয়ে কারা কন্‌চার মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনল। খান আসন্ন যুদ্ধের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল। কারা কন্‌চারের বাজপাখিসুলভ চেহারায় কোনরকম আবেগের লক্ষণ প্রকাশ পেল না, কেবল পেঁচার মতো খয়েরী রঙের গোল গোল চোখে খুশির ঝলক দেখা দিল।

"এই লোনা জমিটা দেখছ ত?" জালাল উদ-দিন বলল। "এর মধ্যে যেমন আমাদের বিনাশ তেমনি সাফল্যও আছে। তাতাররা সংখ্যায় এমন কিছু বেশি নয়। আমরা ওদের তিন গুণ। তবে ব্যাপারটা সংখ্যায় নয়। আমাদের যোদ্ধাদের ওপর আস্থা রাখতে পারি কি? মুমূর্ষু মেরকিতের কাছ থেকে জানা গেছে যে মোঙ্গলরা সবসমেত হাজার বিশেক। তার মানে, আমাদের পাশ আক্রমণ করতে যদি অর্ধেকও আসে তাহলে হবে মাত্র দশ হাজার। আমাদের তুর্কমেনই আছে ছয় হাজার, তায় আবার কারা-কিতাইরা পাঁচ হাজার। তবে কারা-কিতাইরা বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করেছে অভাবের বশে ও পেটের দায়ে। ওরা অভিযানে এসেছে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নয়, অন্যের জ্বালানো আগুনে নিজেদের হাত গরম করতে। আমি ওদের আগে ঠেলে দেব। তাতারদের মালবোঝাই গাড়িগুলো আগে ভাগে হাতানোর মতলবে ওরা সানন্দে যাবে। ঐ মেরকিতই আবার তাতারদের 'ক্ষ্যাপা বাঘ' বলেছে। লড়াইয়ে তাতাররা অবশ্যই কারা-কিতাইদের বেষ্টনী ভেদ করে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেই সময় সর্বশক্তি নিয়ে তাদের মুখোমুখি হতে হবে, পাশ থেকে আঘাত হেনে পাঁকাল লোনা জমিতে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে তারা আটকে পড়ে গেলে আমরা ওদের টুকরো টুকরো করে কাটব। এর পর আমরা আমার বাবাকে বাঁচাতে যাব। আজ বাদশাহকে মনের মধুর শান্তি ও আগুনে ঝলসানো হাঁসের কথা ভুলে যেতে হবে।... হেই, সওয়ারেরা, তুর্কমেন খানদের কাছে ছুটে গিয়ে বল, আজকের

যুদ্ধে তাদের নেতা হবে কারা-কুমের তুষার চিতা কারা কনচার।''

ছয় জন অশ্বারোহী বীর টিলার ওপর ছড়িয়ে থাকা তুর্কমেন সৈন্য সারিগুলোর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে গেল। কারা কনচারের নাম শোনা মাত্র সেনাদলের সকলে শিউরে উঠল, তাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। খোরাসান ও আস্ত্রাবাদের সন্ত্রাস কারা কনচারের নাম কে না শুনেছে! বাদামী রঙের ঢ্যাঙা ঘোড়ার পিঠে এই মৌন কৃষ্ণকায় সওয়ারকে কারা-কুম প্রান্তরের দুর্ধর্ষ ও অদৃশ্য বীরপুরুষ বলে কেউই সন্দেহ করতে পারল না।

কারা কনচার ঘোড়া ছুটিয়ে তুর্কমেনদের কাছে এগিয়ে এসে কয়েক জন অশ্বারোহীকে সংক্ষেপে যুদ্ধের পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিল, তারপর তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্যকে টিলার আড়ালে নিয়ে গিয়ে তাতারদের অপেক্ষায় ওত পেতে রইল।

জালাল উদ-দিনের মিশকালো ঘোড়া বায়ুবেগে কারা-কিতাইদের সামনে গিয়ে পড়ল। ছোট ছোট রোমশ ঘোড়ার পিঠে কম্বলের টুপি মাথায় এই সৈন্যদের দলটি খোঁচা খোঁচা হুলের মতো বেঁটে বর্শাগুলো বাগিয়ে ধরে বিশৃঙ্খল জনতার আকারে অপেক্ষা করছিল।

"দুর্ধর্ষ কারা-কিতাইরা!" জালাল উদ-দিন তাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, "তোমরা হলে পাহাড়ী চিতা, যুদ্ধে অসম সাহসী! তোমাদের সামনে আছে ভীরু যাযাবরদের শিবির। ওরা রাতে সিঁধ কাটা চোরের মতো আমাদের দামী শিকার ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সে শিকারে অধিকার একমাত্র আমাদের — এই স্তেপের মালিকদের। ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়, আর শিবির থেকে তোমাদের ইচ্ছে মতো সব কিছু নিয়ে নাও!"

কারা-কিতাইরা চঞ্চল হয়ে উঠল, জোর কদমে তাতারদের শিবিরের দিকে এগিয়ে গেল। তাদের মাথার ওপর ধুলোর কুণ্ডলী উঠল, আর অশ্বারোহীদের গতিবেগ যত বাড়তে লাগল তাদের বন্য হুহুঙ্কারও তত তীব্র হয়ে ক্রমে পুরোপুরি গর্জনের আকার ধারণ করল।

খরেজম শাহ মুহম্মদ পশুলোমের আঙরাখার দীর্ঘ প্রান্ত গুটিয়ে আরাম করে গালিচার ওপর বসে তার শক্ত সাদা দাঁত দিয়ে বুনো হাঁসের ঠ্যাং চিবুতে লাগল। অন্য ঠ্যাংটির ভাগ পেল শেখ-উল-ইসলাম — শাহের

একমাত্র অনুচর যে বাদশাহের সঙ্গে একাসনে বসার সম্মানের অধিকারী। এমনকি শাহের প্রিয়পাত্র, তার সমস্ত অভিযানে অংশগ্রহণকারী যে তিমুর মালিক তার "অসির হাতল ও নিশ্চিন্ততার ঢাল" সেও বুকের ওপর দু' হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্বেতশ্মশ্রুধারী ইমামের সঙ্গে মুহম্মদের জ্ঞানগর্ভ আলোপ-আলোচনা শুনে যাচ্ছিল: সর্বক্ষণ যাতে আল্লাহের কাছে শাহের বিজয়ের জন্য মোনাজাত করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ইমাম অভিযানে শাহের সঙ্গী হওয়ার বাঞ্ছা প্রকাশ করল।

খরেজম শাহ থেকে থেকে ঠাট্টা-তামাশা করতে করতে স্তেপে একে-একে সমবেত শত্রু সৈন্যদলগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল। সকালের শান্ত বাতাসে স্পষ্ট চোখে পড়ছিল পৃথক পৃথক অংশের মাঝখান দিয়ে অশ্বারোহীদের উত্তেজনাপূর্ণ ছুটোছুটি, তাদের ধাতব গোলাকার ঢালের চমক।

মোঙ্গল বীরপুরুষদের একটি দল সামনের দিকে লাফিয়ে পড়ল। কিপচাক অশ্বারোহীদের সঙ্গে তাদের সঙ্ঘর্ষ বেধে গেল।... ঝক্‌ঝকে তরবারিগুলো উঁচুতে উড়ে উড়ে পড়তে লাগল! এক সৈনিক পড়ে গেল, জিনটা ঘোড়ার পেটের নীচে ঝুলতে লাগল, আর ঘোড়াটা পেছনের দুই পায়ে ঝটকা মেরে আনাড়ির মতো লাফ মেরে স্তেপের ওপর দিয়ে ছুট মারল।

এর পর শুরু হল আক্রমণ। কিপচাকদের কয়েক সারি অশ্বারোহী হলুদ প্রান্তর ধরে ছুটল।

শাহ হাঁস নামিয়ে রেখে চেঁচিয়ে উঠল:

"বেগেরা, নেমে পড়! আল্লাহ ভরসা!"

শাহের হুকুমে মোঙ্গলদের ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্যে কিপচাক সৈন্যের সারিগুলো বাঁকানো হাতের মতো সম্প্রসারিত হতে লাগল। মোঙ্গলরা কিন্তু পূর্ণ বেষ্টনী থেকে পালানোর কোন চেষ্টা করল না।

শিবির থেকে মোঙ্গলদের প্রথম দলটি আলাদা হয়ে বেরিয়ে এলো। প্রতি সারিতে এক শ' জন করে এক হাজার ঘনবদ্ধ অশ্বারোহীর দল লোহার ও চামড়ার বর্মে ঢাকা ছোট ছোট রোমশ ঘোড়ায় চেপে হুড়মুড় করে ছুটল। তারা অনিবার্যভাবে স্তেপে বহুদূর জুড়ে বিস্তৃত কিপচাকদের এলোমেলো, বিচলিত সারি ভেদ করতে চলেছে।

"হু-হু-হু-হু!" মোঙ্গলদের পাশবিক গর্জন শোনা গেল।

শিবির থেকে দ্বিতীয় হাজারের দলটি ছুটে এসে স্তেপের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সূর্যের আলোয় ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ, ধাতব ঢাল ও বাঁকা তরবারীর ঔজ্জ্বল্য ঠিকরে পড়ল।

টিলার চূড়া থেকে শাহ দেখল কীভাবে মোঙ্গলদের গোটা বাহিনীর দঙ্গল থেকে একের পর এক দল বেরিয়ে এসে কর্কশ হুহুংকার তুলে দুর্নিবার গতিতে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

কিপচাকদের মধ্যে ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। তাদের ফৌজের প্রান্ত ভাগের দলটি মোঙ্গলদের শকটশ্রেণী লুট করার মতলবে শিবিরের দিকে ঘুরল। ওদিকে শিবির থেকে আরও একটি এক হাজারী দল বেরিয়ে এসে সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে কিপচাকদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। দুই দলের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বেধে গেল।

রণাঙ্গন ধুলোর মেঘে আচ্ছন্ন হল। সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন কিপচাক অশ্বারোহীরা ছিটকে বেরিয়ে আসতে লাগল, তারা ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে লেপ্‌টে স্তেপের দিকে ধেয়ে যায়।

"এমন আর কখনও দেখি নি!" শাহ দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল। সে দূরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে উদ্বিগ্নভাবে আঙুলে দাড়ির প্রান্ত জড়াতে লাগল।

মোঙ্গলদের চারটি দল একে-একে রীতিমতো সারিবদ্ধ হয়ে যে টিলার ওপর মুহম্মদ ও তার অনুচরবর্গ ছিল সেই দিকে, শাহের বাহিনীর খোলা মধ্য ভাগ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল।

মোঙ্গলদের কান ফাটানো হুহুংকার নিকট থেকে নিকটতর লাগল।

এই বন্যাস্রোতে কে রোধ করতে পারে? মুহম্মদ চার দিকে চোখ বুলাল। তিমুর মালিক আর তার পাশে নেই। ঘোড়ায় লাফ দিয়ে উঠে সে যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে ছুটে গেছে।

সেরা, অভিজ্ঞ কিপচাক সৈন্যদের দলগুলো মোঙ্গলদের অগ্রবর্তী বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পথ কেটে বেরিয়ে আসতে মোঙ্গলদের মাত্র কয়েক মুহূর্ত লাগল, তারপর আরও এগিয়ে গেল মুহম্মদ যে টিলায় দাঁড়িয়ে ছিল তারই কাছাকাছি।

"ঘোড়া! আমার ঘোড়া!" মুহম্মদ গর্জন করে উঠল। কারও শোনার অপেক্ষা না করেই সে চট্‌পট্‌ টিলার পাদদেশের দিকে দৌড়ে গেল,

সেখানে দু'জন সহিস রক্তিম পুচ্ছধারী বাদামী রঙের ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।

শাহ লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে সবেগে স্তেপের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার পার্শ্বচরেরা বর্ম, ঘোড়ার সাজসজ্জা ও ঘুঙুরের ঝন্ ঝন্ আওয়াজ তুলে পেছন পেছন ছুটল।

টিলার ওপর পড়ে রইল লণ্ডভণ্ড গালিচা, মিঠাইভর্তি তামার ও রুপোর থালাবাটি। বাতাসে বিচিত্রবর্ণের রেশমী দস্তরখানের প্রান্তদেশ আন্দোলিত হয়। শাহের পার্শ্বচরদের মধ্যে কেবল একজনই পালানোর অবকাশ পেল না। সে হল শ্বেতশ্মশ্রুধারী শেখ-উল-ইসলাম। গোটা অনুচরবৃন্দ যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে শাহকে অনুসরণ করে তখন সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। টিলার ওপর উঠে ইমাম গালিচা সমান করে নিয়ে নতজানু হয়ে বসে। তুষারশুভ্র উষ্ণীষের মসলিনের ভাঁজ হাতড়ে সে ডিম্বাকৃতি সোনালি ফলক বার করল।

মোঙ্গলরা টিলার দিকে এগোতে থাকলে তিন জন সেনাপতি ও প্রবীণ দোভাষী তার চূড়ায় উঠে গেল। সেনাপতিদের একজন যুবক, কঠোর তার মুখভঙ্গি, চোখ দু'টি কালো, কালো দাড়িগাছা সরু গোছের, তার প্রান্তভাগ বেণী পাকিয়ে বাঁ কানের ওপর ঝোলানো। দ্বিতীয় জন বৃদ্ধ, ভারী ও মোটাসোটা এক মোঙ্গল, তার ডান হাতটি বাঁকা। তার মুখের ওপর কোণাকুণি গাঢ় লাল ক্ষতচিহ্ন, যার ফলে এক চোখ কোঁচকানো, আর অন্যটি বিস্ফারিত হয়ে সন্ধানী দৃষ্টিতে চার দিকের সমস্ত কিছু লক্ষ্য করছে। তৃতীয় জন ছিল দীর্ঘকায়, লিক্ লিকে, তার দেহ আগাগোড়া ইস্পাতের বর্মে ঢাকা। এরা হল চেঙ্গিজ খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র জুচি খান এবং চীনে ইতিমধ্যেই খ্যাতি প্রাপ্ত দুই সেনানায়ক — কানা সুবুদাই বাহাদুর ও লিক্ লিকে তখুচার নোইয়ন। ইমাম বারবার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে এক মনে উপাসনা করে যেতে লাগল। "লোকটা পুজারী গোছের কেউ হবে,'' দোভাষী বলল। ইমাম উঠে দাঁড়িয়ে বুকের ওপর দু' হাত ভাঁজ করল, পিঠ নুইয়ে এক-পা দু-পা করে মোঙ্গলদের মধ্যে একজনের কাছে এগিয়ে এলো।

"গত তিন বছর হল আমি দুনিয়ার মালিক চেঙ্গিজ খানের বিশ্বস্ত সেবক," শান্তস্বরে এই কথা বলে সে মোঙ্গলের সামনে সোনার ফলকটি বাড়িয়ে ধরল। "প্রত্যেক মাসে আমি কারাভানের সঙ্গে চীন অভিমুখী

বড় সড়কে প্রথম মোঙ্গল চৌকির কর্তাকে চিঠি দিয়ে খবর জানিয়েছি। এখন আমার প্রার্থনা আমাকে মোঙ্গল ফৌজের কাজে বহাল করুন। আমি খরেজমে ফিরে যেতে চাই না।"

দোভাষী ইমামের কথা অনুবাদ করে শোনাল। জুচি খান অবজ্ঞাভরে সোনার ফলকটা নিল।...

"সোনার বাজপাখি আঁকা ছোট্ট মোহর।..." স্তেপের ওপর সমস্ত দিক থেকে অশ্বারোহীদের দাপাদাপি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে করতে সে মন্তব্য করল। সোনার ফলকটি শেখ-উল-ইসলামকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল:

"না! যতদিন তুমি তোমার হুজুরের নেকনজরে আছ, ততদিন তোমাকে আমাদের দরকার। তুমি তোমার ওপর আস্থাভাজন শাহের কাছে ফিরে যাও, আমাদের আবার বিশ্বস্ত চিঠিপত্র পাঠাতে থাক।"

মোঙ্গলরাও তৎক্ষণাৎ ইমামের কথা ভুলে গেল। সংঘর্ষ টিলার আরও কাছাকাছি চলে এলো। জালালে উদ-দিনের তুর্কমেনরা মোঙ্গলদের বাঁ দিকের রক্ষণভাগে ভেঙে ফেলল, ফৌজের এক অংশ কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল, বাকিদের কোণঠাসা করে জলাভূমির মধ্যে ঠেলে দিল।

মোঙ্গলদের তিন সেনাপতিই জোর কদমে টিলা থেকে নেমে পড়ল।

সন্ধে পর্যন্ত যুদ্ধ চলল। তুর্কমেন ও কারা-কিতাইরা বাঁ পাশে সরে এসে মোঙ্গলদের আক্রমণ করল। বিচ্ছিন্ন দলে দলে লড়াই চলল। মোঙ্গলরা কখনও ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে, এক পাশে সরে গিয়ে পালাতে থাকে, কখনও বা হঠাৎ ঘোড়াগুলোর মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে অনুসরণকারী তুর্কমেনদের ওপর মরিয়া আক্রমণ করে, তারপর আবার পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। গোধূলির অন্ধকার ঘনিয়ে আসা মাত্র মোঙ্গলরা তাদের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করল।

খরেজম শাহ টিলায় ফিরে এসে উদ্বেগের মধ্যে রাত কাটাল। কিপচাক সৈন্যরা ঘোড়াগুলোকে ফাঁস দড়িতে বেঁধে তাদের পাশে মাঠের চার দিকে শুয়ে পড়ল।

দূরে মোঙ্গলদের জ্বালানো আগুনের শিখা প্রতিফলিত হয়ে আকাশ রক্তিম ঝলকে শিহরিত হল। আগুন সারারাত দপ্‌দপিয়ে জ্বলল। "মোঙ্গলরা ভোরবেলাকার যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে," কিপচাকরা বলল।

স্তেপের সমস্ত প্রান্ত থেকে আর্তনাদ ও সাহায্যের জন্য চিৎকার শোনা গেল, — কিপচাক ফৌজের অর্ধেক এই যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহত হয়ে পড়ে আছে।

জালাল উদ-দিন খরেজম শাহকে বোঝাতে গেল:

"মোঙ্গলরা যখন আমাদের ফৌজের সঙ্গে একেবারেই এঁটে উঠতে পারে নি এই সময় পিছু হটলে আমাদের খ্যাতি নষ্ট হতে পারে। ওরা এখন শিবিরে শক্তি বৃদ্ধি করছে।... তার মানে, এখনই, এই রাতেই চুপিচুপি গিয়ে হঠাৎ আক্রমণে ওদের খতম করা দরকার।"

"আমি আগামীকাল যুদ্ধ চালাব," বহুমূল্য পশুলোমের আঙরাখা গায়ে জড়াতে জড়াতে মুহম্মদ বলল।

সূর্যের তির্যক রশ্মিমালা যখন স্তেপের ওপর ছড়িয়ে পড়ল এবং টিলা থেকে দীর্ঘ ছায়া প্রসারিত হল তখন খরেজম শাহের বাহিনী আবার তিন অংশে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে মোঙ্গলদের দিকে এগিয়ে চলল।

কিন্তু ধূমায়িত আগুনের পেছনে, তাদের শিবির ফাঁকা: তাতে একটি মোঙ্গল সৈনিকেরও দেখা মিলল না। কেবল গড়াগড়ি যাচ্ছিল নৃশংস আঘাতে খণ্ডবিখণ্ড মেরকিতদের মৃতদেহ আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল কয়েকটি খোঁড়া উট।

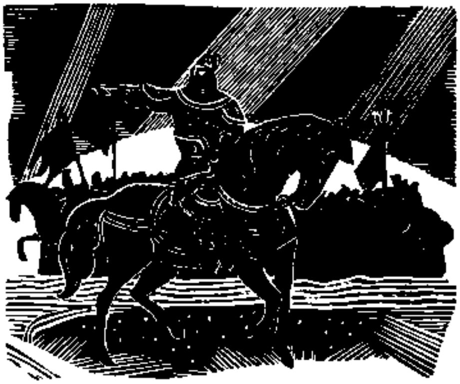
মোঙ্গলদের পশ্চাদনুসরণের জন্য তুর্কমেনদের যে দলটিকে পাঠানো হয়েছিল তা সন্ধে নাগাদ ফিরে এলো।

"মোঙ্গলরা এত দ্রুত পূব দিকে পালাল যে বহু দূরে উড়ন্ত ধুলোর মেঘ ছাড়া আর কিছুই আমরা ঠাহর করতে পারলাম না।"

"ওরা খাসা যোদ্ধা, ওদের মতো আর দেখি নি!" এই বলে খরেজম শাহ তার বাহিনীকে ঘোড়ার মুখ ফেরানোর হুকুম দিল।

"এটা ছিল জাসুসীদের আগ বাড়ানো দল," জালাল উদ-দিন শাহকে বলল। "ওরা বিপুল ফৌজ নিয়ে আসবে। এখন ওদের পিছু নেওয়া দরকার, সন্ধান নিয়ে জানা দরকার ওরা কিসের জন্য তৈরি হচ্ছে, আমাদের নিজেদেরও তাড়াতাড়ি যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে হয়।..."

"আনাড়ি ছেলেমানুষের কথা," মুহম্মদ উত্তর দিল। "মোঙ্গলরা আর কখনও আমাকে আক্রমণ করার কথা ভাববে না!.."



চতুর্থ অধ্যায়

সীমান্তে শত্রু

প্রথম পরিচ্ছেদ

মোঙ্গল বাহিনীর আক্রমণ প্রস্তুতি

এই নরপতিটির বিশেষত্ব হল তাঁর চরম
নৃশংসতা, তীক্ষ্ন বুদ্ধি ও বিজয় অভিযান।

(পারসিক রূপকথা থেকে)

কালো ইরতিশের উৎসভাগে, সবুজ স্তেপের মাঝখানে একমাত্র টিলার পাদদেশে হলুদ রেশমী কাপড়ের তাঁবু। এটি চেঙ্গিজ খান ছিনিয়ে আনে চীন সম্রাটের কাছ থেকে। তাঁবুর পেছন দিকে সাদা কম্বলের ছাউনি দেওয়া দুটি বড় বড় মোঙ্গলীয় ছাউনি: একটিতে আছে শিশুপুত্র কুলকানসহ চেঙ্গিজ খানের কনিষ্ঠা পত্নী — মোঙ্গলদের হাতে নিহত মেরকিত খানের কন্যা কুলান। অন্যটিতে সাত জন চাকরানি — চীনা ক্রীতদাসী।

তাঁবুর সামনে, আঙ্গিনায় পাথর জড় করে তৈরি বেদিগুলোর ওপর অগ্নিকুন্ড জ্বলছিল। মোঙ্গল খান-ই-খানানের উদ্দেশে যারা সম্মান দেখাতে

আসে তাদের সকলকেই এই সব আগুনের সারির মাঝখান দিয়ে যেতে হয়: শামানরা বলেছে, "আগুন দুষ্টচিন্তা নাশ করে, অপদেবতাদের বাহিত যে অমঙ্গল ও অসুখ অদৃশ্যভাবে দুর্বৃত্তের চার দিকে ঘোরে তা অপসারণ করে।"

প্রাচীন শামান সর্দার বেকি ও চার জন অল্পবয়স্ক শামানের মাথায় ছুঁচাল পশমী টুপি, পরিধানে শ্বেতবর্ণের প্রশস্ত বালাপোশ; তারা বড় বড় খঞ্জনীর ওপর ঘা মেরে, ঝুমঝুমি বাজিয়ে বেদিগুলো প্রদক্ষিণ করছিল। হুহুঙ্কারের মাঝে মাঝে তারা মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ধুনো, ডালপালা এবং শুকনো সুগন্ধী ফুল আগুনে ছুঁড়ে দিতে থাকে।

তাঁবুর এক পাশে সোনার খুঁটিতে বাঁধা ছিল সেতের নামে সাদা রঙের এক তেজী ঘোড়া। তার চোখ জোড়ায় আগুন ঝরছে, গায়ের কালো চামড়ার ওপর রুপোলি সাদা পশম। এর পিঠে কখনও জিন চাপানো হয় না, কেউ এর পিঠে চাপে না। শামানদের কথায়, চেঙ্গিজ খানের অভিয়ানের সময় অদৃশ্য, পরাক্রান্ত রণদেবতা, মোঙ্গল বাহিনীর রক্ষাকর্তা সুলদে এই তুষারশুভ্র অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত থেকে বাহিনীকে বিজয়ী করেন।

তাঁবুর অপর পাশে বাঁধা ছিল চেঙ্গিজ খানের প্রিয় লড়াইয়ের ঘোড়া নাইমান। এ ঘোড়াটার বুকের ছাতি চওড়া। এর পিঠে জিন সব সময় লাগানোই থাকত। স্তেপের বন্য ঘোড়ার বংশধর ঈষৎ ধূসরবর্ণের নাইমানের পায়ের গোছা ও পুচ্ছদেশের রঙ কালো, তার পিঠ বরাবর কালো রঙের রেখা।

সেতেরের পাশে গাঁথা ছিল এক বাঁশের দণ্ড — তার মাথায় গুটিয়ে রাখা হয়েছে চেঙ্গিজ খানের শ্বেতবর্ণের পতাকা।

টিলার চার ধারে প্রহরায় রয়েছে বর্ম ও লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত দেহরক্ষী 'তুরগাউদ' বাহিনী; তাদের লক্ষ্য ছিল যাতে কোন জনপ্রাণী মহিমান্বিত অধিপতির তাঁবুর ধারে কাছে না আসতে পারে। যারা ব্যাঘ্রমুণ্ড লাঞ্ছিত বিশেষ স্বর্ণফলকের অধিকারী কেবল তারাই এই প্রহরীদের চৌকি পার হয়ে টিলার ওপরে হলুদ রেশমী তাঁবুর দিকে যেতে পারে।

অনতিদূরে, স্তেপে বিশাল বৃত্তাকারে ছড়িয়ে ছিল তাতারদের কালো কালো তাঁবু ও তানগুতদের বাদামী রঙের পশমী তাঁবু। এটা হল

চেঙ্গিজ খানের ব্যক্তিগত 'কুরিয়েন'*, এক হাজার বাছাই দেহরক্ষীর — শ্বেত অশ্বের আরোহী সৈনিকদের শিবির। এই ব্যূহভাগে থাকত একমাত্র অতি বিশিষ্ট খানজাদারা; মোঙ্গল অধিপতি তাদের মধ্য থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে সাহসী ও অনুগতদের এক একটি দল পরিচালনার ভার দিত।

আরও কিছু দূরে অন্যান্য ব্যূহের সারি প্রান্তর ধরে ঘন বনে ঢাকা পাহাড়-পর্বতের দিকে চলে গেছে। এই সব সারির মাঝখানে স্তেপে উট ও নানা রকমের অশ্বদল বিচরণ করছিল। বিভিন্ন জাতের ঘোড়ার দল যাতে মিশে না যায় কিংবা মাদী ও বাচ্চা ঘোড়ার পালের কাছাকাছি না এসে পড়ে সেই উদ্দেশ্যে সহিসরা ফাঁসদড়ি দোলাতে দোলাতে উৎকট হাঁকডাক তুলে এদিক-ওদিক ঘোড়া ছুটিয়ে চলছিল।

মুসলিম ভূমির দিকে যাত্রার আগে মোঙ্গল অধিপতি বুখারায় খরেজম শাহ মুহম্মদের কাছে বহুমূল্য উপঢৌকন সমেত একদল দূত পাঠাল। সে এই দলের নেতা নির্বাচন করল গুরগঞ্জের ধনী বণিক, তার অনুগত জনৈক মুসলমান মাহ্মুদ ইয়ালভাচ্‌কে — যে অতীতে মধ্য এশিয়া থেকে চীনে কারাভান পাঠানোর ব্যবসা করত। পশ্চিমের দেশগুলোতে কী হচ্ছে, সেখানে ফৌজ কীরকম এবং খরেজম শাহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কিনা — এই সব জানার ভার তার ওপর দেওয়া হল। সেই সঙ্গে চেঙ্গিজ খান সেখানে বহু গুপ্তচরও পাঠাল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচ্য নৃপতির দূত

তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের ভাঁজে ভাঁজে
তখনও দূর দেশের ফুলের সৌরভ রয়ে গেছে।

(পারসিক রূপকথা থেকে)

পরাভূত সমরখন্দ খরেজমের শেষ শাহের সাময়িক রাজধানী হল। স্বাধীনতাপ্রেমী সমরখন্দবাসীদের বিরুদ্ধে বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার

---

* কুরিয়েন — মোঙ্গলীয় ভাষার শব্দ, এর অর্থ হল যাযাবর প্রধানের তাঁবুর চতুর্দিক ঘিরে তাঁবুর ব্যূহ।

জন্য মুহম্মদ সেখানে এক উঁচু মসজিদ তৈরি করল এবং বিশাল প্রাসাদের নির্মাণকর্ম শুরু করে দিল। সে আগের মতোই নিজেকে দিগ্বিজয়ী বীর বলে ভাবতে থাকে, ভাবে অনুগত কিপচাক ফৌজ নিয়ে জুলকার্নাইন ইস্কান্দারের মতো আরও এগিয়ে যাওয়া উচিত দুনিয়ার শেষ সীমানা পর্যন্ত, খরেজম শাহের আধিপত্যের সীমানা বিস্তার করা 'শেষ সাগর' অবধি* — যার ওপারে শুরু হয়েছে আঁধার। তার প্রধান ও বিপজ্জনক শত্রু বলতে সে বুঝত খলিফা নাসিরকে — সে মুহম্মদকে তামাম মুসলিম দুনিয়ার নেতার আসন ছেড়ে দিতে রাজি নয়। প্রথমে নাসিরকে পরাস্ত করে বাগদাদের পবিত্র মাটিতে, তার জামা মসজিদের সামনে বর্শা গেঁথে বসাতে হবে, তারপর ধনসম্পদে বিখ্যাত দূর চীনদেশ জয় করার উদ্দেশ্যে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে পূব দিকে এগোতে হবে।

মুহম্মদ বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করল। সবুজ পতাকা উড়িয়ে সে ইরানের মধ্য দিয়ে আরব খলিফাদের রাজধানী বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করল।

কিন্তু অচিরেই শাহের সেনাদলের অগ্রণী অংশটি ইরানের পর্বতমালায় তুষার ঝড়ের মধ্যে পড়ে গরম জামা-কাপড়ের অভাবে ধ্বংস হল; দুর্বৃত্ত কুর্দদের হাতে পড়ে দুর্বল সেনাবাহিনীর আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। দুর্ঘটনা মুহম্মদকে নিবৃত্ত করল এবং খলিফার সঙ্গে যুদ্ধের আবশ্যকতা সম্পর্কে সে সন্দিহান হয়ে পড়ল। "আল্লাহ হয়ত ক্রুদ্ধ," এই ভেবে সে বুখারায় ফিরে এসে আপাতত তার 'ভ্রমণযষ্টি নামিয়ে রাখল'।

এখানে শশকবর্ষের (১২১৯) শরৎকালে প্রাচ্যের অধিবাসী মোঙ্গল, তাতার, চৈনিক ও অন্যান্য জাতির খান-ই-খানান চেঙ্গিজ খানের কাছ থেকে বিশাল দূতবাহিনী এসে হাজির হল। খরেজম শাহকে আবার তাতারদের নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়তে হল।

স্তেপের বিচিত্রবর্ণের ঘোড়ায় চেপে শাহের প্রাসাদের ফটকের দিকে অগ্রসর হল চেঙ্গিজ খানের দূতবৃন্দ — পরম ধনবান সেই সব মুসলিম বণিকদের মধ্যে তিন জন, যারা প্রতিবছর খরেজম থেকে এশিয়ার বিভিন্ন

---

* তখনকার দিনে পৃথিবীকে অনন্ত সাগরমালা বেষ্টিত একটি দ্বীপ বলে মনে করা হত।

প্রান্তে পণ্যদ্রব্য বোঝাই উটের সারি পাঠাত। গুরগঞ্জ, বুখারা ও ওত্রার* নামে বড় বড় তিনটি শহরের এই বণিকেরা বহুকাল থেকেই চেঙ্গিজ খানের কাজে বহাল আছে। এ ধরনের ধনী বণিকেরা সচরাচর বণিকসঙ্ঘ গঠন করত এবং বাণিজ্যে ভাগ্য পরীক্ষার অভিলাষী আমানতকারীদের কাছ থেকে অর্থ নিত। বিপুল পরিমাণ অর্থের বাণিজ্যিক লেনদেনের ওপর প্রাপ্য মেটানোর জন্য তাদের হুকুম যেমন অতি দূরবর্তী প্রাচ্যে, তেমনি প্রত্যন্ত পশ্চিমে — সর্বত্রই তামিল করা হত, আর তা থেকে মূলশোধ হত শাসকদের কোষাগারে খাজনা জমা পড়ার চেয়ে তাড়াতাড়ি।

একশ'টি উটের পিঠে এবং দীর্ঘ পশমে আচ্ছাদিত এক জোড়া চমরী গাইয়ে টানা উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত শকটে করে খরেজম শাহের কাছে উপঢৌকন বয়ে আনা হয়েছে। দূতদের আশ্রয়স্থল হিশেবে নির্দিষ্ট পল্লী প্রাসাদ থেকে শুরু করে শাহের প্রাসাদের তোরণ পর্যন্ত রাস্তা লোকে লোকারণ্য। বণিকদের হুকুম-বরদারদের পরনে একই রকম পরিপাটি চীনাংশুক জোব্বা — তারা উটের পিঠ থেকে বোঝা নামায়, বাঁধন খুলে অসাধারণ, অমূল্য উপহারসামগ্রী প্রাসাদের দরবার কক্ষে নিয়ে আসে।

উপহার সামগ্রীর মধ্যে ছিল অদৃষ্টপূর্ব বর্ণের নানারকম মূল্যবান ধাতুপিণ্ড, গণ্ডারের শিঙ, বস্তাভর্তি কস্তুরী, লাল ও গোলাপী প্রবাল, মরকত ও বহুমূল্য পাথর থেকে কাটা পাত্র, সাদা উটের পশম থেকে বোনা 'তাগু' নামে মহার্ঘ বস্ত্রখণ্ড — যা কেবল খানদের হাতেই তুলে দেওয়া যায়; এ ছাড়াও ছিল সোনার কাজ করা রেশমী বস্ত্র, মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ মসলিন। সব শেষে হুকুম-বরদাররা বয়ে আনল উটের গ্রীবা পরিমাণ বিশাল আয়তনের এক স্বর্ণখণ্ড — এটি সংগৃহীত হয়েছে চীনের পর্বতমালা থেকে। চমরী গাইয়ের টানা শকটে এটিকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

---

* ওত্রার শহর — মোঙ্গল অভিযানের আগে পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার বৃহত্তম নগরগুলোর একটি ছিল। ১২১৯ সনে চেঙ্গিজ খানের হাতে ওতরার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, বলতে গেলে অধিবাসীদের একজনও রেহাই পায় নি। পরবর্তীকালে শহর নতুন করে তৈরি হয়, মধ্য এশিয়ার ইতিহাসেও তার নাম চোখে পড়ে, তবে আগের মতো জনবহুলতা ও সমৃদ্ধি অর্জন আর তার ভাগ্যে হয়ে ওঠে নি। বর্তমানে এখানে যে ইতস্তত বহু উন্নত ভূমি ও টিলা দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোর নীচে ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ শহরের ধ্বংসস্তূপ চাপা পড়ে গেছে।

কারাখানিদ বংশের শেষ সুলতান ওসমানের উঁচু প্রাচীন সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে খরেজম শাহ দূতদের অভ্যর্থনা জানাল। পারিষদ দলের মতো শাহের নিজের অঙ্গেও শোভা পাচ্ছিল কিংখাবের বসন; চিন্তামগ্ন ও নিস্পৃহ শাহের দু' চোখ অর্ধনিমীলিত। তার দৃষ্টি সমবেত লোকজনের মাথা ছাড়িয়ে অনেক দূরে ইতস্তত ঘুরতে থাকে। তখতের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে তার খাস উজির, চার দিকে অন্যান্য উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীর ভিড়।

আভূমি নত হয়ে দূত তিন জন নতজানু হল, তাদের আগমনের হেতু জানালে। প্রধান দূত, দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ মাহ্মুদ ইয়ালভাচ্ শুরু করল:

"মোঙ্গলদের সার্বভৌম অধিপতি, খান-ই-খানান চেঙ্গিজ খান মৈত্রী, শান্তি ও সুপ্রতিবেশীসুলভ মনোভাবের গ্রন্থিবন্ধনের উদ্দেশ্যে বিশেষ দূত করে আমাদের পাঠিয়েছেন। মোঙ্গল খান-ই-খানান খরেজম শাহকে উপঢৌকন ও তাঁর অভিনন্দন প্রেরণ করছেন এবং তাঁর এই বাণী জ্ঞাপনের ভার আমাদের উপর দিয়েছেন..." বলে মাহ্মুদ ইয়ালভাচ্ অপর দূতের হাতে তুলট কাগজের পাকানো একটি লিপি তুলে দিল — লিপিটির সঙ্গে সাদা ফিতে দিয়ে নীলরঙা মোমের মোহর আঁটা ছিল।

দ্বিতীয় দূত, আলি খোজা আল-বুখারি পড়ল:

"হে মাননীয়, আপনার উচ্চ মর্যাদা কিংবা আপনার পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তন সম্পর্কে যে আমি অবগত নহি এমত নহে। মহামান্য শাহ যে দুনিয়ার অধিকাংশ রাজ্যে সম্মানের অধিকারী সে বিষয়ে আমি ওয়াকিবহাল। এই কারণে, হে খরেজম শাহ, আপনার সহিত মৈত্রী বন্ধন সুদৃঢ় করাকে আমি আমার কর্তব্য জ্ঞান করি, কেন না আপনি আমার নিকট স্বীয় সন্তানবর্গের মধ্যে প্রিয়তম সন্তানতুল্য* প্রিয়পাত্র..."

"সন্তান? কী বললে — সন্তান?" শাহ আচম্কা সজাগ হয়ে উঠে হুংকার ছাড়ল। কোমরবন্ধনীতে গোঁজা তরবারির হাড়ের হাতলে হাত

* প্রাচ্যদেশে তৎকালে প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী এক দেশের শাসক তার অধীনস্থ কোন সামন্ত শাসককেই সন্তান সম্বোধনের অধিকারী।

রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, বক্তার মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

দূত বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে পড়ে চলল: "...আপনি ইহাও অবগত আছেন যে আমি চীনের উত্তরাঞ্চলের প্রধান নগর স্বীয় অধিকারে আনয়নপূর্বক চীনসাম্রাজ্য জয় করিয়াছি এবং আপনার সাম্রাজ্যের সংলগ্ন যে ভূখন্ড আছে তাহাও নিজ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি..."

শাহ মাথা ঝাঁকাল, হীরের আংটি লাগানো আঙ্গুলে কালো দাড়ির গোছা পাকাতে লাগল।

"...যে কাহারও তুলনায় আপনি উত্তমরূপে অবহিত যে আমার অধিকারভুক্ত ভূখন্ড আমার অপরাজেয় সেনাদলের শিবির এবং তাহা রৌপ্যখনিতে পরিপূর্ণ। আমার বিস্তৃত ভূমি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিবিধ দ্রব্য উৎপন্ন করে। এই কারণে শিকারের সন্ধানে নিজ রাজ্যসীমার বহির্ভূত অঞ্চলে গমনের আমার কোন প্রয়োজন নাই। শাহেনশাহ, নিজ নিজ ভূমিতে অপর পক্ষের বণিকদের অবাধ প্রবেশাধিকার দান আমাদের উভয় পক্ষের নিকট হিতকর বলিয়া যদি আপনি স্বীকার করেন তাহা হইলে উহা আমাদের উভয়ের পক্ষেই লাভজনক হইবে এবং আমরা উভয়ে ইহাতে পরম পরিতোষ লাভ করিব।"

দূত তিন জন নীরবে পশ্চিমী মুসলিম দেশমন্ডলের সার্বভৌম অধিপতির উদ্দেশে প্রাচ্যের যাযাবর জাতিবর্গের অধিপতির লিখিত পত্রের জবাবের প্রতীক্ষায় থাকে। খরেজম শাহ সেই একই রকম অবিচল ভঙ্গিতে উপবিষ্ট। খাস উজিরের দিকে তাকিয়ে সে আলস্যভরে সোনার বাজুবন্ধ অলঙ্কৃত হাত নাড়াল।

খাস উজির আনুষ্ঠানিকভাবে চেঙ্গিজ খানের বার্তা গ্রহণ করল। সে মুহম্মদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে মুহম্মদ আবার হাত নাড়াল — ঠিক যেন কোন বিরক্তিকর মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে। উজির তখন প্রধান দূত মাহ্মুদ ইয়ালভাচের দিকে ঝুঁকে পড়ে অনুচ্চ স্বরে বলল:

"শাহী অভ্যর্থনা শেষ হল। বাদশাহ এখন অন্যদের মেহেরবানি করবেন — জরুরী আবেদনকারীদের দর্শন দেবেন।"

দূতে তিন জন উঠে দাঁড়াল এবং উল্টো দিকে মুখ না ফিরিয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে প্রবেশ পথের দিকে পিছু হটল, তারপর পরবর্তী অভ্যর্থনাকক্ষে প্রবেশ করল। এখানে উজির তাদের নাগাল ধরে মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচের কানে কানে বলল:

"মাঝরাতে আমার জন্য অপেক্ষা করো!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নৈশ আলাপন

> নিজেকে শক্তিমান বলে জাহির করো না — আরও শক্তিমানের দেখা পাবে। নিজেকে চতুর বলে জাহির করো না — আরও চতুরের দেখা পাবে।
>
> (কির্গিজীয় প্রবাদ)

রাতে মোঙ্গল দূতদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থান — শহরের উপকণ্ঠবর্তী প্রাসাদে এক মৌনী ভৃত্য মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌কে নিতে এলো। বিশাল বিশাল পাতায় ঢাকা এক প্রাচীন গাছের নীচে জিন দেওয়া ঘোড়ার দল অপেক্ষা করছিল। চাঁদের আলোয় মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌ অশ্বারোহীদের মধ্যে খাস উজিরকে চিনতে পারল।

"তুমি আমার সঙ্গে আসবে," উজির বলল। "ঘোড়ায় উঠে বস।"

সম্পূর্ণ নিঝুম বুখারার অন্ধকারাচ্ছন্ন অলিগলি পার হয়ে এসে তারা লোহার দরজা দেওয়া পথরোধকারী এক দেয়ালের সামনে এসে থামল। সাঙ্কেতিক টোকায় দরজা নিঃশব্দে ফাঁক হল। সেখানে লোহার জালিবর্ম ও শিরস্ত্রাণ আঁটা যে বিকটদর্শন সৈন্যটি দাঁড়িয়ে ছিল চাঁদের আলোয় তাকে দেখাচ্ছিল রুপোয় ঢালাই করা মূর্তির মতো। মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌ উজিরের অনুসরণ করে যে বাগানে উপস্থিত হল সেখানকার জলাশয়গুলোতে রাজহাঁসের দল ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন, আর ঘাটের কুঞ্জভবন থেকে ভেসে আসছিল মৃদু নারীকণ্ঠ।

এক অপূর্ব কুঞ্জভবনের উঁচু চত্বরে সে উঠে পড়ল। ভারী পর্দার পেছনে কারুকার্যমণ্ডিত বস্ত্রে ঢাকা একটি ছোট ঘর দেখা গেল। রুপোর

উঁচু উঁচু পিলসুজে চড়চড় শব্দে মোটা মোটা মোমবাতি জ্বলছে। শাহ মুহম্মদ কাশ্মীরী শাল থেকে তৈরি বিচিত্রবর্ণের জোব্বা গায়ে জড়িয়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে ছিল।

"কাছে এসে বস!" অতিথির প্রীতি সম্ভাষণ শোনার পর শাহ বলল। "জরুরী ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাই। তুমি আমার প্রজাদের একজন — তুমি খরেজমের লোক, আমার শহর গুরগঞ্জে তোমার জন্ম, তাই না? তুমি ইমানদার মুসলমান, কোন পাষণ্ড কাফের নও, তাই তুমি যে মনেপ্রাণে ও কাজে সমস্ত ইমানদারের পক্ষে, ইসলামের দুশমনের কাছে যে নিজেকে বিকিয়ে দাও নি তোমার উচিত এক্ষুনি তা আমার কাছে প্রমাণ করা।''

"এ সবই সত্যি, বাদশাহ! আমার জন্ম গুরগঞ্জে," মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ মুহম্মদের পদতলে নতজানু হয়ে বসে পড়ে উত্তর দিল। "সসম্ভ্রমে ও সসঙ্কোচে আমি শাহেনশাহের কথা শুনছি, ইসলামভূমির শাসকের সেবায় আমি জীবন বিসর্জনের জন্য সানন্দে প্রস্তুত।"

"আমার সমস্ত প্রশ্নের যদি ঠিক-ঠিক জবাব দাও তাহলে আমি তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দেব। আমার প্রতিশ্রুতি যে আমি পালন করব এই হল তার জামিন,'' বলে শাহ তার সোনার বাজুবন্ধ থেকে একটি বড় মুক্তা ছিঁড়ে নিয়ে তা দূতের দিকে বাড়িয়ে দিল। "কিন্তু মনে রেখো যে তুমি যদি মিথ্যবাদী ও বেইমান বলে প্রতিপন্ন হও তাহলে আগামীকাল আর তোমাকে সূর্যের মুখ দেখতে হচ্ছে না।"

"আমাকে কী করতে হবে? আজ্ঞা করুন বাদশাহ!"

"তোমার মারফত আমি তাতারদের খান চেঙ্গিজ খান সম্পর্কে সব কিছু জানতে চাই। আমি চাই, তার কাছে থেকে তুমি আমার চক্ষুকর্ণের কাজ কর। আমি চাই, চেঙ্গিজ খান কী করছে, সে কী মতলব আঁটছে, কোথায় অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে — তাড়াতাড়ি এসব খবর জানিয়ে বিশ্বস্ত কারও হাত দিয়ে তুমি আমাকে চিঠি পাঠাও। হলফ করে বল যে তুমি এসব পালন করবে!"

''আল্লাহ সাক্ষী বাদশাহ, আমি আপনার সেবা করি এবং করব!'' এই বলে মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ দুই হাতে দাড়ি স্পর্শ করল।

"তুমি আরও একদিন এখানে থেকে চেঙ্গিজ খান সম্পর্কে যা কিছু জান — কোথা থেকে সে এসেছে, কোন কোন যুদ্ধ সে করেছে এবং কী

করে সে সমস্ত তাতারের অধিপতি হল — এসব বৃত্তান্ত আমার মুনশী মির্জা ইউসুফকে বলবে।”

“তা আমি বলব, জাহাঁপনা!”

“চেঙ্গিজ খান জোর গলায় বলছে যেন সে এখন পরাক্রান্ত চীনের অধিপতি এবং এমনকি চীনের রাজধানীও দখল করে নিয়েছে। সত্যিই কি তাই, না এসব তার বুকনি মাত্র?”

“হলফ করে বলছি, এটা সত্যিই!” মাহ্‌মুদ জবাব দিল। “এমন একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার গোপন থাকতে পারে না। এ সব যে সত্যি, শিগ্‌গিরই তার প্রমাণ পাবেন জাহাঁপনা।”

“না হয় ধরা গেল তা-ই,” শাহ বলল। “কিন্তু আমার রাজ্যের বিশাল আয়তন এবং আমার ফৌজ যে কী বিপুল পরিমাণ তা তোমার জানা আছে ত? তাহলে কোন সাহসে এই হাম্‌বড়া রাখাল কাফেরটা আমির উল-ইসলাম আমাকে পুত্র বলে সম্বোধন করল?..” শাহ তার শক্ত দুই হাতে দূতের কাঁধ চেপে ধরে তাকে নিজের কাছে টেনে আনল, তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকে বিদ্ধ করে বলল, “এখন বল তার ফৌজের শক্তি কত?”

খরেজম শাহের কথায় মাহ্‌মুদ চাপা ক্ষিপ্ততার আভাস পেল। তার ক্রোধ ও শাস্তির ভয়ে মাহ্‌মুদ বুকের ওপর দু’ হাত ভাঁজ করে সশ্রদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিল:

“আপনার অগণিত দিগ্‌বিজয়ী ফৌজের তুলনায় চেঙ্গিজ খানের ফৌজ রাতের অন্ধকারে সামান্য ধোঁয়ার রেখা বৈ নয়!...”

“বটে!” শাহ সহর্ষে চেঁচিয়ে উঠে দূতকে ঠেলে সরিয়ে দিল। “আমার ফৌজ অসংখ্য, অপরাজেয়! দুনিয়ার সকলেই একথা জানে, আর তুমি আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়েছও ভালো করে।... কাল তুমি তাতার বাদশাহের কাছে লেখা আমার জবাব পাবে। আর তোমাকে এবং তোমার মোঙ্গল বণিক বন্ধুদের আমি যেমন পণ্য-দ্রব্য বেচা-কেনার ব্যাপারে তেমনি মুসলিম রাজ্যের ওপর দিয়ে অবাধ যাতায়াতের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও অগ্রগণ্যতা দেব। এখন তুমি আমার উকিলের সঙ্গে যাও; ও তোমাকে গোল কামরায় নিয়ে যাবে, সেখানে আমার মুনশী, বুড়ো মির্জা ইউসুফ অপেক্ষা করছে।”

খরেজম শাহ প্রসন্নভাবে মাথা নাড়িয়ে কয়েক বার হাতে তালি বাজাল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দূতমুখে চেঙ্গিজ খান বৃত্তান্ত

> অসাক্ষাতে কারও নিন্দা করা ঠিক নয়, কেন না মাটি সে সংবাদ তার কানে লাগাতে পারে।
>
> (প্রাচ্যদেশীয় প্রবচন)

উকিল মোঙ্গল দূতকে তার পেছন পেছন আসতে বলল। প্রাসাদের আঁকাবাঁকা জটিল পথে সে তাকে উঁচু গম্বুজওয়ালা গোলাকার কক্ষে নিয়ে এলো। দেয়ালের ধারে লোহা বাঁধানো কালো কালো সিন্দুকের সারি। অপরিসর কুলুঙ্গিগুলোর ছোট ছোট তাকে ধুলোমাখা পুঁথির তাড়া।

"শাহের কিতাবমহল!" মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌ মনে মনে এই ভেবে কিছুটা আশ্বস্ত হল। তার আশঙ্কা ছিল স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য জেরা ও পীড়নের উদ্দেশ্যে তাকে কোন স্যাঁতসেঁতে পাতাল-ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে।

গালিচার ওপর বসে ছিল তুষারশুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত শীর্ণকায়, ন্যুব্জ এক বৃদ্ধ, তার রক্তবর্ণের দু'টি চোখ অবিরাম অশ্রু ভারাক্রান্ত। বৃদ্ধের পাশে এক তাড়া কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে বসে ছিল এক তরুণ মির্জা, তার মুখাবয়ব কিশোরীর মতো সুশ্রী ও কমনীয়।

উকিল জরুরী কাজের অজুহাত দেখিয়ে স্থান ত্যাগ করল।

দীর্ঘদেহী, বিপুলকায় দূতের মাথায় কায়দা করে পাকানো পাগড়ি, অঙ্গে লাল রেশমী জোব্বা। প্রবেশপথে চৌকাটের সামনে সবুজ চটি জোড়া ছেড়ে রেখে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতে বৃদ্ধ সাদর সম্ভাষণ উচ্চারণ করে উঠে দাঁড়াল। বৃদ্ধ অভ্যর্থনা জানালে দূত নতজানু হয়ে বসল। দু'জনেই অনুচ্চস্বরে প্রার্থনা উচ্চারণ করল, দাড়িতে হাত বুলাল এবং শারীরিক কুশল প্রশ্ন বিনিময় করল।

দূত বলল:

"তাতার অধিপতি সম্পর্কে আমি যা কিছু জানি, সে সব আপনার কাছে বলার জন্য শাহেনশাহ আমাকে হুকুম দিয়েছেন। আমি সচরাচর তাতার অধিপতির দোভাষী, তবে এখন দূতের কাজ করছি।..."

"হে মাননীয় ও দুর্লভ অতিথি, আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে আপনার কথা শুনেছি। আমাদের শাহেনশাহ আমাকেও ঐ একই হুকুম দিয়েছেন: আপনার কাছ থেকে আমাদের দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে হবে এবং যাবতীয় শোনা কথা প্রাসাদের গোপন ঘটনাপঞ্জীতে লিখে রাখতে হবে।"

মাহ্‌মুদ ইয়ালেভাচ্‌ চোখের দৃষ্টি নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। মনে মনে ভাবল, "আমি যা কিছু বলব কয়েক দিন বাদেই প্রাসাদের গালগল্পবাজদের কাছে সে সব জানাজানি হয়ে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ কিছুই যদি না বলি ত শাহ ক্রুদ্ধ হন, আবার এই নৈশ আলাপের কথা তাতারদের খান-ই-খানান অবশ্যই জানতে পারবেন — দুই বিপদ থেকে কী করে পার পাওয়া যায়? চেঙ্গিজ খানের গুপ্তচররা ইতিমধ্যে সর্বত্র প্রবেশ করেছে..."

দূত মুখে বিষণ্ণতা ও উদ্বেগের ভাব এনে বাঁ হাতে জড়ানো মুক্তোর মালা জপতে শুরু করল।

"আমি এমন অনেক জিনিসের কথা বলব যেগুলো বুদ্ধিতে গ্রহণ করা যায় না," সে বলল। "অভ্যস্ত সমস্ত কিছুর থেকে সে সব এতই দূরের। মাঝে মাঝে এই সব বিবরণের সত্যতায় আমারই বিশ্বাস হয় না।... কিন্তু আমি যদি বলি এ সবই মিথ্যে তাহলেও আপনি জানতে চাইবেন সেই মিথ্যেটা কেমন। তাই, আমি যা শুনেছি তা-ই বলব। মানুষ মাত্রেই ভুল করে। যদি কেউ জোর দিয়ে বলে যে সে ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে তাহলে তার সঙ্গে কোনরকম কথাবার্তাই চলতে পারে না!.."

মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌ থামল এবং ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে লক্ষ্য করতে লাগল তরুণ মির্জা কী দ্রুত গতিতে তার কথাগুলো লিখে যাচ্ছে। খাগের কলম স্বচ্ছন্দে কাগজের পাতার ওপর ছুটে চলছে, অপূর্ব আরবী অক্ষরমালার বুননে আঁকা সমান সমান পংক্তিতে শব্দের পর শব্দ বসছে।

"এই যুবক সব কথা লিখে নিচ্ছে কেন? তাতারদের সম্পর্কে আমি ত এখনও কিছু বলতে শুরু করি নি!"

"যুবক নয়," মুনশী মির্জা ইউসুফ উত্তর দিল। "ও হল একটি মেয়ে, বেত্ত জানকিজা।... আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে, হাতও কাঁপে। তাই আমার নাতনীটি আমাকে সাহায্য করে। ও এত সহজে আর এমন সুন্দর লেখে, ঠিক যেন সেরা আরবী খোশনবিশ; তবে বেটি আর বেশি

দিন আমাকে সাহায্য করতে পারবে কিনা সন্দেহ। এখনই সে 'কালো চোখের খুশির ঝলক' আর 'গালের তিল' নিয়ে বয়েৎ লেখে, তাই আমার আশঙ্কা যে শিগ্‌গিরই ও আমাকে ছেড়ে যাবে।... তখন আমাকে বুকের ওপর দু' হাত ভাঁজ করে 'হাজরে আমওয়াদের'* দিকে মাথা রেখে শয্যা নিতে হবে আর কি।..."

"আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না, নানা!" চোখ না তুলে লিখতে লিখতে সে বলল।

বৃদ্ধ আবার দূতের দিকে ফিরে বলল:

"আপনি যা যা বলবেন সে সবের জন্য, আমাদের যা যা জানা দরকার সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য বাদশাহ আপনাকে ভালোমতো পুরস্কার দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। আমাদের নিশ্চিন্ত মনোভাবের জন্য ইসলামভূমি হঠাৎ দুর্ধর্ষ দুশমনের হামলায় পড়লে পরিতাপের বিষয় হবে! আমাদের সকলের মতো আপনিও নিশ্চয়ই ইমানদার? আপনি সময়মতো আমাদের হুঁশিয়ার করে দিতে পারবেন কি? বড় রকম পুরস্কারের আশা করতে পারেন।..."

"আমার কিছুই দরকার নেই!" দূত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। "দুনিয়া ঘুরে ঘুরে আমি যে মেহনত করেছি তার স্বীকৃতিতে সত্যিকারের ইমানদাররা যদি আমার জন্য এই প্রার্থনা করেন যে কিয়ামতের দিনে যেন আমি জেগে উঠে আশীর্বাদধন্য পুণ্যাত্মাদের মধ্যে নিজেকে দেখতে পাই সেটাই হবে আমার পুরস্কার!"

তরুণীর মুখে ঈষৎ হাসির রেখা খেলে গেল। সে দূতের দিকে, তার হৃষ্টপুষ্ট দেহ এবং সোনার আঙটি সমেত হাতের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। দূত নীরব, প্রতিটি শব্দ সে বিবেচনা করে বলছে।

"তা-ই যেন হয়!" বৃদ্ধ মুনশী সহানুভূতির সুরে বলল।

দীর্ঘ পক্ককেশমণ্ডিত ক্ষীণকায় ক্রীতদাস নানারকম মিঠাই ভর্তি একটি থালা এনে অতিথির সামনে রাখল। মাটির কলসী থেকে সে রুপোর পাত্রে গাঢ় লাল রঙের শরাব ঢালল।

---

* 'হাজরে আমওয়াদ' — মুসলমানদের ধর্মস্থান মক্কায় রক্ষিত কালো রঙের বিশাল উল্কাপিণ্ড। শিলাটির অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাসে তীর্থযাত্রীরা তার প্রতি সম্মান দেখিয়ে থাকে।

"আমাদের প্রাসাদের পাতাল ঘরের পুরনো শরাব পরখ করে দেখুন," মুনশী বলল। "প্রথমত, যেটা জানা আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তা হল কারা এই মোঙ্গল ও তাতার জাতি? তারা কোথায় বাস করে? সংখ্যায় তারা কত? তারা কেমন যোদ্ধা? ধূর্ত ইবলিসের* মায়ায় মাটির জ্বলন্ত গর্ভ থেকে ছুঁড়ে দেওয়া ভয়ঙ্কর ইয়াজুজি ও মাজুজির মতো আচম্‌কা আমাদের সীমানায় এদের আবির্ভাব ঘটেছে।"

দূত বিশদ করে বলতে লাগল:

"মোঙ্গলরা এবং তাতাররাও স্তেপের লোক; তারা বাস করে পাশাপাশি, পুবের বহুদূর দেশগুলোতে, স্থায়ী বসবাসে তারা অভ্যস্ত নয়। তাদের বিস্তৃত জমি বলতে বোঝায় ঘোড়া, ভেড়া ও উট চরার উপযোগী প্রচুর ঘাস ও সামান্য জলের মরুভূমি, কেন না এই সব পশুপালের জন্য অনেক ঘাস ও সামান্য জল লাগে..."

মুনশী দূতকে বাধা দিয়ে বলল:

"আমাদের জানা দরকার ফৌজ হিশেবে ওরা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক কিনা?"

"ইসলামের কাছে আমি বিশ্বাসঘাতক ও ডাহা মিথ্যেবাদী হব যদি বলি যে মোঙ্গলরা ও তাতাররা প্রতিবেশীদের পক্ষে ভয়ঙ্কর ইয়াজুজি ও মাজুজির চেয়ে কম বিপজ্জনক।"

"আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন!" বৃদ্ধ মির্জা ইউসুফ চেঁচিয়ে উঠল।

"ওরা জাত যোদ্ধা, একশ' বছর হল ওরা একে অপরের সঙ্গে, ওদের এক জাত অন্য জাতের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে।... আজ হয়ত কোন তাতার খান এক হাজার ঘোড়া, বিরাট ভেড়ার পাল এবং একশ' আধা উলঙ্গ রাখালের অধিকারী — যারা সব সময় অসন্তুষ্ট, সব সময় বুভুক্ষু, কেন না তাদের প্রত্যেকের আছে বুভুক্ষু স্ত্রী, বুভুক্ষু ছেলেমেয়ে।... খান যখন দেখে যে তার রাখালরা অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে এবং তারা বন্য জন্তুর মতো গর্জন করছে তখন সে তাদের হুকুম দেয়: 'প্রতিবেশী জাতের সঙ্গে যুদ্ধে চল! আমরা অন্নপরিতৃপ্ত হয়ে ধনসম্পদ নিয়ে ফিরে আসব!' খান তার রাখালদের নিয়ে অভিযানে যাত্রা করে।... কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের পরিণতিতে সময় সময় স্বয়ং খানের গলায় বেড়ি পড়ে, তার পশুপাল

---

* ইবলিস — কোরান-এ উল্লিখিত দুষ্ট শক্তি, শয়তান।

ও রাখালদের সঙ্গে মাথা পিছু চার দিরহাম মূল্যে তাকেও বেচে দেওয়া হয় আর তাদের কেনে তৃতীয় কোন জাত অথবা বণিকেরা, দাস ব্যবসায়ীরা...”

“এ সব বিবরণের দরকার কী?” মুনশী তিরস্কারের সুরে বলল। “গোলাম কিংবা অন্য সব ছোটখাটো বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানার দরকার নেই, আমরা জানতে চাই তাতারদের খানের বাহিনী সম্পর্কে, তার অস্ত্রশস্ত্র এবং তার যোদ্ধাদের সংখ্যা ও গুণ সম্পর্কে!”

দূত ধীরেসুস্থে সুরাপাত্রে চুমুক দিল।

সে বলল, “পর্বতের কাছে যেতে হলে পথে কখনও কখনও প্রথমে নদী, সরোবর ও লবণাক্ত জলাভূমি ঘুরে যেতে হয়...”

“মাননীয় অতিথি, আগে আমাদের লবণাক্ত জলাভূমির কথা না বলে তাতারদের বাদশাহ সম্পর্কে বলুন।”

“খরেজম শাহের পাতাল ঘরে ভালো সুগন্ধী শরাব আছে দেখছি,” বিচলিত না হয়ে মাহ্মুদ ইয়ালভাচ্ বলে চলল, “জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন তিনি নির্বিঘ্নে রাজত্ব করেন!.. জঙ্গী তাতার খানদের মধ্যে তেমুচিন নামে এক খান যুদ্ধে বিশেষ সাফল্য, শত্রুর প্রতি নিষ্ঠুরতা, নিজের লোকজনের প্রতি ঔদার্য এবং আক্রমণের প্রচণ্ডতার জন্য বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়ান। এই খান তেমুচিন প্রথম জীবনে বহু দুঃখ দুর্দশা ভোগ করেন। লোকে বলে যে যৌবনে তিনি ক্রীতদাস পর্যন্ত ছিলেন এবং গলায় কাঠের বেড়ি বাঁধা অবস্থায় তাঁকে শত্রুভাবাপন্ন এক জাতের কামরশালায় দারুণ কঠিন কঠিন কাজ করতে হয়।* কিন্তু তিনি তাঁর শেকলের আঘাতে প্রহরীকে হত্যা করে পালিয়ে যান, তারপর অন্যান্য খানদের ওপর প্রতিপত্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে বহু বছর যুদ্ধবিগ্রহ করেন।... খানেরা যখন তাঁকে খান-ই-খানান বলে ঘোষণা করল এবং তেমুচিন পরম সম্ভ্রান্ত খানদের ইচ্ছা পূরণ করবেন এই আশায় তাঁকে ‘সম্মানের শুভ্র পশমী আসনে’ বসাল তখনই তাঁর বয়স পঞ্চাশ।... কিন্তু তেমুচিন সকলকে তাঁর নিজের ইচ্ছার অধীন করলেন, নতুন নাম ধারণ করলেন — ‘চেঙ্গিজ খান’ যার অর্থ হল ‘ফেরেশ্‌তা’। তিনি অবাধ্য জাতিগুলোকে পরাস্ত করে তাদের

---

* যৌবনে চেঙ্গিজ খানকে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন ভোগ করতে হয়, প্রতিবেশী গোষ্ঠীর হাতে বন্দী হয়ে তিন বছর সে কঠোর দাসত্বের মধ্যে কাটায়।

গোলামে পরিণত করলেন, আর তাদের নেতাদের কড়াইয়ে জীবন্ত সিদ্ধ করলেন।..."

"কী ভয়ানক!" মনুশী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "কিন্তু আপনি ভয়াবহ রূপকথা বলছেন, তাতারদের পরাক্রান্ত অধিপতির ফৌজ সম্পর্কে ত কিছু বলছেন না।"

দূত আরও এক পাত্র সুরা পান করল, মনুশী ইতিমধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে শুরু করেছে। "প্রাসাদের শরাব কড়া।... খরেজম শাহের যা যা দরকার দূত কি সে সমস্ত বলার অবকাশ পাবে, না ঘুমে ঢলে পড়বে?" এদিকে ক্ষীণকায় বৃদ্ধ ভৃত্যটি আবার রুপোর পাত্রে সুরা ঢেলে দিয়েছে।

"আমি ফৌজের কথাই বলছি," দূত শান্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলল। "যেদিন চেঙ্গিজ খান খান-ই-খানান বলে ঘোষিত হলেন সেদিন থেকে ইতিপূর্বে যারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ করত সেই সমস্ত তাতারে তাঁর জোটবদ্ধ অনুগত বাহিনী হয়ে দাঁড়াল। তিনি নিজে তাতারদের হাজারে হাজারে, শয়ে শয়ে, গণ্ডায় গণ্ডায় ভাগ করে দেন। যে সব বংশানুক্রমিক খান তাঁর আস্থাভাজন নয় তাদের নাকচ করে দিয়ে নিজে হাজারী, শতকী ইত্যাদি সর্দার নিয়োগ করলেন। তিনি তাঁর দূতদের মারফত চার দিকে এই নতুন আইনও ঘোষণা করেন যে কোন যাযাবর এখন থেকে অন্য কোন যাযাবরের সঙ্গে সংঘর্ষে নামতে, তার ওপর লুঠতরাজ করতে বা তাকে ঠকাতে পারবে না, এ ধরনের প্রতিটি অপরাধের জন্য শাস্তি একটিই — মৃত্যুদণ্ড!"

"তা চেঙ্গিজ খানের আইনে কি তাতার ছাড়া অন্য জাতের লোকজনের ওপর লুঠতরাজ করার ও তাদের ঠকানোর অধিকার আছে?"

"আছে বৈকি!" দূত বলল। "এমনকি তাতার ছাড়া অন্য জাতের লোকের সম্পত্তি লুঠ করা, চুরি করা কিংবা তাকে হত্যা করা ওদের কাছে রীতিমতো শৌর্য বলে গণ্য।"

"বুঝলাম," মনুশী ফিস্‌ফিস্ করে বলল। "আর সাধারণ রাখালরা? তাদের পেটের খিদে কি কমল?"

"চেঙ্গিজ খান ঘোষণা করেছেন যে তাঁর অধীন জাতগুলো নিয়ে দুনিয়ায় বেহশ্‌তের মনোনীত একমাত্র জাতি গড়ে উঠেছে এবং এখন থেকে সে জাতি পরিচিত হবে 'মোঙ্গল,' অর্থাৎ 'বিজয়ী' নামে।... দুনিয়ার

আর সব জাতিকে হতে হবে মোঙ্গলদের গোলাম। অবাধ্য জাতগ্‌লোকে চেঙ্গিজ খান অনিষ্টকর আগাছার মতো প্‌থিবীর মাটি থেকে উৎখাত করবেন, একমাত্র মোঙ্গলরাই বাঁচার অধিকারী হবে।"

ম্‌নশী অবাক হয়ে দ্‌' হাত ঝাড়া দিয়ে বলল:

"তার মানে কি এই যে ইমান্দাররা যাতে তার বশ্যতা স্বীকার করে তাতারদের খান আমাদের সীমান্তেও সেই দাবি নিয়ে হানা দিয়েছে?.. কিন্তু আমাদের বাদশাহের আছে সাহসী যোদ্ধাদের বিশাল ফৌজ; ইসলামের পবিত্র সব্‌জ পতাকার নীচে এই যোদ্ধারা সিংহের মতো লড়াই করে।... এমন নির্ভীক ম্‌সলিম ফৌজ নিয়ে খরেজম শাহ আলা উদ-দিন ম্‌হম্মদের মতো যশস্বী সেনানায়ক কোথাকার তুচ্ছ রাখালদের এক উন্মাদ খানের বশ্যতা স্বীকার করবেন — এমন কথা ভাবাই ত পাগলামী, এ যে ছেলেভুলানো র্‌পকথা! স্বয়ং পয়গম্বরের পবিত্র ছায়া আমাদের ফৌজের মাথার ওপর ছত্র ধরে তার বিজয় এনে দেয়!"

দ্‌ত তার মাংসল দ্‌ই হাত স্থ্‌ল উদরের ওপর জড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, চোখ বন্ধ করল।

"আমি ত আগেই বলেছি যে আমার ব্‌ত্তান্ত আপনার কাছে অলীক গল্পকথা ও র্‌পকথা বলে ঠেকবে!"

"না, না, মান্যবর অতিথি! বলে যান! আমি আপনার কথা শ্‌নছি, যদিও আপনি যা যা বলছেন তা খ্‌বই অসাধারণ, অবিশ্বাস্য।"

দ্‌ত সোজা হয়ে বসল। তর্‌ণী লক্ষ্য করল যে তার চোখ জোড়া ব্‌দ্ধি ও প্রফুল্লতার দীপ্তিতে ঝকঝক করছে, কিন্তু সে আবার ক্লান্ত ভঙ্গিতে চোখ বন্ধ করে অবসন্নভাবে বলে চলল:

"তাতারদের খান দেখলেন যে খানদের লোভ কমে নি, সাধারণ রাখালদের ব্‌ভুক্ষা ও অনটন তীব্র হয়ে উঠেছে, তাতার জাতি আগে নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে অনর্থক যে শক্তি ক্ষয় করত তা এখন প্‌ঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। তাই সাধারণ রাখালরা যাতে নিজেদের খানদের বির্‌দ্ধে না যায় সেই উদ্দেশ্যে চেঙ্গিজ খান এই প্‌ঞ্জীভূত শক্তিকে অন্য দিকে চালনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত খানদের পরামর্শসভা কুর্‌লতাই ডেকে তাদের বললেন: 'শিগ্‌গিরই তোমাদের এক বিরাট অভিযানে নামতে হবে। য্‌দ্ধ থেকে তোমরা ফিরবে সোনায় বোঝাই হয়ে, সামনে তাড়া করে নিয়ে ঘোড়া ও ভেড়ার পাল আর কাতারে

কাতারে হুন্দুরী গোলাম। অতি দরিদ্র রাখালও পাবে ভরপেট আহার, দেহ আচ্ছাদনের জন্য বহুমূল্য রেশমী পোশাক, প্রত্যেককে কয়েক জন করে বন্দী দেব।... আমরা অত্যন্ত ধনী এক দেশ জয় করব, তোমরা সকলে এমন ধনী হয়ে ফিরবে যে শিকার তোমাদের তাঁবুতে বয়ে আনতে ভারবাহী পশুপাল কুলাবে না।...' বসন্তকালে স্তেপের চারণভূমি যখন পশুখাদ্য ঘাসে সবুজ হয়ে উঠল তখন চেঙ্গিজ খান তাঁর ক্ষুধার্ত অশ্বারোহী বাহিনীকে প্রাচীন সমৃদ্ধ চীনদেশের দিকে নিয়ে চললেন।... যে সব চীনা বাহিনী তাঁর মুখোমুখি হল তাদের তিনি উড়িয়ে দিলেন, দেশের ওপর দিয়ে ছুটলেন ঝঞ্ঝার মতো, চীনের হাজারখানেক শহরকে ভস্মস্তূপ করে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন। যুদ্ধের কেবল তিন বছর পর অর্ধেক চীনকে পরাস্ত করে প্রচুর পরিমাণ শিকারের বোঝা নিয়ে তিনি তাঁর স্তেপের আস্তানায় ফিরে আসেন..."

"আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন!" মুনশী ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল।

"আমি আপনাকে যা যা বললাম তা আবারও আপনার কাছে রূপকথা বলে মনে হতে পারে, অথচ এ সবই সত্যি!"

"মাননীয় মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌, অনুগ্রহ করে বলুন, এই অসাধারণ সেনানায়ক চেঙ্গিজ খান দেখতে কেমন।"

"তিনি দীর্ঘকায়, বয়স ষাট পার হয়ে গেছে বটে, কিন্তু এখনও প্রচণ্ড বলবান। ভারী পদক্ষেপ এবং বিসদৃশ চলন ভঙ্গিতে তিনি যেন ভল্লুক, ধূর্ততায় — শৃগাল, খলতায় — সর্প, ক্ষিপ্রতায় — চিতাবাঘ, অক্লান্ততায় — উট, আর যাদের পুরস্কৃত করতে চান তাদের প্রতি ঔদার্যে তিনি যেন নিজের শাবকদের প্রতি স্নেহময়ী এক রক্তপিপাসু বাঘিনী। তাঁর ললাট উন্নত, শ্মশ্রু দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত এবং হলুদবর্ণের নিষ্পলক চোখ জোড়া মার্জারের মতো। সমস্ত খান ও সাধারণ যোদ্ধারা তাঁকে অগ্নিকাণ্ড কিংবা বজ্রপাতের চেয়েও বেশি ডরায়, আর তিনি দশ জন সৈনিককে এক হাজার শত্রুকে আক্রমণ করার হুকুম দিলে তারা কোনরকম ভাবনা চিন্তা না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেন না তারা বিশ্বাস করে জয় তাদের হবেই — চেঙ্গিজ খান সব সময়ই বিজয়ী হন..."

"আমার বয়স অনেক হল," মুনশী বলল, "আমি বহু খ্যাতিমান, দুঃসাহসী সেনানায়ক দেখেছি, কিন্তু আপনি যেমন বর্ণনা দিচ্ছেন সে

ধরনের লোক আমার চোখে পড়ে নি।... আপনার কথা প্রায় রূপকথার মতো।... যদি পারেন তাহলে আমাকে বুঝিয়ে বলুন দেখি, এই তাতার খান প্রতিটি রাখালকে বড় লোক করে দেওয়ার পর নিজে হঠাৎ কেন তার জন্মভূমি থেকে এত দূরে আমাদের সীমান্তে এসে হাজির হল?"

দূত সুরাপাত্রে শেষ চুমুক দিয়ে আবার চোখ বন্ধ করল, প্রচণ্ডভাবে টলে উঠল। মুনশী কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল এবং ভৃত্য আরও ঢালতে যাচ্ছে দেখে তাকে সতর্ক করে দিল। কিন্তু দূত চোখ মেলে রূপোর পাত্র শূন্য দেখে ভৃত্যের দিকে ইঙ্গিত করল, ভৃত্য আবার গাঢ় রক্তিম সুরা কানায় কানায় ঢালল।

"আমি এত পান করছি দেখে অবাক হবেন না! মাননীয় মির্জা ইউসুফ, না আপনি, না আপনার তরুণী সহকারিণীটি, কেউই এক বিন্দুও পান করেন নি, তার মানে আমাকে একা তিন জনের জন্য পান করতে হয়..."

মাহ্‌মুদ পাত্রটি দু' হাতে ধরে মৃদুমন্দ দুলতে দুলতে বলে চলে:

"মোঙ্গল খান-ই-খানান তাঁর আস্তানায় তিন বছর বিশ্রাম করলেন। তিনি তাঁর অর্ধেক ফৌজ রেখে এসেছেন চীনে। সেখানে জনসাধারণ এখনও মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আর ফৌজের দ্বিতীয় অর্ধাংশ তিনি নিজে মরুভূমি ও পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়ে পশ্চিমে চালিয়ে নিয়ে গেলেন..."

মুনশী দুই হাতে কান চেপে ধরে কাতরে উঠল।

"আমি ভয়ঙ্কর কিছু আঁচ করছি!.."

দূত বলে চলল:

"খানদের লালসা ও সাধারণ যাযাবরদের বুভুক্ষার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সৈন্যদের অভিযোগ, শিকারের সেরা অংশ খানরা হাতিয়ে নিয়েছে, দরিদ্রদের ভাগ্যে পড়েছে তাদের ফেলে দেওয়া ছিটে ফোঁটা। তখন সৈন্যেরা যাতে আবার নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে এবং খানদের হত্যায় মেতে না ওঠে, সেই উদ্দেশ্যে চেঙ্গিজ খান তাদের আরও দূরে নিয়ে যেতে মনস্থ করলেন..."

"তাতার বাহিনী এখন কত বড়?"

দূত নিদ্রাজড়িত ক্লান্তস্বরে বলল:

"চেঙ্গিজ খান পশ্চিমে নিয়ে গেছেন এগারোটি দল। প্রতিটি দলে

আছে দশ হাজার তাতার ঘোড়সওয়ার, প্রতি ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে আছে একটি করে অতিরিক্ত ঘোড়া, কখনও বা দু'টি..."

"তার মানে তাতার খানের আছে মোট এক লক্ষ দশ হাজার ঘোড়সওয়ার?" মুনশী সহর্ষে চেঁচিয়ে উঠল। "আর আমাদের বাদশাহের সৈন্যসংখ্যা তার চার গুণ!.. তিনি যদি আমাদের সকলকে জেহাদে নামার জন্য ডাক দেন তাহলে ইসলামের বিপুল ফৌজ সম্পূর্ণ অপরাজেয় হয়ে দাঁড়াবে!"

"মহামহিম খরেজম শাহ আলা উদ-দিন মুহম্মদকে আমি কি ঠিক এই কথাই বলি নি? বাদশাহ মুহম্মদ শতাধিক বছর রাজত্ব করুন! — তাঁর বাহিনীর কাছে তাতার বাহিনী রাতের আঁধারে সামান্য ধোঁয়ার রেখা বৈ নয়!.. এটা ঠিক যে পশ্চিমের দিকে অভিযানের পথে উইগুর, আলতাইবাসী, কির্গিজ, কারা-কিতাই — স্তেপের সব যাযাবর তাতার বাহিনীর সঙ্গে এসে জুটেছে, আর তার ফলে চেঙ্গিজ খানের তাতার বাহিনী দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে উঠেছে।... এটা রূপকথা নয়!"

দূত ঝিমিয়ে পড়ল, হাতে ঠেস দিয়ে গালিচার ওপর ঝুঁকে পড়ল, দেহ এলিয়ে দিল। তরুণী তার মাথার নীচে সবুজ ছাগচর্মের বালিশ গুঁজে দিল, তারপর বৃদ্ধ মির্জা ইউসুফের কানে কানে বলল:

"ধূর্ত শেয়াল! সত্যি কথা বলতে চায় না।..."

"দূতেরা এমনই হয়! দিলখোলা দূত কোথায় পাবি!"

উকিল প্রবেশ করল। সকলেই অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল, নিদ্রিত দূতকে নিয়ে কী করা যায় বুঝে উঠতে পারল না।

মাহ্মুদ ইয়ালভাচ্ হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেল, ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বিড়বিড়স্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করল:

"মাতাল হয়ে আমি আপনাদের কাছে কী বলতে কী বলে ফেলেছি নিজেরই মনে নেই! বৃথাই আপনারা এ সব লিখলেন! লেখাগুলো পুড়িয়ে ফেলুন!.."

উকিল প্রাসাদের সঙ্কীর্ণ অন্ধকার অলিগলি দিয়ে দূতকে বাগানের পথ রোধকারী ফটকের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো — সেখানে জিন দেওয়া ঘোড়া অপেক্ষা করছিল। অশ্বারোহীরা টলটলায়মান দূতকে কষ্টেসৃষ্টে জিনের ওপর চাপাল। প্রত্যূষের পূর্বমুহূর্তের আধা অন্ধকারে নিদ্রিত

বুখারার নিস্তব্ধ পথঘাট পার হয়ে তারা শাহের পল্লী প্রাসাদে এসে পেঁছিলে।

পরের পর দিন শাহ মুহম্মদের হাত থেকে জবাবী চিঠি নিয়ে তাতার দূতবৃন্দ পুবে, তাতার খান-ই-খানানের শিবিরে ফিরে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মোঙ্গল খান সমীপে বার্তা

চেঙ্গিজ খানের চেহারার বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর দীর্ঘ আকৃতি ও মজবুত দৈহিক গড়ন। তিনি ছিলেন মার্জারাক্ষ।

(পারসিক ইতিহাসবিদ জুজ্জানি, ত্রয়োদশ শতক)

তাতারদের ছাউনিগুলোর মাঝবরাবর পথ ধরে দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে তিন অশ্বারোহী। তাদের পশমী আলখাল্লা যুধ্যমান ঈগলের ডানার মতো ঝট্পট্ আন্দোলিত হচ্ছে। দু' জন প্রহরী আড়াআড়ি বর্শা ঠেকিয়ে তাদের পথ অবরোধ করল। অশ্বারোহীরা ঘোড়া থেকে নেমে সাদা বালুকাভূমির ওপর ধূলিমলিন আলখাল্লা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন তার লাল ডোরাকাটা জোব্বা ঠিকমতো গুছিয়ে নিতে নিতে চেঁচিয়ে বলল:

''খানের নাম আশীর্বাদধন্য হোক! বিশেষ জরুরী বার্তা আছে!''

কাছাকাছি ছাউনি থেকে ইতিমধ্যে দু' জন নোকর ছুটে বেরিয়ে এলো — তাদের গায়ে চামড়ার নীল আঙরাখা, আস্তিনে লাল ডোরাচিহ্ন।

"আমরা খান-ই-খানানের দূত হয়ে পশ্চিম দেশে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ফিরে এসেছি। আমাদের আসার সংবাদ দাও। আমি দূত মাহ্মুদ ইয়াল্ভাচ্।"

হলুদ তাঁবুর রেশমী পর্দায় ঈষৎ ফাঁক দেখা গেল, সেখান থেকে হুকুম ভেসে এলো। তাঁবুর অভিমুখী পথে একের পর এক সারিবদ্ধ আট জন প্রহরী তার পুনরাবৃত্তি করে বলল:

"খান-ই-খানানের হুকুম: 'আসতে দাও'।"

আগন্তুক তিন জন মাথা নোয়াল; বুকের ওপর দু' হাত ভাঁজ করে তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। চৈনিক ভৃত্য তাদের প্রবেশ করতে দিল; ভেতরে প্রবেশ করে আনত মস্তকেই তারা গালিচার ওপর নতজানু হয়ে বসল।

"বল!" গম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল।

মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ চোখ তুলল। সামনে দেখতে পেল রুক্ষ পিঙ্গল শ্মশ্রুমণ্ডিত ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণের এক কঠিন মুখ। চওড়া কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে গিঁট পাকানো দুই সাদা বেণী। বিশাল পান্না বসানো কালো চক্‌চকে টুপির আড়াল থেকে সবুজ আভাযুক্ত হলুদ রঙের দু'টি চোখ তীক্ষ্ন অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

"আপনার সওগাতে এবং মৈত্রী প্রস্তাবে খরেজম শাহ আলা উদ-দিন মুহম্মদ খুব খুশি। আপনার বণিকদের সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে তিনি সোৎসাহে রাজি হয়েছেন। কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন।..."

"এই কারণ যে আমি তাকে 'সন্তান' বলে সম্বোধন করেছি?"

"আপনি বরাবরের মতোই আন্দাজ করেছেন দেখছি মহামান্য। শাহ এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন যে আমার ঘাড় থেকে মাথা যায় আর কি!"

খানের চোখ জোড়া কুঞ্চিত হয়ে সঙ্কীর্ণ রেখার আকার ধারণ করল।

''তুমি ভেবে বসলে যে তোমার...'' এই বলে খান তার পুরুষ্টু আঙ্গুল দিয়ে শূন্যে আঁক কাটার ভঙ্গি করল।

এই সঙ্কেতকে সকলে ভয় করত: চেঙ্গিজ খান এইভাবে মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করত।

"আমি খরেজম শাহকে ঠাণ্ডা করলাম, তিনি আপনাকে 'সালাম' ও চিঠি পাঠিয়েছেন।"

"তুমি তাকে ঠাণ্ডা করলে? কী দিয়ে?" কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর ফুটে উঠল। চোখ জোড়া কখনও বিস্ফারিত কখনও বা সঙ্কুচিত হয়ে তীব্র দৃষ্টি হানতে লাগল।

মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ শাহ মুহম্মদের কাছে আপ্যায়নের এবং কীভাবে খাস উজির এসে তাকে গোপন মন্ত্রণার জন্য নিয়ে গেল তার বিশদ বর্ণনা দিতে লাগল। এই কথা নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে সে চেঙ্গিজ খানের প্রশস্ত করতলে খরেজম শাহের কাছ থেকে পাওয়া মুক্তাটি রাখল এবং মুহম্মদের সঙ্গে তার কথাবার্তার হুবহু বিবরণ দিল।

চোখ না তুলেই মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ অনুভব করল যে খান অনিমেষ দৃষ্টিতে তার দিকে লক্ষ্য করছে, চেষ্টা করছে তার গোপন ভাবনার মর্ম ভেদ করার।

"এই কি তোমার শোনা সমস্ত কথা?"

"অক্ষম যদি কোন কিছু ভুলে গিয়ে থাকে ত ক্ষমা করবেন!"

একটা অস্ফুট হুস্ শব্দ শোনা গেল: খান সন্তুষ্ট। সে মাংসল হাতে মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচের কাঁধ চাপড়াল।

"তুমি ধূর্ত মুসলমান বটে মাহ্‌মুদ। আমার ফৌজ রাতের অন্ধকারে ধোঁয়ার রেখার মতো — এটা তুমি মন্দ বল নি। শাহ তা-ই ভাবুক! আজ সন্ধ্যায় তিন জনেই খানা খেতে আমার কাছে এসো।''

দূতেরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো।

দীর্ঘদেহী, ঈষৎ ন্যুব্জ খান উঠে দাঁড়াল, তার গায়ে সোনার চওড়া কোমরবন্ধনী জড়ানো মোটা ক্যাম্বিসের কালো পোশাক। সাদা কৃষ্ণসার চর্মের পাদুকায় ঢাকা বাঁকা বিশাল বিশাল পায়ের চেটোয় থপ্‌থপ্ আওয়াজ তুলে সে তাঁবুর ভেতরে খানিকটা এগিয়ে গেল, পর্দা ফাঁক করে লক্ষ্য করতে লাগল কীভাবে সাদা উষ্ণীষধারী ও রঙচঙে জোব্বা পরনে দূত তিন জন ধূলিধূসরিত ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে ধীরে ধীরে চলে গেল।

"বড় ফরমান জারির অর্থাৎ অভিযানে যাওয়ার সময় এগিয়ে এলো। এখন কেবল শুভ লগ্নের অপেক্ষা!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চেঙ্গিজ খানের বিনিদ্র রজনী যাপন

বিলাসে অভ্যস্ত চৈনিকদের মতো দীর্ঘ ধূমনালী তাপিত চুল্লী তক্তপোষে অথবা মুসলিম বণিকদের মধ্যে প্রচলিত পালকের শয্যায় ঘুমানো চেঙ্গিজ খান পছন্দ করত না। শরীরের নীচে শক্ত মাটি অনুভব করতে তার ভালো লাগত, তাই বৃদ্ধ চৈনিক ভৃত্য ভালোভাবে মসৃণ করা পুরু কম্বল গালিচার ওপর দু' ভাঁজ করে পেতে তার শয্যা রচনা করত।

খান সচরাচর শয়নমাত্রই ঘুমিয়ে পড়ত। সে প্রায়ই স্বপ্ন দেখত এবং এই সব স্বপ্নের গূঢ় অর্থ কী তা ব্যাখ্যা করার জন্য শামানদের কিংবা তার

পরম জ্ঞানী চৈনিক অমাত্য ইয়েলিউ চু-ত্সাইকে* ডাকত, তবে তাদের ব্যাখ্যার ওপর সে সব সময় আস্থা না রেখে নিজে যা শ্রেয় বলে বুঝত সেই অনুযায়ী কাজ করত। প্রত্যুষে ঘুম ভাঙতে গরম চামড়ার আঙরাখার নীচে শুয়ে শুয়ে খান ভাবত তার লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা ও ঘোড়ার কথা, সেই সব পথের কথা যেখান দিয়ে গেলে অধিবাসীদের কাছ থেকে তার অর্ধভুক্ত বাহিনীর অন্ন সংস্থান করা যাবে, ভাবত মোঙ্গলিয়ায় তার সন্তান-সন্ততি, বাঁদী ও গোলাম সমেত যে পাঁচশ' পত্নী পড়ে আছে তাদের ভরণপোষণের কথা। এ ছাড়াও ভাবত, যে সব দেশে সে অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে সেখানে আগে থাকতে পাঠানো অসংখ্য গুপ্তচরের সংগ্রহ করা তথ্য নিয়ে; পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ পুত্রদের সম্পর্কেও তার ভাবনা হত; ভাবনা হত নিজের পায়ের ও গ্রন্থির যন্ত্রণা নিয়ে, মৃত্যু সম্পর্কেও বটে।...

খানের পক্ষ্মহীন চক্ষুপল্লব উন্মুক্ত, তার নির্নিমেষ চোখের দৃষ্টি একটি বিন্দুতে নিবদ্ধ। সে তাকিয়ে ছিল তাঁবুর দুই বস্ত্রখণ্ডের মাঝখানে ফাঁকের দিকে। আকাশের এক ফালি নীলিমা চোখে পড়ে। তারাগুলো ইতিমধ্যেই স্তিমিত হয়ে গেছে। প্রহরী নোকর জায়গা থেকে খানিকটা সরে গিয়ে আবার ধীর গতিতে ফিরে আসছিল — থেকে থেকে তার কালো ছায়া নজরে আসে।

একটি অস্বস্তিকর ভাবনা প্রায়ই ঘুরে ফিরে খানের মনে আসছিল। পশ্চিমে অভিযানের প্রাক্কালে চেঙ্গিজ খানের স্থূলাঙ্গিনী পত্নী বুর্তে অভ্যাসবশত তাকে কিছু জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছিল।

---

* চীনে, রাজধানী জয় করার সময় চেঙ্গিজ খান ইতিপূর্বে রাজত্বকারী কিদান রাজবংশের উত্তরপুরুষ ইয়েলিউ চু-ত্সাইয়ের পরিচয় পায়। শিক্ষা, কাব্যরচনা, চৈনিক আইন-কানুন ও রাজকীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের জন্য ইয়েলিউ চু-ত্সাইয়ের খ্যাতি ছিল। জ্যোতিষী এবং গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুযায়ী ভবিষ্যদ্বক্তা হিশেবে ইয়েলিউকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন চেঙ্গিজ খানের বিশেষ পছন্দ হয়। চেঙ্গিজ খান তাঁকে অধীনস্থ দেশসকল শাসন বিষয়ে প্রধান মন্ত্রণাদাতার পদে নিযুক্ত করে এবং তিনি মোঙ্গল সাম্রাজ্যের এক অতি বিশিষ্ট রাজকর্মচারী হয়ে দাঁড়ান। ব্যক্তিগত জীবনে অনাড়ম্বরতা ও সততার জন্য এবং চেঙ্গিজ খানের ক্রোধ উপশমের ক্ষমতা রাখার জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাছ থেকে সম্পদ বলতে পাওয়া যায় কেবল পুথি এবং জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত সরঞ্জাম।

আভূমি মস্তক নত করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে বলে, "খান-ই-খানান, তুমি ফৌজ নিয়ে পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি পার হয়ে অজানা দেশে অন্যান্য জাতের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করতে যাচ্ছ। তুমি কি ভেবে দেখেছ যে শত্রুর তীর তোমার বুকে বিঁধতে পারে, কিংবা ভিনদেশী সৈন্যের তলোয়ার তোমার ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ কেটে খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে পারে? এর ফলে যদি ভয়ঙ্কর এমন কিছু ঘটে যায় যার কোন প্রতিকার নেই ('মৃত্যু' শব্দটা ভেবেও সে মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে পারল না) আর তোমার জায়গায় যদি কেবল তোমার পুণ্য নামটি থেকে যায় তাহলে আমাদের চার ছেলের মধ্যে কাকে তোমার ওয়ারিশ ও দুনিয়ার মালিক হওয়ার হুকুম দাও? তোমার ইচ্ছে আগে থাকতে জানিয়ে দাও, যাতে পরে আমাদের ছেলেদের মধ্যে যুদ্ধ, ভাইয়ে-ভাইয়ে হানাহানি না ঘটে।"

এর আগে পর্যন্ত কেউই তাকে তার বার্ধক্য সম্পর্কে এবং তার আয়ু যে সম্ভবত সীমিত হয়ে এসেছে তেমন ইঙ্গিত দিতে সাহসী হয় নি। সকলেই জোর গলায় বলেছে সে পরাক্রান্ত, অপরিবর্তনীয়, অপূরণীয় এবং জগৎ তাকে ছাড়া দাঁড়াতে পারে না। একমাত্র বর্ষীয়সী, বিশ্বস্ত বুর্তেই মৃত্যুর কথা বলার সাহস পেল।...

সে কি সত্যি সত্যিই জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে? না, সে এখনও সমস্ত গোপন ঈর্ষাকারীকে দেখাতে পারে যে সে জিন ছাড়া ঘোড়ায় লাফ দিয়ে চড়ার সামর্থ্য রাখে, ধাবমান অবস্থায় বন্য বরাহকে বিদ্ধ করতে পারে এবং ঘাতকের মুখোমুখী হয়ে নিজের শক্ত আঙ্গুলে তার শ্বাসরোধ করতে পারে। তার দুর্বলতা অথবা জরাগ্রস্ততার কথা বলতে যারা সাহস পায় সে তাদের সকলকে কঠোর শাস্তি দেবে।...

বুদ্ধিমতী, নির্ভীক বুর্তে কিন্তু তখন ওয়ারিশের কথা বলে ঠিকই করেছিল। সত্যিই ত চার পুত্রের মধ্যে কাকে সে তার ওয়ারিশ করবে? পিতার মৃত্যু সবচেয়ে বেশি কামনা করে অদম্য ও স্বেচ্ছাচারী জ্যেষ্ঠ পুত্র জুচি। তার বয়স এখন চল্লিশ এবং নিঃসন্দেহে তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হল পিতার হাত থেকে রাজত্বের লাগাম কেড়ে নিয়ে তাকে অকর্মণ্য বৃদ্ধদের তাঁবুতে চালান করা। এই কারণে চেঙ্গিজ খান জুচিকে অনেক দূরে, তার রাজত্বের প্রত্যন্ত প্রদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং জুচির প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও ভাবনা-চিন্তার বিবরণ পাওয়ার জন্য তার পেছনে গুপ্তচর নিয়োগ করেছে।...

দ্বিতীয় পুত্র জাগাতাইয়ের কাছে পিতার মৃত্যুর চেয়ে নিজের ভ্রাতা ও প্রতিদ্বন্দ্বী জুচির বিনাশ বেশি কাম্য। যতক্ষণ দু' জনেই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ও নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিবাদ করে ততক্ষণ তাদের দিক থেকে কোন বিপদ নেই। এখনই সে স্থির করে ফেলল যে তৃতীয় পুত্র উগেদেইকে তার উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করবে; সে নম্র ও নিশ্চিন্ত প্রকৃতির, খোশমেজাজি; খানাপিনা, বাজপাখি নিয়ে শিকার, ঘোড়দৌড় তার পছন্দ, সে পিতাকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে গর্ত খুঁড়বে না। সবার ছোট, চতুর্থ পুত্র তুলি খানও সেই রকম। তারা দু' জনেই মদ্যপানোৎসব পছন্দ করে, ক্ষমতালিপ্সার আগুন তাদের দহন করে না।

তাই অভিযানে নির্গত হওয়ার আগে চেঙ্গিজ খান তৃতীয় পুত্র উগেদেইকে তার সিংহাসনের ওয়ারিশ বলে ঘোষণা করল। এতে কিন্তু সে জ্যেষ্ঠ দুই পুত্রকে আরও ক্ষিপ্ত করে তুলল এবং এখন থেকে তাকে সব সময় সতর্ক হয়ে থাকতে হল; যে কোন মুহূর্তে সে আততায়ীর আক্রমণ, অন্ধকারের বুক ভেদ করে বিষমাখা তীর অথবা তাঁবুর পর্দা ফুঁড়ে বর্শার আঘাত আশঙ্কা করে।...

তখন থেকে অপমানিত জুচি তার জন্য নির্দিষ্ট এক বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে স্থায়ীভাবে দূরে রয়ে গেছে। সে বিশিষ্টতা অর্জনের জন্য, সৈন্যদের ভালোবাসা আকর্ষণের জন্য চেষ্টা করে যায়, সে খ্যাতির সন্ধান করে। সে যুবক ও শক্তিমান।... যুবক হওয়ার মাধুর্য আছে!..

এ পাশ ও পাশ করতে করতে থেকে থেকে খানের মনে পড়ে প্রাচীনা, স্থূলাঙ্গিনী বুর্তের উক্তি, সে ভাবে তার মৃত্যুর কথা। সে ভাবে স্তেপের উঁচু টিলার কথা — যেখানে ছুটে বেড়ায় ছোট ছোট বাঁকা শিঙওয়ালা চঞ্চল সাইগাক হরিণ, যেখানে উঁচু আকাশে ধীরে ধীরে পাক খায় ঈগলেরা।... এই রকম সব টিলার নীচে পরাক্রান্ত মহাবীরদের দেহাবশেষ শান্তি লাভ করছে। আজ অবধি চিরকালই সকল জাতির সবচেয়ে শৌর্যবান অধীশ্বরেরও মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তিনি, চেঙ্গিজ খান, সকলের চেয়ে পরাক্রান্ত। আজ পর্যন্ত কেউ কি এত বিস্তৃত ভূখণ্ড জয় করেছে?.. তা ছাড়া মৃত্যু কী? শোনা যায় এমন জ্ঞানী-গুণী বৈদ্য, যাদুকর ও মায়াবী নাকি আছে, যারা পরশপাথরের সন্ধান রাখে। তারা যৌবনদায়িনী সুধাও তৈরি করতে পারে, নিরানব্বইরকম গাছগাছড়া সেদ্ধ করে এমন মহার্ঘ ওষুধ বানাতে পারে যা অমরত্ব এনে দেয়।...

তেমুচিন নামে এক সামান্য নোকর, এই সেদিনও যার কাঁধে বেড়ি বাঁধা ছিল সেই ক্রীতদাসকে কি কুরুলতাইয়ে* 'রসুল' চেঙ্গিজ খান বলে ঘোষণা করা হয় নি? অমরলোক যদি থাকে তাহলে তার রসুলকেও ত অমর হতে হয়। তার চীনদেশীয় মহাজ্ঞানী অমাত্য ইয়েলিউ চু-ত্সাই তাড়াতাড়ি, কালই তার সাম্রাজ্যের দিকে দিকে এই মর্মে কড়া হুকুম পাঠান যে চীনদেশীয় তাও সন্ন্যাসী, তিব্বতের ডাকসিদ্ধ এবং আলতাইয়ের শামান — পরম জ্ঞানী-গুণী যারাই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী তারা যেন অবিলম্বে খানের সদর শিবিরে আসে এবং সকলেই যেন সঙ্গে নিয়ে আসে অটুট শক্তি, যৌবন ও অমরত্বের দাওয়াই। এ ধরনের অলৌকিক দাওয়াইয়ের জন্য তিনি, খান-ই-খানান তাদের এমন অপূর্ব পুরস্কার দেবেন যা তামাম দুনিয়ায় আর কোন অধিপতি কখনও দেন নি।...

বহুক্ষণ তার চোখে আর ঘুম আসে না, ছট্ফট্ করতে থাকে, অবশেষে সবে ঝিমুনি এসেছে এমন সময় পায়ের বুড়ো আঙুলে একটা মৃদু যন্ত্রণা অনুভব করল। তার আঙুলে সজোরে কিসের যেন চাপ পড়ল। খান ভীত হল না। যাযাবরদের মধ্যে প্রচলিত এই ইঙ্গিতটি তার জানা আছে। সে মাথা খানিকটা তুলল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করতে পারল না। এই ইশারা তার ভালোমতো মনে আছে: তার বয়স যখন কম ছিল তখন সে নিজে তার প্রিয়া বুর্তের পায়ের আঙুলেও এইভাবে চাপ দিত — বুর্তে তখন ছিল তন্বী ও চপলা। পিতা দাই সেচেন ছিল কড়া মেজাজের মানুষ; তার আঁধারকালো তাঁবুতে বিছানো কম্বলের ওপর বিশাল পরিবারের সকলের শয্যা ছিল।

তার পায়ের কাছে বসে ও কে? কে তাকে ডাকে?

সে সন্তর্পণে হাত বাড়াতে করতলে অনুভব করল পোশাকের মিহি রেশম এবং এক নারীর সঙ্কুচিত অবয়ব, সরু সরু কাঁধ; মাথায় অদ্ভুত কেশবিন্যাস — কে ও? মূর্তিটিকে কাছে টেনে আনতে সে অশুদ্ধ ভাঙা ভাঙা ভাষায় বলতে লাগল:

"তুম্হার কুসুল্তু, তুম্হার আদরের কুলান খাতুন, মইরে যাইছে গো, তুম্হি যায়।... ভালা কর।... তুম্হি সুরুজ, কুসুল্তু — চান্দ।

---

* কুরুলতাই — শাসকবংশভুক্ত সম্ভ্রান্ত সামন্ত খানদের মন্ত্রণাপরিষদ। মুখ্য সেনানায়করাও এতে উপস্থিত থাকত।

এটি হল চীনা মেয়ে, খানের তরুণী ভার্যা কুলান খাতুনের দাসী, কুলান খাতুনকে সে 'কুসুলুতু' বলে ডাকে। মেয়েটি ইঁদুরের মতো নিঃশব্দে কখন তাঁবুতে এসে ঢুকে পড়েছে। কুলান তাকে ডাকছে।

খান ভেতরে কম্বল জড়ানো প্রশস্ত জুতো জোড়া এঁটে নিল, তার পাশে ঘুমন্ত দুই পুত্র উগেদেই ও তুলির গায়ের স্পর্শ বাঁচিয়ে সন্তর্পণে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কুলান খাতুনের ছাউনিতে

দেখ দেখ সুন্দরীদের, তুল্য কোথায় পাবে?
নয়নযুগল চেরা চেরা, কৃষ্ণ যেন বনবিড়াল।

(মোঙ্গল গীত থেকে)

তুষার ঢাকা পাহাড়-পর্বত থেকে প্রবাহিত শীতল বায়ুভরে শান্ত রাত শিহরিত হয়ে ওঠে। ঘন মেঘরাশির আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে। এখানে-সেখানে এক-আধটা নিষ্প্রভ তারা মিট্‌মিট্ করছে। চীনা দাসীটি ফুটন্ত যুঁই ফুলের মৃদু সৌরভ বিস্তার করতে করতে আগে আগে চলেছে।

দু'টি ছায়ামূর্তি মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো।

"থাম! কে যায়?"

" 'কালো ইরতিশ'।..." দাসী চাপা গলায় বলল।

" 'দুনিয়া হার মানে'!" প্রহরী সঙ্কেত বাক্যে জবাব দিল, ছায়ামূর্তি দু'টিও পথ ছেড়ে দিল।

সাদা ছাউনির দিকে অগ্রসর হতে হতে খান ভাবতে থাকে: "আজ আবার কুসুলুতু নতুন কোন ভোল দেখাবে?" সামরিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বন্ধ করে যতবার সে তার কাছে এসেছে ততবারই তার নতুন নতুন রূপের পরিচয় মিলেছে: কখনও দেখা গেছে চীনা মেয়েদের কায়দা মাফিক তার পরনে অদ্ভুত অদ্ভুত ফুলের কাজ করা চীনাংশুক পোশাক, কখনও বহুমূল্য পশুলোমের চাদর মুড়ি দিয়ে শয্যায়

পড়ে থেকে সে এমনভাবে উঃ আঃ করেছে যেন মরতে বসেছে, মিনতি করেছে ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডটির ওপর তার শক্তিমান করস্পর্শ রাখতে, কখনও বা দেখা গেছে বসে বসে মোঙ্গল বুড়ির মুখে কেরুলেনের* সবুজ তীরভূমি এবং স্তেপের নির্জন ধু-ধু প্রান্তরের মাঝখানে কোন এক নিঃসঙ্গ যাযাবর আস্তানা নিয়ে গান শুনতে শুনতে সে দু' হাতে মাথা চেপে ধরে আছে, চোখের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

চীনা মেয়েটি সাদা ছাউনির প্রবেশ-পথের পর্দা তুলে ধরতে খান ভেতরে পদার্পণ করল। ছাউনির মাঝখানে স্তেপের ঝোপঝাড়ের শিকড় জ্বালিয়ে অগ্নিকুণ্ড করা হয়েছে, সুগন্ধী ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে গোলাকার ছাদের রন্ধ্রপথের দিকে বয়ে চলেছে। কুলান খাতুন দু' হাতে হাঁটু জড়িয়ে বসে ছিল, তার চেরা-চেরা দু' চোখের দৃষ্টি আগুনের কম্পমান শিখার দিকে স্থির নিবদ্ধ। সচরাচর যেমন রেশমী গালিচা থাকে, তার বদলে মেঝেতে ছিল তিনটি মামুলী ধরনের রঙচঙে কম্বল। একপাশে জড় করা ছিল কতকগুলো বোঝাই গাঁটরি-বোঁচকা — যাত্রার উপযোগী করে বাঁধা ছাঁদা।

খান প্রবেশ-পথের মুখে থমকে দাঁড়াল। তার চক্‌চকে মার্জার চোখে কৌতুকের ফুল্‌কি ঝলকে উঠল। "এই হল আর এক নতুন চাল!" সে ভাবল।

কুলান খাতুন সংবিৎ ফিরে পেয়ে আকর্ণ সুর্মাটানা চোখের ওপর হাত বুলাল। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে সটান মাটিতে পড়ে গেল, দু' হাতে খানের পা জড়িয়ে ধরল।

"হে মহীয়ান, অনুপম, যুগে যুগে অদ্বিতীয়, আপনার নিদ্রা, কিংবা চিন্তা, কিংবা সামরিক পরামর্শসভার ব্যাঘাত ঘটিয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি এখানে আর থাকতে পারছি না। চার দিক থেকে, প্রতিটি আনাচে-কানাচে আমি নিজের ও আমার শিশুপুত্রের মৃত্যু আশঙ্কা করছি। আমি নিঃস্ব অবস্থায় একজন বিশ্বস্ত দাসীকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে চাই স্তেপে, যেখানে কেউ আমাকে চিনবে না।"

"আরে একটু অপেক্ষা কর না, আমাকে এক পেয়ালা চীনা চা দাও

---

* কেরুলেন ও ওনোন — আরগুনের শাখানদী, মোঙ্গলিয়ার মূল ভূখণ্ডের প্রধান নদী। এই দুই নদীর তীরে চেঙ্গিজ খানের যৌবন অতিবাহিত হয়।

দেখি, আমি ততক্ষণ তোমার পাশে বসে শুনি কোথা থেকে কে তোমাকে হুমকি দিচ্ছে।"

খান অগ্নিকুণ্ড ঘুরে এসে কম্বলের ওপর বসে পড়ল। ছাউনিতে যে রেশমী গালিচা বিছানো ছিল সেগুলো গেল কোথায়? দেয়ালে পাখি ও ফুলের কাজ করা যে সব পর্দা আগে ঝুলত সেগুলোই বা কোথায়? চল্লিশ বছর আগে সে নিজে যেমন একটা ছাউনিতে ছিল এখন এটা তেমনই এক সাধারণ যাযাবরের ছাউনি।

কুলান আবার নিথর হয়ে বসে থেকে ক্রুদ্ধ বনবিড়ালের দৃষ্টিতে খানের দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগল। তার পাশে গুটিসুটি মেরে উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে ছিল শিশুপুত্র কুলকান; ঈষৎ মলিন তার গায়ের রঙ, মাথার কালো চুল ছাঁটা, কানের ওপর তুলে দেওয়া দু'টি ছোট ছোট বেণী। কুলান কথা বলে চলল, তার কণ্ঠস্বর অনুচ্চ, ক্ষুব্ধ, সুরেলা:

"আমি কোন কিছুর আশা করতে পারি না, কোন রক্ষাব্যবস্থার আশা করতে পারি না। আমার বাবা নেই, মা নেই, আর সমস্ত ভাইয়ের মধ্যে আছে একজন — সে সামান্য নোকরের কাজ করে, অথচ আগে ওরই ছিল হাজার নোকর। আর আমার ভাইও শিগ্‌গিরই মারা যাবে।"

"কেন মারা যাবে?"

"আমরা মেরকিতরা সকলে, আমাদের অভাগা গোটা জাতটা, যার বাঘের মতো চোখ তোমার সেই নির্দয় নিষ্ঠুর ছেলে জুচির নোকরদের তলোয়ারের আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে। শিগ্‌গিরই সে এখানে আসবে, আমি দেখব আমার বাবাকে, আমাদের গোটা বংশকে যে খুন করেছে সেই জঘন্য লোকটাকে। এমন শিলার নীচে থাকতে যাব কেন যা যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়ে আমাকে পিষে ফেলতে পারে? আমাকে ছেড়ে দাও! যাওয়ার সমস্ত গোছগাছ করা হয়ে গেছে।"

"জুচি খান এখানে আসবে না। সে ইরগিজ নদীর ধারে নতুন যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে। আর আমি এখনও জীবিত, দুনিয়ার শাসনভার আমার কাঁধে। আমি তোমার রক্ষক, আর কোন রক্ষাব্যবস্থার কথা তুমি বলছ?"

কুলান তার সরু সরু আঙুল চোখের ওপর বুলিয়ে উদ্‌গত অশ্রু মুছল।

"তোমার ভাই জামাল হাজিকে আমি আমার হাজার নোকরের একটি শতকী দলের সর্দার করে দিচ্ছি। কাল আমি আমার হাজারী সেনাপতি

চাগানকে বলব যে এই শতফৌজের দলটি তোমাকে, তোমার ছাউনি এবং তোমার খুদে মহাবীর কুলকানকে পাহারা দেবে। আমার রক্ষাধীনে থেকে ভয় পায় এমন সাহস কার?''

কুলান চোখ নীচু করে অনুচ্চ, কম্পিত কণ্ঠে বলল:

"তোমার নিজের ওপরই ত তীরের আঘাত আসার আশঙ্কা আছে।..."

''তীর! বল, কার তীর?'' খান কুলানের কাঁধে হাত রাখল।

কুলান ঠোঁট কামড়াল, এক ঝটকায় তাকে ছাড়িয়ে, লাফ দিয়ে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে অন্য দিকে ছুটে গেল। তার দীর্ঘ কালো বেণী কম্বলের ওপর কিল্‌বিলে সাপের মতো হুটোপাটি খেতে লাগল। খান বেণীর প্রান্ত পায়ে চেপে ধরে অনুচ্চ স্বরে আবার জিজ্ঞেস করল:

"বল, কে আমার মৃত্যুর জন্য মতলব আঁটছে?"

কুলান ছাউনির দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াল।

''হে মহনীয়, অতুলনীয়! কোন জাতি, কোন ফৌজই তোমার কাছে ভয়ঙ্কর হতে পারে না। দমকা বাতাস যেমন শরতকালের পাতা উড়িয়ে নিয়ে যায়, তুমিও তেমনি তাদের পরাস্ত করবে। কিন্তু যারা তোমার সঙ্গে একই তাঁবুতে বসে আছে, দিনরাত তোমার ওপর নজর রাখছে সেই সব গোপন শত্রুর হাত থেকে তুমি নিজেকে বাঁচাতে পার কি? একমাত্র আমিই তোমার দাসী, তোমাকে ভালোবাসি, যেমন ভালোবাসি আমার জন্মস্থান আলতাইয়ের ঝক্‌ঝকে তুষারে ঢাকা বিশাল, সুন্দর পাহাড়কে। একমাত্র তুমিই আমার রক্ষক। তুমি না থাকলে অন্যেরা আমাকে ঢেলার মতো রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ঠিক বলছি কিনা? বাতাসের ভাষা, ওরিওল পাখির কাতরানি, সাপের হিসহিস আওয়াজ — সবই ত তুমি দেখতে পাও, সবই বোঝ। যা যা বলছি ঠিক কিনা?"

"সব বল, যা যা জান বল," বেণী না ছেড়ে ভাঙা ভাঙা গলায় খান বলল।

কুলান খাতুনের চোখে নিষ্ঠুর আনন্দের সবুজ অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল।

"স্তেপের সাবেকি লোকজন বুদ্ধিমানের মতো ভেবে বার করেছেন যে সব সময় খানের সবচেয়ে ছোট ছেলেরই ওয়ারিশ এবং ছাউনির আগুনের রক্ষক হওয়া উচিত। বড় ছেলেরা বেড়ে উঠেই চট্‌পট্ বাবার ঘোড়ার লাগাম বাগানোর জন্য হাত বাড়ায়। এই কারণে বাবা তাদের যা দেওয়ার ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে নিজের ছাউনি থেকে তফাতে তাদের ছাউনি তৈরি

করে দেয় — মানে তারা নিজেরাই নিজেদের গৃহস্থালী চালাক। আর বাচ্চা ছেলেটি যতক্ষণ বড় হচ্ছে ততক্ষণ বাবা নিশ্চিন্তে তার ঘোড়ার পাল চরাতে পারে। তুমি ওদের সকলকে দান করেছ, সব ছেলেকে যার যার অংশ ভাগ করে দিয়েছ, তাহলে তুমি সবার ছোট কুলকানকে ওয়ারিশ করতে ভুলে গেলে কেন?"

খান বেণী ছেড়ে দিল, অনেকক্ষণ ফোঁসফোঁস করে অবশেষে বলল:

"আমি বাচ্চাকে আর তোমাকেও রক্ষা করছি।... তাই আমি তাকে ওয়ারিশ বলে ঘোষণাও করছি না। মোঙ্গলরা মেরকিত মায়ের সন্তানকে কখনই ভালোবাসবে না, মানবে না।"

কুলান নতজানু হয়ে পড়ে গেল।

"অথচ আমি দুনিয়ায় যিনি অদ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ, যিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে অসাধারণ, মেরকিত মায়ের সন্তান সেই তোমাকে, হে আমার প্রভু, রসুল, তোমাকে ভালোবাসতে ডরাই না, কেন না তোমার মা, মহীয়সী ওয়েলুন্ মোঙ্গল বংশের নন — আমাদের মেরকিত বংশের মেয়ে।"

চেঙ্গিজ খান ঘড় ঘড় করে নিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল।

"হ্যাঁ, তুমি হক্ কথা বলেছ! সকলে সে কথা ভুলে গেছে। মনে না করে সেই ভালো।... তোমার কথা আমার মনে গাঁথা থাকবে। কোথাও যাওয়ার কথা চিন্তাও করো না। আবার গালিচার ভাঁজ খোল। ছোট্ট বনবিড়ালটি, আমার আদরের ধন, আমার কুসুল্তু, নোইয়নদের সঙ্গে সামরিক পরামর্শের পর তোমার কাছে আসব।"

এই বলে ভারী পদক্ষেপে খান ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলো।

কুলান উঠে দাঁড়িয়ে ভ্রূভঙ্গি করল, চিন্তামগ্নভাবে ধীরে ধীরে নিজের দীর্ঘ কালো বেণী হাতের ওপর জড়াতে লাগল। সে দাসীকে ডাকল। চীনা মেয়েটি দেয়ালের ধারে আরাম করে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কুলান তার ছোট পায়ের লাথিতে ওকে জাগিয়ে দিয়ে বলল:

"ইতর কোথাকার! হাত ভেঙে ফেলেছিল আর কি!... আবার গালিচা পাত! ঘোড়ার চুলের আরও এক গোছা বিনুনি গেঁথে আমার বেণীতে লাগা — অসভ্যটা প্রায় ছিঁড়ে ফেলেছে! কাল ভিনদেশী দূতদের সঙ্গে বড় ভোজসভা আছে। রুপোলি ফুলের কাজ করা নীল চীনে পোশাকটা বার করে রাখবি।..."

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মোঙ্গল খানের কর গণনা

'ক্রুদ্ধ বনবিড়াল' তাকে যে কথা বলল তা মনে মনে আন্দোলন করতে করতে খান ধীর পদক্ষেপে টিলার চার পাশে ঘুরতে লাগল। তার সামনে আবার ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়াল। তারা 'কালো ইরতিশ' ও 'দুনিয়া হারে মানে' সঙ্কেত বাক্য বিনিময় করল। চেঙ্গিজ খান প্রহরীকে নিজের সকল অভিযানের সঙ্গী পুরনো নোকর বলে চিনতে পারল।

"কী শুনেছিস? কী দেখেছিস?"

"ঐখানে, দূরে পাহাড়ের গায় বহু আলো জ্বলছে। দেখে মনে হয় যেন তারার মালা — এই মাঠের যে সব বাসিন্দা নিজেদের গরু-ভেড়ার পাল নিয়ে পাহাড়ে পালিয়ে গেছে এগুলো তাদের জ্বালানো আগুন। ওরা আমাদের ফৌজকে ভয় পাচ্ছে।"

"আর নোকররা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে?"

"তারা বলাবলি করছে যে আমরা সব ভেড়া খেয়ে শেষ করে ফেলছি, ঘোড়াগুলো সব ঘাস শেষ করে এখন শিকড় ধরে টানাটানি করছে, তলোয়ার খুন চাইছে। এই জন্য তারা বলাবলি করছে: খান-ই-খানান আমাদের চেয়ে বিজ্ঞ, তিনি সব দেখতে পান, সব জানেন, শিগ্‌গিরই তিনি আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে যাবেন যেখানে সব কিছু প্রচুর পরিমাণে আছে, যেখানে আমাদের আর আমাদের ঘোড়ারও পেট ভরবে।"

"ঠিক কথা! খান সব দেখতে পান, সব জানেন, সব কিছু নিয়েই ভাবেন। জলদি করে হাজারী সর্দার চাগানের কাছে ছুটে যা। গিয়ে বলবি যে আমরা হুকুম করছি এক্ষুনি যেন একশ' সৈন্যের ছয়টা দল নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসে।"

"এক্ষুনি যাচ্ছি, খান!"

"দাঁড়া! চাগানকে আরও বলবি যে আমি এখানে, টিলার ওপর, এই জলাটার সামনে কর গুনতে গুনতে ওর জন্য অপেক্ষা করব আর একটা করে আঙুল দুমড়াবো।"

মোঙ্গল তার বাঁকা বাঁকা পায়ে দুলতে দুলতে টিলা থেকে নীচে

ছুটল, আর খান পায়ের গোড়ালির ওপর অনড় হয়ে বসে পড়ে কান বাড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে অন্ধকার থেকে ভেসে আসা শব্দ শুনতে লাগল। সে মনে মনে গুনে চলল: "এক, দুই, তিন, চার।..." — একশ' পর্যন্ত গোনা হতে একটি আঙ্গুল দুমড়াল।

চাঁদ ধীরে ধীরে আকাশে ভেসে চলেছে, কখনও মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, কখনও অন্ধকার আকাশে আবার বেরিয়ে আসছে, আর তাতে পাহাড়ের চার দিকে চক্রাকারে বিস্তৃত নোকরদের ছাউনিগুলো কখনও স্পষ্ট ও কাছাকাছি হয়ে দেখা দেয়, কখনও বা মেঘের ছায়ায় দূরে সরে গিয়ে অস্পষ্ট বিন্দুর মতো কালো হয়ে যায়।

দুশ' অবধি গুনে খান যখন দ্বিতীয় আঙ্গুল দুমড়াল তখন ছাউনিগুলোর মাঝখান দিয়ে ছায়ামূর্তির সারি ছুটে আসতে দেখা গেল, কয়েক জন নোকর জোর কদমে কুয়াশাচ্ছন্ন স্তেপের দিকে ছুটছিল। গোটা শিবির জুড়ে গমগম আওয়াজ উঠল:

"হুঁশিয়ার!"

খান নিশ্চল বসে থেকে ধীরে সুস্থে তৃতীয় একশ' সংখ্যা গুনে চলল, তারপর চতুর্থ।... দূর থেকে ভেসে এলো চাপা কোলাহল। কোলাহল ক্রমেই বাড়তে থাকে, খান বুঝতে পারল হাজার ঘোড়ার পাল ছুটছে। ঘোড়ার পাল আরও কাছে চলে এলো, তারপর টিলার গোড়ায় এসে ঝট্ করে থামল। খান ঘোড়ার ঘামের কটু ঘ্রাণ অনুভব করল। মুহূর্তের মধ্যে গোটা শিবির আচ্ছন্ন করে ধুলোর মেঘ উড়ল।

খান গোনে আর একের পর এক আঙ্গুল দুমড়িয়ে যায়। ঘোড়ার পালের মাঝখান থেকে চিঁহি চিঁহি রব ও চাঁট মারার চাপা আওয়াজ ভেসে এলো। খান ভাঙ্গা ভাঙ্গা নীচু গলায় হাঁক দিল:

"চাগান! হেই চাগান!"

"হেই, শুনতে পাচ্ছি!" অন্ধকার থেকে টানা টানা উত্তর এলো।

"আমি ছ'টা আঙ্গুল দুমড়িয়ে ফেলেছি! দেরি কেন?"

"আরও দুটো দুমড়ান, আমরা ততক্ষণে ঘোড়ায় চেপে বসব!"

চাঁদ আবার মেঘের আড়াল থেকে বাইরে এলো, উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ছাউনিগুলোর বেষ্টনীর মাঝখান — যেখানে চার দিক থেকে ছুটে আসছিল মোঙ্গলরা। এক দল বয়ে আনছিল জিন ও গদির কাপড়-চোপড়, অন্যেরা ঘোড়াগুলোকে তাদের ছাউনির দিকে নিয়ে

যাচ্ছিল, আর এক দল জোর কদমে তাদের পূর্বনির্দিষ্ট জায়গার দিকে ছুটছিল।

খান গুনে চলল। সপ্তম আঙ্গুলটি দুমড়ানোর পর পেছনে পদশব্দ শুনতে পেয়ে সে ফিরে তাকাল। দু' জন নোকর চেঙ্গিজ খানের জিন লাগানো ধূসর ঘোড়াটিকে নিয়ে এসেছে। হাতে কেশর আঁকড়ে ধরে সে জিনে উঠে বসে ধীরে ধীরে টিলার প্রান্তভাগে এগিয়ে গেল। তার পেছনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে সাত জন নোকর, একজনের হাতে আন্দোলিত নিশান।

খানের সামনে চার দিক থেকে ধেয়ে আসছে ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারের ঘন দঙ্গল। তারা সকলেই কিন্তু চট্‌পট্‌ যার যার জায়গা নিয়ে ফেলল। চেঙ্গিজ খান অষ্টম আঙ্গুলটি দুমড়ানোর অবসর পেতে না পেতে তার সামনে অশ্বারোহীদের ছয়টি সারি শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, প্রতিটি সারিতে একশ' করে সৈনিক, সামনে হাজারী দলের সেনাপতি চাগান আর তার পাশেই জন কয়েক তুরগাউদ দেহরক্ষী।

"চাগান, আমার কাছে!" চেঙ্গিজ খান চেঁচিয়ে উঠল।

চাগান টিলার দিকে এগিয়ে এসে খানের কাছ থেকে তিন পা তফাতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"সমস্ত খারাচু* আর স্তেপের কানখোলা খরগোশগুলো সব গিয়ে যেখানে উঠেছে ঐ পাহাড়টায় তুমি যাবে। তুমি ওদের সমস্ত ভেড়ার পাল এখানে তাড়িয়ে নিয়ে আসবে, একটা ভেড়াও ছাড়বে না। যাও!"

চাগান ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে সেনাদলের দিকে এগিয়ে গেল।

"আমার পিছু নাও!"

সেনাদল সারির পর সারি বেঁধে, শত জনের সারির পেছনে শত জন চাঁদের আলোয় শ্বেতোজ্জ্বল পথে মোড় নিল। খান টিলার প্রান্তভাগে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে গোনে আর একের পর এক আঙ্গুল গুটিয়ে যায়, যতক্ষণ না শেষ অশ্বারোহীটি দূরের আধা অন্ধকারে ডুবে গেল। খান দশম আঙ্গুল দুমড়াল:

'দাম্ভিক, হামবড়া খরেজম শাহ কি এমন ফৌজ তৈরি করতে পেরেছে? শিগ্‌গিরই বুখারার লড়াইয়ে তা দেখা যাবে।'

---

* খারাচু — সাধারণ দরিদ্র যাযাবর লোকজন।

নবম পরিচ্ছেদ

কারাভান গায়েব

চেঙ্গিজ খান তার মুসলমান দূতদের আদেশ দিল তারা যেন বিশাল কারাভান সাজায় এবং পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে চলেছে এমন ভাব করে খরেজম শাহের রাজত্বে যায়। চেঙ্গিজ খান চীন থেকে লুট করে আনা তার নিজস্ব মূল্যবান সামগ্রীর একটা বড় অংশ তাদের দিল আর লাভের টাকায় যত বেশি সম্ভব কাপড় কেনার আদেশ দিল, যাতে সে তা বিশিষ্ট লোকজনকে উপহার হিশেবে দিতে পারে।

মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ প্রচুর পণ্য-দ্রব্য বোঝাই কারাভানে পাঠাল, কিন্তু নিজে খরেজম যেতে রাজি হল না। সে এবং তার দুই সঙ্গী ছাউনিতে পড়ে পড়ে কাতরাতে লাগল এবং অন্যদের বুঝ দিল যে বুখারায় তাদের বিষ দেওয়া হয়েছিল। পাঁচশ' উটের কারাভান, তার সঙ্গে চলল বণিক ও তাদের হুকুম-বরদারের ভেকধারী সাড়ে চারশ' লোক। চেঙ্গিজ খান তার মোঙ্গল নোকর উসুনকে কারাভানের সর্দার করল।

তিয়েন-শানের গিরিশাখা অতিক্রম করে কারাভান সীমান্তবর্তী মুসলিম শহর ওতরারে পেঁছাল। সেখানে কারভোন-সর্দার উসুন শাহ মুহম্মদের স্বহস্তে স্বাক্ষরিত এবং মোম দিয়ে তার মোহর আঁকা প্রমাণপত্র নগরপালকে দেখাল; এই পত্রে শাহ মোঙ্গল বণিকদের 'অবাধে ও সম্পূর্ণ বিনা খাজনায় খরেজমের সমস্ত নগরে গমনাগমনের ও বাণিজ্যের' অনুমতি দান করেছে।

ওতরার শহরের খ্যাতি তার বাজারের জন্য। বসন্তকালে ও শরৎকালে দূর দূর যাযাবরভূমি থেকে যাযাবররা এখানে আসত। তারা সঙ্গে করে নিয়ে আসত ভেড়া ও ক্রীতদাসের দল, আনত নুনে ভেজানো চামড়া, পশম, বিভিন্ন রকমের পশুলোম, গালিচা আর সে সব বদল করে নিত কাপড়-চোপড়, জুতো, অস্ত্র, কুঠার কাঁচি, ছুঁচ, ও কাঁটা, থালা-বাটি এবং তামার ও মাটির তৈরি তৈজসপত্র। এসবই মাভেরান্নগর ও খরেজম শহরের হুনরী ও তাদের ক্রীতদাসদের হাতে তৈরি।

ওতরারের বাজারের পক্ষে কারাভানটির আগমন ছিল অসাধারণ ঘটনা। বণিকেরা এমন সব অপূর্ব ও মহার্ঘ সামগ্রী গালিচার ওপর সাজিয়ে রাখল যা ওতরারের লোকেরা কখনও চোখে দেখে নি। তারা দলে দলে ভিড় করে এসে অবাক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল নিখুঁত সোনার

প্রলেপ লাগানো এমন সব ধাতুমূর্তি যেগুলোকে সোনার ঢালাই করা বলে মনে হয়, সেই সঙ্গে মূল্যবান মণিখচিত 'সৌভাগ্যের প্রতীক' বাঁকা লৌহদণ্ড, মরকত ও অন্যান্য মণিতে অলঙ্কৃত পাত্র, ফরসী ও অদ্ভুত অদ্ভুত মূর্তি, পাতলা চীনেমাটির চাপাত্র ও পেয়ালা, বহুমূল্য পাথরে খচিত সোনার হাতল ও খাপ সমেত তরবারি। ছিল বীবর ও রুপোলী শিয়ালের চামড়া, ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য মেরুনকুলের লোমে পাড় ঢাকা খসখসে পুরু রেশমের পোশাক-পরিচ্ছদ। এ ছাড়াও অন্যান্য দুর্লভ ও মূল্যবান সামগ্রী ছিল। ভিড়ের মধ্য থেকে লোকে বলাবলি করতে লাগল:

"এই সমস্ত দামী দামী জিনিস তাতাররা চীনের রাজপ্রাসাদ থেকে লুঠ করে এনেছে। এই জমকালো পোশাকগুলোর ওপর শুকনো রক্তের দাগ দেখা গেলেও যেতে পারে। সৈন্যরা লুটের মাল নামমাত্র মূল্যে বণিকদের কাছে বেচেছে, আর বণিকেরা এখানে ফের বিক্রি করে মুনাফা লুটতে চায়।"

অন্যদের কথা হল: "আমাদের ফৌজ চীনে যায় না কেন? আমরাও ত এরকম ধন-দৌলত আনতে পারতাম।"

"তাতার বণিকরা যদি অর্ধেক দামে এই সব জমকালো জিনিস বাজারে ছাড়তে থাকে তাহলে ওতরারের বণিকরা করবেটা কী? আমাদের জিনিসের দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না।"

স্তেপের রাখালরা অসম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল।

"এ সব জিনিস কার দরকার? কেবল খান আর বেকদের, তা ছাড়া এ দিয়ে তৈরি হতে পারে হাকিম আর মহামান্য ইমামদের জোব্বা। এই জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদ কেনার জন্য এখন তারা আমাদের কাছ থেকে দ্বিগুণ খাজনা খসিয়ে ছাড়বে।"

ওতরারের নগরপাল হল খরেজমের শাহমাতা তুর্কান খাতুনের বোনপো ইনাল্‌চিক কাইর খান। সে তার অনুচরবর্গকে সঙ্গে নিয়ে বাজার ঘুরে দেখল, মোঙ্গল কারাভানের সাজানো জিনিসপত্রের সামনে দাঁড়াল এবং বণিকদের কাছ থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করল। তারপর উদ্বিগ্নচিত্তে কেল্লায় ফিরে গিয়ে সে খরেজম শাহের উদ্দেশে এক বার্তা পাঠাল, তাতে লিখল:

"বণিকের বেশে ওতরারে এই যে লোকগুলো এসেছে তারা বণিক

নয়, খুব সম্ভব তাতার খানের জাসুসী। এরা উগ্র স্বভাবের। বণিকদের মধ্যে একজন, জাতে হিন্দু, বেতমীজের মতো 'খান' পদবী বাদ দিয়ে আমাকে স্রেফ নাম ধরে ডাকার চেষ্টা করে, তাই আমি তাকে বেত মারার হুকুম দিয়েছি। বাদবাকি বণিকরা খরিদ্দারদের এমন সব বিষয় নিয়ে জিজ্ঞেসবাদ করে যার সঙ্গে বাণিজ্যের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। সাধারণ লোকজনের মধ্যে কাউকে একান্তে পেলে তারা হুমকি দেয়: 'তোমাদের অগোচরে কী ঘটছে সে ব্যাপারে কোন ধারণাই তোমাদের নেই। শিগ্গিরই এমন ঘটনা ঘটবে যার বিরুদ্ধে তোমরা দাঁড়াতে পারবে না।...' ''

এমন চিঠি পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে খরেজম শাহ মুহম্মদ ওতরারে মোঙ্গল কারাভান আটক করার হুকুম দিল। মোঙ্গল কারাভানের সর্দার উসুন সমেত সাড়ে চারশ' বণিকের সকলে রাতারাতি কেল্লার পাতাল ঘরে লোপাট হয়ে গেল আর ওতরারের স্থানীয় শাসনকর্তা মোঙ্গলদের পণ্য-দ্রব্য বিক্রির জন্য পাঠিয়ে দিল বুখারায়। যে টাকা উঠল তা খোদ খরেজম শাহের হাতে এলো।

গোটা কারাভানের মধ্য থেকে একমাত্র একজন উট চালক বেঁচে গেল। সে কোনরকমে পালিয়ে গিয়ে প্রথম মোঙ্গল চৌকিতে পৌঁছাল, সেখানে তাকে ঘণ্টি দোলানো ডাকবাহী ঘোড়ার* পিঠে তুলে দেওয়া হল এবং সে ভয়ঙ্কর সংবাদ নিয়ে চেঙ্গিজ খানের উদ্দেশে ছুটল।

দশম পরিচ্ছেদ

দূত অবধ্য

চাঁদ ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে আবার একাদশীর কাস্তে হয়ে বাঁকতে না বাঁকতে তাতার অধিপতির কাছ থেকে বুখারায় নতুন দূতের আগমন হল। এবারের দূত ইবন কেফরেজ বোগরা। তার পিতা কোন এক সময়

---

* চেঙ্গিজ খান তার সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান সড়কের ধারে ডাকচৌকি স্থাপন করে, খানের হুকুমনামা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেগুলিতে ডাকবাহী ঘোড়া ও হরকরা সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকত। ডাকবাহী ঘোড়ার গলায় ঘণ্টি সমেত বন্ধনী আঁটা থাকত, যাতে কেউ তার সামনাসামনি পড়লে ছেড়ে দেয়।

খরেজম শাহের পিতা তাকাশের অধীনে আমির ছিল। তার সঙ্গে এলো দু' জন সম্ভ্রান্ত মোঙ্গল।

দূতেদের অভ্যর্থনা জানানোর আগে খরেজম শাহ মুহম্মদ কিপচাক সেনাপতিদের সঙ্গে বহুক্ষণ সলা-পরামর্শ করল। তাদের নির্দেশক্রমে স্থির হল অহঙ্কারদৃপ্ত ও রূক্ষ ভঙ্গিতে মোঙ্গল দূতদের অভ্যর্থনা জানানো হবে এবং যা-ই হোক না কেন, চেঙ্গিজ খানের মতলব জানার জন্য তাদের বক্তব্য শোনা দরকার।

প্রধান দূত মাথা উঁচু করে প্রবেশ করল। সে হাঁটু একটুও বাঁকাল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রীতিমতো যুদ্ধংদেহি ভঙ্গিতে কথা বলে চলল, যদিও উকিলের কথামতো অস্ত্র সে প্রবেশ পথে জমা রাখে।

"পশ্চিম ভূখণ্ডের অধিপতি!" সে বলল, "আমরা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি যে চেঙ্গিজ খানের রাজ্য থেকে ওতরারে আমাদের যে বণিকরা এসেছিল তাদের আপনি নিজে আপনারই হাতে স্বাক্ষর করা এবং আপনার মোহর আঁকা প্রমাণপত্র দেন। তাতে আপনি আমাদের বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি দেন এবং হুকুম দেন সকলে যেন তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করে। কিন্তু আপনি তাদের সঙ্গে শঠতা করেছেন — তারা সকলে নিহত, তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। বেইমানীমাত্রেই ঘৃণ্য, তা আরও জঘন্য হয়ে দাঁড়ায় যখন আসে ইসলামের নেতার কাছ থেকে।"

খরেজম শাহ হুঙ্কার দিয়ে উঠল:

"বেহায়া কোথাকার! তোর এত বড় সাহস যে আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলিস! আমার আমলা যে কাজ করেছে তার জন্য আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিস কী বলে?"

"শাহেনশাহ, তার মানে আপনি বলতে চান যে ওতরারের শাসনকর্তা আপনার আজ্ঞা বিরোধী কাজ করেছে? চমৎকার কথা! তাহলে ঐ অপরাধী ভৃত্য ইনাল্‌চিক কাইর খানকে আমাদের হাতে তুলে দিন, কীরকম সাজা তার হওয়া উচিত আমাদের খান-ই-খানানের তা জানা আছে। কিন্তু উত্তরে আপনি যদি 'না' বলেন তাহলে যুদ্ধের জন্য তৈরি হোন, আর সে লড়াইয়ে, বলে রাখছি নির্ভীক বহু লোকের কলিজা খসে পড়বে, তাতারদের কঠিন ধারালো বর্শা লক্ষ্য ভেদ করবে!"

হুমকি শুনে খরেজম শাহ গভীর ভাবনায় ডুবে গেল। সকলে নিস্পন্দ,

বুঝতে পারে এখনই মীমাংসা হবে সেই প্রশ্নের: যুদ্ধে নামা না যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা? কিন্তু কিছু সংখ্যক উত্তেজিত কিপচাক খানেরা চেঁচামেচি শুরু করে দিল:

"হামবড়াটার লাশ চাই! আমাদের হুমকি দেয়, এত সাহস! শাহেনশাহ, ইনাল্‌চিক কাইর খান যে আপনার মাসতুত ভাই! আপনি কি তাকে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলার জন্য কাফেরদের হাতে তুলে দেবেন? আজ্ঞা হোক, এই বাচালটাকে খতম করে দেওয়ার, নয়ত আমরাই একে খতম করি!.."

খরেজম শাহ মড়ার মতো পাণ্ডুর ও ধূসর মুখে বসে রইল। তার দুই ঠোঁট থরথর করে কেঁপে উঠল যখন সে নীচু গলায় বলল:

"না, আমার বিশ্বস্ত কর্মচারী ইনাল্‌চিক কাইর খানকে আমি দেব না!"

তখন কিপচাক খানদের মাঝখান থেকে একজন মোঙ্গল দূতের দিকে এগিয়ে এসে তার দাড়ি চেপে ধরল, তলোয়ারের এক কোপে দাড়ি কেটে ফেলে তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিল। দূত ইবন কেফরেজ বোগরা বলবান এবং সাহসী হওয়া সত্ত্বেও মারামারির মধ্যে গেল না, কেবল চেঁচিয়ে বলল:

"কোরান শরিফে বলা হয়েছে: দূত অবধ্য!"

খানেরা চেঁচিয়ে উঠল:

"তুই আবার দূত কিসের? — তাতার খানের জুতোর ধুলোবালি! তুই মুসলমান হয়ে আমাদের দুশমনদের সেবা করিস কেন? তুই বেইমান, তাতারদের মলমূত্র! তুই দেশের শত্রু!"

বলার সঙ্গে সঙ্গে কিপচাক খানেরা দূতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তরবারির খোঁচায় তাকে শেষ করে দিল আর তার দুই মোঙ্গল সঙ্গীকে প্রহারে জর্জরিত করল।

ঐরকম আঘাত জর্জরিত অবস্থায় তাদের পেঁছে দেওয়া হল খরেজম শাহের রাজত্বের সীমানায়. সেখানে তাদের দাড়ি পোড়ানো হল, তারপর ঘোড়া কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল।

চেঙ্গিজ খান ক্রুদ্ধ

দিনের মধ্যে কয়েকবার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে খান কিসের যেন প্রতীক্ষায় দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাঁবুতে ফিরে সে রেশমী গালিচার ওপর বসে পড়ে, তার প্রধান অমাত্য চীনা বংশোদ্ভূত ইয়েলিউ চু-ত্সাই তাকে যা যা বোঝায় সে সব মনোযোগ দিয়ে শোনে। ইয়েলিউ চু-ত্সাই দীর্ঘকায়, কৃশ, ধীরস্থির স্বভাবের ব্যক্তি, তার চোখের দৃষ্টি সজাগ ও তীক্ষ্ন।

"ঘোড়ায় বসে দুনিয়া জয় করা যায় বটে, কিন্তু জিন আঁকড়ে পড়ে থেকে দুনিয়া শাসন করা অসম্ভব। অবিলম্বে প্রতিটি জেলায় শাসনকর্তা নিয়োগ করা দরকার — সে শস্য ভাণ্ডারের তদারক করবে, জনসাধারণের কাছ থেকে ন্যায্য কর আদায়ের উদ্দেশ্যে 'কাছারি' বসাবে আর যারা কর দেবে না তাদের মৃত্যুদণ্ড দেবে। বিজ্ঞ লোকদের মাঝখান থেকে নির্বাচিত দু' জন করে ব্যক্তিকে এধরনের 'কাছারিতে' বহাল রাখতে হবে; তাদের একজন হবে প্রধান, আর অন্য জন — তার সহকারী। আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বণিকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা দরকার, সুরা, সির্কা ও লবণের ওপর, লোহা, সোনা ও রুপো নিষ্কাশনের ওপর এবং চাষের জমিতে সেচের জল ব্যবহারের অধিকার লাভের জন্য শুল্ক বসানো দরকার।..."*

"এ সবই কাজের কথা বটে," চেঙ্গিজ খান উত্তর দিল।

মোহর জিম্মাদার উইগুর ইজমাইল খোজা খানের হাতে মোহর তুলে দিল। মোহরটিতে ছিল রক্তবর্ণচর্চিত সোনালী ফলকের ওপর মরকত মণির ব্যাঘ্রমূর্তি। ইয়েলিউ চু-ত্সাই ইতিপূর্বেই যে ফরমানটি প্রস্তুত করে রেখেছিল খান তার ওপর ছাপ মারল।

রৌদ্রদগ্ধ নিবাতে মধ্যাহ্নে স্তেপের ওপর উত্তাপের তরঙ্গ কাঁপতে থাকে। চেঙ্গিজ খানের গোটা শিবির ঝিমন্ত, প্রান্তরে ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ ঘোড়াগুলো অবধি এখন পালে পালে জোট বেঁধে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সমান তালে মাথা আন্দোলন করে তাদের চার ধারের উড়ন্ত ডাঁশ তাড়াচ্ছে। দূর থেকে মাছির গুঞ্জনের মতো মৃদু একটানা আওয়াজ ভেসে আসে।

* রশীদ উদ্-দিন।

তারপর স্পষ্ট হয়ে উঠল ঘণ্টির টুং টাং। চেঙ্গিজ খান খর্বাকৃতি পুরুষ্টু আঙ্গুল তুলল, দ্বারের দিকে চৌকো মুখ ঘুরাল, ভারী স্বর্ণ কুণ্ডলে ঝুলন্ত লতি সমেত বিশাল কানটি খাড়া করল।

"হরকরা, একা নয়।..." এই বলে সে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো।

ইতিমধ্যেই রাস্তার ওপর দিয়ে ধুলোর ঘূর্ণি গড়িয়ে আসতে দেখা গেল।

তিন জন অশ্বারোহী শিবিরের দিকে ছুটছিল। তারা কালো রঙের ছাউনিগুলো অবধি পৌঁছুতে একটা ঘোড়া হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল, অশ্বারোহীও ছিটকে পড়ল মাথা ডিঙিয়ে।

প্রহরীরা লাগাম টেনে ধরে ঘোড়াগুলোকে তোরণের দিকে নিয়ে এলো। সেখান থেকে প্রহরীদের সঙ্গে আগন্তুকদের দু' জন এগিয়ে চলল আস্তাবলের উদ্দেশে — সেখানে চেঙ্গিজ খানের দেখা মিলল।

খান একটা সাদা মাদী ঘোড়ার সামনে আলগোছে বসে লক্ষ্য করছিল কীভাবে ধূসর রঙের বাচ্চা ঘোড়া তার মায়ের গোলাপী বাঁটে মুখ দিয়ে গুঁতো মেরে চলেছে।

আগন্তুক দু' জনের সর্বাঙ্গে পট্টি বাধা। ক্ষত ও পুঁজে ঢাকা তাদের মুখ স্ফীত হয়ে উঠেছে। তাদের চেহারার এমনই পরিবর্তন ঘটেছে যে খান তাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল:

"তোমরা কারা?"

"খান-ই-খানান! আগে আমরা ছিলাম আপনার হাজারী দলের সেনাপতি, এখন আমরা হয়েছি কবর ফেরত মানুষ। খরেজমের শাহের খেয়াল চাপল আমাদের নিয়ে নিষ্ঠুর ঠাট্টা-তামাসা করবে, তাই হুকুম দিল সৈন্যের সম্মান ও মর্যাদার চিহ্ন আমাদের এই দাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার।"

"ইবন কেফরেজ বোগরা তাহলে কোথায়?"

"তিনি আপনার হুকুমের কথা জোর গলায় বলায় যে সব কুকুর খরেজম শুয়োরের চার দিক ঘিরে ঘেউঘেউ করে তারা তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছে।"

"কী! তারা আমার দূতকে — সাহসী, বিশ্বাসী ইবন কেফরেজ বোগরাকে কেটে ফেলেছে?"

চেঙ্গিজ খান আর্তনাদ করে উঠল। সে বালিমুঠি তুলে মাথায় ছড়াল, অশ্রুসিক্ত মুখের ওপর হাত ঘষল, সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল,

এলোমেলো, ভারী পদক্ষেপে রাস্তা বরাবর ছুটল। ইতিমধ্যে যারা তার কাছাকাছি ছিল তারা ছাড়াও নতুন নতুন সৈন্য চিৎকারে সচকিত হয়ে তার পিছু পিছু ছুটে গেল — যদিও বুঝতে পারে না উৎকণ্ঠার কারণটা কী।

খান হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়ার খুঁটির বাঁধন ধরল, খুঁটি থেকে জিন ছাড়া ঘোড়া খুলে নিয়ে তার কেশর আঁকড়ে ধরে হুড়মুড় করে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল, বায়ুবেগে সোজা নীল পাহাড়ের দিকে চলল। ইয়েলিউ চু-ত্সাই ও চেঙ্গিজ খানের পুত্ররা ঘোড়ায় চেপে বসে তাকে অনুসরণ করল।

তারা প্রস্তরসঙ্কুল পাহাড়ের দিকে কদম ছুটিয়ে এলো। দেবদারু শ্রেণীর মাঝখানে শিলাখণ্ডের প্রান্তে খান দাঁড়িয়ে ছিল। দূর থেকে তাকে দেখা যাচ্ছিল। সে টুপি খুলে গলায় কোমরবন্ধনী ঝুলাল।* তার ধূলিধূসরিত তামাটে মুখ বেয়ে বড় বড় ফোঁটায়, চক্‌চকে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ল।

"অমরলোক! তুমি সাধুদের ত্রাণ কর, দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তি বিধান কর!" খান চেঁচিয়ে উঠল। "অসাধু মুসলমানগুলোকে সাজা দাও! আমার বাহাদুর যোদ্ধারা, তোমরা শুনছ: মুসলমানরা আমার দূত উসুনকে আর যে সাড়ে চারশ' উৎসাহী বণিক সেখানে ব্যবসা করতে গিয়েছিল তাদের খুন করেছে। মুসলমানরা তাদের সমস্ত পণ্য লুটে করে নিয়েছে, আমাদের উপহাস করছে। তারা আমার আরও এক দূত সাহসী ইবন কেফরেজ বোগরাকে খুন করেছে। তারা শুয়োরের চামড়া ঝলসানোর মতো করে আর দু' জন দূতের দাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, ঘোড়া কেড়ে নিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এটা কি আমরা সহ্য করব?"

"মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য আমাদের নিয়ে চলুন!" তাতাররা চেঁচাল। "আমরা ওদের শহর ছারখার করে দেব, বৌ-বেটাসুদ্ধ সকলকে খুন করব! আমরা ওদের গোটা ভেড়ার পাল ও সব ঘোড়া ছিনিয়ে নেব।"

"সেখানে হিম নেই, ঠাণ্ডা তুষারঝড় নেই," চেঙ্গিজ খান গলা চড়িয়ে বলে চলল। "সেখানে সব সময়ই গরমকাল, সেখানে জন্মায় মিঠে খরমুজা,

---

* মোঙ্গলদের কাছে এর তাৎপর্য হল 'স্বর্গের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করা'।

তুলো ও আঙুর। সেখানকার জলায় গরমকালে তিন বার ঘাস গজায়। এমন সুখের দেশে কিনা মুসলমানদের মতো অপরাধীরা বাস করবে? আমরা ওদের জমি কেড়ে নেব, ওদের শহরগুলো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব। গুঁড়িয়ে দেওয়া শহরের জায়গায় আমরা যব বুনব, সেখানে আমাদের শক্ত ঘোড়াগুলো চরবে আর দাঁড়িয়ে থাকবে কেবল আমাদের বিশ্বস্ত স্ত্রী ও সন্তানদের ছাউনি। মুসলমানদের দেশে যাওয়ার জন্য তোমরা কি প্রস্তুত?"

"আমাদের কেবল দেখিয়ে দিন তারা কোথায়, আমরা তাদের খতম করব!" তাতাররা চিৎকার করল।

"শামানদের সাহায্য ছাড়াই আমি দেখতে পাচ্ছি যে 'সৌভাগ্যের চাঁদ' উঠেছে এবং এই হল পশ্চিমে ফৌজ নিয়ে যাওয়ার সময়!'' চেঙ্গিজ খান জোর গলায় বলল, তারপর ঘুরে ধীরে ধীরে পাহাড়ের আরও ওপরে উঠতে লাগল। পিছন পিছন চলল তার দেহরক্ষীরা এবং চেঙ্গিজ খান যেখানে নিজের ভাবনা-চিন্তা নিয়ে একা থাকতে চাইল পাহাড়ের সেই জায়গাটার চার দিকে তারা বেষ্টন দিয়ে রইল।

পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে আরও ওপরে উঠে চেঙ্গিজ খান সেখানে এক সমতল জায়গার ওপর আগুন জ্বলতে দেখল। একটি ছেলে তার পাশে বসে বহনযোগ্য ছোট হাপর দিয়ে কয়লার আঁচে ফুঁ দিচ্ছিল, আগুনে পড়ে ছিল তেতে ওঠা লোহার টুকরো। সেখানেই আলগোছে বসে এক বুড়ো মোঙ্গল সাঁড়াশী দিয়ে লোহার টুকরোটা উল্‌টে-পাল্‌টে দিচ্ছিল, তার হাতে পেটানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে ধরা ছিল কামারের হাতুড়ি।

"কে তুই?" খান জিজ্ঞেস করল।

"আমি কামার খোরি, জেবে নোইয়নের দলের লোক।''

"তুই এখানে কেন?"

"তীরের জন্য পোড় খাওয়া লোহার ফলা তৈরি করছি। লোহার আঘাতেও এগুলো বেঁকে না, সবচেয়ে মজবুত বর্ম ফুঁড়ে যায়। এরকম মোক্ষম তীর বানিয়ে আমি কি আপনাকেই সাহায্য করছি না?"

"তুই ঠিক কথাই বলছিস," চেঙ্গিজ খান মন্তব্য করল। "তা তুই এখানে, পাহাড়ের ওপর কাজ করছিস কেন?"

"এখানে পাহাড়ের ওপর বহু ধুনোভর্তি গাছের শেকড় আছে, সেগুলো জ্বালিয়ে প্রচন্ড তাপ পাওয়া যায়। তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে

গেলে কি, এখান থেকে, পাহাড় থেকে আমি দূরে দেখতে পাই স্তেপ, ঐ পাশে আছে আমাদের আস্তানা, যেখানে আমার জন্ম।"

"কী আজেবাজে বকছিস? এখান থেকে আমাদের আস্তানা দেখা যায় না। অনেক দূরে!''

"দূর বলুন আর যাই বলুন, স্তেপ সর্বত্রই এক। আমি আমার জন্মস্থান যেদিকে, সেদিকে তাকাই, মনটা হাল্কা লাগে।"

"এই ছোঁড়াটা কি তোর ছেলে?"

"ছিল চীনেদের ছেলে, এখন আমার ছেলে। খান-ই-খানান, আমি আপনার সঙ্গে চীনে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে এই অনাথ ছেলেটিকে জোগাড় করেছি। ঘোড়ার জিনের ওপর ওকে মানুষ করেছি। এখন কামারশালায় আমার ডান হাত হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"তোর কামারশালাটা কোথায়?"

"গোটা কামারশালাটাই আমার সঙ্গে ঘোড়ার ওপর। এই হল হাতুড়ি, আর এক টুকরো লোহা নেহাইয়ের কাজ করে। হাপর আমি রাখি থলিতে, ওটা বয়ে চলি দ্বিতীয় ঘোড়ায়, যাতে আমার ছেলে বসে।"

"তোর ঘোড়া দুটো কি ভালো, শক্ত সমর্থ?"

"আমার ঘোড়াগুলো একেবারেই বুড়ো, ওগুলোকে নিয়ে কত লড়াইয়ে না গেছি! যখন আমরা বুখারায় যাব তখন সেখানে শক্ত দেখে ঘোড়া বেছে নেব, আর হাতুড়ি পেটানোর জন্য গোটা কয়েক গোলাম।..."

''ভালোমতো লড়াই করলে গোটা ঘোড়ার পাল পেয়ে যাবি।''

''এখন কি আর আমি সৈন্য হওয়ার যুগ্যি! নানা জায়গায় জখম হয়ে আর কিছু নেই। যুদ্ধে আমাকে দিয়ে বিশেষ লাভ হবে না, তবে হ্যাঁ ছুরি আর তীরের ফলা পেটাই করতে পারি — এটা আমার অভ্যেস আছে বটে। খান-ই-খানান, বলুন ত এখানে কি আমাদের আরও অনেক দিন বসে থাকতে হবে? আমাদের জেবে নোইয়নের দল ত খিদেয় মরে যাচ্ছে, নিজেদের ঘোড়া খেয়ে ফেলছে। আরও এগিয়ে যাওয়ার সময় এসে গেছে বোধ হয়।...''

চেঙ্গিজ খান ভয়ঙ্কর ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল: এটা কুলক্ষণ।

"না, কামার খোরি, আগে আমাকে বল দেখি জেবে নোইয়নের গোটা দল যেখানে দিন দশ-বারো আগে এগিয়ে চলে গেছে সেখানে কি তুই তার নাগাল ধরার জন্য স্তেপে ঘুরে বেড়াবি আর সামনে যে কোন বাউণ্ডুলের

দেখা পাবি তাকেই জিজ্ঞেস করবি তাদের কেউ জেবে নোইয়নকে দেখেছে কিনা? আমার সব নোকর যদি শিবিরের এদিক-ওদিক ছাড়া ছাড়া ঘুরে বেড়াতে থাকে তাহলে ত গোটা ফৌজের আর কিছু থাকবে না!"

কামার কাঁপতে কাঁপতে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

"আমার হুকুম: এই কামার খোরিকে আমার হাজারী দলের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে তার পায়ের গোড়ালিতে যেন এমনভাবে বিশ ঘা বেত মারা হয় যাতে যন্ত্রণা কাকে বলে তা টের পায়। যে সব নোকর তাদের দল ছেড়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে তাদের ধরার জন্য শিবিরের চার পাশে এক্ষুণি টহলদার ঘোড়সওয়ারদের পাঠানো হোক, সেই সব দলের সর্দার এবং তাদের হাজারী সেনাপতিদের নাম আমাকে জানানো হোক, আমি তাদের সকলকে সাজা দেব।"

কামার হাত দিয়ে চেঙ্গিজ খানের বিশাল বক্র পদযুগল আলিঙ্গন করতে চেঙ্গিজ খান তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল, ধীরে ধীরে পাথুরে পায়ে-চলা পথ ধরে ওপরে উঠতে লাগল। অবশেষে সে থামল।

"আমি এখানে আমার অভিযানের সাফল্যের জন্য স্বর্গের সঙ্গে কথাবার্তা বলব। পাহাড়ের চার দিকে পাহারা বসাও, যাতে কথাবার্তার সময় কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে!" এই বলে খান আরও দূরে, পাহাড়ের চূড়ার দিকে চলল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সমুচিত পত্র

> মোঙ্গল ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা চেঙ্গিজ খানের জানা ছিল না, সে লিখতেও জানত না।
>
> (আকাদমিশিয়ান ভ. বার্তোল্‌দ)

সন্ধ্যা নাগাদ খান তার তাঁবুতে ফিরে এসে নিজের অভিজ্ঞ সামরিক নেতাদের ডেকে পাঠাল। সেখানে উপস্থিত ছিল চেঙ্গিজ খানের যৌবন সঙ্গীরা — বিজয় গৌরবমণ্ডিত বন্ধুরা, যাদের দেহ ন্যুব্জ ও বিশীর্ণ,

চুল সাদা ও গালের চামড়া শিথিল; ছিল দূরদর্শী খানের কৃপায় পদোন্নত, কীর্তি রচনার নেশায় উদ্‌গ্র তরুণ যোদ্ধারা। প্রত্যেকের পতাকাতলে আছে অভিযানের জন্য দস্তুরমতো প্রস্তুত দশ হাজার করে অশ্বারোহী।

সকলে ভিড় করে অর্ধ চক্রাকারে গালিচার ওপর বসে ছিল। একমাত্র চেঙ্গিজ খান বসে ছিল অন্যদের চেয়ে উঁচু আসনে — স্বর্ণ সিংহাসনে। সিংহাসনের পিঠ চীনা হুনুরীর নিপুণ হাতে এমনভাবে তৈরি যেন 'সৌভাগ্যসূচক ড্র্যাগনেরা' পরস্পর বিজড়িত হয়ে থেকে অদ্ভুত আকৃতির এক 'মুক্তাখন্ড' নিয়ে খেলা করছে। সিংহাসনের দুই হাতলে দু'টি ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মূর্তি। সোনার কারুকাজ করা এই আসনটি খান চীন সম্রাটের রাজপ্রাসাদ থেকে হস্তগত করে এবং সমস্ত অভিযানে এটাকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

সিংহাসনের ডান দিকে উপবিষ্ট চেঙ্গিজ খানের দুই ভ্রাতা ও তার দুই কনিষ্ঠ পুত্র — উগেদেই ও তুলি, বাঁ পাশে আসীন খানের কনিষ্ঠা পত্নী তরুণী কুলানে খাতুন — তার হাতের কব্জি থেকে শুরু করে কাঁধ অবধি মহার্ঘ মণিমুক্তাখচিত কণ্ঠমালো ও স্বর্ণ কঙ্কণে ঝলমল করছে। চীনা ভৃত্যরা নিঃশব্দ চরণে উপবিষ্টদের পেছনে ঘুরে ঘুরে স্বর্ণপাত্রে খাদ্য, ঘোলের সরবৎ এবং কড়া রক্তিম সুরা পরিবেশন করছিল।

খানের বাঁ হাত বরাবর তার তরুণী ভার্যার পাশে বসে ছিল দুই দূত: একজন হল মহা শৌর্যবান তানগুত* সম্রাট বুরখানের প্রতিনিধি আশাগান্‌বু, অপর জন দক্ষিণ চীনের সুন্‌ সম্রাটের প্রতিনিধি — সেনানায়ক মেন হুন**; উত্তর চীনের ত্‌সিন সম্রাটের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক থাকায় দক্ষিণ চীনের সম্রাট মোঙ্গলদের সঙ্গে মৈত্রী ও জোট প্রার্থী।

এই ভোজসভায় চেঙ্গিজ খান সোনার তৈজসপত্রের জাঁকজমকে এবং ভোজ্য দ্রব্য ও পানীয়ের প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে অতিথিদের তাক লাগিয়ে দিল। বিশাল বিশাল স্বর্ণপাত্রে পরিবেশিত হল গরম-গরম খাবার: বাচ্চা মাদী ঘোড়ার মাংস, বুনো হরিণ ও স্তেপের পাখির মাংস। তার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে আসতে লাগল চীনা পাচকের তৈরি নানা ধরনের অপূর্ব মিঠাই। ঘোড়ার টকানো দুধ, ঘোল, পারস্যের রক্তিম সুরা, তরমুজের বীজ থেকে তৈরি

* তানগুত সাম্রাজ্য — চীনের উত্তর-পশ্চিমের একটি জেলা।

** মোঙ্গলদের ও চেঙ্গিজ খান সম্পর্কে মেন হুনের বৃত্তান্ত আজও সংরক্ষিত আছে।

চীনদেশীয় কড়া মদ, বহুদিন ধরে দীর্ঘ পথে বহুবার বদলি ঘোড়ায় চেপে হরকরাদল দক্ষিণাঞ্চল থেকে যে ফলমূল বয়ে এনেছে সেই সব দুর্লভ সামগ্রী — এ সবই, বিশেষ করে যেখানে বুনো ঘোড়ার পাল চড়ে বেড়ায় আর ব্যাঘ্রদল তাদের সন্ধানে বিচরণ করে, এমন এক নির্জন উপত্যকার পরিবেশে অসাধারণ বলে মনে হল।

তাঁবুর রেশমী পর্দার অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে চীনা গায়িকাদের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের গান, বাঁশি ও বাঁশিজাতীয় অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ। বিচিত্র সাজ পোশাক পরনে কিছু সংখ্যক নর্তকী নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলছিল কী করে নিঃশঙ্কচিত্তে স্তেপে হরিণ চরে বেড়ায়, কীভাবে বনবিড়াল গুড়ি মেরে এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত নিজেই অন্তরালবর্তী শিকারীর তীরে প্রাণ দেয়।

সফল ভোজসভায় পরিতৃপ্ত চেঙ্গিজ খান সিংহাসনের ওপর পা গুটিয়ে বসে চবর্‌চবর্‌ শব্দে আহার করে চলছিল, বিশেষ এক পাত্র থেকে ঝলসানো মাংসের টুকরো তুলছিল; তার সামনে চীনা ভৃত্য নতজানু অবস্থায় পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। অতিথিদের মধ্যে যাদের প্রতি খান অসীম করুণা দেখাতে ইচ্ছুক, তাদের মুখে ভালো ভালো মাংসের টুকরো তুলে দিচ্ছিল।

ভোজের সময় চেঙ্গিজ খান তানগুত দূতের দিকে ঈর্ষাভরে আড়চোখে তাকাচ্ছিল: এই দূতটি খানের স্ত্রী কুলান খাতুনের পাশে বসে তার হাসির উদ্রেক করে বলে যাচ্ছিল তার মতো লোক, যে কখনও স্তেপে পথ হারায় নি, সেও কী করে চীনে প্রথম এসে রাজধানীর সরু সরু আঁকাবাঁকা অলিগলির মধ্যে পথ গুলিয়ে ফেলে। কুলান কোন দিকে খেয়াল না করে হাসতে থাকে। চেঙ্গিজ খান ভেড়ার ঠ্যাং চিবুতে চিবুতে তানগুত দূতকে বলল:

"তোমার অধিপতি সম্রাট বুরখান সামনের নতুন অভিযানে আমার ডান হাত হবেন বলে কথা দিয়েছেন। এখন মুসলমান জাতি আমার দূতদের মেরে ফেলায় আমি খরেজমের শাহকে সাজা দিতে চলেছি। সম্রাট বুরখানকে তাঁর ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়ে আমার ফৌজের ডান পাশে সামিল হতে হয়।"

সুন্দরী কুলান খাতুনের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত তানগুত দূত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চেঙ্গিজ খানকে উত্তর দিল:

"অভিযানের জন্য আপনার যদি যথেষ্ট সৈন্য না থাকে তাহলে আর খান হওয়া কেন?"

চেঙ্গিজ খান ভেড়ার ঠ্যাং পাশে ফেলে দিয়ে সাদা কৃষ্ণসার চর্মের জুতোর গায়ে তৈলাক্ত আঙ্গুল মুছল, দামী পশুলোমের আঙরাখার প্রান্ত গোঁফের ওপর বুলোল। সকলে চুপ। হাসফাস করতে করতে সে ঘড়্ঘড়্ আওয়াজ তুলল, তারপর তানগুত দূতকে উদ্দেশ্য করে বলল:

"তুমি তোমার সম্রাটের তরফ থেকে বলছ। এমন উদ্ধত জবাব দিতে তুমি সাহস পেলে কোথা থেকে? আমার বিশাল ফৌজকে এক্ষুণি তানগুত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে চালানো কি কঠিন কাজ নাকি? কিন্তু এই মুহূর্তে আমি অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত আছি, তাই তোর মতো খল, ইতর তানগুতদের আমি এখনই সাজা দিতে যাচ্ছি না। তবে অমরলোক যদি আমাকে শত্রুর তীর থেকে বাঁচিয়ে রাখে তাহলে প্রতিজ্ঞা করছি খরেজম শাহকে খতম করে ফিরে আসার পর আমি তোর বেইমান প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামব। তখন তোর এই কথার যোগ্য জবাব পাবি, দেখতে পাবি আমি খান হওয়ার ক্ষমতা রাখি কিনা!.. ইয়েলিউ চু-ত্সাই, এক্ষুণি ঘোড়ায় জিন দিতে বল, এই তানগুত কুকুরের বাচ্চাটা আমার তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাক।"

তানগুত দূত আশাগান্‌বু আমতা-আমতা করতে করতে উত্তরে বলল:

"আমি অপমানজনক কিছু বলেছি কি?"

কিন্তু চীনা ভৃত্যেরা দুই হাত চেপে ধরে তাকে তাঁবু থেকে টেনে হিঁচড়ে বার করে দিল।

চেঙ্গিজ খান ভ্রূকুটি করল, চীনা দূত মেন হুনের দিকে ফিরে কঠোরস্বরে বলল যে সে অতি অল্প পান করেছে, তাই শাস্তিস্বরূপ তাকে পর পর বড় বড় ছয় পাত্র সুরা পানের হুকুম দিল। দূত আজ্ঞানুবর্তী হয়ে পান করতে লাগল এবং অতিথিরা সকলে মিলে সে সময় চীনা ব্যক্তিটির সম্মানে প্রশংসাসূচক গান ধরল। ষষ্ঠ পাত্রের পর দূত টলে পড়ে গিয়ে নিদ্রায় ঢলে পড়ল। চেঙ্গিজ খানকে আবার খুশি-খুশি ও অমায়িক দেখা গেল, সে বলল:

"আমার অতিথি ভালোমতো পান করেছেন। তার মানে উনি আমার বন্ধু, আমার ভাবনা-চিন্তার শরিক। আমার বন্ধুকে সাবধানে তাঁর তাঁবুতে তুলে নিয়ে যাও। সকালে উনিও তাঁর দেশের দিকে ফিরতে পারবেন। পথে সর্বত্র নগরপালরা যেন তাঁকে একটু বেশি সময় ধরে রাখে, খানা পিনা

দিয়ে খুশি করে। আমার আদেশ এই যে পথে ভালো ভালো বাজিয়েরা যেন তাঁকে বাঁশী আর তারের বাজনা বাজিয়ে শোনায়। আমাদের কামনা এই যে আমাদের চীনা বন্ধুটি যেন কোন কিছুর অভাব বোধ না করেন।"

নিদ্রিত দূতকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে চেঙ্গিজ খান ইয়েলিউ চু-ত্সাইয়ের উদ্দেশে বলল:

"আমার দূতের ঘাতক খরেজম শাহ মুহম্মদকে চিঠি লেখা হয়েছে কি?''

খানের প্রধান অমাত্য শান্তস্বরে জবাব দিল:

"দুই সাহসী সেনানায়ক যখন লড়াইয়ের জন্য তৈরি হন তখন কি আর আমি যোগ্যভাবে লিখতে পারি? আমি কেবল জানি বিজিত দেশ-গুলোতে কীভাবে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায়, চেষ্টা করি যাতে আপনার হুকুম পালিত হয়। এই কারণে চিঠি লিখেছে আপনার আরও অভিজ্ঞ কলমচী ইজমাইল খোজা উইগুর।"

"কোথায় সে?"

বর্ষীয়ান সচিব এবং খানের মোহর জিম্মাদার ইজমাইল খোজা সিংহাসনের কাছে এগিয়ে এসে নতজানু হল, সে মাথার ওপর তুলে ধরে আছে তুলট কাগজের পাকানো মোড়ক।

"পড়!"

ইজমাইল খোজা পড়তে শুরু করল:

"অমরলোক আমাকে সমস্ত জাতির খান-ই-খানান রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিগত সাত বৎসরে আমি বহু অসাধারণ কর্ম সম্পাদন করিয়াছি। সুপ্রাচীন কাল হইতে এই রূপ সাম্রাজ্য কদাপি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যে সকল নৃপতি আমার বশ্যতা স্বীকার করেন না আমার নির্মম আঘাতে তাঁহারা বিনাশপ্রাপ্ত হন। আমার বাহিনীর আগমনমাত্র অতি দূর দেশসমূহ পর্যন্ত বশীভূত ও শান্ত হয়। তোমার এই রূপ শ্রদ্ধা বোধ নাই কেন? ভাবিয়া দেখ! তুমিও কি আমার রোষের আঘাত গ্রহণে ইচ্ছুক?..''

চেঙ্গিজ খান সিংহাসন ছেড়ে নেমে এলো, ইজমাইল খোজাকে পাঠ শেষ করার অবকাশ না দিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে বার্তাটি ছিনিয়ে নিল।

"এ চিঠি কাকে লেখা? আমার সঙ্গে কথা বলার যোগ্য কোন অধিপতিকে না কানকাটা কুকুরের বাচ্চাকে? এটা কি শত্রুর সঙ্গে কথা বলার রীতি? তুই নিজে মুসলমান, তাই মুসলমান খানের সামনে লেজ নাড়িস। তুই বলতে চাস শাহ মুহম্মদ যেন ভেবে দেখে। আমি কি তাকে ডরাই?"

ইজমাইল খোজা গালিচায় মুখ গুঁজে পড়ে থেকে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। খান তাকে কোমরের কষি ধরে হিড়হিড় করে তাঁবু থেকে বার করে আনল, লাথি মেরে দোর গোড়ায় ঠেলে দিল। অমাত্য ইয়েলিউ চু-ত্সাই তার পাশে উপস্থিত হয়ে মৃদু তিরস্কারের সুরে বলতে লাগল:

"আপনার কলমচীর পাকা চুল-দাড়ির দিকে একবার নজর দিন। তার এত কালের সেবার কথা একবার স্মরণ করুন। ও আপনার ছেলেদের ও নাতীদের লেখাপড়া শিখিয়েছে। বিশ্বস্ত সেবককে এইভাবে শাস্তি দেওয়া ঠিক নয়।..."

চেঙ্গিজ খান সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল:

"ইজমাইল খোজা গোলামের মতো চিঠি লেখে। নিজের মান রেখে কথা বলতে ও জানে না। আমার নাতীদের লেখাপড়া শেখায় শেখাক, তবে রাজা-রাজড়ার সঙ্গে যেন কথা বলতে না আসে।"

খান তাঁবুতে ফিরে এসে আবার সিংহাসনে উঠে বসল। ডান পায়ের হাঁটু দু' হাতে চেপে ধরে সে বেশ কিছুক্ষণ বাঁ পায়ের গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে বসে রইল। তার হলদেটে সবুজ চোখ কখনও বিস্ফারিত হয়, কখনও বা সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। সিংহাসনের পাশে সাদা তুলট কাগজ হাতে অন্য এক কলমচীর আবির্ভাব হল। ইয়েলিউ চু-ত্সাই কলমচীকে লেখার জন্য খাগের কলম বাড়িয়ে দিল। কিন্তু চেঙ্গিজ খান তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি এক বিন্দুতে নিবদ্ধ করে চুপচাপ বসে থাকে। তারপর সে প্রতীক্ষারত নতজানু কলমচীর দিকে ফিরে বলল:

"লেখ: 'সমরের সাধ ছিল — সে সাধ মিটাব'।"

স্বপ্নোত্থিতের মতো খান ইয়েলিউ চু-ত্সাইয়ের হাত থেকে নীল রঙের* প্রলেপ দেওয়া সোনার মোহর তুলে নিল, চিঠির ওপর চাপ দিয়ে বসাল। তুলট কাগজের ওপর ছাপ ফুটে উঠল:

---

* অন্যান্য জাতির অধিপতিদের উদ্দেশে খানের লিখিত পত্রের ওপর থাকত নীল রঙের ছাপ, সাধারণ দলিলাদির ওপর — লাল রঙের।

স্বর্গে বিধাতা,
খান — মর্ত্যলোকে বিধাতার শক্তি।
গ্রহ-তারার অধিপতি।
সকল মানুষের প্রভুর মোহর।

মৌন অতিথিদের নিস্তব্ধতা ভেদ করে অকস্মাৎ ধ্বনিত হল আক্রমণোদ্যত মোঙ্গলদের রণহুঙ্কার:

"হু-হু-হু!"

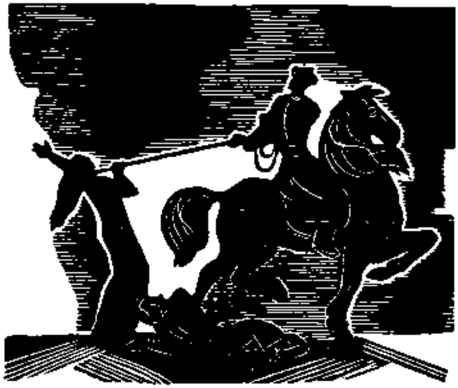
মনিবের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে তাঁবুর চাঁদোয়ার পেছনে বাঁধা চেঙ্গিজ খানের প্রিয় তেজীয়ান্ ঘোড়ার দল চিঁহি চিঁহি হাঁক ছাড়ল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শিবিরের সকল প্রান্তে মোঙ্গলদের অশ্বদল সেই আহ্বানে সাড়া তুলল।

ইয়েলিউ চু-ত্সাই সন্তর্পণে দু' হাত পেতে তুলট কাগজের লিখনটি গ্রহণ করল, চেঙ্গিজ খান কর্কশ ও কাটা-কাটা স্বরে বলল:

"চিঠিটা পাঠিয়ে দিতে হবে! মুসলমান রাজ্যের সীমান্তে! এক্ষুণি! বার্তাবহের সঙ্গে রক্ষী চাই! তিনশ' ঘোড়সওয়ার!.." উপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দিকে ফিরে খান আবার নরম হয়ে ঘড়্ঘড়্ আওয়াজ তুলে বলতে লাগল: "এই বারে আমাদের ভোজ চলুক, নির্ঝঞ্ঝাটে কথাবার্তা চালানো যাক। শিগ্গিরই মুসলমানদের শহরগুলোতে গিয়ে আমাদের মন আনন্দে মেতে উঠবে। সেখানে আমরা ফুর্তি করব! আমি এখনই দেখতে পাচ্ছি কী করে চষা জমি ঘোড়ার ঘামের বাষ্পে ঢেকে যাবে, কীভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত লোকজন পালাতে থাকবে, আমাদের ফাঁসের দড়িতে আটক মেয়েরা বন্য জন্তুর মতো কেঁউকেঁউ করবে; সেখানে নদীতে এই সুরার মতো লাল রক্তের বন্যা বয়ে যাবে আর ধোঁয়ার অন্ধকার আকাশ জ্বলন্ত বসতির আভায় গন্গন্ করবে!..."

বলতে বলতে সে চোখ কুঁচকে খর্বাকৃতি মাংসল অঙুলি তুলে কান পেতে শুনতে লাগল কীভাবে সমস্ত শিবির জুড়ে তেজীয়ান ঘোড়ার দল একে অপরের ডাকে সাড়া তুলে চলেছে।

উপবিষ্ট সকলে অর্ধস্ফুটস্বরে বলতে লাগল: "অভিযান শুরু হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে!..." এবং বড় বড় সামরিক নেতাদের রীতি অনুযায়ী তারা পরস্পরের সাফল্য কামনা করে ধীরে ধীরে স্বর্ণপাত্র ঠোকাঠুকি করল, আসন্ন গৌরবের দিন নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠল।



পঞ্চম অধ্যায়

অজ্ঞাতপূর্ব জাতির আক্রমণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রক্ষণ নেই যার, মরণ ঘটে তার

> মোঙ্গল আক্রমণের পর হার্বাশিদের বিস্রস্ত কেশরাশির মতো দুনিয়ায় বিশৃঙখলা দেখা দিল। মানুষ হয়ে দাঁড়াল নেকড়ের মতো হিংস্র।
>
> (সাদী, ত্রয়োদশ শতক)

চেঙ্গিজ খানের কাছ থেকে ছয়টি শব্দ সংবলিত কঠোর পত্রাঘাত পেয়ে খরেজ্জম শাহ মুহম্মদ হুকুম দিল তাড়াতাড়ি তার নতুন রাজধানী সমরখন্দের চার দিকে দৃঢ় প্রাচীর গড়ে তুলতে, যদিও তার আয়তন বিশাল: প্রাচীরের দৈর্ঘ্য হওয়ার কথা বারো ফারসাখ*।

* প্রায় ৮৪ কিলোমিটার।

তিন বছরের অগ্রিম রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে শাহ তার রাষ্ট্রের সর্বত্র তহসিলদারদের পাঠাল, যদিও বর্তমান বছরের রাজস্বই আদায় করতে বেগ পেতে হয়েছে।

শাহ তীরন্দাজ সেনাদল গঠনেরও হুকুম দিল। তীরন্দাজদের বলা হল তারা যেন নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র এবং কয়েক দিনের রসদ নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে জমায়েতে উপস্থিত হয়।

সর্বশেষে শাহ যাদের দেশে মোঙ্গলদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে সেই কারা-কিতাইদের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত সাইহুন (সির দরিয়া) নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী সমস্ত গ্রাম অবিলম্বে জ্বালিয়ে দেওয়ার আদেশ দিল। শাহের হুকুমে ঐ সব অগ্নিদগ্ধ গ্রামের অধিবাসীদের বিধ্বস্ত এলাকা থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হল যাতে সেখানে এসে মোঙ্গলরা গবাদি পশু বা খাদ্যদ্রব্য কিছুই না পায়। কিন্তু ভস্মীভূত অঞ্চলের ক্রুদ্ধ অধিবাসীরা কারা-কিতাইদের আশ্রয়ে পালিয়ে গেল ও সেখানে পুরুষেরা মোঙ্গল সেনাদলে ভর্তি হল।

খরেজমের সকল প্রান্ত থেকে ফৌজ যতক্ষণ এসে জমায়েত হতে লাগল ততক্ষণ শাহ সমরখন্দে থেকে গেল। মোসাহেবদল পরিবেষ্টিত হয়ে সে মসজিদে গেল, সেখানে শেখ-উল ইসলামের বাকচাতুর্যপূর্ণ ধর্মোপদেশ শুনল। মসজিদের সামনের চকে সুসংবদ্ধভাবে সারি সারি দণ্ডায়মান অসংখ্য ইমানদারের সমক্ষে সে সোৎসাহে প্রার্থনা করল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে সে ইমামের অনুসরণে সরবে মোনাজাত আবৃত্তি করল।

ড্রাগন বর্ষের শুরুতে (১২২০) মুহম্মদ প্রধান প্রধান সামরিক নেতা, খানদানী বেগ, উচ্চপদস্থ পাত্রমিত্র ও অভিজ্ঞ, প্রবীণ ইমামদের নিয়ে এক জরুরী পরামর্শ সভা ডাকল।

সমরখন্দের বিদ্রোহীদের দমন এবং কিপচাক স্তেপে অভিযানের পর থেকে যে 'নয়া ইস্কান্দার', 'জঙ্গী মুহম্মদ' নামে পরিচিত হয়ে আসছে তার কাছ থেকে উদ্দীপনাময় ও আশাব্যঞ্জক, জ্ঞানগর্ভ ও নির্ভীক সিদ্ধান্ত শোনা যাবে বলে সকলের প্রত্যাশা ছিল। গালিচার ওপর গা ঘেঁসাঘেঁসি করে গোলাকারে বসে সকলে শাহের প্রতীক্ষা করছিল, তারা শাহের সামরিক অভিজ্ঞতার কথা বলছিল এবং বলছিল যে সে অবশ্যই দ্রুত ও বিজয় গৌরবে দেশকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হবে।

তিমুর মালিক বলল:

"আজ বাদশাহ সমরখন্দের দুর্গ মজবুত করার কাজ ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। সমস্ত জায়গা থেকে জড় করা হাজার হাজার চাষী ও গোলাম কীভাবে পরিখা খুঁড়ছে তা তিনি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করেন। মাটি ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার ফলে কোদালের ঘায়ে বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল না। শাহ ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচালেন: 'তোমরা যদি এত ধীরে ধীরে কাজ কর তাহলে বর্বর তাতাররা এখানে এসে পরিখার মধ্যে তাদের যে সব চাবুক স্তূপাকার করে ফেলবে কেবল তাতেই পরিখা কানায় কানায় ভর্তি হয়ে যাবে।' এই কথা শোনার পর যারা ওখানে কাজ করছিল তারা রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা বলল: 'চেঙ্গিজ খানের সৈন্যবল কি তাহলে এতই বেশি?'"

খরেজম শাহ গম্ভীর মুখে, নীরবে সভাকক্ষে প্রবেশ করল। সে দুই পা গুটিয়ে সিংহাসনে বসল। প্রধান ইমাম সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা বাণী উচ্চারণ করল, শেষ করল এই বলে: "বাদশাহের স্বার্থ ও গৌরব রক্ষার খাতিরে আল্লাহ খরেজমের শরিফ ও সমৃদ্ধ ভূমি রক্ষা করুন!" সকলে করতল প্রসারিত করে তুলে ধরল এবং দাড়িতে আঙ্গুলের ডগা বুলাল। শাহ বলল:

"আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে সাহায্য চাই। যার যে ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো বলে মনে হয় এক এক করে সকলে বলুন।"

প্রথম কথা উচ্চারণ করল বহু শাস্ত্রের জ্ঞানে অলঙ্কৃত, 'নায়েব-এ রসুল এবং সাম্রাজ্যের শক্তি' নামে পরিচিত পেশ ইমাম, বর্ষীয়ান শিহাব উদ-দিন খিভাকি।

"মসজিদের মিম্‌বরের* উঁচু আসন থেকে বরাবর যা বলে এসেছি তা-ই আবার এখানে বলছি। পয়গম্বরের উপদেশাবলী হাদীস** বিশ্বাসযোগ্য — সেই মহাপুরুষের পুণ্য ও মহাযশস্বী নাম স্মরণ করে বলছি, হাদীসে বলা হয়েছে: 'নিজের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় যিনি প্রাণ দেবেন তিনিই শহীদ।' সকলেরই এখন উচিত জাগতিক কার্যকলাপের তামসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে আজ্ঞানুবর্তিতার পথ অনুসরণ করা এবং শৌর্য ও উদ্যমের তরবারির আঘাতে যাবতীয় উদ্বেগের অবসান ঘটানো।"

---

* মিম্‌বর — জ্ঞানপীঠ।

** হাদীস — পয়গম্বর মহম্মদের জীবন ও উপদেশাবলী যা কোরানের অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

"আমরা সকলে লড়াইয়ের ময়দানে আমাদের শির দিতে প্রস্তুত!" উপবিষ্ট ব্যক্তিরা চেঁচিয়ে বলল।

"তা আপনার উপদেশ কী?" শাহ জিজ্ঞেস করল।

"আপনি — মহান সেনানায়ক, নয়া ইস্কান্দার!" বৃদ্ধ ইমাম বলল। "আপনার উচিত হবে আপনার অগণিত সেনার পুরো বাহিনীকে সাইহুন নদীর তীরে নিয়ে গিয়ে সেখানে কাফের মোঙ্গলদের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়া। এশিয়ার কঠিন মরুপথ ধরে আসার পর শত্রুদের বিশ্রামের অবকাশ না দিয়ে আপনার উচিত হবে টাটকা শক্তি নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া।"

মুহম্মদ চোখের দৃষ্টি নামাল, চুপ করে থেকে পরের জনকে বলার হুকুম দিল।

একজন কিপচাক খান বলল:

"অবশ্যকর্তব্য হল আমাদের রাজ্যের একেবারে ভেতরে মোঙ্গলদের আসতে দেওয়া। এখানে এলাকা আমাদের ভালো জানা থাকায় আমরা অনায়াসে তাদের ধ্বংস করতে পারব।"

অন্য সব কিপচাক খান পরামর্শ দিল সমরখন্দ ও বুখারার দুর্গ এবং উঁচু উঁচু প্রাচীরের ওপর ভরসা করে তাদের নিজেদের অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক, মোঙ্গলরা যাতে আরও দূরে ইরানে প্রবেশ করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রচুর জলবাহী জাইহুন নদীর ঘাট আগলানোর কাজে ব্যস্ত থাকলেই হল।

অন্য এক খান বলল, "এই সব বর্বর যাযাবরদের আমার ভালোই জানা আছে। দেশের ওপর দিয়ে যাবে, লুঠতরাজ করবে, তবে বেশি দিন এখানে থাকবে না। গরম তাদের পোষায় না। ওরা আর ওদের ঘোড়ার দল কড়া শীতে অভ্যস্ত। মোঙ্গলরা যতক্ষণ আমাদের দেশে কর্তৃত্ব করবে ততক্ষণ আমাদের প্রিয় বাদশাহকে আগলে রাখার চেষ্টা করে যেতে হবে — তাঁর রাজত্বের পরমায়ু শতাধিক বছর হোক! আমরা হিন্দুকুশ পাহাড়ের শ্রেণীর ওপারে পিছু হটে আরও দূরে গজনীর দিকে যাব। সেখানে আমরা নতুন করে বিরাট ফৌজ সংগ্রহ করব। নিতান্তই আবশ্যক হলে আমরা হিন্দুস্তানে চলে যেতে পারি। ইতিমধ্যে মোঙ্গলরা শিকারে পরিতৃপ্ত হয়ে তাদের স্তেপে আবার ফিরে যাবে।"

"কাপুরুষের কথা!" তিমুর মালিক গরগর করে বলল। মুহম্মদ তার পুত্র জালাল উদ-দিনকে জিজ্ঞেস করল:

"তুমি কী বল?"

"আমি আপনার সৈনিক, আপনার আজ্ঞানুবর্তী।"

"আর তুমি, তিমুর মালিক?"

"আক্রমণকারী জয়লাভ করে। আর যে কেবল আত্মরক্ষা করে সে সর্বনাশের হাওয়ার মুখে পড়ে," তিমুর মালিক জবাব দিল। "এই কারণে দুর্বল ব্যক্তি সাহসের সঙ্গে আক্রমণ করে ক্রুদ্ধ শক্তিশালী বাঘের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়। আর পাহাড়ের ওপারে সে-ই চলে যায় যে লেজ গুটিয়ে নেয়, যে শত্রুর মুখোমুখি হতে ভয় পায়। আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমি আপনার কাছে অনেক আগে থেকেই প্রার্থনা করছি: তাতারদের ফৌজের আগে আগে টহলদার রিসালা যেখানে ঘোরাফেরা করছে সেখানে আমাকে যেতে দিন। তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে আমি পরখ করে দেখতে চাই আমার তীর ঠিকমতো লক্ষ্যভেদ করে কিনা, আমার ঝক্‌ঝকে তলোয়ার হাতে ভারী ঠেকছে কিনা!"

"তা-ই হবে!" মুহম্মদ বলল। "শিগ্‌গিরই গিরিপথগুলোর বরফ সরে যাবে, তখন মোঙ্গলরা পাহাড় থেকে ফরগানা উপত্যকায় নামতে থাকবে। সেখানে মোঙ্গলদের মাথার ওপর তুমি তোমার তলোয়ার পরখ করে দেখো। তোমাকে খোজেন্ত শহরের ফৌজের সেনাপতি করে দিচ্ছি।"

সকলে চোখ নামিয়ে দু' হাতের আঙ্গুলের ডগা একত্রিত করল। স্পষ্ট বোঝা গেল যে যুদ্ধে যেমন অপ্রতিরোধ্য, কথায়ও তেমনি অসংযত, অকপট তিমুর মালিক শাহের কোপে পড়েছে। তিমুর মালিক খরেজম শাহের বাক্‌পটুতার বন্যাস্রোতে কদাপি তোষামোদের মধু ঢালত না। খোজেন্তে একটা নগণ্য সেনাদল ছিল এবং তিমুর মালিকের মতো একজন অভিজ্ঞ নেতার পক্ষে সামান্য এক দুর্গের সেনাপতি হওয়াটা সম্মানের ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তিমুর মালিকের কথার মধ্যে অপমানের খোঁচা ছিল তাই মুহম্মদ আরও বলল:

"তিমুর মালিক জোর দিয়ে বলছে যে একমাত্র আক্রমণকারীই জয়লাভ করে? কিন্তু যুদ্ধে যা দরকার তা অন্ধ সাহস নয় — বিচক্ষণতা। আমি কোন শহরকেই তাচ্ছিল্য করছি না এবং একটিকেও প্রতিরক্ষাহীন অবস্থায় রাখছি না। আমারও ধারণা যে ভেড়ার চামড়ায় সর্বাঙ্গ ঢাকা এই

মোঙ্গলরা অথবা তাতাররা আমাদের গরম সহ্য করতে পারবে না এবং এখানে বেশি দিন থাকবে না। নিরীহ অধিবাসীদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো রক্ষাব্যবস্থা হল আমাদের দুর্গগুলোর দুর্ভেদ্য দেয়াল আর...”

“আর আপনার বাহুবল! আপনার পরম জ্ঞান!” চাটুকার খানেরা চেঁচিয়ে বলল।

“অবশ্যই, আমি যে বাহিনী পরিচালনা করব তা হবে তাতারদের পথে ভয়ঙ্কর, অনড় শিলার মতো,” মুহম্মদ বলল। “নির্ভীক ইনাল্‌চিক কাইর খান কি অবরুদ্ধ ওতরারে আজ পাঁচ মাস হল যুদ্ধে মোঙ্গলদের প্রবল আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখছেন না? তিনি দৃঢ়ভাবে তাদের সমস্ত রকম হামলার মোকাবিলা করে যাচ্ছেন, কেন না আমি সময়মতো সেখানে সাহায্যের জন্য বিশ হাজার সাহসী কিপচাক পাঠাই।...”

“ শাবাশ কাইর খান!” খানেরা ধ্বনি তুলল।

“আমাকে বিশ্বস্ত, সন্ধান জানা লোকজন বলেছে যে আমার ইসলাম ফৌজের তুলনায় তাতারদের ফৌজ — রাতের অন্ধকার ধোঁয়ার রেখা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাকে ভয় পাওয়ার কী আছে? স্বেচ্ছাসেবকদল আর ভয়ঙ্কর চেহারার বিশটি শক্তিশালী হাতি ছাড়াও আমি সমরখন্দে এক লক্ষ দশ হাজার সৈন্য রাখব। বুখারায় পঞ্চাশ হাজার দুর্ধর্ষ যোদ্ধা আছে। আর সব শহরেও আমি প্রতিরক্ষার জন্য বিশ-ত্রিশ হাজার করে সৈন্য পাঠিয়েছি। সারা বছর ধরে সমস্ত দুর্গে বাধা পেতে পেতে চেঙ্গিজ খানের তাতারদের কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে? নতুন ফৌজ তার কাছে পৌঁছাবে না, তার শক্তির হাল হবে গরমে গলা বরফের মতো।...”

“ইনশাল্লাহ! ইনশাল্লাহ!” সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

শাহ বলে চলল, “আর আমি এই অবসরে ইরানে ইমানদারদের নিয়ে নতুন নতুন ফৌজ গড়ে তুলব। আমি নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে অবশিষ্ট তাতারদের ওপর এমন ঘা মারব যে তাদের বংশধরদের কেউ কখনও ইসলামের ভূমির দিকে আগুয়ান হতে সাহস করবে না।”

“ইনশাল্লাহ! ইনশাল্লাহ!” খানেরা সহর্ষে বলল। “অজেয় সেনানায়কের জ্ঞানগর্ভ কথা বটে!”

দিওয়ান আর্শের বড় কর্তা শাহের কাছে এগিয়ে এসে একটি চিরকুট দিল। তাতে জনৈক নিঃস্ব দরবেশের পাঠানো এক সংক্ষিপ্ত সমাচার ছিল: সে অতিকষ্টে মোঙ্গল চৌকি পার হয়ে এই মর্মে সংবাদ এনেছে যে ওতরার

অভিমুখে শাহের প্রেরিত বিশ হাজার কিপচাক সৈন্য বিশ্বাসঘাতকতা করে মোঙ্গলদের দলে ভিড়েছে। সকলেই উদ্বেগের সঙ্গে মুহম্মদের দিকে তাকিয়ে তার মুখ দেখে সংবাদ ভালো না মন্দ তা আঁচ করতে প্রবৃত্ত হল। শাহ ভ্রূভঙ্গি করে নিম্নস্বরে বলল:

"সময় হয়ে গেছে, আর দেরি নয়!" তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে ইমামের মোনাজাত শুনে প্রাসাদের অন্দর মহলে চলে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুরবান কিজিক হল সওয়ার

"এই, কুরবান কিজিক*, এই, ভাঁড়! আজ থেকে তোকে আর মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে না। খরেজম শাহ তোকে তাঁর রিসালাদার করে দিয়েছেন।" ঘোড়া থেকে না নেমেই অশ্বারোহী বীরপুরুষ তার চাবুকের হাতল দিয়ে কুরবানের কুঁড়েঘরের নীচু, বাঁকাচোরা দুয়ারে ঘা মারল।

"আবার কোন নতুন বিপদ আমাদের ওপর এসে পড়ল?" সবজি বাগান থেকে পড়িমরি করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসতে আসতে এক কুঁজো গোছের অস্থিচর্মসার বুড়ি — কুরবানের মা চেঁচিয়ে বলল।

"শিগ্‌গির বেরিয়ে আয় কুরবান! দিনে-দুপুরে ঘুমোচ্ছে কেন? বুজার** মাত্রাটা বেশিরকম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে?"

"বুজার কথা ভাবার কি আর আমাদের উপায় আছে!" বুড়ি বিলাপ করে বলল। "কুরবান প্রথমে সারারাত, জল যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ খেতের নালা পাহারা দেয়, জল আসার পর সে নিজের খেতে জল ঢালে, তারপর চার জন পড়শীর সঙ্গে ওর একার মারামারি বেধে যায় — ওদের মতলব ছিল সময়ের আগেই নিজেদের চষা জমিতে ওর ভাগের জল নিয়ে যাওয়া। কুরবান এখন সর্বাঙ্গে কালশিটে নিয়ে পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে।"

বুড়ি কুঁড়েঘরের ভেতরে চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কুরবানের আবির্ভাব ঘটল। আলুথালু অবস্থায় চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে এসে দাঁড়াল,

---

* কিজিক — ভাঁড়।

** বুজা — চাল অথবা জোয়ার থেকে তৈরি সুরা জাতীয় পানীয়।

বুটিদার ধুসর ঘোড়ার পিঠে জমকালো পোশাক পরনে বাহাদুর সওয়ারের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগল।

"সালাম, নওজোয়ান বেগ! ডিহিদারের কী হুকুম?"

"খোদ খরেজম শাহ তোকে ডেকে পাঠিয়েছেন ঘোড়া, তলোয়ার ও বর্শা নিয়ে অজানা ইয়াজুজি ও মাজুজিদের সঙ্গে যুদ্ধে নামার জন্য।"

কুরবানের দেহ কোলকুঁজো, ঘাড় লিকলিকে; সে হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে পিঠ চুলকে নিয়ে বলল:

"আমাকে নিয়ে হাসাহাসি রাখুন দেখি বেগ! আমি আবার যোদ্ধা কী রকম? কোদাল আর রান্নার হাতা ছাড়া অন্য কিছুই আমি ধরতে জানি না।"

"সে সব বিচারের কাজ তোর-আমার নয়। হাকিম আমাকে পাঠিয়েছেন গাঁয়ের সব মোড়লের কাছে ঘুরে ঘুরে তাঁর এই ফরমান জানিয়ে দিতে যে গাঁয়ের লোকজন যেন চট্‌পট্‌ জমায়েত হতে থাকে — ঘোড়া থাকলে ঘোড়ায়, উট থাকলে উটে চেপে। দেখিস কিন্তু, কালই তোকে হাজিরা দিতে হবে তোর বেগের কাছে। তিনি তোদের — তোর মতো বাহাদুরদের যুদ্ধে নিয়ে যাবেন। আর যে হাজির না হবে তার গর্দান যাবে। বুঝলি?"

"দাঁড়ান, বেগ, আমাকে বুঝিয়ে বলুন দেখি ব্যাপারটা কী? কারা এই ইয়াজুজি-মাজুজি?"

কিন্তু অশ্বারোহী বীরপুরুষ তার ছাইরঙা তেজীয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে ছুটে চলে গেল। কেবল পথের ওপর উঠল ধুলোর মেঘ. ধীরে ধীরে তা পাশে উড়ে গিয়ে চষা জমির ওপর থিতিয়ে পড়ল।

"বাছা কুরবান, বেগেরা ভেবেছে কী? ওরা তোর কাছ থেকে কী চায়?" চৌকাঠের সামনে মাটিতে বসে পড়ে বুড়ি ছেলেকে ধরে জিজ্ঞেস করল।

"নির্ঘাত খেপে গেছে। আমাদের কটা ঘুড়ীটার মরণও হয় না। তাহলে ত হাকিমের কাছে আমার ডাক পড়ত না।" কটা ঘুড়ীটা জমির এক ধার থেকে ঘাস খুঁটে খাচ্ছিল, কুরবান তার দিকে এগিয়ে গেল। তার গলার ফাঁসদড়ির প্রান্ত ধরে রেখেছে কুরবানের ছোট ছেলে — আধা উলঙ্গ, পরনের কাপড় বলতে আছে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত গোটানো শালোয়ার।

"এই, কুরবান কিজিক, কী হয়েছে রে?" পাশের জমিতে যারা কাজ করছিল তারা ছুটে এসে চেঁচামেচি করতে লাগল।

কুরবান জবাব দিল না। প্রহারের ঘায়ে তার সর্বাঙ্গ তখনও টন্‌টন্‌

করছে। সে ঘুড়ীর গায়ে হাত বুলাল, বিরল কেশর পাট করল, হাড় জিরজিরে পিঠে হাত বুলালে।

"আমাদের ওপর রাগ করিস না কুরবান! জানিসই ত কুকুরেরা নিজেদের মধ্যে হাড় নিয়ে প্রথমে কামড়াকামড়ি করে বটে, কিন্তু পরে দেখ, আবার পাশাপাশি শুয়ে রোদ পোহায়," পড়শীরা বলল। "জলের জন্যে আপন ভাই অবধি জানোয়ার বনে যায়। তা বল কুরবান, ডিহিদারের ঘোড়সওয়ার এসেছিল কেন?"

"লড়াই..." কুরবান মিনমিনে গলায় বলল।

"লড়াই?!'' কথাটা পুনরাবৃত্তি করে চার জনেই আড়ষ্ট হয়ে গেল।

"লড়াই কী রকম?" একজন সংবিৎ পেয়ে বলল। "খরেজম শাহ হলেন দুনিয়ার মালিক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর ছায়ায় ঢাকা। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবে এমন সাহস কার?"

"তা ছাড়া আমাদের কাছ থেকে ওরা চায় কী? আমরা ত আর যোদ্ধা নই! আমরা ফসল বুনি, তারপর বেগেরা আমাদের কাছ থেকে তা নিয়ে যায়, তা মরুক গে, আমাদের নিয়ে যেন আর টানাটানি না করে।"

''সওয়ার কী বলল রে?''

"সে বলল, দেশ রক্ষা করার জন্য সবাইকে যুদ্ধে যেতে হবে। যার যার ঘোড়া কিংবা উট নিয়ে বেগের কাছে হাজির হতে হবে।"

"আমি বাপু বৌ বাচ্চা নিয়ে পাহাড়ে বা জলা জায়গায় পালিয়ে যাব। কাকে রক্ষা করা? এই মাটি? এ আর আমাদের কোথায়? — বেগের! বেগেরা তাদের রিসালা নিয়ে এর জন্য লড়ুক!''

"খরেজম শাহের ভাড়াটে কিপচাক ফৌজ আছে। তাদের কাজ যুদ্ধ করা। আজ অবধি তারা বেশির ভাগ লড়াই করেছে আমাদের সঙ্গে — চাষীদের সঙ্গে, তাদের জ্বালায় আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেছে।"

"এখন কিনা ঠেকায় পড়ে আমাদের কাছে এসে ধন্না দিয়েছে।''

"আরে দ্যাখ, দ্যাখ! আবার নতুন কোন বিপদ এলো বুঝি!"

রাস্তায় ধুলোর ঝড় উড়িয়ে দ্রুত বেগে অশ্বারোহীদের একটা দল এগিয়ে আসতে লাগল, তাদের পেছন পেছন উঁচু চাকাওয়ালা চারটি গাড়ির ঘর্ঘর আওয়াজ উঠল। কুরবানের মাটির কুটিরের সামনে তারা থেমে গেল। গাড়ি থেকে সাদা রঙের দীর্ঘ লাঠি হাতে কয়েক জন অনুচর লাফিয়ে নেমে পড়ল।

"এগিয়ে এসো!" একজন অশ্বারোহী বলল। কুরবান এবং অন্য গ্রামবাসীরা অবনত হয়ে, বুকের ওপর দু' হাত ভাঁজ করে এগিয়ে গেল।

"তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে জান। আমি হলাম সুবার হাসিব, খাজনা আদায়কারী। প্রধান খাজাঞ্চী মুস্তাফি সব হাসিবের কাছে হুকুম পাঠিয়েছেন। দেশে যুদ্ধের বিপদ দেখা দিয়েছে, স্তেপ থেকে কাফের তাতাররা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা যদি আমাদের দেশে ঢুকে পড়ে তাহলে সকলকে কেটে সাফ করে ফেলবে, আমাদের পশুপাল ও ফসল কেড়ে নেবে, আমাদের ঘরে কিছু থাকবে না।''

''এমনিতেই আমাদের ঘরে কিছু নেই!'' কুরবানের বুড়ি মা বলল।

"দুশমন এলে আমাদের গর্দানও যাবে," হাসিব বলল। "তার মানে পাঁচ লক্ষ সৈন্যের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা এবং তাদের সকলকে খাওয়ানো-পরানোর জন্য প্রচুর টাকাকড়ি আর ফসলের দরকার। এই কারণে শাহ খাজনা আদায় করার হুকুম দিয়েছেন।"

"আমরা সবে সমস্ত খাজনা শোধ করে দিয়েছি।"

"তোমরা এ বছরেরটা দিয়েছ, আর এখন দেবে আগামী বছরের। এখনই দিতে হবে। প্রথম জন থেকে শুরু করা যাক। এটা কার বাড়ি?"

"আমার বাড়ি, বড় কর্তা!" কুরবান কিজিক বলল। "শোধ করার মতো কিছু আমার নেই! আমার ঘরে কিছুই নেই! থাকার মধ্যে আছে একটা মুরগী, সেও ডিম পাড়ে না।"

"তোর ঐ সব লব্‌জ আগে থেকে জানা আছে! তোদের সব শেয়ালেরই এক রা। এই, সেপাইরা, ভালো করে বাড়ি তাল্লাশ করে দেখ, বিশেষ করে ঘরের মাচা।"

চার জন অশ্বারোহী আঙিনা পার হয়ে ঢুকে ঘরের মাচা ও সবজি বাগান খুঁজে দেখল, ফিরে এলো খালি হাতে। একজনের হাতে মুরগী।

''তোকে দু'দিন সময় দিচ্ছি। আজ তুই পঞ্চাশটা ছড়ির ঘা খাবি, আর গমের বস্তা না আনা পর্যন্ত প্রতিদিন তোকে পিটুনি দেওয়া হবে। তারপর তোর জমি দিয়ে দেওয়া হবে অন্য কাউকে, তোর চেয়ে খাটিয়ে কোন চাষীকে — যে বাহাদুর ফৌজকে মদত দিতে গররাজি হবে না।"

কুরবান কিজিক মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

"শাহ যা চান আমি তা-ই করব!.. আমি আমার ঘুড়ীতে চড়ে ইয়াজুজি ও মাজুজিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাব। আমি কাজ করব,

সাঁকো আর রাস্তা মেরামত করব, তাই বলে আমাকে আমার ছেলেমেয়েদের সামনে মারবেন না, ফসল দাবি করবেন না — আমার কাছে তা নেই-ই! আমার চারটি ছোট ছোট বালবাচ্চা — আরশুলার মতো, আর বুড়ি মা। এদের খাওয়াতে হয় আমাকে, কিন্তু কী খাওয়াব জানি না। দোহাই, মহামান্য হাসিব!" এই বলে সে তহসিলদারের ঘোড়ার খুর জড়িয়ে ধরল, নিজের কথার সাহসিকতায় সে নিজেই অবাক হয়ে গেল তার মনে হল সে নিজে কীটের মতো নগণ্য আর তার কটা ঘুড়ীটা বুভুক্ষু কুকুরের মতো অভাগী।

"তুই একটা ভাঁড় দেখছি, কুরবান কিজিক," তহসিলদার বলল। "তুই ত জানিসই যে মহান আল্লাহ চিরকালের জন্য মানুষের মধ্যে বর্ণ বিভাগ করে দিয়েছেন: সবার ওপরে শাহ, তারপর বেগ, তারপর বণিক, সবার শেষে সাধারণ চাষী। সকলের উচিত যার যার যোগ্য কাজ করা: শাহ হুকুম দেন, আর বাকি সকলকে তা তামিল করতে হয়। আর খেত-মজুরকে কী করতে হয়? বেগ আর শাহের জন্য কাজ করতে হয়, তাঁদের যতটা প্রয়োজন ততটা শস্য দিতে হয়। অতএব এক বস্তা গম যোগাড় কর। থাক, আজ আর তোকে মারব না, সময় নেই। কাল তোর চামড়া খুলে নেব।"

হাসিব ঘোড়ায় চাবুক মেরে এগিয়ে গেল।

প্রস্থানরত তহসিলদারদের পথ থেকে ধূলিজাল সরে যেতে, বিষণ্ণ পড়শীরা যে যার ঘরে ফিরে গেলে কুরবান কিজিক যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হল।

সে মসজিদে মোল্লার কাছে গেল, বড় রাস্তার মোড়ে মুদিখানার মালিকের কাছে গেল। পথচারীদের কথাবার্তা শুনে সে নিশ্চিত হল যে বেগের কথাই ঠিক: সর্বত্রই যুদ্ধের কথা, অজ্ঞাত জাতির কথা। সে জাতি আসছে পুব থেকে; সম্ভবত তারা সাধারণ যাযাবর কির্গিজ, কারা-কিতাই কিংবা উইগুর, অথবা তাতারদের কোন গোষ্ঠী — পর পর কয়েক বছর ভালো ফসল হওয়ার ফলে যার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে, পশুপাল বৃদ্ধি পেয়েছে, পরন্তু সে জাতির বাসভূমিতে কোন তুষারঝঞ্ঝা ও পশু-মড়ক দেখা যায় নি।

সর্বত্র গুজব শোনা যেতে লাগল যে ঐ গোষ্ঠীর যোদ্ধারা দেড় মানুষের সমান দীর্ঘাকৃতি, তরবারি ও তীর তাদের ভেদ করতে পারে না আর তাদের

বাধা দিতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায় হল শহরের উঁচু, মজবুত দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অথবা জলাভূমিতে পালিয়ে যাওয়া।

কুরবান চিন্তাভারাক্রান্ত মনে ফিরে এলো। ঘুড়ীটার খাদ্য হিশেবে খড় ও জলাঘাসের ডগা কুচি কুচি করে কেটে নিল। কাস্তের মরচে ধরা ভাঙা টুকরো খুঁজে পেতে বার করে সেটাকে এক লগির আগায় গেঁথে বসাল — বর্শা হল। ও কামারের কাছেও গেল, তাকে কাজে সাহায্য করল, কেন না শাহের হুকুমে বুখারায় যাওয়ার মুখে গ্রামের বহু লোক কামারশালায় এসে জড় হয়েছে। কুরবান কামারকে সাহায্য করায় নয়টি তামার দিরহাম উপার্জন করল, এখন সে দোকানদারের কাছ থেকে ছোট ছোট কয়েক টুকরো ভেড়ার মাংস কিনতে পারে।

জোতদার বেগের খেতে সারাদিন কাজ করার পর সন্ধ্যায় কুরবানের বৌ ফিরে এলো। সে জোয়ার দিয়ে এক কড়াই জাউ তৈরি করল, কয়েক খণ্ড ভেড়ার চর্বিতে পরটা ভাজল।

পরিবারের সকলে যখন মাটির গামলার চার পাশে খেতে বসে তখন কুরবান কর্তাসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে বাকি যারা বসে ছিল অলক্ষ্যে তাদের প্রত্যেককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

এই তার কুঁজো বুড়ি মা — মাথায় সাদা চুলের গোছা, কাজ করতে করতে তার পিঠে কুঁজ উঠেছে। মার অল্পবয়সের চেহারা, তার শ্যামল রঙ, সুন্দর কালো কালো উজ্জ্বল চোখ জোড়া ও সজীব হাসি কুরবান মনে করতে পারল। ঝলসানো রোদে মাথায় নিয়ে জলা মাঠে কাজ করে করে, ফসল কিংবা শুকনো ডালপালার ভারী ভারী আঁটি বয়ে বয়ে অবিরাম পরিশ্রমের ফলে তার পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে, কাঁধ বসে গেছে

এই হল তার বৌ — শরীরে এখনই ভাঙন ধরেছে, তার এক কালের সুন্দর কমনীয় মুখে ফুটে উঠছে রুক্ষ কুঞ্চনরেখা। সারাদিন সে যত বেশি সম্ভব কাপড় বোনা যায় সেই চেষ্টায় তাঁতের ওপর ঝুঁকে পড়ে মেঝেয় বসে কাজ করেছে। বুড়িদের মতো ওর হাত দুটো কর্কশ হয়ে গেছে, আঙুলের গাঁটগুলো উঁচিয়ে আছে।

পাশে বসে আছে চার ছেলেমেয়ে। কে কার চেয়ে বেশি পরিমাণ জাউ হাতিয়ে মুখে পুরতে পারে এর জন্য তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে ওদের মা প্রত্যেককে ভেড়ার মাংসের এক একটি কুচি ভাগ করে দিচ্ছে

বড় ছেলে হাসানের এগারো বছর বয়স হয়ে গেছে। সে বাবার সঙ্গে বুখারায় যাওয়ার বায়না ধরেছে, তার ইচ্ছে কেবল ঐ জমকালো শহর দেখাই নয়, সে দেখতে চায় কী করে তার বাবা ঠুনকো, বাঁকাচোরা বর্শা, তলোয়ার আর গোল ঝক্ঝকে ঢাল নিয়ে ক্ষ্যাপা ঘোড়ায় চড়ে ছোটে।

আরও তিনটি: বড়টি মেয়ে — তার উঠতি বয়স, এখনই তার লাজুক লাজুক ভাব, ওড়নার আঁচলে মুখ ঢাকে। বাকি দু'টি একেবারেই বাচ্চা। দু'টিতে হাঁটু মুড়ে বসে চেটেপুটে জাউ খেয়ে চলছে, দুই গাল জাউয়ে মাখামাখি। ওদের কী হবে?

প্রায় সারারাত কুরবান ঘুমাতে পারল না, বৌয়ের সঙ্গে আলোচনা করল কীভাবে তার অবর্তমানে ঘরসংসার দেখাশোনা করতে হবে, কখন খেতে জল ছাড়তে হবে, কী করে ফসল কাটার জন্য পড়শীদের সাহায্য নিতে হবে, ঐ দিন কী দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করতে হবে।

"আর ইয়াজুজিরা যদি এখানে এসে পড়ে?" বৌ জিজ্ঞেস করল। "আমরা কোথায় পালাব? তোমার সঙ্গে আমাদের পরে দেখা হবে কী করে?"

কুরবান বৌকে আশ্বাস দিল। এটা ত আর সম্ভব নয় যে অজ্ঞাত শত্রুরা বুখারায়, একেবারে ইসলামের বুকের ওপর এসে হাজির হবে! খরেজমের শাহ সম্ভবত তাঁর শক্তিশালী ফৌজ জড় করে স্তেপে শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে তাদের ধ্বংস করার জন্য কিপচাক ভূমির মধ্য দিয়ে বাহিনী চালিয়ে নিয়ে যাবেন। তখন কুরবানও ভালো ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসবে, তার পেছন পেছন লাগাম টেনে নিয়ে আসবে আরও একটা ঘোড়া, যুদ্ধে লুট করা রকমারি মালে তা চুড়োচুড়ি হয়ে থাকবে — এগুলো হবে গোটা পরিবারের জন্য সওগাত।

খুব ভোরে কাছাকাছি খাতে গিয়ে কুরবান তার ঘুড়ীর পিঠে এত শুকনো ডালপালা চাপিয়ে নিয়ে ফিরল যে কুটোকাটার স্তূপের নীচ থেকে মাত্র চারটি পা চোখে পড়ে। কুরবান ডালপালা কেটে দেয়ালের লাগোয়া জায়গায় সমান করে গুছিয়ে গুছিয়ে রাখল। ভেতরের দিক মাটি দিয়ে পরিপাটি করে লেপা আর ওপরে খড় চাপানো খোঁড়লটির মধ্যে কিছু জোয়ার আর খেতে বোনার জন্য গমের যে সামান্য সঞ্চয় রাখা হয়েছে তার কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে না বলার জন্য সে বৌ আর মাকে

আরও একবার সতর্ক করে দিল। এ সঞ্চয় থেকে অনেক দিন চলবে, আর তারপর ত কুরবান ফিরেই আসছে।

"অত দূরের পথে যাবি কী করে?" বৌ আর মা বিলাপ করতে লাগল। "সঙ্গে খাবার নেই, টাকাকড়িও নেই! না খেতে পেয়ে ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন খানায়-খন্দে গিয়ে পড়ে থাকবি। আমাদের ভাগ থেকে জোয়ার নে!"

"ভয়ের কিছু নেই, সব ঠিক আছে!" কুরবান জবাব দিল। "বীরপুরুষের খাবার পথে মেলে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুদ্ধারম্ভ

হাতে গড়া বর্শা নিয়ে কুরবান পথ ধরল। কোথায় হাজির হতে হবে তা জানার জন্য সে বেগের বসতবাড়িতে এসে নামল। দেওয়ান তাকে গালাগাল করে বলল যে বেগ ইনান্‌চ খান ইতিমধ্যেই তার অশ্বারোহী সেনাদল নিয়ে চলে গেছে। যারা দেরি করে এসেছে তাদের সকলকে বুখারার অভিমুখী বড় রাস্তায় গিয়ে তাকে ধরতে হবে।

পথে পথে চোখে পড়ে পায়ে হেঁটে ও ঘোড়ায় চেপে দলে দলে গ্রামবাসী চলেছে, চলেছে পোঁটলা-পুঁটলি ও বাচ্চা-কাচ্চা বোঝাই হয়ে সারি সারি দু'চাকার গাড়ি। মন্থর গতিতে পা টেনে টেনে চিৎকার-চেঁচামেচি আর কান্নাকাটি করতে করতে চলেছে বুড়ো-বুড়ি ও মেয়েদের দল। সমস্ত দিক জুড়ে মাল বোঝাই গাড়ির শ্রেণী — কতকগুলোর গতি শহরের দিকে, কতক তার বিপরীত — দক্ষিণের পাহাড়-পর্বতের দিকে তাদের গতি।

সময়টা ছিল বসন্তের গোড়া। মাঠে রবিশস্য সবুজ হতে শুরু করেছে। সূর্যের উত্তাপ এখনই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। পথ-ঘাট শুকিয়ে এসেছে, কোন অজানার উজানে চলমান লোকজনের সারির ওপর পুরু ধুলোর মেঘ উড়ছে। বিভিন্ন বসতির কাছাকাছি চোখে পড়ে কামারশালা — সেখানে হাতুড়ির ঠক্‌ঠক্‌ আওয়াজ উঠছে, সশস্ত্র লোকজন ঘোড়ার নাল লাগানোর জন্য এবং বর্শার ফলা অথবা নিপুণ হাতে পেটানো লোহার তলোয়ার পাওয়ার জন্য চেঁচামেচি ও তর্কাতর্কি করছে।

পর দিন সন্ধে নাগাদ যখন দূরে বুখারার উপকণ্ঠের মাটির দেয়াল নজরে এলো ততক্ষণে এক দরবেশের সঙ্গে কুরবানের খাতির হয়ে গেছে। লোকটার চোখ কালো, দাড়ি আছে; সে চলছিল তার কৃষ্ণকায় গর্দভের পাশে পাশে, গর্দভের পিঠে এক বোঝাই বস্তা চাপানো। বছর তেরো বয়সের একটা ছেলে এক মুহূর্তের জন্যও তার সঙ্গ ছাড়ছিল না। দরবেশ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধগামী সাহসী মহাবীরদের কল্যাণ ও সাফল্য কামনা করে গান গাইছিল। কোন কোন সৈনিক দরবেশের ভিক্ষাপাত্রে পরটা অথবা একমুঠো করে গম দিচ্ছিল।

রাত নেমে আসতে শহরের চার দিক ঘিরে প্রান্তরে নিশাযাপনকারীদের জ্বালানো হাজার হাজার অগ্নিকুণ্ডের আলো জ্বলে উঠল। দরবেশকে অনুসরণ করে কুরবান নীচু নীচু কতকগুলো কুঠুরির কাছাকাছি এসে পেঁছুল; সেখান থেকে একটানা 'হু, হু, হু' আওয়াজ ভেসে আসছিল। এগুলো হল 'খানাকা' — দরবেশদের আখড়া। ভেতরে লোকের ভিড় — তারা দরবেশদের কাছে এসেছে রোগমুক্তির প্রার্থনা নিয়ে এবং আসন্ন যুদ্ধে মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য দোয়া ভিক্ষা করতে। দরবেশরা তুকতাক বিদ্যার পরিচয় দিচ্ছিল, মন্ত্রতন্ত্র আওড়াচ্ছিল, আগন্তুকদের হাতে পবিত্র বাণী লেখা কাগজের চিরকুট গুঁজে দিচ্ছিল।

কুরবান বেড়ার কাছে ঘুড়ীটাকে বেঁধে রেখে অগ্নিকুণ্ডগুলোর চার দিকে ঘুরে ঘুরে তার কটা ঘুড়ী ও দরবেশের গর্দভটির জন্য একগাদা খড়কুটো জড় করল। দরবেশ তার পরটা এবং লোহার কড়াইয়ে জ্বাল দেওয়া ময়দার মণ্ডের ভাগ দিল।

"বীরপুরুষের খাবার পথে মেলে!" কথাটা কুরবানের মনে পড়ে গেল।

ঘুমের সঙ্গে লড়াই করে লাগাম হাতে জড়িয়ে ধরে কুরবান সারা রাত ঘোড়ার পাশে কাটাল। অগ্নিকুণ্ডের ধারে লোকে বলাবলি করছিল যে এখন বিলকুল খোঁড়া এবং নেহাৎ হেঁজিপেঁজি ঘোড়াও চড়া দামে বিকোয়, কেন না সকলেই চলে যেতে চায় বুখারা থেকে যথাসম্ভব দূরে পারস্যের পর্বতাঞ্চলে কিংবা হিন্দুস্তানে, অজানা কাফেরদের নাগালের বাইরে।

ভোরের দিকে কুরবানের ঘুমটা এত গাঢ় হয়ে এলো যে সে টেরই পেল না কী করে একজন লোক লাগাম কেটে ফেলে তার কটাকে নিয়ে সটকান দিল।

"লোকে বলে, জেহাদী যোদ্ধার ঘোড়া যে চুরি করে আল্লাহ সেই বেহায়া চোরকে সাজা দেবেন," দরবেশ বলল। "তবে আপাতত দেখা যাচ্ছে আল্লাহ আমাকেও, এই গরিব বেচারি হাজি রহিমকেও সাজা দিয়েছেন, কেন না চোরে আমার বুড়ো গাধাটাকেও নিয়ে গেছে। এই বলে সান্ত্বনা পাওয়া যাক যে এখন আমরা ঝাড়া হাত পায়ে বুখারা শরিফ দেখতে যেতে পারি।"

কুরবান তার দীর্ঘ বর্শাটা কাঁধে তুলে নিয়ে তার বালক সঙ্গী ও দরবেশকে নিয়ে একসঙ্গে বিখ্যাত নগরী — 'জ্ঞানের আকাশের উজ্জ্বল তারকা', 'বুখারা শরিফ' দেখতে বের হল।

তিন মুসাফির 'একে অপরের দোস্তীর কষি আঁকড়ে ধরে' অগণিত জনতার অবিরাম বন্যাস্রোতের মধ্য দিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে বুখারার দিকে যাত্রা করল।

পুরনো আমলের তৈরি উঁচু উঁচু প্রাচীর আগাছা ও কাঁটাঝোপে ছেয়ে গেছে, কোথাও কোথাও ধসে পড়েছে; প্রাচীরের গায়ে এগারোটি তোরণ — এগুলোর মধ্য দিয়ে বণিকদের কারাভান দুনিয়ার সকল প্রান্তের সঙ্গে ইসলামের এই কেল্লার সংযোগ রক্ষা করত।

প্রথম তোরণের কাছে বিশাল জনতার ভিড়। প্রহরীরা অতিক্রমকারী সকলকে জিজ্ঞেসবাদ করছিল এবং সকলের উদ্দেশে আহ্বান জানাচ্ছিল: "শহর রক্ষার জন্য, সৈন্যদের অন্ন যোগানো আর অস্ত্র তৈরির কাজে লেগে যাও! কার্পণ্যে হাতের মুঠো যেন ছোট না হয়, উদারতায় টাকার থলির বাঁধন খুলে যাক!"

বর্ষীয়ান জ্ঞানী-গুণী আলিমরা চামড়ার থলি নিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সকলের কাছ থেকে জন্মভূমি রক্ষার পবিত্র কাজে দান সংগ্রহ করছিল।

তোরণের ঠিক পেছনেই সারি সারি দোকানপাট। সম্ভাব্য সমস্ত রকম পণ্য দ্রব্যের ছোট ছোট দোকান গায়ে গায়ে লাগানো। আজকে বিশেষ করে চাহিদা কিসের তা জেনে বণিকেরা হাঁক ডাক তুলে জাহির করে পথযাত্রার মজবুত অথচ শস্তাদরের কাপড়ের অথবা পথে শয়নের জন্য অপরিহার্য ভালো বোনা কম্বলের কিংবা দীর্ঘকাল টাটকা থাকে মধুর পাকে তৈরি এমন সব মিঠাইয়ের গুণ।

সর্বত্রই চোখে পড়ে আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভের আশায় আশপাশের

নানা অঞ্চল থেকে পুত্রকন্যা ও মালপত্র সমেত আগত শরণার্থীর দল।

শহরিস্তান থেকে দ্বিতীয় যে প্রাচীরটি শহরতলিকে পৃথক করে রেখেছে তার বিশাল তোরণ অতিক্রম করে তিন মুসাফির কোলাহলমুখর রাস্তা থেকে মসজিদ আর মাদ্রাসার উঁচু উঁচু খিলান ঘেরা নিস্তব্ধ চকে মোড় নিল। বহু বছরের শ্রম ও কঠোর সংযমের পর এই দীনহীন মসজিদগুলোর ইমাম হওয়ার আশায় আরবী ভাষায় লেখা কালামুল্লা সম্পর্কে পরম জ্ঞান অর্জনের জন্য কয়েক হাজার শীর্ণকায় নবীন ও প্রবীণ শিক্ষার্থী — 'শাগরেদ' এসব জায়গায় অধ্যয়ন করছে।

এখানে চকের ওপর আনুষ্ঠানিক নামাজের বড় জমায়েত চলছিল: কালামুল্লার সাজানো পংক্তির মতো সমান সারি বাঁধা মুসল্লিরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পক্বশ্মশ্রুধারী মহামান্য ইমামের গতিবিধি অনুসরণ করছিল। ইমাম নতজানু হয়ে বসতে, মাটিতে ঝুঁকে পড়তে অথবা কানের কাছে হাত ওঠাতে কয়েক হাজার ইমানদার দেখাদেখি সেই সব ভঙ্গি অনুসরণ করল। কেবল অসংখ্য শরীরের ওঠা-পড়ার খসখস শব্দ চকের ফলকের ওপর দমকা হাওয়ার ঘা মারতে লাগল।

মোনাজাত শেষ হয়ে গেলে উঁচু মসজিদের সোপানশ্রেণীর সামনে লাল রঙের পুচ্ছধারী বাদামী ঘোড়া নিয়ে আসা হল — তার অঙ্গে শোভা পাচ্ছে সোনালি ফুল বোনা রক্তবর্ণের মখমল বস্ত্রখন্ড।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলো কৃষ্ণশ্মশ্রুধারী খরেজম শাহ — তার মাথায় মুক্তাখচিত তুষারশুভ্র উষ্ণীষ।

শাহ জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিল:

"ইসলামের সমস্ত জাতি — এক জাতি। আমাদের শ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা — শান দেয়া তলোয়ার। ইমানদারদের সম্পর্কে পয়গম্বরের বাণী হল: 'ইসলামের যোদ্ধৃবর্গ, আমি তোমাদিগকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে গড়িয়াছি এবং জমিনে ও আসমানে যাহা কিছু রহিয়াছে মুসলমানগণকে সে সকলের মালিক নির্ধারণ করিয়াছি।' ইমানদারদের হতে হবে বিশ্বচরাচরের অধিপতি, তাই কোন কিছুতে ভয় পেয়ো না! কালামুল্লায় আমাদের উদ্দেশে একথাও বলা হয়েছে: 'আল্লাহ কেবল তাঁহার দাসের প্রচেষ্টা অনুযায়ীই তাহার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।'... অতএব নির্ভীক কৃপাণের আঘাতে শত্রুকে খতম করার জন্য তোমাদের সব রকম উদ্যম নিতে হবে।... পয়গম্বরের বাণীর জন্য যারা জান কবুল করেছে সেই ইমানদার

মুসলমানদের রোষের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় সাধ্য কার? দুশমনদের যেখানে দেখবে সেখানেই খতম কর, ওদের তাড়া কর! মহান আল্লাহর গজব কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ের পথ দেখাক!.."

"কাফেরদের খতম কর! কাফেরদের খেদাও!" জনতার মধ্য থেকে রব উঠল।

খরেজম শাহ লাল রঙের পুচ্ছধারী বাদামী ঘোড়ার ওপর উঠে বসে আরও কয়েকটি কথা বলল:

"আমাদের উদ্দেশ্য হল সদুপদেশ দেওয়া, আমরা তোমাদের তা-ই দিলাম। তিয়েন-শানের বরফ ঢাকা গিরিখাত থেকে পাষন্ডরা ইতিমধ্যে নামতে শুরু করেছে — তাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমরা সমরখন্দে চললাম।... তবে তাদের কপালে দুঃখ আছে! দুশমনরা আমাদের মরিয়া যোদ্ধাদের নির্ভীক সারির মুখে পড়ে মারা যাবে।... আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন!"

"যোদ্ধা মুহম্মদ বেঁচে থাকুন! কাফের বিজয়ী খরেজম শাহ জিন্দাবাদ!" শাহ এবং তার সুসজ্জিত কিপচাক দেহরক্ষীদের পথ করে দিতে দিতে জনতা আওয়াজ তুলল। "একা আপনিই আমাদের সেরা প্রতিরক্ষা!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অসির ধার — যোদ্ধার রক্ষাকবচ

বুখারা থেকে নির্গত হয়ে খরেজম শাহ মুহম্মদ অকস্মাৎ তার অশ্বের মুখ সমরখন্দ অভিমুখী বড় রাস্তার দিকে না ফিরিয়ে ফেরাল দক্ষিণে, কলিফের দিকে। রেশমী শালে মুখ ঢেকে সে নীরবে চলতে থাকে কখনও দুলকি চালে, কখনও বা দ্রুত গতিতে, তার সমগ্র অনুচরবৃন্দও পিছিয়ে না থেকে তাকে অনুসরণ করে চলে। দৈবাৎ সামনাসামনি পড়ে যেতে পথচারীরা পথ ছেড়ে পাশে খানায় লাফিয়ে পড়ে। তারা উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে যেন অবিকল ভয়ঙ্কর ইবলিশের তাড়া খেয়ে হাজার হাজার ঘোড়সওয়ার ছুটে চলেছে।

খাস উজির বৃথাই বাদশাহের পুত্র জালাল উদ-দিনের দৃষ্টি আকর্ষণ

করে বলতে গেল জাহাঁপনার সম্ভবত পথ ভুল হয়েছে। জালাল উদ-দিন উদাসীনভাবে উত্তর দিল:

"তাতে আমার কী? আমি পিতার অনুগত — তা সে বাদশাহ জাহান্নামের আগুনের মুখে ঝাঁপ দিতে চাইলেও।"

"এটা কার তালুক?" হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করে খরেজম শাহ ঘর্মাক্ত বাদামী ঘোড়াকে থামাল। সে তার হাতের চাবুক উঠিয়ে একটা দেয়াল দেখাল — দেয়ালের ওপর হেলে পড়া বুরুজগুলোর ওপারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু উঁচু ছিমছাম ঝাউয়ের সারি।

"এটা তিমুর মালিক খানের শিকার বাগ। পুরনো বাগান আর বুনো জন্তুজানোয়ারের দামী চিড়িয়াখানা বলে এর নাম-ডাক আছে।"

"ভালো করে সমস্ত জায়গাটা দেখতে চাই!" মুহম্মদ বলল। "তা বীরপুরুষ তিমুর মালিককে এখানে দেখছি না কেন?"

"যে দিন তিনি খোজেন্ত রক্ষিদলের সেনাপতি হওয়ার হুকুম পেলেন সেই দিনই উনি ওখানে চলে গেছেন।"

"একরোখা! আমি তাকে তাড়াহুড়ো করার হুকুম দিই নি। ওকে ছাড়া এখন আমার খারাপ লাগবে।..."

একশ' রক্ষীর দল অভ্যর্থনার আয়োজন করার জন্য আগে আগে ছুটে গেল। মুহম্মদ তার তেজী ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরে পায়ে পায়ে তালুকের দিকে এগিয়ে চলল। তোরণের ভারী কপাট খুলে গেল। ভৃত্যেরা আঙিনায় ছুটোছুটি করতে লাগল। চাবির ঝন্ঝন্ আওয়াজ তুলে তারা দীর্ঘ উঁচু চত্বরের অভিমুখী দরজাগুলো খুলতে লাগল। গোলামের দল বস্তা বস্তা যব আর গাদা গাদা শুকনো খড়ের আঁটি টেনে নিয়ে চলল। অশ্বারোহী বীরপুরুষের দল কাছাকাছি গ্রামে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল, ফিরে এলো বাছাই করা ভেড়ার মাংসের টুকরো আড়াআড়ি জিনের ওপর ধরে। ফৌজি বাবুর্চিরা উনুন জ্বালিয়ে খানা পাকাতে লেগে গেল।

শাহ মই বেয়ে বাগানের দেয়াল সংলগ্ন এক হাল্কা গড়নের কুঞ্জগৃহে উঠল। তার পেছন পেছন উঠে এলো জালাল উদ-দিন এবং তালুকের প্রবীণ নায়েব।

কুঞ্জগৃহ থেকে চোখে পড়ে আরও উজাড়, বৃক্ষপত্রশূন্য একটি বাগান। কিছু বুনো ছাগল তৃণাঙ্গণের ওপর শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিল, আর তাদের

পাশে দীর্ঘ শৃঙ্গধারী এক পাহাড়ী ছাগ সজাগ দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে ছিল।

নায়েব বুঝিয়ে বলল, "আরও কিছু দূরে, বাগানের গভীরে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে দু' জোড়া বুনো শুয়োর থাকে। আর খাঁচায় আছে কিছু দিন আগে পাহাড় থেকে ধরে আনা দু'টি দারুণ হিংস্র চিতাবাঘ। চিতাবাঘেরা কীভাবে বুনোশুয়োর আর ছাগলদের পেছনে তাড়া করে আমাদের হুজুর তিমুর মালিক ওই আরামঘর থেকে তা দেখতে ভালোবাসেন, কখনও নিজে শিকারের জন্য বাগানে নেমে আসেন। তিনি তীরের এক ঘায়ে জন্তু মারতে পারেন, আগে থেকে বলে দিতে পারেন শরীরের কোন জায়গায় তীর বিঁধবে।"

"হট!" শাহ রূঢ়স্বরে বলল।

পুত্রকে একান্ত পেয়ে শাহ নীচু গলায় তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল।

"আমি চিন্তিত। চরেরা একসঙ্গে তিন দিক থেকে খবর নিয়ে এসেছে। সর্বত্র কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে।"

"তা না হলে আর যুদ্ধ!" জালাল উদ-দিন উদাসীনভাবে মন্তব্য করল।

"প্রথম চর খবর এনেছে যে কটা রঙের বাঘ চেঙ্গিজ খানটা ওতরার দখল করে ইনাল্‌চিক কাইর খানকে ধরেছে, প্রতিহিংসা মেটানোর উদ্দেশ্যে তার চোখে ও কানে গলানো রুপো ঢেলে দেওয়ার হুকুম দিয়েছে। এখন চেঙ্গিজ খান এদিকে আসছে, আমাকে খুঁজছে।"

"আসুক না! আমরা ত তারই অপেক্ষায় আছি!"

"ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পড়েও কিনা তুই নিশ্চিন্ত!"

"আমাদের এত বিরাট ফৌজ আছে যে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই।"

"দ্বিতীয় চর এসেছে দক্ষিণ দিক থেকে। সে জোর দিয়ে বলছে যে তাতারদের টহলদার রিসালা দেখেছে।"

"সে কোন ছোটখাটো দল হবে। এখন, বসন্তের গোড়ায় বরফ ঢাকা পাহাড়ী পথে বড়রকমের কোন ফৌজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা।"

"কিন্তু পাহাড় থেকে নেমে এসে তাতার সৈন্যদের দল হিন্দুস্তানের দিকে আমাদের পিছু হটার পথ বন্ধ করে দেবে।"

"আমরা সে দিকে পিছু হটতে যাব কেন?"

"আরও খবর আছে। ক্‌জিল-কুমের মর্‌ভূমিতে এর মধ্যেই মোঙ্গলদের টহলদার রিসালা দেখা গেছে।''

"মর্‌ভূমিতে ঠেকানোর জন্য দশ হাজার তুর্কমেন ঘোড়সওয়ারের দল পাঠানো হয়েছে।"

"এই তুর্কমেনরা মোঙ্গলদের বাধা দিতে পারবে না।"

"যদি তা-ই হয় তাহলে ত চেঙ্গিজ খান শিগ্‌গিরই ব্‌খারার ফটকের কাছে দেখা দিতে পারে। এর জন্য আমাদের তৈরি হতে হয়।"

"হতে পারে যে লাল দাড়িওয়ালা জানোয়ারটা ইতিমধ্যে চুপিচুপি ব্‌খারার দিকে এগিয়ে আসছে, তার সৈন্যদল আমাদের খোঁজে চার দিক তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে পড়া উচিত!..'' ম্‌হম্মদ বিড়বিড় করে এমনভাবে এদিক-ওদিক তাকাল যেন বাগানের ঝোপের আড়াল থেকে এই ব্‌ঝি ওরা আক্রমণ করে বসে।

জালাল উদ-দিন চুপ করে রইল।

"উত্তর দিচ্ছিস না যে?"

"তুমি আমাকে বাতুল বলে ভাব। আমি আর কী বলতে পারি?"

"আমি তোকে বলতে হ্‌কুম করছি।"

"তাহলে আমি বলব, তুমি আমার গ্‌নাহ মাফ করতে পার কিংবা গর্দান নিতে পার। নচ্ছার চেঙ্গিজ খানটা এখানে এলে আমাদের ফৌজের উচিত হবে শহরের উঁচু উঁচু দেয়ালের আড়ালে গা ঢাকা না দিয়ে তাকে খ্‌ঁজে বার করা। নিরীহ গ্রামবাসীদের ছাল চামড়া তুলে নেওয়ার বেলায় যারা সাহস ধরে অথচ এই ভয়ঙ্কর য্‌দ্ধের ম্‌হ্‌র্তে যারা বাঁশপাতার মতো থরথর করে কাঁপে আমি হলে সেই কিপচাক খানদের সকলকে লড়াইয়ের ময়দানে খেদিয়ে নিয়ে যেতাম। আমি ওদের জানের ভয় দেখিয়ে শহরের ফটকের ভেতর ঢোকা বন্ধ করে দিতাম। অসির ধার আর তেজী ঘোড়া — যোদ্ধার রক্ষাকবচ। কটা রঙের বাঘটা এখানে আসছে? তা ভালোই ত। তার মানে আমরা এখন তার পথ জানি। ঘোড়ার ম্‌খ ঘ্‌রিয়ে তার পিছ্‌ নেওয়া উচিত, তার টেংরি কামড়ে ধরে পথ আটকে দিতে হয়, চার দিক থেকে আক্রমণ করা দরকার, ওর উটগ্‌লোকে খতম করা চাই, মাংস সমেত তার কটা চামড়া থেকে দাড়ির গোছা উপড়ে আনা চাই। সমরখন্দে প্রাচীরের আড়ালে এক লাখ ঘোড়সওয়ার ল্‌কিয়ে থাকলে

লাভ কিসের? ওরা ওখানে দিব্যি ভেড়ার মাংস চিবুচ্ছে আর ওদের ভালো ভালো ঘোড়াগুলো শক্তি হারাচ্ছে।"

"তুই তোর বাপের হুকুমের সমালোচনা করছিস? আমি বহুদিন হল এটা লক্ষ্য করেছি। তুই আমার ধ্বংস চাস।"

জালাল উদ-দিন চোখ নামাল, তার কণ্ঠস্বরে বিষণ্ণতা ফুটে উঠল:

"এটা ঠিক নয়। বিশ্বচরাচর যদি রসাতলে যায় সেই কঠিন মুহূর্তেও আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না। কিন্তু আমি তোমার প্রিয় ইস্কান্দারের নামে দিব্যি করে বলছি যে এরকম নিরীহ ও দোটানা মনোভাব আমার কাছে বাতুলতার সামিল। তোমার এই বিশাল ফৌজ যদি জঙ্গী শিবিরের যোগ্য না হয়, যদি তা তোমার হাতের ইশারায় দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত না থাকে তাহলে তাতে কাজ কী! এই উঁচু উঁচু প্রাচীরেই বা কী কাজ যদি তা আমাদের স্ত্রী ও শিশুদের আড়াল না দিতে পারে, যদি তার পেছনে আতঙ্কগ্রস্ত মেয়েদের কম্বলের নীচে গা ঢাকা দিয়ে থাকে সশস্ত্র বীরপুরুষের দল! তুমি আমার গর্দান নিতে পার, কিন্তু আমি যা বলছি তা কর। পিতা, আমরা সমরখন্দে যাই, সেখান থেকে এগিয়ে যাব..."

"একমাত্র ইরানে, কিংবা হিন্দুস্তানে!"

"না! আমাদের দুটো বিবেচনার মধ্যে একটি বাছাই করে নেবার আছে: হয় মরদের মতো লড়াই করা নয়ত নির্বাসনে কলঙ্কজনক মৃত্যু। তাতারদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য আমরা ফৌজ নিয়ে খোলা মাঠে নামব।... আমরা হব বিদ্যুতের আঘাতের মতো ক্ষিপ্র, রাতের ছায়ার মতো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।... তুমি মহান সেনানায়কের খ্যাতি পাবে!.. আর দেরি নয়, কাজে নেমে পড়!"

"তুই সেনানায়ক নোস," শাহ বাদশাহী ভঙ্গিতে হীরের আঙটিসুদ্ধ আঙ্গুল তুলে বলল, "তুই সাহসী জোয়ান, কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এমন কয়েক হাজার ঘোড়সওয়ারের সর্দার অবধি হতে পারিস।... আমি কিন্তু সাহসী অথচ কাণ্ডজ্ঞানহীন ঘোড়সওয়ারের মতো আচরণ করতে পারি না। আমাকে সব কিছু আগাগোড়া ভেবে দেখতে হয়, সব রকম পরিণাম চিন্তা করতে হয়। আমি অন্য রকম ভেবেছি। আমরা তোকে সঙ্গে নিয়ে কলিফে যাব, সেখানে জাইহুন নদীর ঘাট রক্ষা করব।"

"আর আমাদের জন্মস্থানকে ছেড়ে যাবে? লোকে যদি খরেজম শাহদের গোটা বংশকে এই বলে শাপ-শাপান্ত করে যে আমরা তাদের কাছ থেকে কেবল খাজনা আদায়েরই ক্ষমতা রাখতাম, আর বিপদের দিনে তাদের তাতারদের হাতে ছিন্নভিন্ন হওয়ার জন্য রেখে চলে গেলাম তাহলে ত তারা ভুল করবে না!"

"ইরানে আমি নতুন করে বিরাট ফৌজ জড় করব।"

"না বাদশাহ! এখন যে শক্তি হাতে আছে তা নিয়েই কাজ করা উচিত। তোমার নিজের বাহিনী যখন নেতা ছাড়া অবস্থায় প্রাচীরের আড়ালে আত্মগোপন করছে তখন অন্য ফৌজকে তালিম দিয়ে গড়ে তোলার আর সময় নেই। একদিনের বিজয়ের জন্য বিশ বছর ধরে ফৌজকে তালিম দিতে হয়। সমরখন্দে চল! তোমার পাশে থেকে সাধারণ ঘোড়সওয়ার হয়ে আমি যুদ্ধ করব!.."

"না, না! তোকে হুকুম করছি বাল্‌খে যেতে, সেখানে গিয়ে নতুন ফৌজ জোগাড় করা যাবে। সৌভাগ্য আমাকে ছেড়ে গেছে।..."

"সৌভাগ্য?" জালাল উদ-দিন ক্রোধে গর্জন করে উঠল। "সৌভাগ্য মানে? সৌভাগ্য কি বীরকে ছেড়ে যেতে পারে? সৌভাগ্য থেকে পালানো ঠিক হবে না, তার পিছু পিছু ছুটতে হয়, তার নাগাল ধরতে হয়, চুলের মুঠি চেপে ধরে তাকে সবলে নিজের পদলেহী করতে হয়।... এই হল সৌভাগ্য লাভের উপায়!.."

"যথেষ্ট হয়েছে! তুই চিরকাল মাথামোটা ঘোড়সওয়ারই হয়ে থাকবি। বিশাল খরেজম সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তোর নেই।..."

খরেজম শাহ দ্রুত চরণে আরামঘর থেকে নীচে নেমে এলো, হাঁসফাঁস করতে করতে তাড়াতাড়ি বাড়ির উঁচু চত্বরের দিকে চলল; সেখানে বিছানো ফরাসের ওপর চর্ব্যচোষ্য দস্তরখানের আয়োজন প্রস্তুত। নামাজ শেষ করে শাহ ভোজনের দিকে মনোযোগ দিল, খেতে খেতে পথঘাট সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ করতে লাগল এবং ভোজন অর্ধসমাপ্ত রেখেই ঘোড়ায় জিন দেওয়ার হুকুম দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুর্ধর্ষ তিমুর মালিক

ওত্‌রারে চেঙ্গিজ খান তার বাহিনীর এক অংশ দিয়ে দুই ছেলে উগেদেই ও জাগাতাইকে রেখে গেল, তাদের বলল:

“নগরপাল ইনাল্‌চিক কাইর খানকে যতক্ষণ জ্যান্ত ধরা না যাচ্ছে ততক্ষণ তোরা শহর ঘেরাও করে রাখবি। ওকে শেকলে বেঁধে আমার কাছে নিয়ে আসবি। আমি নিজে এই বেতমীজটাকে সাজার মতো সাজা দেব।”

বড় ছেলে জুচিকে হুকুম দিল জেন্দ ও এন্‌গিকেন্ত শহর দখল করার। বাহিনীর অবশিষ্ট অংশকে খান বিভিন্ন দিকে পরিচালনা করল।

পাঁচ হাজার অশ্বারোহী দিয়ে আলাক নোইয়নকে চেঙ্গিজ খান পাঠাল বেনাকেত শহরের দিকে সেখানে কিপচাক সৈন্যদের একটি দল ছিল। তিন দিনের অবরোধের পর অধিবাসীরা বর্ষীয়ানদের পাঠিয়ে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল। আলাক নোইয়ন হুকুম দিল পুরুষেরা সকলে যেন শহর থেকে বেরিয়ে এসে মাঠে সার বেঁধে দাঁড়ায় — যোদ্ধা, হুনুরী এবং অন্যান্য লোক — এই রকম আলাদা আলাদা ভাগ করে। যোদ্ধারা নির্দিষ্ট স্থানে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে সরে দাঁড়াতে মোঙ্গলরা বল্লম, তরবারি ও তীরের আঘাতে তাদের সকলকে মেরে শেষ করল। অবশিষ্ট বন্দীদের ভেতর থেকে সবচেয়ে শক্তসমর্থ যুবকদের বেছে নিয়ে হাজার, একশ' ও দশের এক-একটি ভাগ করে মোঙ্গল সেনাপতিদের জিম্মায় দিয়ে দেওয়া হল, ভেড়ার পালের মতো তাদের আরও দূরে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল যাতে তারা অবরুদ্ধ শহরগুলোর প্রাচীর ভাঙে এবং প্রবল আক্রমণের প্রথম চোটটা তাদের ওপর দিয়েই যায়।

পথে অন্যান্য মোঙ্গল সৈন্য ও জোটের সৈন্যদল আলাক নোইয়নের সঙ্গে শামিল হতে তার যোদ্ধার সংখ্যা প্রায় আশি হাজারে দাঁড়াল। এই সৈন্যদল খরস্রোতা ও প্রচুর জলে পরিপূর্ণ জাইহুন নদী বিধৌত খোজেন্ত নগরের দিকে এগিয়ে এলো। প্রাচীন উঁচু প্রাচীরের দুর্ভেদ্যতার ওপর আস্থা থাকায় নগরবাসীরা আত্মসমর্পণে অস্বীকার করল।

শহরের ফৌজের সেনাপতি সবে হয়ে এসেছে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, সাহস, দৃঢ়তা ও অকপট স্বভাবের জন্য বিখ্যাত তিমুর মালিক। জাইহুন

নদী যেখানে দু'টি শাখায় ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে, নদীর মাঝখানে দ্বীপের ওপর সে এক উঁচু কেল্লা বানানোর অবকাশ পেল এবং সেখানে অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য দ্রব্য মজুত করে রাখল।

মোঙ্গলরা উপস্থিত হয়ে বন্দীদের এগিয়ে দিল, চাবুক ও তরবারির আঘাতে কম্পিত মুসলমানরা তখন খোজেন্তের প্রাচীরের ওপর চড়াও হল। খোজেন্তের অধিবাসীরা জাতভাইদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে প্রতিরক্ষা থেকে নিরস্ত হল।

তিমুর মালিক সবগুলো নৌকো হস্তগত করে এক হাজার দুঃসাহসী অশ্বারোহী পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে দ্বীপে ঘাঁটি গাড়ল। ওদিকে খোজেন্তের অধিবাসীরা ক্ষমার আর্জি নিয়ে গণ্যমান্য লোকজনকে মোঙ্গলদের কাছে পাঠাল, ফটক খুলে দিল। মোঙ্গলরা মুহূর্তের মধ্যে নগর লুট করল।

মোঙ্গলরা ক্ষেপণযন্ত্র থেকে দ্বীপের কেল্লার ওপর আক্রমণ চালাল, কিন্তু পাথর ও তীর ঘাঁটি পর্যন্ত পেঁছাল না। তখন মোঙ্গলরা খোজেন্ত থেকে সমস্ত যুবককে তাড়িয়ে নিয়ে এসে বেনাকেত ও অন্যান্য অঞ্চলের বন্দীদের সঙ্গে যুক্ত করল, নদীর দুই তীরে পঞ্চাশ হাজার মতো লোক জমায়েত করল। দশ জনের ও একশ' জনের দলে ভাগ করে মোঙ্গলরা তাদের তিন ফারসাখ* দূরে সবচেয়ে কাছের পাহাড়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেল এবং বাঁধ দিয়ে নদী আটকানোর উদ্দেশ্যে সেখান থেকে তাদের দিয়ে পাথর বয়ে আনাল।

ইত্যবসরে তিমুর মালিক আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য ভিজে কম্বল ও কাদামাটি দিয়ে উপরিভাগ ঢাকা বারোটি ভেলা তৈরি করে ফেলল। সেগুলোর দু' পাশে তীর ছোঁড়ার মতো ফুটো রাখা হল। প্রতিদিন প্রত্যুষে সে প্রতি তীরে ছয়টি করে ভেলা পাঠাতে লাগল, তার সৈন্যরা মোঙ্গলদের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করে চলল, ওদিকে মোঙ্গলদের মশাল-তীর ভেলাগুলোর কোন ক্ষতি করতে পারল না।

তিমুর মালিক প্রতি রাতে হামলার ব্যবস্থা করল, তার দলবল অতর্কিতে ঘুমন্ত মোঙ্গলদের ওপর এমন চড়াও হতে লাগল যে মোঙ্গল বাহিনীকে সব সময় আশঙ্কার মধ্যে কাটাতে হত।

মোঙ্গলদের সঙ্গী চীনা কারিগররা দূর থেকে যুদ্ধ করার উপযোগী নতুন নতুন এবং আরও জোরালো ক্ষেপণযন্ত্র তৈরি করল। পাথর ও বড়

* তিন ফারসাখ — আন্দাজ ২১ কিলোমিটার।

বড় তীর নিক্ষেপের গুলতি তিমুর মালিকের সৈন্যদের ভয়ঙ্কর ক্ষতিসাধন করতে লাগল। পরিস্থিতি নৈরাশ্যজনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে বুঝতে পেয়ে তিমুর মালিক রাতের অন্ধকারে সত্তরটি নৌকো ও ভেলা সাজিয়ে সেগুলোতে মালপত্র বোঝাই করল, সৈন্যদের ওঠাল। আচমকা সমস্ত নৌকোর ওপর আগুনের শিখা ও মশাল জ্বলে উঠল এবং নদীর উত্তাল স্রোতের টানে অগ্নিবন্যার মতো সেগুলো উজানে বেয়ে ছুটে চলল।

দুই তীর ধরে মোঙ্গল ফৌজ তাদের পিছু ধাওয়া করল। মোঙ্গলদের যেখানে দেখা যাচ্ছিল তিমুর মালিক সেই দিক লক্ষ্য করে তার নৌকো ও ভেলা চালাতে লাগাল। ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীরে সে তাদের হটিয়ে দিয়ে আরও দূরে এগিয়ে যায়। বেনাকেতে পেঁছানোর পর এক ঘায়ে নদীর এপার-ওপার বিস্তৃত মোঙ্গলদের বেষ্টনী ছিন্ন করে নৌকো ও ভেলার সারি পাশ কাটিয়ে দ্রুত চলে গেল।

নদীতে আরও বড় প্রবল বাধা থাকতে পারে এই আশঙ্কায় বার খালিগকেন্তের কাছাকাছি জায়গায় বহু ঘোড়ার পাল দেখতে পেয়ে তিমুর মালিক তীরে নৌকো ভিড়াল, যোদ্ধাদের ঘোড়ায় চড়িয়ে স্তেপে ছুটে গেল; মোঙ্গলরা তার পিছু নিল। তিমুর মালিকের যোদ্ধাদের বার কয়েক গতি থামিয়ে যুদ্ধে নামতে হল, মোঙ্গলদের হটিয়ে দিয়ে তারা আবার এগিয়ে চলল।

আত্মসমর্পণের ইচ্ছে কারোই ছিল না, মাত্র জন কয়েক রাতের অন্ধকারে মোঙ্গলদের শিবিরের সারি ভেদ করে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল। অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় যোদ্ধাদের নিয়ে নিজের ঘোড়ার ওপর ভরসা করে স্তেপের আরও গভীরে অগ্রসর হতে হতে তিমুর মালিক প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে লাগল।

যখন তিমুর মালিকের শেষ সঙ্গীরাও ধরাশায়ী হল অথচ তার তূণীরে সাকুল্যে তিনটি তীর রয়ে গেছে তখন মাত্র তিন জন মোঙ্গল তাকে ধাওয়া করে চলেছে। এক জন মোঙ্গলের চোখ তীরবিদ্ধ করে সে বাকিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল।

তূণীরে দু'টি তীর সম্বল করে তিমুর মালিক মরুভূমির ইঁদারা পর্যন্ত পেঁছাল; সেখানে কারা কন্‌চারের সেনাদলের তুর্কমেনরা ছিল। তারা তাকে নতুন ঘোড়া দিল, তিমুর মালিক তাতে চেপে খরেজমে পেঁছে চেঙ্গিজ খানের সঙ্গে পরবর্তী যুদ্ধের তোড়জোড় করতে লাগল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মরুভূমির বুকে মোঙ্গল বাহিনী

এই বিদঘুটে জাতটা এত দ্রুত পথ চলে
যে স্বচক্ষে না দেখলে কারও প্রত্যয় হবে না।

(ক্লাভিগো, পঞ্চদশ শতক)

যখন ওতরারে জ্বলন্ত ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ থেকে ধোঁয়া উঠছিল এবং নগর দুর্গে অবরুদ্ধ একরোখা ইনাল্‌চিক খান প্রাচীর বয়ে উঠে আসা মোঙ্গলদের প্রাণপণে ঠেকিয়ে যাচ্ছিল তখনই চেঙ্গিজ খান নয়পুচ্ছ সংবলিত শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দিয়ে তার দলবলকে আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়ার হুকুম দিল।

চেঙ্গিজ খান তার পুত্রদের ও প্রধান প্রধান সামরিক নেতাকে ডেকে পাঠাল। সকলে একটা বড় কম্বলের ওপর গোল হয়ে বসল। ইতিমধ্যে প্রত্যেকেই হুকুম পেয়ে গেছে কোন দিকে, কোন শহরের অভিমুখে তাকে যাত্রা করতে হবে, অথচ কেউই ভরসা করে ভয়ঙ্কর অধিপতিটিকে জিজ্ঞেস করতে পারল না তার শ্বেত পতাকার গতি কোন মুখে হবে।

চেঙ্গিজ খান বলল:

"আমার অনুপস্থিতিতে সাবধানী বুগুর্জি নোইয়ন গোটা ফৌজের কর্তা হবে। সামনের ভাগের দলগুলো পরিচালনা করবে আচমকা আক্রমণে পটু জেবে নোইয়ন আর ওত পাতার ব্যাপারে অভিজ্ঞ সুবুদাই। মাঠের ফসল কেউ পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করবে না, তাহলে ঘোড়াগুলোকে খাওয়ানোর মতো কিছু পাওয়া যাবে না। বুখারা ও সমরখন্দের মাঝখানে সমভূমির ওপর শাহ মুহম্মদের সঙ্গে আমাদের মুলাকাত হবে। আমরা তিন দিক থেকে তার ওপর আক্রমণ চালাব। খরেজম শাহের প্রধান ফৌজকে ধ্বংস করে আমি তামাম মুসলমান দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হব।"

শ্বেত পতাকায় অধিষ্ঠানকারী দেবতা — যোদ্ধাদের রক্ষাকর্তা সুলদের নাম করে ঘোল পান করার পর চেঙ্গিজ খান ঘোড়ায় চেপে বসল, বাহিনী অভিযানে যাত্রা করল। দলের এক ভাগ চলল সাইহুন নদী বরাবর মোহানার বিপরীত দিকে, অন্য ভাগ উজান বরাবর, আর চেঙ্গিজ খান কারাভান চলার পথ ধরে ক্‌জিল-কুম মরুভূমির গহনে প্রবেশ করল।

মাঘের সূর্য দিনের বেলা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, তেতে ওঠে, রাতে ডোবাগুলো বরফে জমে যায়, পাঁকে ভরা জমির ওপর আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ পায়ে-চলা-পথ কঠিন আকার ধারণ করে। ফৌজ নিঃশব্দ চরণে এগিয়ে চলে, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি বা অস্ত্রের ঝনঝনা শোনা যায় না, গানের কলি ধরার মতো মেজাজ কারও দেখা যাচ্ছে না। দলগুলো গায়ে গায়ে লেপ্টে চলেছে। তাদের বিরাম স্বল্প সময়ের, সৈন্যরা ঘোড়ার সামনের খড়ের কাছে নিদ্রা যায়।

রাতে জাসুসীদের দলবল মশাল জ্বালিয়ে আগে আগে চলে। বিভিন্ন সারি যাতে পথ হারিয়ে না ফেলে এবং একে অপরের সঙ্গে মিশে না যায় সেই উদ্দেশ্যে তারা টিলার ওপরে উঠে আগুন জেবলে সংকেত করে। শোনা যায় যে দুশমন মুসলমানদের বাহিনীগুলোর মধ্যে দীর্ঘ ঠ্যাংওয়ালা ঘোড়ার সওয়ার হিশেবে তুর্কমেনদের খ্যাতি আছে। তারা টিলার আড়াল থেকে শিকারী চিতার মতো লাফিয়ে পড়ে, সৈন্যদের সারি ভেদ করে যায়, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং ফাঁসদড়িতে বন্দীদের বেঁধে নিয়ে তেমনি পলকে উধাও হয়ে যায়।

মোঙ্গলদের প্রথম প্রথম ধারণা হয়েছিল যে তাদের বাহিনী বুঝি মরুভূমি ভেদ করে সোজা খরেজমের প্রধান নগরী গুরগঞ্জের দিকে চলেছে। কিন্তু দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর যখন সাইহুনের ঘোলা জল পিছে পড়ে রইল আর সূর্য সকালে তাদের পেছন দিক থেকে না উঠে ডান পাশ থেকে উঠল তখন সকলে বুঝতে পারল যে ঘোড়ার মুখ পশ্চিমে নয়, দক্ষিণে — বিখ্যাত শহর সমরখন্দ ও বুখারার দিকে ঘোরানো।

সেনাবাহিনীর মাঝখানে এক হালকা বাদামী রঙের টগ্‌বগে ঘোড়ায় চেপে চেঙ্গিজ খান চলেছে, সে ঘোড়ার কালো কালো ঠ্যাং শক্তসমর্থ, তার পিঠ বরাবর কালো ডোরা। গোটা বাহিনী চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে — তাতারদের ভাষায় যাকে বলে 'আয়ান' অর্থাৎ 'নেকড়ের কদমে'। বাঁ হাতে আলগা করে লাগাম ধরে অচঞ্চল ও নির্বিকার ভঙ্গিতে অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন খান-ই-খানান; তার চোখ জোড়া কুঞ্চিত, সংকীর্ণ ফাটল কদাচিৎ উন্মুক্ত হচ্ছিল, চলতে চলতে ঝিমুচ্ছে না গভীর ভাবনা-চিন্তায় ডুবে রয়েছে, নাকি ঐ ফাটলের মাঝখান দিয়ে সব কিছু খেয়ালে রেখে, কোনরকম ভুলচুক না করে তীব্র দৃষ্টিতে কাছের ও দূরের যাবতীয় জিনিস খুঁটিয়ে দেখছে তা বোঝা ভার।

এই অভিযানে চেঙ্গিজ খান কোন রকম কালবিলম্ব করল না; তার জন্য ছাউনি ফেলা হল না, ভাঁজ করা কম্বল তার শয্যা হল। শয়নের সময় সে চামড়ার শিরস্ত্রাণ খুলে রেখে দামী কালো পশুলোমের আস্তর লাগানো কান ঢাকা টুপিতে পক্ককেশমণ্ডিত মাথা ঢাকে। সে ঝিমুতে থাকে আর বাতাস, বৃষ্টি অথবা তুষার থেকে খানকে কম্বল আড়াল দিয়ে তার পাশে সারাক্ষণ বসে থাকে চার জন বিশ্বস্ত দেহরক্ষী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অবরুদ্ধ বুখারায়

কঠোরতা যখন দরকার তখন কোমলতা সাজে না। কোমলতায় শত্রুকে মিত্র করা যায় না, তার আবদার বাড়ে মাত্র।

(সাদী)

দরবেশ হাজি রহিম বালক তুগান ও কুরবান কিজিক রাতের আশ্রয়ের সন্ধানে বৃথাই সারাদিন বুখারায় ঘুরে ঘুরে বেড়াল। সন্ধ্যা নাগাদ সশব্দে দোকানপাটের কপাটে আগল পড়ল, লোকজন দ্রুত ছত্রভঙ্গ হয়ে রাস্তা থেকে অদৃশ্য হল, পথরোধকারী উঁচু উঁচু প্রাচীরের আড়ালে গা ঢাকা দিল। তিন মুসাফির অনর্থক দোরে দোরে রাতের আশ্রয়ের জন্য মিনতি জানাল। তারা একই উত্তর শুনতে পেল:

"আমাদের বাড়িই মেহমানে ভর্তি, আগে দেখ!"

সরাই আর আশখানাগুলোও* বন্ধ হয়ে গেছে — সে সব জায়গায় গাদাগাদি করে শরণার্থীদের ভিড়ের মধ্যে এক রাত বসে কাটানোর মতো ঠাঁই দেওয়ার জন্যই মালিকরা মুঠোখানেক করে দিরহাম চেয়ে বসে। এদিকে লম্বা লম্বা লাঠিসোটা হাতে চৌকিদারদের সঙ্গে নিয়ে আইনশৃঙ্খলা এবং লোকজনের স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে তদন্তকারী দারোগা, 'রইস্‌রা' অসদুদ্দেশে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে এমন সব সন্দেহজনক লোকের মনে জিন্দানে হাজতবাসের ভীতি উদ্রেক করে পথে পথে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

---

* আশখানা — ভোজনালয়।

অবশেষে এক সরু গলির একেবারে ভেতরে দুর্গের দেয়ালের গায়ে আধা ধসে পড়া কিছু কুটির দেখতে পেয়ে কুরবান কিজিক সেগুলোর একটির সমতল চালে উঠে শুকনো ডালপালা ও খড়ের গাদায় সকলকে লুকিয়ে পড়তে বলল। সে নিজে প্রথমে উঠে সঙ্গীদের উঠতে সাহায্য করল। সেখানে তারা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দরবেশের প্রশস্ত আলখাল্লায় গা ঢেকে লুকিয়ে রইল।

রাতে বরফের মিহি গুঁড়ো গায়ে ঝরিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক তাদের হাড় কাঁপিয়ে দিল। শহরের গুঞ্জন আরও অনেকক্ষণ চলল, ধীরে ধীরে তা ক্ষীণ হয়ে আসতে আসতে অবশেষে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেল। এখন শোনা যেতে লাগল রাতের চৌকিদারদের চলাফেরার আওয়াজ আর শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পাহারাদার কুকুরগুলোর নিজেদের মধ্যে জানান দিয়ে হাঁক ডাক।

পর দিন মুয়াজ্জিনরা যখন ছিমছাম গড়নের মিনারগুলোর চুড়ো থেকে ভোরের আজানের সুর তুলল তখন তিন বন্ধুতে উঠল গিয়ে শহরের উঁচু প্রাচীরে — ভীত-সন্ত্রস্ত শহরবাসীরা পড়িমরি করে সেখানেই ছুটে আসছিল।

পুবের ফটকের সামনাসামনি সমভূমিতে, নিঃসঙ্গ টিলার ওপর নজরে পড়ার মতো এক অদ্ভুত বিশাল হলুদ রঙের তাঁবু দাঁড়িয়ে আছে। তাঁবুর চার দিকে কাতারে কাতারে অশ্বারোহীর আনাগোনা চলছে। আলাদা আলাদা সারি বেঁধে তারা মাঠের ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে গিয়ে শহরের প্রাচীর ঘিরে দাঁড়াল। বুখারাবাসীরা এ ধরনের চেহারা দেখতে অভ্যস্ত নয় : তাদের ছোট ছোট ঘোড়াগুলো ক্ষিপ্ত বুনো শুয়োরের মতো দুরন্ত গতিতে কদম ফেলে ছুটছে, স্বচ্ছন্দে মোড় ফিরছে, আচমকা থমকে দাঁড়িয়েই আবার নতুন কোন দিকে ছুটে চলছে। ধাতব শিরস্ত্রাণ আর বর্মের লৌহ ফলকগুলো ধুলোর মেঘ ভেদ করে লুটিয়ে পড়া সূর্যরশ্মির কিরণে ঝল্‌মল্‌ করছে। অশ্বারোহীদের নতুন কতকগুলো দল কোদাল ও লাগি হাতে ধরা হাজার হাজার কৃষকের জনতা তাড়িয়ে নিয়ে চলছিল।

"খুদে খুদে ঘোড়ার পিঠে এই অদ্ভুত লোকগুলো কারা?" কুরবান কিজিক জিজ্ঞেস করল।

"কী কথাই না জিজ্ঞেস করলি!" মাটিতে বর্শা ঠুকে এক উগ্র মেজাজের যোদ্ধা বলে উঠল। "দেখতে পাচ্ছিস না ওরা আমাদের লোকজন

নয়, মুসলমান নয়! এসে গেছে সেই তারা — ইয়াজুজি আর মাজুজিরা, যাদের লোকে 'তাতার' বলে। আর ঐ হলুদ তাঁবুতে বসে আমাদের লক্ষ্য করে হাসছে তাদের সর্দার খান — আল্লাহ্ ওটাকে খতম করুন!"

কুরবান কিজিক আর্তনাদ করে উঠল:

"শহরের ফটক বন্ধ! এখন আর আমার বের হওয়ার উপায় নেই! আমার ছেলেমেয়ে বেচারাদের হাল কী হবে? আমাকে বুঝি এখানে পুরো এক বছরই কাটাতে হয়!"

প্রাচীরের ওপর দিয়ে হোমরা চোমরা গোছের কোন এক সেনাপতি — ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ ও রুপোলি জালিবর্ম আঁটা এক হাজিব চলছিল। কুরবান বুকের ওপর দু' হাত ভাঁজ করে তার কাছে ছুটে গেল, তার পোশাকের প্রান্ত চুম্বন করে বলল:

"মহামান্য বীরপুরুষ বেগ ইনান্‌চ খান, আমাকে চিনতে পারছেন? আমি আপনার খেত-মজুর, আপনার রাইয়ত কুরবান কিজিক! সালাম!"

"তুই নিজের রিসালায় না থেকে এখানে কেন?"

"বাদশাহের হুকুমে আমি কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য পায়ে হেঁটে বুখারায় এসেছি। পথে আমার মাদী ঘোড়াটা চুরি হয়ে গেছে — আল্লাহ করুন সেই চোরের শিরে যেন বজ্রাঘাত হয়! আমার সর্দার যিনি হবেন তাঁর খোঁজে এখানে পুরো দু' দিন হল ঘুরছি। কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ কথাই বলতে চায় না। বাদশাহের জন্য শির দিতে এলাম, অথচ দেখছি যোদ্ধাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময়ই কারও নেই; তাহলে কেই বা এই ইয়াজুজিদের সঙ্গে লড়বে?"

"এমন মরদের মতো কথা শুনে আমার প্রাণ জুড়াল রে কুরবান কিজিক," ইনান্‌চ খান বলল। "তোর দু' হাতে তাকত আছে, আর মাঠে অমানুষিক খাটা-খাটনি করে তোর পিঠও বেঁকে গেছে দেখছি। লড়াইয়ে তুই একটা বড়রকমের বীর হতে পারবি। আমি তোকে নিজের দলে নিচ্ছি। আমার সঙ্গে আয়।''

এইভাবে কুরবান দরবেশ এবং তার সঙ্গী তুগানের কাছ থেকে বিদায় নিল।

ইনান্‌চ খানকে অনুসরণ করে কুরবান এসে হাজির হল এক চত্বরে, যেখানে ঘোড়ার পাল বাঁধা ছিল, সেনাদলের জ্বালানো অগ্নিকুণ্ড থেকে

ধোঁয়া উঠছিল, কড়াইয়ে ভাত ফুটছিল, ভেড়ার চর্বির ঘ্রাণ ভেসে আসছিল। "এখানে লোকজনকে কেবল জবাইয়ের জন্য খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় না, তাদের খাওয়ানোও হয়," কুরবান মনে মনে খুশি হয়ে বলল।

"হেই চাউশ* ওরাজ!" কালো দাড়িওয়ালা লম্বা চেহারার এক তুর্কমেনের উদ্দেশে ইনান্‌চ খান হাঁক পাড়ল; লোকটা তার সেনাপতিকে দেখে ঝুঁকে পড়ে সম্মান দেখাল। "এই সাহসী সৈন্য কুরবানে কিজিক তোমার অধীনে ভর্তি হচ্ছে। ও খেতে ভালো কাজ করত, যোদ্ধা হিশেবেও ভালো হবে।"

"একে কি ঘোড়া দিতে হবে, নাকি ও পাইক সৈন্য হবে?"

"ওকে তলোয়ার, ঘোড়া এবং আর যা যা দরকার হয় দেবে। আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন!" এই বলে ইনান্‌চ খান বিদায় নিল।

চাউশ ওরাজ দশ জনের অশ্বারোহী দলের সর্দার। তারা সকলে গোল হয়ে আগুনের চার ধারে বসে ছিল। তাদের একজনের হাতে ছিল কাঠের তৈরি বড় একটা হাতা; কুরবানের অভিনন্দনের উত্তরে সে বলল:

"এই বড় বর্শাটা এনে ভালোই করেছিস। পোলাও রান্নার লকড়িতে টান পড়েছে।" সে কুরবানের ভারী বর্শা নিয়ে কুড়ুল দিয়ে ছোট ছোট খণ্ড করে কেটে ফেলল, তারপর আগুনে ফেলে দিল।

"এটা হবে তোর ঘোড়া," এই বলে ওরাজ অন্যান্য ঘোড়া থেকে আলাদা করে একপাশে বাঁধা ঢ্যাঙা আকারের ছাইরঙা এক তেজীয়ান ঘোড়ার সামনে কুরবানকে এনে হাজির করল। "ঘোড়াটার মেজাজ খুব গরম, ল্যাজের দিক থেকে ওর কাছে এগোস না — জানে মেরে ফেলবে! মাথার দিক থেকে এগিয়ে গিয়ে ঝট্ করে লাগাম আঁকড়ে ধরবি। তবে ও তোর সঙ্গে মানিয়ে নেবে। একটা ব্যাপার অবশ্য খারাপ — ঘোড়াটা সারি ধরে চলতে পারে না, আগে আগে ছুটে যায়, বিশেষ করে দৌড়ের সময়। তাই লাগামে ঢিল দিস না, ঢিল দিলেই লড়াইয়ের সময় ঘোড়া তোকে সোজা তাতারদের মুখে নিয়ে ফেলবে।"

কুরবান সন্তর্পণে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল, কুরবান কাছাকাছি হতে সে কান খাড়া করে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, পিছু হটে গেল। "আল্লাহ আমার ভরসা," — এই ভেবে কুরবান আগুনের কাছে ফিরে এলো। ওরাজ ওকে বিশাল এক পুরনো তলোয়ার আর ঘোড়ায় চড়ার জন্য হলুদ

* চাউশ — যোদ্ধা।

রঙের একজোড়া দোমড়ান-মোচড়ান জুতো দিয়ে খানা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল। কুরবান সেই মুহূর্তে অনুভব করল যে সেও অন্যান্যদের মতো সত্যিকারের বীর জওয়ান বনেছে।

সন্ধে নাগাদ সৈন্যরা যার যার ঘোড়াকে পেট পুরে যব খাইয়ে জিনের পাশে বাঁধা থলি ভর্তি করে রাখল। কুরবানও তাই করল।

"এখন জোর কাজ শুরু হবে!" এই বলে চাউশ ওরাজ হাঁক পাড়ল, "যে যার ঘোড়ায় উঠে পড়!"

সকলে ঘোড়ায় চেপে বসল। কুরবান কষ্টে সৃষ্টে তার ছটফটে তেজীয়ান ঘোড়ায় উঠে বসল এবং অন্যান্যদের সঙ্গে বুখারার সরু অলিগলির মধ্য দিয়ে পথ ধরল।

"হামলা করা হবে," পাশের জোয়ানটি বলল। "আমাদের মধ্যে ক'জন ফিরে আসবে কে জানে?"

শহরের ফটকের কাছে দলটা থেমে দাঁড়াল। এখানে ছিল একটা চত্বর — আরও সব দল সেখানে এসে জমা হতে লাগল, সব সমেত হাজার পাঁচেক এসে জুটল।

পৃথক পৃথক প্রতিটি দলের সেনাপতি ইনান্‌চ খানের কাছে এগিয়ে আসতে সে তাদের নির্দেশ দিল:

"আমরা আক্রমণ করতে চলেছি হলুদ তাঁবুটা — যেখানে তাতারদের সর্দার খান বসে আছে। সকলকে কেটে ফেল! বন্দী করে কাউকে ধরে আনার দরকার নেই! তাতারদের শিবিরে আমরা হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দেব, ওদিকে আমাদের অন্য দলগুলো কাফেরদের অনায়াসে কাবু করে ফেলবে। আল্লাহ সাহসীদের সহায়!"

ফটকের ভারী লোহা বাঁধানো কপাট খুলে গেল, শহর থেকে দলে দলে অশ্বারোহী বেরিয়ে আসতে লাগল। মাঠে বেরিয়ে আসতে অন্ধকারে কুরবান দেখতে পেল কেবল সামনের দিকে চলমান অশ্বারোহী বীরপুরুষদের ছায়া আর দূরে তাতার শিবিরের অসংখ্য আলো। ঘোড়া দুলকি চাল ছেড়ে মাঝামাঝি কদম ধরল, তারপর গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে দৌড় শুরু করল। কুরবান তার ছাইরঙা তেজীয়ান ঘোড়াকে লাগাম ধরে টেনে রাখার চেষ্টা করল, কিন্তু ঘোড়া লাগাম দাঁতে চেপে ছুটে চলল এবং অনায়াসে পাশাপাশি ধাবমান জোয়ানদের পাশ কাটিয়ে যেতে লাগল।

পাঁচ হাজার অশ্বারোহী বাঁধ-ভাঙা বন্যাস্রোতের মতো তাতারদের শিবিরের দিকে ছুটে চলল এবং ভয়াবহ হুঙ্কার তুলে তাদের জ্বালানো আগুনের সারিগুলোর মাঝখানে ঢুকে পড়ল, ছড়ানো গাঁটরি-বোঁচকা ও জিনের গাদা ডিঙিয়ে লোকজনকে উলটে ফেলে দিল।

তাতাররা লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে পড়ে এদিক-ওদিক পালাল। কুরবান অশ্বারোহীদের মাঝখান দিয়ে ছুটতে ছুটতে চেঁচামেচি করে সেখানে ভারী তলোয়ার ঘুরিয়ে যাচ্ছিল; সে কাউকে ঘা মারল, কাউকে বা ধরাশায়ী করল, তাতারদের সর্দার খানের হলুদ তাঁবু অবধি যাওয়া তার কে রোখে!

অকস্মাৎ তার নজরে পড়ল যে তাদের গোটা দলটি তাতারদের পিছু নেবে কোথায়, বরং অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছুটছে। তার ছাইরঙা ঘোড়া অন্য ঘোড়সওয়ারদের অনুসরণ করল, আর কুরবান মনে মনে আল্লাহের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল যেন ঘোড়াসমেত তাকে খানাখন্দে গিয়ে পড়তে না হয়।

ঘোড়াগুলো বহুক্ষণ ছুটল, তারপর সংযত হয়ে ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ গতি ধরল। সেনাদল চলছিল বুখারা থেকে পশ্চিমে যাওয়ার বড় রাস্তা ধরে।

অশ্বারোহীরা সারারাত চুপচাপ চলল। সকালে ইনান্চ খান বিরতি ঘোষণা করল।

"আমরা ঘোড়াগুলোকে হাঁপ ছাড়ার অবকাশ দেওয়ার পর জাইহুন নদী অবধি যাব, নদী পার হয়ে খরেজম শাহের ফৌজের সঙ্গে শামিল হওয়ার জন্য এগিয়ে যাব!"

এমন সময় শোরগোল ও ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার শোনা গেল — দূরে তাতারদের আবির্ভাব চোখে পড়ল। ভয়ানক হুহু গর্জন করতে করতে তারা বিশ্রামরত সৈন্যদের শিবিরের দিকে ছুটে আসছে। বুখারার অশ্বারোহীরা কোন মতে ঘোড়ায় লাফিয়ে ওঠার সময় পেল এবং পৌরুষ বিসর্জন দিয়ে বিনা যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। এতে তাদের বিনাশের পথই প্রশস্ত হল। প্রায় গোটা সৈন্যদল তাতারদের হাতে ধ্বংস হল।

কবি বলেছেন: "যে ব্যক্তি মরণের আশঙ্কায় জীবন ধারণ করে, মরণের হাত থেকে তার কোনমতেই রেহাই নেই — অন্তরীক্ষলোকে গেলেও নয়!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিনা যুদ্ধে বুখারার আত্মসমর্পণ

যে ব্যক্তি সাহসে বুক বেঁধে অস্ত্র হাতে নিজের জলাশয় রক্ষা না করে তার জলাশয় বিধ্বস্ত হবে। যে অন্যদের ওপর আক্রমণ না করে তার মান খোয়া যায়।

(আরবী প্রবাদ)

ইনান্‌চ খানের পাঁচ হাজার সৈন্য যখন 'বুখারা শরিফের' প্রতিরক্ষা ছেড়ে দিয়ে সৈনিকের গৌরবের বদলে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের কলঙ্ক বরণ করে নিল তখন শহরের বড় মসজিদে বড় বড় খানদানী বাসিন্দারা — বেগ, ইমাম, জ্ঞানী-গুণী আলিম ও বিপুল ধনবান বণিকেরা মিলিত হল। বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর তারা ঠিক করল:

"প্রাণের দায়ে মাথা নোয়ানো বরং ভালো। অতএব, এসো আমরা চেঙ্গিজ খানকে সেবা করতে যাই।"

"ইনসান সর্বত্রই ইনসান," তারা বলল, "তাই তাতারদের খান আমাদের অনুনয়-বিনয় শুনবে, বর্ষীয়ানদের খাতির করবে এবং 'জ্ঞানের আকাশে তারকা' নামে বিখ্যাত এই বনেদি শহরের পরাস্ত অধিবাসীদের সম্ভবত দাক্ষিণ্য করবে।"

রেশম ও কিংখাবের পোশাক গায়ে চাপিয়ে রুপোর থালায় শহরের এগারোটি ফটকের সোনার চাবি নিয়ে বেগ, ইমাম, আলিম ও বণিকেরা ভিড় করে ফটক খুলে বেরিয়ে এসে হলুদ তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলো মোঙ্গল খানের প্রধান দোভাষী। বর্ষীয়ানদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে চিনতে পারল: লোকটা আগে ছিল গুরগঞ্জের ধনী বণিক — মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌ নামে লোকে তাকে চেনে। দোভাষী হিশেবে তার নাম-ডাক আছে; কারাভান নিয়ে দীর্ঘ ভ্রমণের সময় সে বহু ভিনদেশী ভাষা শিখেছে।

সবচেয়ে খানদানী বর্ষীয়ান ব্যক্তিটি বলল:

"আমাদের শহরের সেকেলে প্রাচীর এত মজবুত ও উঁচু যে একমাত্র বহু বছরের অবরোধ ও চরম শক্তিপ্রয়োগে তা দখল করা যায়। এই কারণে

মোঙ্গল অধিপতি যদি কথা দেন যে বিজিতদের ক্ষমা করবেন তাহলে রক্তক্ষয়ের হাত থেকে নগরবাসীদের বাঁচানোর খাতিরে এবং মহামান্য চেঙ্গিজ খানের বীর সেনাবাহিনীর অতিরিক্ত দুর্গতি ও ক্ষয়-ক্ষতি লাঘব করার উদ্দেশ্যে আমরা বিনা যুদ্ধে আমাদের শহর সমর্পণ করতে পারি।"

"অপেক্ষা করুন!" এই বলে দোভাষী তাড়াহুড়োর কোন লক্ষণ না দেখিয়ে হলুদ তাঁবুর দিকে চলল, তারপর বেশ কিছুটা সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে আতঙ্কে কম্পমান বয়োবৃদ্ধদের কাছে ফিরে এলো।

"বয়োজ্যেষ্ঠরা শুনুন, খান-ই-খানান বলেছেন, প্রাচীরের শক্তিসামর্থ্য ও দুর্ভেদ্যতা তার রক্ষাকর্তাদের মুরদ ও হিম্মতের ওপর নির্ভর করে। বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ যদি করেন তাহলে আমার হুকুমে ফটক খুলে দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে।"

আত্মম্ভরী খানদানী বর্ষীয়ানারা নিজেদের দাড়ি আঁকড়ে ধরল, মাথা নাড়িয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। নগরবাসীদের ভাগ্যে যে এখন কী আছে তা আঁচ করতে না পেরে তারা মনে মনে বিভ্রান্ত হয়ে শহরে ফিরে গেল।

বুখারার প্রাচীন প্রাকার এত উঁচু ও মজবুত ছিল যে শহরের নির্বিবাদী অধিবাসীরা দীর্ঘ কয়েক মাস বুখারাকে রক্ষা করতে পারত। কিন্তু সে দিন কেবল কাপুরুষদের কণ্ঠস্বরই শোনা গেল, যারা লড়াই করার দাবি তুলল তাদের বাতুল বলে উড়িয়ে দেওয়া হল।

প্রতিরক্ষা বাহিনীর সেনাপতি এবং অবশিষ্ট সৈন্যদল কৃতঘ্নদের হাতে শহরের ফটকের চাবি তুলে দেওয়ার জন্য ইমাম ও অভিজাত বর্ষীয়ানদের অভিসম্পাত দিতে লাগল, তারা শেষ শক্তি পর্যন্ত লড়াইয়ে ব্যয় করবে বলে ঠিক করল। শহরিস্তানের মাঝখানে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একটি ছোটখাটো দুর্গ — তারা সেই দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিল।

শহরের এগারোটি ফটকের সবগুলো এক সঙ্গে খুলে গেল। হাজার হাজার তাতার দ্রুত বেগে সংকীর্ণ রাস্তাগুলোয় ঢুকে পড়তে লাগল। তারা নিখুঁত সারি বেঁধে এগিয়ে চলল, বিভিন্ন সেনাদল এক-একটি পাড়ার দখল নিল।

ঘরবাড়ির সমতল চালে উঠে বাসিন্দারা আতঙ্কগ্রস্ত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল শ্মশ্রুগুম্ফহীন এই অশ্বারোহী সেনাদের গতিবিধি। এদের ঘোড়াগুলোর আকৃতি খর্ব অথচ গ্রীবাদেশ দীর্ঘ। শহরে সম্পূর্ণ নীরবতা নেমে এলো। একমাত্র বিজাতীয় আগন্তুকদের তীব্র ঘ্রাণ টের

পেয়ে হলুদ রঙের এক জাতীয় কুকুরের দল ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে ভয়ঙ্কর ঘেউঘেউ গর্জন করতে করতে এ ছাদ ও ছাদ টপকে বেড়াচ্ছিল — ছুঁচলো মুখওয়ালা এই কুকুরগুলোর গায়ের লোম আলুথালু, চোখ লাল টকটকে।

মোঙ্গল সৈন্যরা প্রধান প্রধান রাস্তায় প্রবেশ করার পর সাদা ঘোড়ায় চড়ে দেহরক্ষিদলের আবির্ভাব ঘটল — ঘোড়া এবং আরোহী দুয়েরই হাঁটু অবধি বর্মে আচ্ছাদিত।

বাছাই হাজারী দলের মাঝখানে পূর্ব সাম্রাজ্যের অধিপতি সেই ব্যক্তিটিকেও দেখা গেল; কিজিল-কুমের বালুকা প্রান্তর থেকে সে যেন উড়ে এসে পড়েছে এক অগ্নিস্তম্ভের মতো। আগে আগে চলেছে মহাবীর আকৃতির এক মোঙ্গল, তার হাতে নয় পুচ্ছধারী বিশাল শ্বেত পতাকা। পেছন পেছন দুই ঘোড়সওয়ার নিয়ে আসছে জিন ছাড়া সাদা ঘোড়া, তার কালো চোখ জোড়ায় লালের আভা। খান-ই-খানান অবশ্য অনুসরণ করছে আরও দূর থেকে। তার অঙ্গে দীর্ঘ কালো রঙের পোশাক, তার ছাইরঙা ঘোড়ার বুকের ছাতি চওড়া, গায়ে সাধারণ চামড়ার সাজ লাগানো।

দেহভারে ঈষৎ আনত, বিপুলকায় চেঙ্গিজ খান চলেছে উগ্রমূর্তি ধরে, কষে বাঁধা তার কোমরবন্ধনী থেকে কালো খাপে ঝুলছে বাঁকা তলোয়ার। পশ্চাদ্ভাগ আচ্ছাদিত কৃষ্ণবর্ণের শিরস্ত্রাণ, নাসাগ্রে দোদুল্যমান লৌহ ফলক, দীর্ঘ পলিত শ্মশ্রুমণ্ডিত ভাবলেশহীন বিরস মুখাবয়ব ও অর্ধনিমীলিত আঁখি — গোটা দৃশ্যটাই অনভ্যস্ত এবং ইতিপূর্বে খরেজম শাহ সোনার চোখ ধাঁধানো বন্যায় আর মাণিক্যের বর্ণচ্ছটায় যে উজ্জ্বল সমারোহের পরিচয় দিয়েছে তার সঙ্গে এর কোন মিল নেই।

চেঙ্গিজ খান প্রধান চত্বরে এসে পেঁছালে তিন দিক থেকে সোজা সার বেঁধে তার অশ্বারোহী দেহরক্ষিদল দাঁড়িয়ে পড়ে অগ্রবর্তী জনতার গতিরোধ করল। উঁচু মসজিদের সিঁড়িতে প্রধান প্রধান ধর্মনেতা, কাজি এবং শহরের অতি গণ্যমান্য অধিবাসীরা দাঁড়িয়ে ছিল।

মোঙ্গল অধিপতি মসজিদের কাছাকাছি হতে গোটা জনতা নিজেদের বাদশাহের সামনে যেমন করতে অভ্যস্ত সেই ভঙ্গিতে ছাইরঙা ঘোড়ার খুরের কাছে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ল। কেবল জন কয়েক বর্ষীয়ান আলিম তাদের জ্ঞানগরিমার দরুন অধিপতির সামনে দণ্ডবৎ মাটিতে পড়ার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত বলে সোজা দাঁড়িয়ে থেকে বুকের ওপর দু' হাত ভাঁজ করে অভিবাদন জানাল।

"বাদশাহ চেঙ্গিজ খান জিন্দাবাদ! পূব দেশের সূর্য দীর্ঘজীবী হোন!" তীক্ষ্ণ কর্ণভেদীস্বরে বর্ষীয়ানদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, সমগ্র জনতা এক সঙ্গে নানা সুরে সেই আওয়াজের অনুরণন তুলল।

চেঙ্গিজ খান চোখ কুঁচকে এক নজরে মসজিদের উঁচু খিলান মেপে দেখল, হাতের চাবুক ঝাপ্‌টে পাথরের ধাপগুলোর ওপর তার ঘোড়া চালিয়ে দিল।

"এই উঁচু দালানটা কি নগরপালের বাড়ি?" খান জিজ্ঞেস করল।

"না এটা খোদার উপাসনার দালান," ইমামরা বলল।

দেহরক্ষী পরিবৃত হয়ে চেঙ্গিজ খান মহামূল্যবান প্রশস্ত গালিচার ওপর দিয়ে মসজিদের অভ্যন্তরভাগ বরাবর চলল, তারপর মানবদেহের দৈর্ঘ্যের চেয়ে উঁচু পাথরের কিতাবদানের ওপর উন্মুক্ত কোরানের বিশাল পুথির সামনে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। কনিষ্ঠ পুত্র তুলি খানের সঙ্গে খান যেখান থেকে ইমামরা সচরাচর ধর্মোপদেশ ও ফতোয়া উচ্চারণ করে, সেই মিম্‌বরের কয়েক ধাপ ওপরে উঠল। সাদা ও সবুজ রঙের উষ্ণীষমণ্ডিত বর্ষীয়ানরা তার সামনে ভিড় করে দাঁড়াল, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তারা লক্ষ্য করতে লাগল কটা রঙের রুক্ষ শ্মশ্রুমণ্ডিত ভাবলেশহীন বিরস মূর্তি, বহু জাতির উচ্ছেদকারী এই ভয়ঙ্কর ব্যক্তিটির কাছে তারা প্রতীক্ষা করে রইল হয় ক্ষমা নতুবা প্রচণ্ড ক্রোধ।

চেঙ্গিজ খান আঙ্গুল তুলে এক বৃদ্ধ ইমামের উষ্ণীষের দিকে ইঙ্গিত করল।

"এ লোকটা মাথার ওপর এতটা কাপড় পেঁচিয়েছে কেন?"

দোভাষী বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করে খানকে বুঝিয়ে দিল:

"এই ইমাম বলছেন যে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানো এবং পয়গম্বর মহম্মদের সমাধির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য তিনি মক্কায় গিয়েছিলেন। তাই তিনি এরকম বড় পাগড়ি পরেন।"

"এর জন্য কোথাও যাওয়ার অর্থ হয় না," চেঙ্গিজ খান বলল। "ঈশ্বরের আরাধনা সর্বত্রই করা যায়।"

বিস্মিত ইমামরা চুপচাপ হাঁ করে রইল। চেঙ্গিজ খান বলে চলল:

"তোমাদের শাহের অপরাধ পাহাড়প্রমাণ। তাকে সাজা দেওয়ার জন্য বেহেশ্‌ত থেকে কশাঘাত ও প্রাণদণ্ডের পরোয়ানা নিয়ে আমি

এসেছি। আমার হুকুম, আজ থেকে শাহ মুহম্মদকে কেউ যেন কোন আশ্রয় বা অন্নমুষ্টি না দেয়।”

চেঙ্গিজ খান আরও দুই ধাপে উঠে মসজিদের দরজায় ভিড় করে দাঁড়ান সৈন্যসামন্তদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল:

“আমার দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা শোন! ফসল মাঠ থেকে তোলা হয়ে গেছে, আমাদের ঘোড়া চরার মতো কোন জায়গা নেই। তবে এখানকার গোলাগুলো ফসলে ভর্তি, তোমাদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। দানা দিয়ে তোমাদের ঘোড়ার পেট ভরাও!”

গোটা চত্বর জুড়ে মোঙ্গলদের মধ্যে রব পড়ে গেল:

“বুখারার গোলা আমাদের জন্য খোলা! খান-ই-খানান আমাদের ঘোড়াগুলোকে ফসল খাওয়ানোর হুকুম দিয়েছেন।”

মিম্‌বর থেকে নেমে এসে চেঙ্গিজ খান হুকুম দিল:

“এই বুড়ো সর্দারদের প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করে বাহাদুর দেওয়া হোক, তারা যেন কোন কিছু গোপন না করে সব ধনী বাড়ি, ফসলভরা গোলা ও জিনিসপত্রের দোকান দেখিয়ে দেয়। মুহুরীরা এই বুড়োদের কাছ থেকে সমস্ত ধনী বণিকের নাম ধাম জেনে লিখে নিক; ওতরারে আমার বণিকদের খুন করে যে সব ধনরত্ন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে ওরা তার সমস্তটা আমাকে ফিরিয়ে দিক। আমার সৈন্যদের ভুরিভোজন, আমোদ-আহ্লাদ ও নাচগানে মাতিয়ে রাখার জন্য ধনীরা এখানে খাবার-দাবার আর পানীয় নিয়ে আসুক। আজ মুসলমানদের খোদাতাল্লাহের এই দালানে আমি বুখারা দখলের উৎসব করব।”

বর্ষীয়ান সর্দারেরা মোঙ্গল সৈন্যদের সঙ্গে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ বাদেই তামার কড়াই, চালের বস্তা, ছাল চামড়া ছাড়ানো আস্ত আস্ত ভেড়া এবং মধু, ঘি আর পুরনো মদে ভর্তি কলসির বোঝা উটের পিঠে করে নিয়ে ফিরল।

নবম পরিচ্ছেদ

“কী মধুর কেরুলেন স্তেপ!”

জামা মসজিদের সামনের চকে উনুন জ্বালানো হয়েছে। তার আঁচ থেকে ধোঁয়া উঠছে। কড়াইয়ে দুম্বার লেজ, ভাত আর টুকরো টুকরো ভেড়ার মাংস রান্না করার সোঁ-সোঁ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

মসজিদে প্রবেশের মুখে উ'চু চত্বরে এক রেশমী গদির ওপর চেঙ্গিজ খান আসীন। তারে কাছাকাছি ভিড় করে আছে সেনাপতি ও দেহরক্ষীদের দল। বুখারার বর্ষীয়ান লোকজন বুখারা থেকে বাজনদার এবং নানা জাতের মেয়ের গানের দল জড়ো করে নিয়ে এসেছে — তাদের গান বাজনার দলটি এক পাশে থেকে বিচিত্র ধরনের সব বাজনা বাজিয়ে চলছে, ঢাকে ও খঞ্জনীতে ঘা দিয়ে গুরুগুরু আওয়াজ তুলছে।

দস্তুরমতো খানদানী ইমাম ও আলিমেরা মোঙ্গলদের ঘোড়াগুলোকে দরাজ হাতে বিচুলি দিয়ে আপ্যায়ন করছে। দোভাষী মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ খানের অনতিদূরে বসে সতর্ক দৃষ্টিতে সব কিছু নিরীক্ষণ করে যাচ্ছে, পেছনে পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসে আছে তার তিন জন কলমচী — এরা আগে ছিল তার দোকানের কর্মচারী। রঙিন কাগজের লম্বা লম্বা পাতার ওপর তারা মোঙ্গল চৌকি পার হওয়ার হুকুম কিংবা ছাড়পত্র খসখস করে লিখে চলছে।

উপবিষ্টদের সারি ভেদ করে এক মোঙ্গল এগিয়ে গেল — তার সর্বাঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ঝুলছে, আঙরাখার ঝুল লুটিয়ে পড়েছে গোড়ালি পর্যন্ত। মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচের কানের কাছে ঝু'কে পড়ে সে বিড়বিড় করে বলল:

"আমার পাহারাদার দু'টি লোককে পাকড়াও করেছে — তাদের মধ্যে একজন শামান গোছের, তার মাথায় লম্বাটে টুপি, অন্যটি একটি ছেলে। আমরা ওদের খতম করতে গেলে বয়স্ক লোকটা আমাদের ভাষায় বলে উঠল: 'আমাদের গায়ে হাত দিও না! মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ আমাদের পালক পিতা।...' আমাদের ওপর অবশ্য হুকুম আছে শামান আর গুনিনদের যেন ছেড়ে দিই, তায় আবার লোকটা আপনার পোষ্য, আমি হুকুম দিয়েছি ওদের যেন এখনই কিছু না করা হয়। ওদের নিয়ে কী করা যায় বলুন।"

"ওদের এখানে নিয়ে এসো!.."

মোঙ্গল হাজি রহিম আর বালক তুগানকে নিয়ে এলো। মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ হাতের ইঙ্গিতে কলমচীদের পাশে ফরাশের ওপর তাদের বসতে বলল।

চেঙ্গিজ খান কখনই, এমনকি পান ভোজের সময়ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হত না,

সবই লক্ষ্য করত। সে মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচের দিকে চোখের ইশারা করতে মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌ এগিয়ে গেল।

"এরা কারা?"

"আপনার আজ্ঞায় মরুভূমির পথে যাত্রা করার সময় ডাকাতের দল যখন আমাকে জখম করে তখন এই লোকটার কৃপায় আমি জীবন ফিরে পাই। আপনিই বলুন আমার কি উচিত নয় ওকে খাতির-যত্ন করা?"

"আমি অনুমতি দিচ্ছি, এর জন্য তুমি ওকে মাথায় তুলে রাখতে পার। আমাকে বুঝিয়ে বল দেখি ওর মাথায় এমন চোঙ্গা টুপি কেন?"

"লোকটা জ্ঞানী, মুসলিম ফকির ও গায়ক। ও লাটিমের মতো বন্‌বন্‌ করে পাক খেতে পারে, হক কথা বলতে পারে। সাধারণ লোকে এ ধরনের মানুষকে সম্মান করে, তাদের নানা রকম উপহার দেয়।"

"ও তাহলে আমার সামনে লাটিমের মতো পাক খাক। মুসলমানরা কেমন নাচে দেখি একবার।"

মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌ নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে দরবেশকে বলল:

"আমাদের প্রভুর হুকুম হয়েছে আপনি তাঁকে দরবেশদের চরকি নাচন নেচে দেখান। জানেনই ত যে তাঁর ইচ্ছে পূরণ না করলে আপনার গর্দান যাবে। চেষ্টা করুন, আমি আপনার নাচের সঙ্গে বাজনা বাজাব।"

হাজি রহিম ফরাশের ওপর তার ঝোলা, ভিক্ষাপাত্র ও লাঠিগাছা নামিয়ে রাখল। সে আজ্ঞানুবর্তী হয়ে জ্বলন্ত উনুনের সারির মাঝখানে গোলাকার জায়গায় বেরিয়ে এলো। দুই হাত ছড়িয়ে ডান হাতের তালু নীচের দিকে করে আর বাঁ হাতের তালু ঊর্ধ্বে উল্‌টে বাগদাদের দরবেশদের ঢঙে সে দাঁড়াল। দরবেশ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌ বাঁশিতে করুণ সুর তুলল — সে সুরে ভেসে উঠছে কখনও শিশুর ফোঁপানি, কখনও বা বিশাল কোন পাখির আর্তনাদ। বাজনাদাররা খঞ্জনীতে মৃদু টোকা দিল। দরবেশ নিঃশব্দে আলতোভাবে পুরনো পাথরের ফলকের ওপর গোল হয়ে ঘুরল, সেই সঙ্গে চরকির মতো পাক খেতে শুরু করল — গোড়ায় ধীরে ধীরে, তার পর গতি ক্রমেই বেড়ে চলল; তার দীর্ঘ বসন বুদ্বুদের মতো ফুলে উঠল। বাঁশির সুর আরও করুণ, আরও আর্ত হয়ে উঠল — ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যেতে বাজে কেবল খঞ্জনী, কখনও বা আবার শুরু হয় সেই ফোঁপানি।

অবশেষে দরবেশ এক জায়গায় লাটিমের মতো দ্রুত ঘুরতে শুরু

করল, তার পর উপুড় হয়ে পড়তে পড়তে দু' হাতের করতল দিয়ে মেঝে চেপে ধরল।

নোকররা তাকে তুলে ধরে কর্মচারীদের পাশে শুইয়ে দিল। চেঙ্গিস খান বলল:

"বুখারার নাচিয়েকে এক পাত্র মদ দেওয়া হোক, যাতে ওর পাক খাওয়া মাথা সাফ হয়ে যায়। তবে আমাদের মোঙ্গল নাচিয়েরা আরও উঁচুতে লাফাতে পারে, মোঙ্গলদের গানে জোর আর মজাও অনেক বেশি। এখন আমরা মোঙ্গল গাইয়েদের গান শুনতে চাই।"

চত্বরের মাঝখানে, খানের সামনে দু' জন মোঙ্গলের আবির্ভাব ঘটল – একজন প্রৌঢ়, অপর জন যুবা। পায়ের ওপর পা তুলে তারা দু' জন মুখোমুখি হয়ে বসল। যুবক গান ধরল:

নবীনা যতেক ঘোটকীর দল
  নিজ বাসভূমি বিহনে
আকুল হ্রেষায়,
  ধরণীর বুক জরজর করে প্রহারে।
নব পরিণীতা যতেক ললনা
  শোকাহত তারা, আহা রে! —
ধরণীর বুকে অশ্রু ঝরায়
  গর্ভধারিণী স্মরণে।

ঘন প্রাচীরের মতো চার দিক বেষ্টন করে যত মোঙ্গল বসে ছিল তারা সকলে সমস্বরে ধুয়া তুলল:

অহো সম্পদ, সম্পদ মম, অহো মম গৌরব।

প্রৌঢ় মোঙ্গল তার পালা আসতে গাইল:

স্তেপের তুরগ কী যে দুর্বার
  টের পাবে তাহা তখনি,
ঘূর্ণির বেগে
  গিরিমালা যবে পার হয়ে যাবে পলকে।
যোদ্ধার বল, শৌর্যবীর্য
  কেবল তখনই ঝলকে —

খানের পেছনে পার হলে পর
অন্তত আধা ধরণী।

মোঙ্গলরা আবার ধ্বয়া তুলল:

অহো সম্পদ, সম্পদ মম, অহো মম গৌরব!

তর্বণ গায়ক গেয়ে চলল:

দামাল ঘোড়ার প্বষ্ঠে সওয়ার
হলে মনে রেখ নির্ঘাত
দ্বর প্রান্তর হবে অবারিত
ব্যবধান চুকে যাবে।
দ্বর্দম অরি অসির আঘাতে
পরাজিত যবে হবে
জানিও তখনই হবে নিবারিত
য্বদ্ধের যত সংঘাত।

মোঙ্গলরা আবার ধ্বয়া আব্ব্তি করার পর প্রৌঢ় মোঙ্গল গান ধরল:

চেঙ্গিজ খান,
দরশন তাঁর পেয়েছে যে জন, সেই মানে
দ্বনিয়ার সেরা তিনি মহাবীর,
নেই কোথা কোন জ্বড়ি তার।
অতএব এসো আজিকে সবাই
মাতিব তাঁহারি যশোগানে,
তাঁহারি চরণে করি নিবেদন
আমাদের গীতি উপহার!

"মাতিব তাঁহারি যশোগানে!" মোঙ্গলরা আওয়াজ তুলল।

"আর আজ আমরা আমোদ-প্রমোদ করব!" জনতা সমস্বরে চেঁচিয়ে বলল। সকলে শিস দিল, গাঁকগাঁক আওয়াজ তুলল, হাততালি দিল।

আসরের গোল জায়গাটার মাঝখানে প্রবেশ করে নর্তকের দল ম্বখোম্বখি দ্বই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। মোঙ্গলদের গান আর খঞ্জনীর বাজনার তালে তালে তারা জায়গায় দাঁড়িয়ে নাচতে লাগল — হেলে দ্বলে চলে, মাটিতে থপ্‌থপ্‌ করে পা ফেলে এবং নিপ্বণ ভঙ্গিতে একে অন্যের পায়ের তলায় ঠোকাঠুকি লাগিয়ে তারা ভাল্বকের হাবভাব নকল করে দেখাল।

ঝট্ করে তলোয়ার বাগিয়ে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে তারা শূন্যে দিল, লকলকে আগুনের রক্তিম আভায় তলোয়ারের ফলকগুলো ঝক্ করে উঠল।

মাংসল পাঁচ আঙুলের থাবায় কটা রুক্ষ দাড়ি মুঠো করে চেঙ্গিজ খান নিশ্চল হয়ে চুপচাপ বসে ছিল, তার অপলক চোখের জ্বলন্ত কয়লার মতো ধক্‌ধক্ করছে।

নাচ ও চিৎকার-চেঁচামেচি বন্ধ হল।... নতুন একজন গায়ক চেঙ্গিজ খানের প্রিয় থমথমে ও জমকালো একটি গান শুরু করল।

মোঙ্গল স্তেপভূমি,
স্মরণীয় ভূমি তুমি,
যেথা নীল কেরুলেন,
স্বর্ণাভ ওন্‌ওন্।
মোঙ্গল সেনাদল
করে দিল উৎখাত
তিরিশের তিন গুণ
প্রবল স্পর্ধিত জাত।

মৃত্যুর বিভীষিকা,
বজ্র, বহ্নিশিখা
চেঙ্গিজ খান, আর
সন্তান যত তার।
দুই কুড়ি মরুভূমি
পড়ে থাকে পশ্চাৎ –
খুনে খুনে একাকার
রক্তিম বালি যার।

'আবালবৃদ্ধ ভবে
পার কেহ নাহি পাবে।
চারি দিকে দুনিয়ার
মোঙ্গল নাগপাশ।"
আসমান থেকে দূত,
শ্মশ্রু লোহিত যাঁর
বাতির চেঙ্গিজ খান
দিয়েছেন ফরমান।

বলেছেন: "নেবে সুখে
মিঠাইয়ের স্বাদ মুখে।
দেহে দেব জরিদার
রেশমের দামী বাস।
মাভৈঃ, মিটাব আশ,
জিনে বাঁধা পড়ে থাক
দুনিয়াটা ঘুরপাক!"

দুর্মদ পায়ে বল,
আগুয়ান ঘোড়াদল।
আগে আগে ছায়া হানে
জনমনে ত্রাহি রব...
বলগায় দেব রাশ
শেষ যেথা সাগরের;
সেথা শেষ লহরের
জলধারে সেরে স্নান
উদ্দাম ঘোড়াদের
স্থির হবে মনপ্রাণ...

প্রিয় গান শুনতে শুনতে চেঙ্গিজ খান দুলে দুলে নীচু ভাঙা ভাঙা গলায় গানের সঙ্গে গলা মেলায়। তার চোখ থেকে বড় বড় ফোঁটায় অশ্রুধারা রুক্ষ কটা দাড়ি বয়ে গড়াতে থাকে। দামী আঙরাখার প্রান্তে চোখ মুখ মুছে সে গায়কের দিকে একটা সোনার দিনার ছুঁড়ে দিল। গায়ক কায়দা করে সেটা লুফে নিল, উপুড় হয়ে পড়ে মাটিতে চুমো খেল। চেঙ্গিজ খান বলল:

"দূর কেরুলেন নিয়ে গান শোনার পর একটা ব্যথা যেন আমাকে কুরে কুরে খেতে থাকে।... আমি একটু আমোদ পেতে চাই! ওহে মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্, এই মেয়েদের বল, ওরা যেন ভালো ভালো গান গেয়ে আমার মন চাঙ্গা করে তোলে!"

"হুজুর, আমি জানি আপনি কী ধরনের গান ভালোবাসেন, এক্ষুনি মেয়েদের বুঝিয়ে বলছি," এই বলে মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ ধীরে ধীরে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে বুখারার মেয়েদের ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল, তাদের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কথাবার্তা বলল। তারপর তাদের বলল, "এখন তাহলে এমন গান ধর যাতে শাবক হারা নেকড়ে-মার কান্নার হু হু সুর

থাকে, বয়স্করাও গলা মেলাক।... নইলে নতুন প্রভু এমন প্রচণ্ড রাগ করবেন যে তোমাদের মাথার চুল ত থাকবেই না, গর্দানও যাবে।...''

মেয়েরা ফোঁপাতে লাগল। মাহ্মুদ ইয়ালভাচ্ ভারিক্কি চালে মোঙ্গল অধিপতির কাছাকাছি তার নিজের জায়গায় এসে বসে পড়ল।

গায়িকাদের দলের সামনে এগিয়ে এলো এক বালক — তার মাথায় নীল পাগড়ি, গায়ে ডোরাকাটা জোব্বা। মেয়েদের দিকে ঘুরে সে বলল:

"ভয় পাওয়ার কিছু নেই! আমি গাইব!'' বিশুদ্ধ কোমল কণ্ঠে সে গান ধরল। তার গান ছিল বিষণ্ণ। আগুনের চড়চড় শব্দ, ঘোড়ার নাকঝাড় আর খঞ্জনীর ভাঙা ভাঙা আওয়াজের মধ্যে নিস্তব্ধ চকের ওপর দিয়ে সে গানের সুর নিঃসঙ্গভাবে বয়ে চলল।

ছিলে গুলিস্তান ওগো অপরূপা গীতে-গানে উচ্ছ্বাসে,
উপবন তব মরুভূমি বহ্নির কালগ্রাসে!
ক্ষতবিক্ষত খরেজম, আজি রক্তবন্যায়াত!
মোঙ্গল হেথা ছায়ার মূরতি ভ্রমিছে ইতস্ততঃ।

মেয়েদের গানের দলটি সকরুণ আর্তকণ্ঠে ধুয়া তুলল:

আহা, আহা, ওহো! —
বন্দিনী জায়া, শিশুসন্তান তোলে কান্নার রোল।

চকে বুখারার যে সব প্রৌঢ় ছিল তারা সঙ্গে সঙ্গে হতাশ বিলাপের সুরে গেয়ে উঠল:

আহা খরেজম! ওগো খরেজম! ওগো খরেজম ভূমি!

বালক গেয়ে চলল:

পাহাড়ের চূড়া হিমের প্রবাহ ঢালিছে জারাফশানে।
ধোঁয়ার আড়াল, ঘন কালো মেঘ ঘনায়েছে আসমানে।
বন্দিনী জায়া, শিশুসন্তান তোলে কান্নার রোল;
ভ্রাতা আর পিতা সমরে লভিছে ধরণীমাতার কোল।

মেয়েদের গানের দলটি আবার ধুয়া আবৃত্তি করল:

আহা, আহা, ওগো। —
বন্দিনী জায়া, শিশুসন্তান তোলে কান্নার রোল।

এবারেও বুখারার প্রৌঢ়রা হতাশ বিলাপের সুরে গেয়ে উঠল:

আহা খরেজম! ওগো খরেজম! ওগো খরেজম ভূমি!

কেবল একজন খরেজমবাসী মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌ মুখ বুজে বসে ছিল, সে কোন রকম ভাবাবেগ না দেখিয়ে সজাগ হয়ে প্রৌঢ়দের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

"এ ছেলেটা কী গাইছে?" চেঙ্গিজ খান জিজ্ঞেস করল। তার কণ্ঠস্বর তখনও কান্নায় বোজা। "এই বুড়োরাই বা এত হাউ হাউ করছে কেন?"

"আপনি যেমন গান পছন্দ করেন ওরা তা-ই গাইছে," মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌ বুঝিয়ে বলল। "এই গানে ওরা তাদের জন্মভূমি ছারখার হওয়ার জন্য বিলাপ করছে। আর বুড়োরা সবাই শোক করে বলছে 'আহা খরেজম! ওগো খরেজম!' — ওদের অতীত গৌরব হারিয়ে গেল বলে ওরা কাঁদছে।..."

চেঙ্গিজ খানের রোদে পোড়া মুখে কুঞ্চনের জাল দেখা দিল, মুখ মৃদু হাসির ভঙ্গিতে প্রসারিত হল। হুবহু এক প্রকাণ্ড বুড়ো নেকড়ের মতো গাঁক গাঁক আওয়াজ তুলে সে আচম্‌কা হাসিতে ফেটে পড়ল, বিশাল থাবা দিয়ে থল্‌থলে পেটের ওপর চাপড় মারল।

"হ্যাঁ, এই গানই আমার কাছে আনন্দের! ছেলেটা বেড়ে গায়, ঠিক যেন কান্নার আওয়াজ! মহামান্য চেঙ্গিজ খান যখন হাসেন তখন সারা দুনিয়া কাঁদে কাঁদুক!.. বেয়াদপের মাথা আমার হাঁটুর নীচে নুইয়ে ধরতে ধরতে আমি দেখতে ভালোবাসি আমার শত্রু কেমন কাতরায়, কেমন করা ক্ষমা চেয়ে কাকুতিমিনতি করে আর তার ভাঙা গাল বয়ে অঝোরে চোখের জল ঝরে।... আমি এই রকম করুণ গানের ভক্ত! মাঝে মাঝেই এ গান শুনতে চাই।... ছেলেটা কে?"

"এ ছেলে নয়, বুখারার মেয়ে বেক্ত জানকিজা। ভালো লিখতে-পড়তে

জানে বলে ও বিজ্ঞ কলমচীর কায়দায় বাঁধা পাগড়ি পরে ঘোরে।... ছিল শাহের মীর মুনশীর কলমচী।"

"এরকম বন্দিনী সচরাচর মেলে না! ও এখন থেকে সব সময় আ ভোজসভায় এই করুণ গান গেয়ে শোনাবে, সব মুসলমান তাতে কাঁ আর আমি মজা পাব! আমাদের হুকুম, বুখারায় যে সব মেয়েকে হয়েছে তাদের সকলকে আমার সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হে আর এই মেয়েটিকে যেন সর্বত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়।"

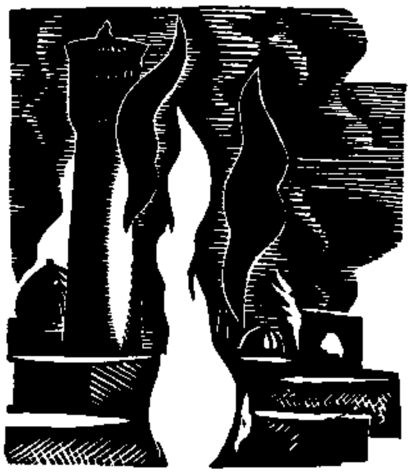
"জো হুকুম হুজুর!"

চেঙ্গিজ খান উঠে দাঁড়াল। চার ধারে যে সব মোঙ্গল বসে ছিল ও তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে 'বিজয়ের দেবতার সম্মানে' চাপাত্র থেকে পান চায়ের অবশিষ্টাংশ মাটিতে ছিটালো।

"আমি আরও দূরে যাচ্ছি," চেঙ্গিজ খান বলল। "আমার ঘে নিয়ে এসো। তাইর খানকে এই শহরের শাসনকর্তা করে রেখে গে তোমরা সকলে তাকে মেনে চলবে।"

আগুনের রক্তিম আভা আর অর্ধচন্দ্রের ফিকে আলোয় চেঙ্গিজ চওড়া বুকের ছাতিওয়ালো ছাইরঙা ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। আগু সারির মাঝখান দিয়ে দেহরক্ষীরা ছুটল সেই দিকে যেখানে বুখা প্রৌঢ়রা তাদের ঘোড়াগুলো দেখাশোনা করছিল, কিছুক্ষণের ম পাথরের ফলকের ওপর খট্‌খট্ আওয়াজ তুলে চকের ওপর দিয়ে দ সারি ধরে অশ্বারোহীদল অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে প্রবেশ করল।

দ্বিতীয় খণ্ড



মোঙ্গল শাসনের কশাঘাত



প্রথম অধ্যায়

ঝটিকাহত খরেজম

প্রথম পরিচ্ছেদ

অস্ত্র বর্জনের বিপদ

হয় আমরা পাথরে শত্রুর মাথা গুঁড়িয়ে দেব, নয়ত তারা নগরপ্রাকারের ওপর আমাদের দেহ লটকাবে।

(প্রাচীন পারসিক কাব্য থেকে)

মোঙ্গল সেনাবাহিনীতে চেঙ্গিজ খান শৃংখলা চালু করেছিল। প্রতিটি অশ্বারোহী দশ জনের মধ্যে, একশ' ও হাজার জনের সারির মধ্যে নিজের জায়গা জানত; হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে বিশাল বিশাল সেনাদল গড়ে উঠত, তারা থাকত সেনানায়কদের অধীনে, সেনানায়করা আবার বাহিনীর দক্ষিণ কিংবা বাম পক্ষের অধিনায়কের কাছ থেকে, কখনও বা স্বয়ং খানের কাছ থেকে বিশেষ নির্দেশ পেত।

সমৃদ্ধ ও জনবহুল বুখারা নগরীর রাস্তায় রাস্তায় দ্রুত ধাবমান মোঙ্গল অশ্বারোহীর ভিড়। তাদের সঙ্গে ছিল মধ্যস্থতার জন্য বুখারার বর্ষীয়ানদের ভেতর থেকে বেছে নেওয়া লোকজন, আগে যারা মোঙ্গল যাযাবরদের আস্তানায় ব্যবসা করত সেই সব মুসলমান বণিক নিয়ে তৈরি দোভাষীর দল। অধিবাসীরা ভয়ে যে যার ঘরে খিল এ'টে বসে ছিল — দোভাষীরা তাদের উদ্দেশে সরবে শহরের নতুন কর্তাদের হুকুম ঘোষণা করে, আর রাস্তার চৌমাথাগুলোতে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য টহলদারদের দেখা যায়।

মোঙ্গল নগরাধিপতি তাইর খান জামা মসজিদে জায়গা নিল। চেঙ্গিজ খানের আজ্ঞা অনুযায়ী সে সেখানে বুখারার মাতব্বরদের ডেকে পাঠাল। তারা শহরের সমস্ত ধনী অধিবাসীর পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা হাজির করল, খরেজম শাহের ফৌজের জন্য আগে থাকতে সংগ্রহ করা রসদের গোপন ভান্ডার, সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত ভান্ডার আর মূল্যবান পণ্য দ্রব্যের দোকান কোথায় কোথায় আছে তারও হদিস দিল।

শহরের সমস্ত প্রান্ত থেকে সদর চকের দিকে চলল বোঝাই উট, ঘোড়া আর গাড়ির সারি। ভীত-সন্ত্রস্ত অধিবাসীরা বয়ে আনতে লাগল বস্তা বস্তা শস্য, কাপড়, পোশাক-পরিচ্ছদ ও গালিচার স্তূপ, দামী দামী তৈজসপত্র, খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য জিনিসপত্র। মসজিদে মসজিদে এগুলো সব জড়ো করা হল, গোটা সম্পত্তি থেকে তিন ভাগের এক ভাগ আলাদা করে রাখা হল মোঙ্গল অধিপতি চেঙ্গিজ খানের জন্য।

অবাধ্য ইখতিয়ার কুশলু যেখানে ফটক বন্ধ করে বসে ছিল সেই নগরদুর্গের পরিখাবেষ্টনী ভরাট করার জন্য কর্মক্ষম অধিবাসীদের পাঠানো হল। ইখতিয়ার কুশলু ও তার সেনারা সঙ্কল্প করেছে যে আত্মসমর্পণ করবে না, শেষ শক্তি দিয়ে লড়াই করবে। দুর্গ রক্ষাকারীদের মধ্যে অন্যান্য খানও ছিল, ছিল মহাবীর মোঙ্গল গুরখান — যে চেঙ্গিজ খানের কাছ থেকে পালিয়ে এসে খরেজম শাহের চাকরী নিয়েছে।

বুখারার হাজার হাজার যুবা ও বৃদ্ধ মাটি আর কাঠের গু'ড়ি দিয়ে গভীর পরিখা ভরাট করতে থাকে — মোঙ্গলরা তাদের কাজের তদারক করে এবং তাড়া দেয়। দু'দিন বাদে দুর্গের উ'চু প্রাকারে, যেখানে সশস্ত্র প্রতিরক্ষাকারীরা দাঁড়িয়ে ছিল তার কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব হল।

"আমরা আমাদের কাজ চট্‌পট সেরেছি," বুখারার লোকেরা বলল।

"এখন দেখা যাক মোঙ্গলরা কত তাড়াতাড়ি এই উঁচু দেয়াল বেয়ে উঠতে পারে।"

মোঙ্গলদের হুকুমে বুখারার ছুতাররা লম্বা লম্বা বহু মই তৈরি করল। মোঙ্গলরা তখন জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষিপ্তের মতো কশাঘাত করতে লাগল।

"হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? মই লাগিয়ে দেয়ালে ওঠ।"

দেয়ালের ওপর থেকে ইঁট-পাথর, ফুটন্ত জল ও আলকাতরা গড়িয়ে পড়ছে দেখে বুখারাবাসীরা কেউই তার ধারে কাছে ঘেঁষতে রাজি নয়।

কিন্তু মোঙ্গলরা তরবারি বাগিয়ে ধরে ঘোড়া চালিয়ে বুখারার অবাধ্য জনতাকে কোণঠাসা করে দেয়, নির্বিচারে তাদের মাথার ওপর আঘাত করতে থাকে। বুখারাবাসীরা হাতে দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে সামনের দিকে ছুটতে থাকে। মোঙ্গলরা তরবারির আঘাতে তাদের আঙ্গুল ও হাত টুকরো টুকরো করে কেটে চলে।

দোভাষীরা বলে-কয়ে জনতাকে দেয়াল বয়ে উঠতে রাজী করায়।

বুখারার কিছু কিছু লোক চেঁচিয়ে বলে:

"দেয়াল বয়ে উঠলে মরণ, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেও মরণ! দুর্গে উঠে আমাদের সৈন্যদের কাছে যাই। আমাদের ওপর দয়া করে ওরা লড়াই থামালেও থামাতে পারে!"

বুখারার লোকজন মই নিয়ে দেয়ালে লাগাল, ওপরে উঠতে উঠতে তারা চেঁচাতে লাগল:

"আমরা তোমাদের মতোই মুসলমান! অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ কর!"

ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যরা বেশ খানিকটা কাছাকাছি উঠে আসতে দিয়ে তাদের দিকে পাথর ও গুঁড়ি গড়িয়ে দিল, মই উলটে ফেলে দিল। জবাবে বলল:

"ভীতু কুকুরের দল! ঘুরে দাঁড়াও, মোঙ্গলদের মার! দেখ, আমরা সকলে কীভাবে শহীদের মৃত্যু বরণ করছি, আত্মসমর্পণ করছি না! দুশমনের কাছে মাথা নুইও না!"

দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে ভারী ভারী পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে মোঙ্গল মহাবীর গুরখান চেঁচিয়ে বলল:

"মোঙ্গলরা ওই অনুগত ভেড়ার দলের পেছনে লুকিয়ে আছে কেন?

বুকের পাটা থাকে ত তারা প্রথম এগিয়ে আসুক না! কাঁচা মানুষ খেকো, কটা রঙের কুত্তা, গোমড়ামুখো বুড়ো চেঙ্গিজ খানটা কোথায় লুকাল?"

এই বলে, যারা ওপরে উঠে আসছিল গুরেখান মরিয়া হয়ে তলোয়ার হাতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তলোয়ার ভেঙে গেলে কুঠার তুলে নিল, শেষে মোঙ্গলদের তীর বিঁধে সে ধরাশায়ী হল।

ইতিমধ্যে মোঙ্গলরা চীনদেশীয় অস্ত্রনিক্ষেপ যন্ত্র এনে হাজির করল। তারা ফেঁসো জড়ানো ও আলকাতরা মাখা বিশাল বিশাল জ্বলন্ত তীর এবং তরল দাহ্য পদার্থ ভর্তি পাত্র দুর্গের ওপর ছুঁড়তে লাগল। দুর্গে দাউদাউ করে আগুন জ্বলল।

বারো দিন ধরে নগরদুর্গের অবরোধ চলল। অবশেষে রক্ষিদলের প্রায় সকলকে শেষ করে মোঙ্গলরা দুর্গে প্রবেশ করল, আঘাতে জর্জরিত ও আগুনে ঝলসানো অবশিষ্ট সামান্য কয়েক জন ধরা পড়ল। বিশাল মোঙ্গলবাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র চারশ' জন নগরদুর্গ রক্ষার জন্য লড়ছিল জেনে তারা অবাক হয়ে গেল। ওরা প্রাণ থাকতে বশ্যতা স্বীকার করে নি। শহরের উঁচু মজবুত প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে ঐ রকম অটলভাবে যদি সমস্ত অধিবাসী প্রতিরোধ দিতে পারত তাহলে মোঙ্গলদের পক্ষে ছয় মাসে, এমনকি এক বছরেও প্রাচীন নগরী বুখারা নেওয়া সম্ভব হত না, বুখারার অধিবাসীদেরও সেই ভয়ঙ্কর দুর্ভোগের কবলে পড়তে হত না, যে দুর্ভোগের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী।

যখন নগরবাসীরা মোঙ্গলদের জন্য উপঢৌকন এনে মসজিদ ভর্তি করে ফেলল তখন এই মর্মে এক নতুন ফরমান জারী হল:

"সকল সম্পত্তি গৃহে পরিত্যাগ করিয়া নারী ও শিশুসহ সকল অধিবাসীকে শূন্য হস্তে, এক বস্ত্রে নগর বহির্ভূত প্রান্তরে সমবেত হইতে হইবে!"

দোভাষীরা তাদের বোঝাল:

"চিন্তা করার কিছু নেই, সর্বত্রই পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে। তোমাদের সম্পত্তি ঠিকমতোই রক্ষা করা হবে। শহর থেকে বেরিয়ে ময়দানে জমা হতে বলার কারণ হল ন্যায্য খাজনা বসানোর জন্য লোক গোনা ও সমস্ত লোকের তালিকা তৈরি করা। হুকুম অমান্য করে যে শহরে থেকে যাবে তাকে ধরা মাত্রই মেরে ফেলা হবে।"

ভোরবেলায় বুখারার সমস্ত অধিবাসী ভিড় করে শহর থেকে বেরিয়ে এলো। পিতারা পুত্রকন্যাদের হাত ধরে, কুলনারীরা শিশু সন্তান কোলে নিয়ে চলল, এমনকি বছরের পর বছর যারা ঘরের কোণ থেকে বার হয় নি সেই লোলচর্ম বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে শ্লথপদে চলতে থাকে।

মোঙ্গল টহলদারেরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ফটকে ঘা মেরে চেঁচায়:

"জলদি! চট্‌পট্‌!"

এগারোটি ফটক দিয়ে বেরিয়ে এসে লোকজন ময়দানে জড় হতে থাকে, গোটা শহরের চার দিকে বেষ্টন পড়ে। প্রহরীরা ফের ভেতরে কাউকে প্রবেশ করতে দেয় না।

তখন বোঝা গেল 'বুখারা শরিফে' কত লোকের বাস — মোঙ্গলদের চেয়ে বুখারাবাসীরা সংখ্যায় ছিল দু-তিনগুণ বেশি।

মোঙ্গলরা দোভাষীদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে লোকজনকে জিজ্ঞেসবাদ করে তাদের মধ্যে কে কে হুন্নরী আছে এবং কোন কারিগরী জানে। এই সব হুন্নরীকে তারা আলাদা দলে ভাগ করে রাখে। তারপর শক্তসমর্থ যুবকদের বাছাই করে নিয়ে অশ্বারোহীদের দিয়ে তাদের ঘিরে রাখল।

অবশেষে মোঙ্গলরা সুন্দরী নারী ও তরুণীদের ভিড় থেকে বাছাই করে রাখতে লাগল। এতক্ষণে সকলে বুঝতে পারল যে নিজেদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটতে চলেছে — সম্ভবত চিরকালের জন্য। চিৎকার-চেঁচামেচি ও কান্নার রোল উঠল, অঝোরে অশ্রুধারা ঝরে পড়ল।

কসাইরা যেমন বাজারে গরু-ছাগলের করুণ আর্তনাদের প্রতি কর্ণপাত না করে নির্বিকারভাবে পাচনির আঘাতে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায় বুখারার নতুন কর্তারাও সেইভাবে অবাধ্যদের কশাঘাত করতে থাকে, তাদের গলায় ফাঁসদড়ি পরিয়ে দেয়, ঘোড়া চালিয়ে ভিড় থেকে তাদের টেনে বার করে আনে।

বুখারাবাসীরা মোঙ্গলদের সামনে এত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে তারা বাধা পর্যন্ত দিল না।

চোখের সামনে ধুলোবালির ওপর দিয়ে মোঙ্গলরা স্ত্রী-কন্যাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে কোন কোন স্বামী, পিতা শোকে উন্মত্ত হয়ে আপন জনকে বাঁচানোর চেষ্টায় তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু মোঙ্গলরা

ঘোড়ার খুরের আঘাতে তাদের পদদলিত করল, মাথায় লোহার মুগুরের আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিল।

শহর থেকে বিতাড়িত বুখারাবাসীদের জনতার মধ্যে এমন সব দানিশমন্দ লোক ছিল যারা বহু বছর মাদ্রাসায় কাটিয়েছে, সেখানে শিক্ষার্থীদের বিতরণ করেছে নিজেদের সঞ্চিত বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার। এধরনের দু' জন আলিম ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত হয়ে চার দিকে অমানুষিক নির্যাতন লক্ষ্য করছিল।

"এই কাফেররা মসজিদ লুট করে, তাদের ঘোড়ার খুর আমাদের শরিয়তের পাতা মাড়িয়ে যায়। তারা মার কোল থেকে শিশু ছিনিয়ে নিয়ে পিষে মেরে ফেলে, বাবার চোখের সামনে মেয়ের ওপর বলাৎকার করে," প্রথম জন বলল। "এটা কি সহ্য করা যায়?"

দ্বিতীয় জন, শহরের বিখ্যাত আলিম রুকন উদ্-দিন ইমাম জাদে জবাব দিল:

"চুপ! বাতাস আল্লাহের গজব বয়ে আনছে! বাতাসে উড়ন্ত খড়কুটোর কিছু বলার নেই!"

বৃদ্ধ রুকন উদ্-দিন কিন্তু বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরে নীরবে সহ্য করতে পারল না। মেয়েদের প্রতি মোঙ্গলদের নিষ্ঠুর আচরণ দেখে রুকন উদ্-দিন ও তার পুত্র তাদের পক্ষ নিতে গিয়ে তৎক্ষণাৎ নিহত হল। আরও অনেকের সেই একই পরিণতি হল: নিজেদের পরিবারের অপমান ও লাঞ্ছনা দেখে তারা তাদের রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে, মোঙ্গলদের মারাত্মক আঘাতে ধরাশায়ী হয়।

দিনটা ছিল ভয়ঙ্কর — শোনা যায় কেবল শত শত মুমূর্ষুর আর্তনাদ, আর পিতা, স্বামী ও ভ্রাতার কাছ থেকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া নারী ও শিশুর কান্না। সাহায্য করার মতো কোন ক্ষমতা পুরুষদের ছিল না, তাদের মনে হল কবির সেই বাণী: "তরবারির কালো হাতল শক্ত করে ধরতে যার আলস্য তরবারির তীক্ষ্ম ফলা তারই দিকে ফিরবে।"

মোঙ্গলরা পরিত্যক্ত, জনশূন্য রাস্তায় ফিরে এলো। বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে লুটের মালে ঘোড়ার পিঠ বোঝাই করে ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে গোটা শহর জুড়ে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। প্রাচীন নগরী বুখারার ওপর অগ্নির জিহ্বা প্রসারিত হল, কালো ধোঁয়ায় সূর্য ঢাকা পড়ল।

ঘরবাড়ি ছিল হালকা ধরনের, কাঠ আর মাটিতে গড়া, তাই শহর দেখতে দেখতে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ডের আকার নিল। ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল কেবল জামা মসজিদ আর কোন কোন প্রাসাদের ইঁটের দেয়াল।

ফুঁসে ওঠা আগুনের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য মোঙ্গলরা লুটের মাল ফেলে দিয়ে হুড়মুড় করে শহর থেকে বেরিয়ে পড়ল। এর পর শহর বহু বছর ঝুলকালিমাখা ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে রইল — থাকার মধ্যে সেখানে আত্মগোপন করে থাকত পেঁচা আর শিয়াল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমরখন্দের নগর প্রধানদের বেইমানি

এ তোমার ভ্রষ্টাচার, খেয়ালের বলি,
কে বলে হেনায় রাঙা? — রক্তে মাখা তোমার অঙ্গুলি!

(রিজা তেভ্‌ফিক)

ড্রাগন বর্ষে (১২২০) বসন্তের গোড়ায় চেঙ্গিজ খান বুখারা থেকে সমরখন্দের দিকে যাত্রা করল। জারাফশানের দুই তীর ধরে সেনাবাহিনী চলল। এই যাত্রায় যারা তার বশ্যতা স্বীকার করল তাদের ওপর খান তেমন কোন অত্যাচার করল না। সেরিপুল ও দাবুসিয়ে শহরের ফটক মোঙ্গলদের সামনে বন্ধ দেখে সে ঐ দুই জায়গায় অবরোধের জন্য সেনাদল রেখে গেল।

সমরখন্দের কাছাকাছি এসে চেঙ্গিজ খান তার শিবিরের জায়গা হিশেবে বেছে নিল খরেজম শাহের পল্লীপ্রাসাদ 'কোক সেরাই' — 'শ্যামল' প্রাসাদ। এখানে আসতে লাগল তার চার পুত্রের সেনাদল, সেই সঙ্গে মোঙ্গলরা যাদের চাবুক মেরে পশুপালের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে রকম বন্দীর ভিড়। সবগুলো সেনাদল আঁটসাঁট বেষ্টনী তৈরি করে শহরের চার ধারে আস্তানা গাড়ল।

খরেজমের সমস্ত শহরের মধ্যে সমরখন্দ ছিল সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি। তার দুর্ভেদ্য পুরু প্রাচীন উঁচু প্রাকারে ছিল লোহার ফটক, প্রতিটি ফটকের দু' পাশে ছিল বুরুজ আর কামান বসানো রন্ধ্র। রক্ষী সৈন্যদলের

সংখ্যা ছিল এক লক্ষ দশ হাজার। তাদের মধ্যে ষাট হাজার সৈন্য তুর্কী গোষ্ঠীর নানা উপভাষায় কথা বলত। এরা ছিল প্রধানত কিপচাক, বাদবাকিদের মধ্যে ছিল তাজিক, গুরিয়ান, কারা-কিতাই ও অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকজন। আর ছিল ভয়ঙ্কর দর্শন বিশটি রণহস্তী; এদের ওপর খরেজম শাহের বড়রকমের আশা-ভরসা ছিল। এ ছাড়া নির্বিবাদী সাধারণ লোকজন — হুন্দুরী ও অসংখ্য ক্রীতদাস নিয়ে গোটা এক বাহিনী গড়ে তোলা যেত।

সমরখন্দ রক্ষার নেতৃত্ব যদি কাইর খান বা তিমুর মালিকের মতো অভিজ্ঞ ও দুর্ধর্ষ সেনাপতির ওপর থাকত তাহলে শহর অনেক দিন পর্যন্ত ধরে রাখা যেত — এক বছর ত বটেই — সেই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের সঞ্চয়ও ছিল। কিন্তু খরেজম শাহ সমরখন্দের প্রধান সেনাপতি করল তার মাতুল, সাধারণের ঘৃণার পাত্রী বাদশাহ-জননী তুর্কান খাতুনের ভ্রাতা দাম্ভিক তুগাই খানকে — যে কস্মিন্‌কালেও সেনাপতি ছিল না।

চেঙ্গিজ খান দু' দিন শহরের চার পাশ ঘুরে ঘুরে প্রাকার, বাঁধ এবং কানায় কানায় জলপূর্ণ গভীর পরিখা খুঁটিয়ে দেখল। সে প্রতিরক্ষার দুর্বল জায়গাগুলোর সন্ধান করে মনে মনে আক্রমণের একটা পরিকল্পনা তৈরি করল।

নিজেদের প্রকৃত শক্তিকে বহুগুণ বড় করে দেখিয়ে অবরুদ্ধ সেনাবাহিনীকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে মোঙ্গলরা খেদিয়ে নিয়ে আসা বন্দীদের ফৌজী কায়দায় সার বেঁধে দাঁড় করাল, প্রতি দশ জনের একজনের হাতে নিশান দিল। দূর থেকে সমরখন্দের অধিবাসীদের মনে হল যেন অসংখ্য শত্রুসৈন্য শহর ঘিরে ফেলেছে।

তুর্কী সেনাপতি আল্‌প-এর-খান, সিউঞ্জ খান ও বালান খান তাদের কিপচাক দলবল নিয়ে শহরের ফটক খুলে বেরিয়ে এসে মোঙ্গলদের ওপর আক্রমণ চালাল। জোর সংঘর্ষ বেধে গেল। মুসলমানরাও কিছু মোঙ্গলকে বন্দী করল বটে, কিন্তু নিজেরা হাজারখানেক লোক হারিয়ে দুর্গপ্রাকারের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এলো।

পর দিন কিপচাক সৈন্যদের আর শহর থেকে বের হবার গরজ দেখা গেল না। সমরখন্দের অধিবাসীদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবীরা আচমকা চড়াও হল। মোঙ্গলরা পৃষ্ঠপ্রদর্শনের ভান করল। তাদের পিছু তাড়া করতে গিয়ে সমরখন্দবাসীরা ফাঁদে পড়ল — সৈন্যেরা ওত পেতেই ছিল,

চার দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালানোর পথ আটকে প্রায় সকলকে হত্যা করল। মাত্র কয়েক জন প্রাণ নিয়ে শহরে ফিরল।

তিন দিনের দিন সকালে চেঙ্গিজ খান ঘোড়ায় চড়ে নিজে সমরখন্দ আক্রমণে নেতৃত্ব দিল। সে শহরের প্রাচীরের চার দিকে এবং সমস্ত ফটকের মুখে তার গোটা বাহিনী দাঁড় করিয়ে দিল। মুসলমানরা শহর থেকে বেরিয়ে আসতে মোঙ্গলরা বহু দূর থেকে লক্ষ্যভেদের উপযোগী টান-টান করা বিশাল বিশাল ধনুক থেকে তীর ছুঁড়ে তাদের ধরাশায়ী করতে থাকে। সারা দিন ধরে সন্ধে পর্যন্ত সমরখন্দের নির্ভীক যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই চলে, অবশেষে উভয় পক্ষই যার যার শিবিরে ফিরে যায়।

সেই রাতে সমরখন্দের অতি গণ্যমান্য লোকজন — শহরের প্রধান কাজি, ধর্মগুরু শেখ-উল-ইসলাম ও মসজিদের পেশ ইমামরা নৈশ পরামর্শ সভা ডেকে বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয় বিবেচনা করল। সকলে শহর থেকে বেরিয়ে তারা খানের শিবিরের উদ্দেশে চলল। অবরুদ্ধ শহরের হয়ে তারা খানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করল। চেঙ্গিজ খান 'তার ক্রোধ থেকে তাদের রেয়াত করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘরে ফিরে যেতে বলল', দূতবৃন্দ সানন্দচিত্তে শহরে প্রত্যাবর্তন করল। তখন, নগরদুর্গে যারা আত্মগোপন করে ছিল সেই নির্ভীক সৈন্যদের দলটি বাদে বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তুগাই খানের নেতৃত্বে কিপচাক খানেরাও তাড়াহুড়ো করে মোঙ্গল দলপতির প্রতি আনুগত্য জানিয়ে তার সেবায় তাদের বহাল রাখার প্রস্তাব দিল। চেঙ্গিজ খান অনুকম্পার হাসি হেসে এতেও সায় দিল।

অবরোধের ছয় দিনের দিন সকালে শহরের প্রধান ফটকগুলো খুলে যেতে মোঙ্গলরা হুড়মুড় করে খরেজম শাহের রাজধানীতে ঢুকে পড়ল। বন্দীদের তাড়িয়ে নিয়ে এসে তারা ওদের শহরের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে হুকুম দিল।

শহরের কোন ক্ষতিসাধন করবে না বলে চেঙ্গিজ খান যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা সত্ত্বেও কিন্তু শহরের সমস্ত নর-নারীকে শত শত ভাগে ভাগ করে মাঠে তাড়িয়ে নিয়ে আসা হল আর সেখানে মোঙ্গলরা তাদের ওপর লুণ্ঠন ও ধর্ষণের তাণ্ডব বইয়ে দিল। নগণ্য যে কয়েক জনের হয়ে প্রধান কাজি ও শেখ-উল-ইসলামের মতো বেইমানরা সাফাই গাইল কেবল তারাই এর হাত থেকে রেহাই পেল। মোঙ্গলরা তাদের গায়ে হাত দিল না।

জনসাধারণের উদ্দেশে ঘোষণা করা হল যে সমস্ত অধিবাসীকে যখন

মাঠে নিয়ে আসা হয়েছে তখন কেউ যদি বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকার মতলব করে তাহলে মোঙ্গলরা কোনরকম শাস্তির আশঙ্কা না করে তার রক্তপাত ঘটাতে পারে। এই পরওয়ানা বলে মোঙ্গলরা বহু নিরীহ অধিবাসীকে হত্যা করল।

খরেজম শাহের মাতুল তুগাই খানের নেতৃত্বে তিরিশ হাজার কিপচাক সৈন্যের বাহিনী তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে শত্রুকে সেবা করার জন্য শহর থেকে বেরিয়ে এলো। মোঙ্গলরা তাদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে অস্ত্রসমর্পণ করতে আদেশ দিল যে পরিবর্তে তারা মোঙ্গল অস্ত্রশস্ত্র পাবে। তারা জানালে যে চেঙ্গিজ খানের চাকুরী নিতে গেলে তাদেরও মোঙ্গলদের মতো চেহারা হওয়া চাই। এই কারণে তাদের মাথার চুল অর্ধ চন্দ্রাকারে কামিয়ে দেওয়া হল। শিবির হিশেবে মোঙ্গলরা তাদের একটা বিশেষ উপত্যকা দেখিয়ে দিল। কিপচাকরা সেখানে পরিবারবর্গ নিয়ে তাঁবু খাটিয়ে রইল। পরদিনই কিন্তু মোঙ্গলরা অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাদের সকলকে হত্যা করে সম্পত্তি কেড়ে নিল। যে কয় জন বেঁচে গেল তারা নিহত কিপচাকদের সম্পর্কে মন্তব্য করল: "যুদ্ধ করার ত নয়ই পালানোর পর্যন্ত মুরদ ওদের হল না।"

ঐ রাতেই নগরদুর্গে লুকিয়ে থাকা রক্ষী সৈন্যদল থেকে আল্-প-এর-খানের নেতৃত্বে এক হাজার বেপরোয়া অশ্বারোহী সিপাহী শহর থেকে বেরিয়ে এলো। সাহসে ভর করে তারা মোঙ্গলদের সারি ভেদ করল এবং অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে গা ঢাকা দিল। পরে তারা জালাল উদ-দিনের বাহিনীর সঙ্গে মিলল।

দুর্গরক্ষীদের অবশিষ্ট দলটি যুদ্ধ চালিয়ে গেল। তখন মোঙ্গলরা জাকেরদিজ খালের বাঁধ ভেঙে দিল — এই খালের গর্ভটি আবার নিপুণ হাতে সীসায় তৈরি করা ছিল। জল নগরদুর্গের চার পাশ ডুবিয়ে দিল, দুর্গপ্রাকার জলে এমনভাবে ধুয়ে গেল যে ধসে পড়া জায়গার মধ্য দিয়ে মোঙ্গলরা নগরদুর্গে ঢুকে পড়ে যাকে পেল তাকেই খতম করল।

মাঠে যে সব অধিবাসীকে জড় করা হয়েছিল তাদের মধ্য থেকে মোঙ্গলরা সুন্দরীদের বেছে আলাদা করে রাখল নিজেদের দেশে, দূর মোঙ্গলিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্যে। ছেঁড়া কাপড় থেকে সাদা কাগজ তৈরি, জরি, রেশমের রুপোলি কাপড়, ওড়না, পাকা চামড়া, ঘোড়ার সজ্জা,

তামার বড় বড় কড়াই, রূপোর ও অন্যান্য ধাতুর পাত্র, কাঁচি, ছুঁচ, অস্ত্রশস্ত্র, ধনুক, তূণ এবং অসংখ্য মূল্যবান সামগ্রী বানানোর ব্যাপারে তাদের খ্যাতি ছিল। সেরা কারিগরদের সকলকে চেঙ্গিজ খানের পুত্র ও আত্মীয়স্বজনের গোলাম করে পাঠিয়ে দেওয়া হল মোঙ্গলিয়ায়, অতঃপর সেখানে তাদের নিয়ে বিশেষ ধরনের কারিগর বসতি গড়ে উঠল। মোঙ্গলরা এর পরও একাধিকবার সমরখন্দ থেকে নানা ধরনের কারিগর এবং শক্তসমর্থ ও তরুণ শ্রমিক নিয়ে যায়; ফলে সমরখন্দ ও তার আশপাশের অঞ্চল বহু বছর জনশূন্য হয়ে পড়ে রইল।

সমরখন্দের নগরদুর্গ অধিকার করার পর চেঙ্গিজ খান শহরের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল — সেখানে সর্বত্র পড়ে ছিল মৃতদেহের স্তূপ। অতঃপর সে প্রস্থান করল পল্লীপ্রাসাদে। গরম শুরু হয়ে গেছে, প্রাসাদের ছায়াঘন আরামবাগ তাপের প্রশমন ঘটাচ্ছে। মোঙ্গল অধিপতির কাছে এই গরম অসহনীয়। অধিবাসীরা সেখান থেকে পলায়ন করল। গলিত শবের ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধে শহরে টেকা দায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিরাশ্রয় খরেজম শাহ

মনোবল যার ভাঙা, ঘোড়াও তার খোঁড়া।

(প্রাচ্যদেশীয় প্রবাদ)

মোঙ্গলরা যখন খরেজমভূমির ওপর লুঠতরাজ চালিয়ে যাচ্ছিল শাহ মুহম্মদ তখন সেখান থেকে দূরে। ছোটখাটো সেনাদল নিয়ে সে তখন জাইহুন নদীর তীরে কালিফ শহরে আস্তানা নিতে যাচ্ছিল, ঘটনার গতি কোথায় যায় তার অপেক্ষা করছিল।

সে বলল: "আমার উদ্দেশ্য হল মোঙ্গলদের জাইহুন নদীর ওপারে যেতে না দেওয়া। শিগ্‌গিরই ইরানে আমি নতুন করে বিরাট ফৌজ যোগাড় করব, তখন এই বদমাশ কাফেরগুলোকে খেদাব।"

নদীর বাঁকে উঁচিয়ে থাকা শৈলশৃঙ্গের ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল এক সঙ্কীর্ণ বুরুজ, আর তার গা ঘেঁষে ছিল সমতল চালে ছাওয়া

ছোট ছোট কুটির। পাথরের পুরনো প্রাচীর সেগুলোকে প্রায় বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে।

এখানে বিষণ্ণচিত্তে নানারকম চিন্তাভাবনা করতে করতে খরেজম শাহ দিন কাটায়। বুরুজের শীর্ষে প্রহরী দাঁড়িয়ে থাকে, উত্তরের দিকে নজর রেখে অবিরাম চৌকি দেয়। দূরে টিলাগুলোর ওপর রাতের বেলায় আগুন জ্বলত, দিনের বেলায় উঠত ধোঁয়ার কুণ্ডলী — তাতে শত্রু বাহিনীর গতিবিধির সঙ্কেত পাওয়া যেত।

মুহম্মদ কখনও কখনও নদীর ধারে নেমে আসে, দেখে কদর্য চেহারার নৌকোর ভিড়, তাদের মুখগুলো উঁচিয়ে আছে। শাহ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ঘোলা জলের প্রবল উচ্ছ্বাস কীভাবে তীরের শৈলমালায় প্রতিহত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। তার বাহিনীর বড় অংশটি ধীরে ধীরে জাইহুন পার হয়ে অপর তীরে উঠেছে, সেখানে টিলার ওপর প্রাচীন নগরী কলিফের ঘরবাড়ি চোখে পড়ে। কোন এক সময় দিগ্বিজয়ী জুলকার্ণাইন ইস্কান্দার ও তাঁর সেনাদলকে বাতাসে ফোলানো ছাগলের চামড়ার ভিস্তি বুকে বেঁধে এখানে সঙ্কীর্ণ খরস্রোতা নদী সাঁতরে পার হতে হয়েছিল।

সমরখন্দের অবরোধ শুরু হতে খরেজম শাহ অবরুদ্ধদের দু'-দু'বার সাহায্য পাঠায়: এক বার দশ হাজার, পরের বার বিশ হাজার অশ্বারোহী সেনাদল, কিন্তু দুটোর কোনটাই রাজধানী পর্যন্ত যেতে ভরসা না করে কলিফে ফিরে এসে জানায় যে সমরখন্দের পতন যে কোন দিন ঘটতে পারে এবং তাদের সাহায্যে কোন কাজ হবে না।

বুখারা থেকে রাতে যে সেনাদলটি পলায়ন করেছিল তার মধ্য থেকে দু'শ' অবসন্ন ও আঘাতে জর্জরিত অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে ইনান্‌চ খান কলিফে ছুটে এলো। তাতাররা এই দলটিকে জাইহুনের তীরে তাড়া করে নিয়ে যায়, প্রায় সকলকেই মেরে শেষ করে, মাত্র কিছুসংখ্যক প্রাণ বাঁচাতে পারে। যারা প্রাণে বেঁচে যায় তাদের মধ্যে কুরবান কিজিকও ছিল।

বুখারার প্রতিরক্ষার জন্য যে বিপুল সেনাদল রাখা হয়েছিল তা অপযশ মাথায় নিয়ে বৃথাই ধ্বংস হয়েছে জেনে খরেজম শাহ দস্তুরমতো অবাক। শাহ অনেকক্ষণ না পারল কিছু ভাবতে, না পারল কোন হুকুম দিতে। সে এটাও লক্ষ্য করেছে যে কাছাকাছি জেলার খানেরা তার আজ্ঞা পালন করছে না, তলব করলে হাজির হচ্ছে না। চার দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকত আর চেঙ্গিজ খানের দলে যোগদানের সংবাদ আসতে থাকে। খরেজম শাহ

দেখল যে তার প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে, তার ক্ষমতার ভিত্তি ধসে পড়ছে, নিষ্ঠা ও আনুগত্যের পরিচয় গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাচ্ছে।

খরেজম শাহ মুহম্মদ বড় নৌকায় উঠে বসল। অশ্বারোহী সিপাহীরা সোনা ও মণিমুক্তায় ঠাসা সরু আকারের চামড়ার পেঁটরাগুলো নৌকায় তুলে দিল, সেই সঙ্গে নিয়ে চলল বাদশাহের প্রিয় বাদামী ঘোড়া। নৌকা পরিচিত তীরভূমি পরিত্যাগ করল। প্রবল জলস্রোত উজানের দিকে বয়ে চলেছে, মাঝিমাল্লারা আপ্রাণ পরিশ্রম করে দাঁড় ও লগি দিয়ে নৌকো বিপরীত দিকে চালিয়ে নিয়ে গেল।

জলের নীচে নুড়ি থাকায় ভারী নৌকা ইরানের তীরভূমিতে ভিড়তে পারল না। শুকনো গোছের যে সৈনিকটি দাঁড় টানছিল তার ওপর তখন উকিলের আদেশ হল সে যেন খরেজম শাহকে নৌকা থেকে তীরে বয়ে নিয়ে যায়। কঁকিয়ে-কুঁথিয়ে সে মুহাম্মদের মাংসল দেহ নিজের পিঠে তুলল, জলের ওপর পা ফেলে ফেলে তীরে পোঁছাল।

পাথরের চাঁইয়ের ওপর নেমে শাহ জিজ্ঞেস করল:

"তোর নাম কী? কোথা থেকে এসেছিস?"

"আমি খেত-মজুর কুরবান কিজিক। ইনান্চ খান আমাকে যে জমির ফালি ইজারা দেন সেখানে আমি আমার পরিবার রেখে এসেছি। তাঁরই সঙ্গে বুখারা থেকে পালিয়ে বেঁচেছি। তখন রাতে চড়াও হওয়ার সময় আমি তাতার খানের হলুদে তাঁবুর সামনে ছিলাম, ভেবেছিলাম তাকে খতম করব, কিন্তু আমাদের সিপাইরা কেন যেন ভয় পেয়ে জাইহুনের দিকে মুখ ফেরাল। আমার ছাইরঙা ঘোড়াটাও ক্ষ্যাপার মতো তাদের পিছু পিছু ছুটল। আমরা কোনরকমে সেখান থেকে পালালাম।"

"তোর নাম কুরবান ভাঁড় কেন?" শাহ জিজ্ঞেস করল। "তোর চেহারায় ত খুশির কোন লক্ষণ দেখছি না।"

"আমার নাম কুরবান ভাঁড়, কেন না দুঃখের বিষয় এই যে আমি সব সময় স্থান-কাল না বুঝে হক কথা বলে ফেলি। কী বলা উচিত আর কী বলা উচিত নয় এই কাণ্ডজ্ঞান আমার কখনই হল না। এই কারণে ঠাট্টা করে লোকে আমাকে 'ভাঁড়' বলে আর প্রায়ই হক কথা বলার জন্য আমার ওপর মারধোর করে, আমিও অবশ্য তাদের ছেড়ে দিই না।"

"তুই আমাকে আগে কখনও দেখেছিস?"

"দেখি আর নাই দেখি, প্রায়ই কিন্তু আপনাকে মনে পড়ত — আমাদের

ওপর মোচড় দিয়ে খাজনা আদায় করতে গিয়ে হাকিম সব সময় বলতেন 'শাহের জন্য'। তখনই আমরা আপনাকে স্মরণ করতাম।..."

খরেজম শাহ কাষ্ঠহাসি হাসল। উকিলের কাছ থেকে সোনার দিনার চেয়ে নিয়ে কুরবানকে দিল।

"এই যোদ্ধা কুরবান আমার সঙ্গে যাবে। খানাখন্দের ওপর দিয়ে লোকজন পার করার ব্যাপারে লোকটা ওস্তাদ, তা ছাড়া ও আমাকে হক কথা শোনাবে।"

"যে আজ্ঞে, শাহেনশাহ," কুরবান বলল। "আপনাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া আর কঠিন কি — বড় এক বস্তা ফসল বওয়ারই সামিল। তবে আমার জুতো জোড়া নিয়ে আসার জন্য আর একবার ওপারে যাওয়ার অনুমতি দিন।"

"তা অনুমতি দিচ্ছি।"

বাদশাহ ঘোড়ায় চেপে বসল, লক্ষ্য করল কীভাবে ভিজে সালোয়ার হাঁটুর ওপরে গুটিয়ে নিয়ে ঢ্যাঙা, কুঁজোটে কুরবান তার লিকলিকে ঘাড় দুলিয়ে ধনরত্ন বোঝাই চামড়ার পেটরাগুলো তীরে বয়ে আনতে সাহায্য করল।

নৌকা তার পর কুরবানকে নিয়ে ওপারে চলে গেল।

খরেজম শাহ যখন তার বাদামী ঘোড়ায় চেপে খাড়া পথ বয়ে ওপরে উঠছিল তখন নদীর পারে উত্তেজনা দেখা দিল। সকলে দূরে, উত্তর দিকে লক্ষ্য করে কী যেন দেখাচ্ছিল — সেখানে টিলার ওপর পাশাপাশি পাঁচটি ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। এটা ছিল মারাত্মক সঙ্কেত: শত্রু বিশাল সেনাদল নিয়ে এগিয়ে আসছে।

"সব নৌকা এক্ষুণি উজানের দিকে ছেড়ে দাও!" মুহম্মদ হুকুম দিল। "তাতাররা যেন পার হয়ে এদিকে না আসতে পারে!" এই বলে শাহ তার বাদামী ঘোড়া হাঁকাল।

খরেজম শাহের খোঁজ করতে করতে জেবে নোইয়ন ও সুবুদাই বাহাদুরের পরিচালনায় বিশ হাজার তাতার জাইহুনের তীরে এসে উপস্থিত হল।

তাদের পার হতে কেউ বাধা দিল না। তীর জনমানবশূন্য, কালিফের অধিবাসীরা পলায়ন করেছে। কোন নৌকা ছিল না বটে, কিন্তু "জলদি!

থামা নয়!" — চেঙ্গিজ খানের এই আজ্ঞা পালন করে তাতাররা কাঠ কেটে বিশাল বিশাল গামলা গোছের লম্বাটে জিনিস বানিয়ে ফেলল, গরুর চামড়া দিয়ে সেগুলো ঢেকে দিয়ে তার ওপর নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র রাখল।

ঘোড়াগুলোকে জলে নামিয়ে দিয়ে তাতাররা দু' হাতে তাদের লেজ আঁকড়ে ধরে কাঠের ঐ গামলাগুলোকে নিজেদের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধল যাতে ঘোড়া মানুষকে টানে আর মানুষ টানে গামলা।

এইভাবে একদিনে সমস্ত তাতার খরস্রোতা জাইহুন পার হল।*

কিন্তু খরেজম শাহ ততক্ষণ বহু দূরে চলে গেছে। সে দ্রুত পশ্চিমের দিকে যাচ্ছিল।

মুহম্মদের অনুগামী বাহিনীর বড় অংশ ছিল কিপচাকদের নিয়ে। তারা ষড়যন্ত্র করল। তবে কে যেন শাহকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিল। যে তাঁবুতে রাত কাটানোর কথা প্রতিদিন সন্ধ্যায় মুহম্মদ সবার অলক্ষ্যে তা ছেড়ে যেত। একদিন সকালে দেখা গেল তাঁবুর কম্বল কিপচাক তীরে চালুনির মতো এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে।

খরেজম শাহের আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল। কোথায় গেলে যে বাঁচা যায় বুঝতে না পেরে সে তাড়াহুড়ো করে পথে যখন তখন গতি বদলাতে লাগল। সর্বত্রই সে অধিবাসীদের বোঝাতে লাগল তারা যেন শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্ত করে, দেয়ালের ওপর ভরসা করে, সঙ্ঘর্ষ এড়িয়ে চলে। এতে জনসাধারণের ভয় বাড়ল, অনেকেই পাহাড়-পর্বতে পালিয়ে গেল।

কেবল পাহাড়-পর্বতে আড়াল করা শহর নিশাপুরে এসে অবসাদ দূর করার জন্য মুহম্মদ ভোজ ও আমোদ-আহ্লাদে মাতল।

তাতাররা নাছোড়বান্দা হয়ে মুহম্মদের পিছু পিছু ছুটল, তার যাত্রাপথ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে লাগল। নিশাপুরেও যখন খবর এলো যে মোঙ্গলরা আর দূরে নেই তখন শাহ শিকারের নাম করে অশ্বারোহীদের ছোটখাটো দল নিয়ে পলায়ন করল, যাত্রাপথের কোন চিহ্ন রাখল না।

---

* রশীদ উদ্-দিন।

নিশাপুরে যাওয়ার পথে তাতাররা তুস, জাভা, রেই এবং আরও কিছু শহর লুণ্ঠন করল। খরেজম শাহ কোথায় পলায়ন করেছে তা জানার জন্য তারা বিভিন্ন দিকে ছোট ছোট সেনাদল পাঠাল। সেনাদল প্রতিটি শহর ও প্রতিটি গ্রাম লুণ্ঠন করল, পুড়িয়ে ছারখার করে দিল, আবালবৃদ্ধ বনিতা কাউকে রেহাই দিল না।

মুহম্মদ আবার বেশ কিছু সেনাদল যোগাড় করল। ইতিমধ্যে খরেজম শাহ বিশ হাজার অশ্বারোহী পাওয়ার পর হামাদানের উপকণ্ঠে দৌলতবাদের প্রান্তরে তাতাররা অতর্কিতে তাকে ঘিরে ফেলল। শাহের বাহিনীর অধিকাংশ তাদের হাতে বিনষ্ট হল। কৃষকের বেশে এক সাধারণ অথচ শক্তসমর্থ ঘোড়ায় চড়ে মুহম্মদ যুদ্ধে লিপ্ত হল। এটা ছিল তাতারদের সঙ্গে খরেজম শাহের শেষ সাক্ষাৎকার। মোঙ্গলদের সেনাদল মুসলমানদের চেয়ে বড় না হওয়া সত্ত্বেও মুহম্মদ বিজয়ী হতে পারল না — তার একমাত্র চিন্তা ছিল কী করে পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা পায়।

কিছু তাতার শাহকে চিনতে না পেরেই তার দিকে তীর ছোঁড়ে, তাতে তার ঘোড়া আহত হয়, কিন্তু মুহম্মদ ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ে গা ঢাকা দেয়। তাতাররা এখানে খরেজম শাহের চিহ্ন বেমালুম হারিয়ে ফেলল।

এখান থেকে তাতাররা আরও পশ্চিমে জেনজান ও কাজভিনের দিকে চলল, বেক তেগিন ও কিউচ বুক খানের পরিচালনাধীন খরেজম বাহিনী ধ্বংস করে আজারবাইজান ও মুগান স্তেপ ভেদ করে এগিয়ে চলল, সেখানে জর্জিয়াবাসীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ঘটল।

তাতাররা যেখানেই যাক না কেন কোথাও থেমে থাকল না, তারা কেবল অতি প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাবার-দাবার ও পোশাক-পরিচ্ছদ নিল, কেবল সোনা ও রুপো হাতিয়ে নিয়ে সামনের পথ ধরল। চেঙ্গিজ খান তাদের ওপর যে কাজের ভার দিয়েছে তার গুরুত্ব স্মরণ করে তারা যথাসম্ভব কম বিরতি দিয়ে দিনরাত চলতে থাকে, তারা চলে খরেজম শাহ মুহম্মদের সন্ধানে।

জনবসতিগুলোতে ভালো ভালো ঘোড়া বেছে নিয়ে তাতাররা তাদের পিঠে চেপে সামনের দিকে ছোটে। প্রত্যেক অশ্বারোহীর পাশে একটি করে বাড়তি ঘোড়া যায়, কারও কারও থাকে কয়েকটি ঘোড়া। পথে পুরো বেগে ছোটার সময় তাতাররা এক ঘোড়া থেকে অন্য ঘোড়ায় চেপে বসে আর

সেই কারণেই তারা চব্বিশ ঘণ্টায় বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করে অতর্কিতে এমন জায়গায় এসে দেখা দিত যেখানে তাদের আবির্ভাবের কথা কেউ ভাবতেই পারে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আবেস্কুন সাগরের দ্বীপে

আমার বাহিনী বল কে দিবে ফিরায়ে,
করি দিবে উপশম পরাজয়-গ্লানি?
হৃত মোর রাজ্যপাট কে বা দিবে আনি,
অরির কবল হতে লইবে ছিনায়ে?

(তুর্কী উপকথা থেকে)

দিয়ানুই মহকুমায় উপস্থিত হয়ে শাহ মুহম্মদ আমুল শহরের কাছাকাছি জায়গায় আত্মগোপন করল। স্থানীয় আমিরবর্গ তার সামনে হাজির হয়ে সম্মান জানাল, ঘোষণা করল যে তারা শাহকে সেবা করতে প্রস্তুত। শাহের আগেকার সেই বিশাল পারিষদদলের মধ্যে আর প্রায় কেউই ছিল না। নিদারুণ অবসন্ন, সম্পূর্ণ ক্লান্ত শাহ তার আস্থাভাজন বড় বড় আমিরের সঙ্গে পরামর্শ করল, আর রীতিমতো মরিয়া হয়ে বারবার বলে চলল:

"দুনিয়ায় এমন কোন নিরিবিলি ঠাঁই পাওয়া যেতে পারে কি, যেখানে তাতারদের বজ্র-বিদ্যুতের হাত থেকে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা যায়?"

তখন সকলেই জানাল যে সবচেয়ে ভালো হয় যদি শাহ নৌকায় চড়ে আবেস্কুন সাগরের* কোন একটি দ্বীপে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বার করেন। পরামর্শমতো খরেজম শাহ সাগরের একটি নির্জন, ছোটখাটো দ্বীপে চলে এলো — দ্বীপটি একেবারেই ফাঁকা, সেখানে লোকবসতির কোন চিহ্নই নেই।**

---

* আবেস্কুন সাগর — কাস্পিয়ান সাগর।

** ত্রয়োদশ শতকে কাস্পিয়ান সাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠ ছিল অন্য রকম, সাগরে তখন যে সব দ্বীপ ছিল সেগুলো পরে অদৃশ্য হয়।

অচিরেই মুহম্মদের পুত্ররা — উজলাহ্ শাহ, আকে শাহ ও জালাল উদ-দিন এই দ্বীপে এসে পেঁৗছাল। এখানে খরেজম শাহ এক ফরমান জারি করে ইতিপূর্বে যে জালাল উদ-দিন তার হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছিল তাকেই আবার অল্পবয়স্ক পুত্র উজলাহ্ শাহের জায়গায় তখ্তের ওয়ারিশ নিয়োগ করল।

"এখন একমাত্র জালাল উদ-দিনই আমার রাজ্য উদ্ধার করে দিতে পারে," মুহম্মদ স্বীকার করল। "ও দুশমনকে ত ডরায়ই না বরং তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সুযোগ খোঁজে। শপথ করে বলছি, জালাল উদ-দিন বিজয়ী হওয়ার পর আল্লাহ যদি আমাকে আবার পরাক্রম ফিরিয়ে দেন তাহলে আমার রাজ্য জুড়ে কেবলই বিরাজ করবে ক্ষমা ও সত্য!"

অতঃপর খরেজম শাহ জালাল উদ-দিনের কটিদেশে নিজের হীরকখচিত হাতলযুক্ত তরবারি ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে 'সুলতান' খেতাব অর্পণ করল। তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের আদেশ দিল তারা যেন তার প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে।

খরেজম শাহের তরবারি গ্রহণ করে সুলতান জালাল উদ-দিন বলল:

"খরেজম সাম্রাজ্যের শাসনভার আমি তখনই পাচ্ছি যখন তা তাতারদের হাতে চলে গেছে। আমি এমন এক ফৌজের সেনাপতি হতে চলেছি যা আজ নামে মাত্র ফৌজ, সে ফৌজের সেনাদল আজ ঝড়ের মুখে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বৃক্ষপত্রের মতো। কিন্তু মুসলিম দেশগুলোর ওপর ঘনিয়ে আসা এই অন্ধকার রাতে আমি পাহাড়ে-পর্বতে সাড়া জাগিয়ে যুদ্ধের আগুন জ্বালব, আমি সাহসী লোকজন যোগাড় করব।"

জালাল উদ-দিন পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নতুন করে লড়াই চালানোর জন্য ফিরে গেল। বাদবাকিরা সকলে আবেস্কুন সাগরের বালুকাময় দ্বীপে মুহম্মদকে একা রেখে চলে গেল।

আলকাতরামাখা কদাকার নৌকোগুলো তীরভূমি ছেড়ে যেতে বিষণ্ণ ও চিন্তামগ্ন খরেজম শাহ মুহম্মদ বালুকাময় অন্তরীপে দাঁড়িয়ে রইল। তুর্কমেন মাঝিমাল্লারা বিশাল ছাইরঙা পাল তুলে দিল, শাহজাদারা ও আস্ত্রাবাদের আমির বুকের ওপর দু' হাত ভাঁজ করে নৌকোয় দাঁড়িয়ে রইল — শাহের দৃষ্টি যতক্ষণ তাদের দিকে নিবদ্ধ ততক্ষণ মুখ অন্য দিকে ফেরাতে কেউ সাহস করল না।

পালে ভরা হাওয়া লাগতে নৌকো দুলে উঠল, ঢেউয়ের আড়ালে ডুব দিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন নীল পর্বতশ্রেণীর দিকে দ্রুত সরে যেতে লাগল।

এখন জন্মভূমির সঙ্গে এবং সদ্য অসন্তুষ্ট বিদ্রোহী প্রজাদের সঙ্গে খরেজম শাহের শেষ সম্পর্কটুকুও ছিন্ন হল। তাতারদের হামলার বা কটা চেঙ্গিজ খানের কালো ছায়ার আর কোন ভয় নেই। অক্লান্ত জেবে আর সুবুদাইও মুহম্মদের পিছু ধাওয়া করে আর এখানে আসছে না।

এখানে, সমুদ্রের বুকে এই অবাধ প্রান্তরে অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা মনে মনে আন্দোলন করা যাবে, নির্বিঘ্নে বর্তমান নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা যাবে, ধীরে-সুস্থে ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাবে। পুরো এক মাসের খোরাক সম্পর্কে খরেজম শাহ নিশ্চিন্ত: আস্তাবাদের শাসনকর্তা বালির টিলার মাঝখানে এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় কম্বলের ছাউনি করে দিয়েছে, কড়াই, এক বস্তা চাল, কিছু ভেড়ার চর্বি, ভিস্তি, কুঠার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন শাহ হবে দরবেশ; নিজেকে প্রতি দিনের খাবার পাক করতে হবে।

নৌকো ইতিমধ্যে বহু দূরে চলে গেছে, মুহম্মদ তখনও চিন্তামগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর শুকনো তপ্ত বালির ওপর গা এলিয়ে দিল, রোদের ঈষৎ উষ্ণতায় ও সমুদ্রের মৃদুমন্দ বায়ুর আন্দোলনে তার তন্দ্রা এসে গেল।

খস্‌খস্‌ শব্দ ও ফিস্‌ফিস্‌ কথাবার্তায় মুহম্মদ সংবিৎ ফিরে পেল। তার কানে এলো এই কথাগুলো: "লোকটা বড় কেউ হবে, ওর শক্তি আছে!..."

এই নির্জন দ্বীপে এ আবার কার কণ্ঠস্বর? আবার দুশমন? শাহের হুঁশ ফিরে এলো। টিবির ওপর ধূসর ঘাসপাতার ঝোপে কালো ভেড়ার চামড়ার টুপি পরা একটা মাথা জেগে উঠেই লুকিয়ে পড়ল। মুহম্মদের সঙ্গে কোন অস্ত্র ছিল না — তীর-ধনুক আর কুঠার ছিল তার ছাউনিতে। শাহ তাড়াতাড়ি টিবির ওপর উঠল। ছিন্ন বস্ত্র পরনে নগ্নপদ কয়েক জন লোক মাটি কাদার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে কদর্যভাবে চার হাত পায়ে খুঁড়িয়ে চলেছে কোন এক বিদঘুটে জীব।

"আস্তাবাদের আমিরকে বলেছিলাম একেবারে জনশূন্য দ্বীপে আমাকে ছেড়ে দিতে! এই লোকগুলো কোথা থেকে এলো?" মুহম্মদ উদ্বিগ্ন হয়ে

নিজের ছাউনির দিকে চলল। ছাউনির ওপর ধোঁয়ার কুন্ডলী উঠছিল। সামনের জমিতে অর্ধবৃত্তাকারে বসে ছিল গুটি দশেক বিকট মূর্তি। মানুষের আকৃতি বলতে এদের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই — এরা কারা? বড় বড় ফোড়া আর দগদগে ঘায়ে তাদের মুখগুলো সিংহের মুখের মতো বীভৎস টক্‌টকে ও স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে।

"কে তুমি?" যারা বসে ছিল তাদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করল। "এখানে এসেছ কী করতে? লোকে সব জায়গা থেকে আমাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়, তাই আমরা এই দ্বীপে আস্তানা নিয়েছি।"

"তোমরা কারা?"

"আল্লাহ আমাদের অভিশাপ দিয়েছেন। আজ আমরা এই দ্বীপে এসেছি, আমরা এখানে মাছ ধরে জীবন কাটাব।"

"চোখে দেখতে পাও না নাকি?" আরেক জন বলল। "আমরা সবাই কুষ্ঠরোগী; বেঁচে থাকতে থাকতেই আমাদের শরীর লাশের মতো খসে খসে পড়ে। দেখ, এর সব আঙ্গুল খসে পড়েছে। এ লোকটার পায়ের চেটো আর কনুই অবধি হাত গলে পড়ে গেছে, ও ভালুকের মতো চার হাত-পায় চলে। এর চোখ গেছে, আর এর জিভ খসে পড়েছে, বোবা হয়ে গেছে।..."

মুহম্মদ চুপচাপ মনের দুঃখে নৌকোর কথা ভাবতে লাগল; নৌকো ততক্ষণে কালো বিন্দুর মতো দূরে তটভূমির দিকে চলে যাচ্ছিল।

"আমরা সকলে আল্লাহের দোয়া চেয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। আমাদের ওপর তাঁর দয়া হতে তিনি তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"আমি তোমাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারি?"

যারা বসে ছিল তাদের মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়াল। মনে হল লোকটা শক্তিতে ও দৈর্ঘ্যে আর সকলকে ছাড়িয়ে যায়, তার হাতে একটা কুঠার ধরা ছিল।

"আমি আমাদের এই দলের শেখ, এখানে হতভাগ্যদের রাজ্যে সকলে আমাকে মেনে চলে। আমার হুকুম যে মানবে না সে খুন হয়ে যাবে। তুমি সুস্থ, শক্তসমর্থ। আমরা আমাদের সমাজে তোমাকে নিচ্ছি, তুমি জাল টানবে, জল আর কাঠ বয়ে নিয়ে আসবে। আমাদের মধ্যে সকলের সে সাধ্য নেই। আল্লাহ আমাদের কাছে এই যে ছাউনিটা পাঠিয়েছেন

তার ভেতরে আমরা কড়াই, চাল, ময়দা, এক কলসী তেল আর ভেড়ার চর্বি পেয়েছি। এখন তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে। জামা-কাপড় খুলে ফেল — আমরা সকলে পালা করে পরব, তোমার ত আর কোন দরকার নেই।"

মুহম্মদ উলটো দিকে ঘুরে গিয়ে দম বন্ধ করে তীরের দিকে ছুটল। কুষ্ঠরোগীরাও তার পিছু নিল, টিলার চূড়ায় জড় হয়ে তার ওপর নজর রাখল। খরেজম শাহ বালুকাময় গিরিখাতে গিয়ে সমুদ্রের স্রোতে বয়ে আসা শুকনো ডালাপালা যোগাড় করে স্তূপাকার করল, আগুন জ্বালাল। ঘন ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠল।

"এই ধোঁয়া ওপার থেকে দেখতে পেয়ে নৌকো এসে আমাকে আবার জমিতে নিয়ে যাবে," মুহম্মদ বিড়বিড় করে বলল। মনে মনে ভাবে কেবল নৌকোর কথা, নৌকো ততক্ষণে দূরে কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে গেছে। "হোক সেখানে যুদ্ধ, পিছু পিছু ধাওয়া করে বেড়াক তাতার ঘোড়সওয়ারের দল, সেখানে অন্তত আছে জ্যান্ত, সুস্থ লোকজন। তারা একে অন্যের সঙ্গে শত্রুতা করে, তারা দুঃখকষ্ট ভোগ করে, কাঁদে, হাসে; এই জ্যান্ত মড়াদের দ্বীপের চেয়ে তাদের মধ্যে বাস করা অনেক আনন্দের।"

প্রতিশ্রুতিমতো পনেরো দিন পর নৌকো দ্বীপে ভিড়ল। নৌকোয় জন কয়েক সিপাহী নিয়ে খরেজম শাহের সেনাপতি তিমুর মালিক এসে পৌঁছাল। খরেজম শাহকে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় সে তীরে পড়ে ছিল। একটা কাক তার মাথার ওপর বসে চোখ ঠোকরাচ্ছিল।

দ্বীপের চার ধার ঘুরে তিমুর মালিক ভীত সন্ত্রস্ত কুষ্ঠরোগীদের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে দেখল। দ্বীপে কী ঘটেছে তিমুর মালিক তাদের কাছ থেকে তা জানতে চাইল। তারা বলল:

"আমরা দেখতে পেলাম যে নৌকোয় যারা এসেছিল তারা সকলে এই লোকটাকে আমাদের দ্বীপে ছেড়ে দিয়ে বাদশাহ বলে সম্মান দেখিয়ে কুর্নিশ করতে লাগল। বুড়োদের কাছ থেকে আমরা রীতিমতো শুনে এসেছি যে কুষ্ঠরোগী যদি শাহ কিংবা সুলতানের গায়ের পোশাক পরতে পারে তাহলে তার রোগ সেরে যায়, ঘাও শুকিয়ে যায়। কেবল এই জন্যই আমরা ওর গায়ের পোশাক খুলে নিয়েছি। আমরা তাকে আমাদের সঙ্গে

খেতে বলেছি, তার জন্য খাবার বয়ে এনেছি, কিন্তু সে স্পর্শ করে নি, সব সময় আগুন জ্বালাত আর চুপচাপ পড়ে থাকত, এখন যেমন আছে। তার সব জামা-কাপড়ই গোটা আছে। আমাদের বিশ্বাস যে লোকটা সুলতান-টুলতান কিছু নয়, কেন না আমাদের কারোই রোগ সারে নি।"

"আজ্ঞা হোক ব্যাটাদের সাবাড় করে দিই!" একজন সিপাহী চেঁচিয়ে উঠল।

"কেবল আমাদের তলোয়ারে নয়, ওদের বিষাক্ত রক্তে আমাদের তলোয়ারের ঝক্‌ঝকে ফলা নোংরা করে আর কাজ নেই!" এই বলে দ্বিতীয় সৈনিক কুষ্ঠরোগীদের সর্দার শেখের পেট তীরবিদ্ধ করল। লোকটা বিকট চিৎকার করে পালাতে লাগল, বাকি কুষ্ঠরোগীরাও তার পিছু পিছু ছুটল।

"ছেড়ে দাও!" তিমুর মালিক চেঁচিয়ে বলল। "আল্লাহ ওদের যথেষ্ট সাজা দিয়েছেন। আমি ওদের চেয়েও বেশি অসুখী! খরেজম শাহদের গৌরবের জন্য আমি সারা জীবন লড়াই করেছি। খরেজম শাহ মুহম্মদ অপরাজেয়, তিনি নয়া ইস্কান্দার, জাতির দুর্গতির দিনে তিনি নির্ভীক মুসলমান ফৌজকে বিজয় গৌরবের পথ দেখাবেন — এই বিশ্বাসে আমি নিজের খুন ঢেলেছি। এখন আমার ক্ষতচিহ্নের জন্য আমি লজ্জিত, মরুভূমির মায়া মরীচিকার জন্য বৃথাই আমার যৌবনের দিনগুলো নষ্ট করেছি ভেবে আমার আফসোস হচ্ছে। এখানে পড়ে রয়েছেন এমন এক পুরুষ যাঁর ছিল বিশাল বাহিনী, যিনি দিগ্বিজয়ী হতে পারতেন, অথচ আজ হাত তুলে একটা কাক তাড়ানোর মতো শক্তিও তাঁর নেই। আজ সকলের মন থেকে বিস্মৃত হয়ে তিনি পড়ে আছেন, নগ্নতা ঢাকার জন্য সালোয়ার তাঁর অঙ্গে নেই, দাফনের জন্য জন্মভূমির এক মুঠো মাটিও তাঁর মিলল না। আমার আর যোদ্ধা হয়ে কাজ নেই! যে মারাত্মক ভুলের জ্বালায় আমি জ্বলে পুড়ে মরছি সারা জীবনের চোখের জলে তা দূর হবার নয়।..."

তিমুর মালিক তার বাঁকা তলোয়ার তুলে নিয়ে পায়ে মাড়িয়ে ভেঙে ফেলল। সে নিজে তার উষ্ণীষের কাপড় খুলে খরেজম শাহের দেহ ঢেকে দিল, সংক্ষিপ্ত একমাত্র যে মোনাজাতটা জানা ছিল তা আবৃত্তি করল। সিপাহীরা ছুরি দিয়ে বালি খুঁড়ে খরেজম শাহ মুহম্মদের দেহ শুইয়ে দিল। এক কালে যে ছিল অতি পরাক্রান্ত মুসলিম অধিপতি

সে কসাইয়ের ছুরিকাতলে কম্পমান ছাগশিশুর মতো গ্লানিকর মৃত্যু বরণ করল।

তিমুর মালিক দ্বীপ পরিত্যাগ করল, সুলতান জালাল উদ-দিনকে খুঁজে বার করে তার পিতার মৃত্যুসংবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে সে নিজের সিপাহীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। শোনা যায় যে অতঃপর সাধারণ দরবেশ হয়ে সে বহু বছর আরব, ইরান ও হিন্দুস্তান ভ্রমণ করে।*

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুরবান কিজিকের গৃহযাত্রা

"মার টান! হে'ইয়ো জোয়ান!"

স্রোতের প্রতিকূলগামী নৌকো জাইহুনের খরস্রোতের সঙ্গে যুঝে ধীরে ধীরে তীরের দিকে আসতে লাগল।

"ভিনদেশে শাহের ঘোড়া দেখাশোনা করা? — ঢের হয়েছে! দেশে না খেয়ে মরব সেও ভালো!" কুরবান কিজিক মনে মনে বলল। "দামী খাঁচায় করে আশখানায় ঝুলিয়ে রাখা কোকিলের আনন্দ আর কি! বাদশাহ আমাকে একটা সোনার দিনার দিয়েছেন। এমন দিন জীবনে একবারই আসে। কিন্তু বাড়ি অবধি দিনারটাকে নিয়ে যাই কী করে? কেবল এটাকে মুখে পুরে গালের একপাশে রেখে। উনি যে আবার নৌকোগুলোকে নদীর উজানে খরেজমে পাঠিয়ে দিতে বললেন!.. না! সেখানে আমি যাচ্ছি না। না কুরবান আর শাহের জন্য লড়তে চায় না, পালাতেও চায় না। এভাবে পালাতে পালাতে ত অথৈ 'শেষ সমুদ্রে' গিয়ে পড়বে, তার পর? কুরবান তার মাঠে গিয়ে কাজ করতে চায়, ছেলেমেয়েদের দেখতে চায়।..."

---

* কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে বহু বছর বাদে নিঃস্ব দরবেশের বেশে তিমুর মালিক মধ্য এশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে। যুদ্ধে যে মোঙ্গলের চোখ সে তীরে বিদ্ধ করে খোজেন্তে সে ব্যক্তি তিমুর মালিককে সনাক্ত করে। মোঙ্গল মহকুমা শাসক তিমুর মালিককে তার সামনে হাজির করার হুকুম দেয় এবং গর্বিত ও দৃপ্ত উক্তির জন্য তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে।

কুরবান শৈলবেষ্টিত, পরিত্যক্ত তীরভূমির দিকে তাকাল — টিলার চূড়ায় বাদামী ঘোড়ার পিঠে মুহম্মদকে তখনও দেখা যাচ্ছে। কুরবান জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তীরের দিকে চলল। দুর্গ থেকে নীচে টিলার ওপর দিয়ে কাঁধে পুঁটলি নিয়ে একে অন্যকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো লোকজন ছুটছে, লাফ দিয়ে নৌকোয় উঠে তারা বারবার বলতে লাগল:

"তাতাররা এসে পড়েছে! শিগ্‌গির যে যার প্রাণ বাঁচাও!"

কুরবানের দিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো অবস্থা কারও ছিল না। তীর বরাবর ছুট দিয়ে কুরবান গিয়ে পৌঁছাল সেই কুঁড়ে ঘরটায় যেখানে অন্যান্য মাঝিদের সঙ্গে কুরবানের থাকার জায়গা হয়েছিল। খড়ের গাদার মধ্যে সে তার জুতোর পুঁটলিটা খুঁজে পেল, আরও একবার নদীর দিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে পেল যে নৌকোগুলো একটার পর একটা তীরভূমি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এখানেই কুরবান কোন রকম ইতস্তত না করে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার পথে নামল।

সে টিলার ওপর উঠে কেল্লার প্রাচীরের ধারে গেল। সেখান থেকে দেখতে পেল কীভাবে হলুদ রঙের পাথুরে প্রান্তরের ওপর দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য লোকজনের লাল ও ভুরে আঙরাখাগুলো এলোমেলো ছুটছে, আরও কিছু দূরে একটা ধুলোর মেঘ ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

"ওটা তাতারদের দল!" বুঝতে পারামাত্রই কুরবান শুকনো স্তেপ ধরে সামনে ছুটতে লাগল — পাথরে আর কাঁটায় যে তার খালি পা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

"সামনে টিলা, তার পেছনে নিশ্চয়ই খাত আছে। তাতাররা কেল্লা ও ঘাট দখল করার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকবে। কুরবানকে নিয়ে তাদের মাথা ঘামানোর সময় কোথায়?"

এই ভেবে সে উঁচু লাগি বসানো একটা কবরের ঢিবি দেখতে পেয়ে তার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, কিছুটা নিশ্বাস নিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল।

ধুলোর আড়ালে এখনই অশ্বারোহী চেনা যাচ্ছে — তাদের গায়ে ভেড়ার চামড়ার বাদামী রঙের ঢিলে আলখাল্লা, ছুটন্ত ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর তাদের দেহ ঝুঁকে আছে। কারও কারও গায়ে লোহার বর্মের ফলক

ঝক্ঝক্ করছে। ইতিমধ্যেই ভেসে আসছে তাতারদের গর্জন, তাদের বন্য হুহুঙ্কার, সেই সঙ্গে ছোটখাটো গড়নের ধূলিধূসরিত হাজার হাজার অশ্বের পদধ্বনি।

কোন কোন অশ্বারোহী দল থেকে বেরিয়ে এসে পলায়নরত লোকজনের পথ আগলে সোজা প্রান্তরের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তরবারি ঝলকে উঠল, লোকে ধুপ্ধাপ্ পড়ে যেতে লাগল, তাতাররা চার দিকে বেড় দিয়ে থামল, ঘোড়া থেকে না নেমেই ঝুঁকে পড়ে লোকের ফেলে যাওয়া পোঁটলা-পুঁটলি তুলে নিল, তারপর ঘোড়া চালিয়ে আবার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল।

কুরবান হামাগুড়ি দিয়ে শুকনো খাত পর্যন্ত গেল, সেখান থেকে গড়িয়ে নীচে নেমে আবার ছুটতে শুরু করল।

সারা দিনে মরুপ্রান্তরের আর কামাই নেই, মাঝে মাঝে চোখে পড়ে পরিত্যক্ত খেত। পথে ইতস্তত এক আধজন লোকের সঙ্গে, কখনও বা ভ্রাম্যমাণ লোকজনের দলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কুরবান ঐ দিক থেকে, 'শোক ও অশ্রুর উপত্যকা' থেকে আসছে জেনে সকলেই তাকে থামিয়ে বুখারার ভাগ্য সম্পর্কে, খরেজম শাহের পলায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ করে, তাকে শিবিরের আগুনের সামনে আমন্ত্রণ জানিয়ে অল্প আঁচে সেঁকা রুটির ভাগ দেয়, সাগ্রহে তার বিবরণ শোনে।

কুরবান বলে যেতে লাগল কীভাবে সে একা কয়েক জন তাতারের সঙ্গে লড়াই করে, কীভাবে সে তাদের সকলকে খতম করে এবং যে ঘোড়ার ওপর সে বসেছিল সেটা শত্রুর হাতে মারা যায়। এখন সে বাড়ির দিকে চলেছে, এখন তার একমাত্র মনোবাসনা যেখানে জলসেচের খালটি তার জমির দিকে বাঁক নিয়েছে সেই জায়গায় পুরনো ঝাউগাছটাকে দেখে, নিজের ছেলেমেয়েদের আবার আদর করতে পেরে মনপ্রাণ জুড়ায়।...

শেষ পর্যন্ত সে নিজেই তার গল্পকথায় বিশ্বাস করতে লাগল। তবে বাদশাহকে কী করে নৌকো থেকে তীরে বয়ে এনেছিল সে কথা ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করল না, কেন না জন্মভূমির দুর্গতির দিনে তাকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্য সকলেই মুহম্মদকে অভিসম্পাত দেয়। লড়াইয়ের ময়দানে শহীদের মৃত্যুবরণে ভীত হয়ে সে কিনা নিজের জাতিকে মোঙ্গল ও তাতারদের শাসনের হাতে তুলে দিল!

এক জায়গায় খাতের মধ্যে বহু লোক দেখতে পেয়ে কুরবান এগিয়ে গেল, তারা সরে গিয়ে আগুনের পাশে তাকে জায়গা করে দিল। সবারই মুখে তাতারদের কথা, তাদের মুখে পড়ার বিবরণ।

"আমরা একই গাঁয়ের লোক। আমাদের ওখানে ব্যাপারটা ঘটে এই রকম: আমরা জনা দশেক লোক রাস্তায় জড় হয়ে গল্পগুজব করছিলাম। এমন সময় গাঁয়ে এক তাতার এসে হাজির। ব্যাটা সোজা আমাদের ওপর ঘোড়া চালিয়ে দিয়ে একের পর এক যাকেই পায় তাকেই কোপ মেরে সাবাড় করে। একটিমাত্র ঘোড়সওয়ারের গায়ে হাত তোলে এমন সাহস এক জনেরও হল না। আমাদের মতো যারা বেড়া ডিঙাতে পারল তারাই প্রাণে বাঁচল।"

"তাহলে আমি যা শুনেছি বলি। একটা লোক যখন তার খেতে কাজ করছিল তখন এক তাতার এসে তাকে ধরল, লোকটাকে খতম করার মতো কোন অস্ত্র কিন্তু তাতারের হাতে ছিল না। সে বিকট গলায় হাঁক ছাড়ল: 'মাটিতে মাথা পেতে দে, নড়াচড়া করবি না বলছি!' কী হল বলতে পার! লোকটা ত মাটিতে শুয়ে পড়ল আর তাতারও লুটের মাল বোঝাই মাল টানা এক ঘোড়ার দিকে তার ঘোড়াটা ছুটিয়ে দিল, সেখান থেকে তলোয়ার খুঁজে বার করে ফিরে এসে লোকটাকে মেরে ফেলল।"

এইভাবে আগুনের ধারে বসে তারা নিজেদের জাতির দুঃখ-দুর্দশার জন্য শোক করতে লাগল, কুরবানকে রুটির টুকরো আর পাত্রে করে গরম গরম গোলা ময়দার ভাগ দিল।

এমন সময় তাদের মাথার ওপরে একটা উঁচু জায়গা থেকে ভয়ঙ্কর, ভাঙা ভাঙা গলার আওয়াজ উঠল:

"অ্যাই, ওখানে কারা আছ? নিজেরা নিজেরা হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেল দেখি!"

ওপরে, খাতের কিনারায় বাদামী রঙের ঘোড়ায় চড়ে এক তাতারকে দেখা গেল।

"সর্বনাশ! আমরা গেলাম!" লোকেরা বিড়বিড় করে উঠল, তারপর কোমরের বাঁধন খুলে ফেলে বাধ্যের মতো বাড়িয়ে দেওয়া হাত বাঁধতে উদ্যত হল।

"দাঁড়াও!" কুরবান বলল। "লোকটা ত একা। আমরা কি লোকটাকে মেরে ফেলে পালাতে পারব না?"

"আমাদের ভয় হচ্ছে!"

"আমরা নিজেরা যখন একে অন্যের হাত বাঁধব তখন ও আমাদের মেরে ফেলবে। এস, বরং আমরাই ওকে মারি! হয়ত আমরা প্রাণে বেঁচে যাব।"

"না, না! এমন কাজ করার মতো বুকের পাটা কার আছে?"

সকলেই কাঁপতে কাঁপতে হাত বাঁধাবাঁধি করতে লাগল।

যেন ভেট নিয়ে যেতে চায় এই ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে নিজের সামনে পুঁটলি বাড়িয়ে ধরে কুরবান খাড়াই বয়ে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে তাতারের দিকে এগিয়ে গেল।

অশ্বারোহীর বয়স নেহাৎ কম নয়। তার চিবুকের ওপর স্বল্প কয়েক গুচ্ছ পলিত কেশ ঝুলছিল। রোদ-জল-হাওয়ায় পোড় খাওয়া মুখাবয়ব কালের বলিরেখায় কুঞ্চিত। খোঁচা খোঁচা কাঁটার মতো চেরা চোখ তুলে লোকটা তাকাল।

"এটা কী?" পুঁটলিটা তোলার জন্য ঝুঁকে পড়ে অশ্বারোহী বলল।

কুরবান সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ও হাত জাপ্‌টে ধরল। ঘোড়াটা ভয় পেয়ে এক পাশে ছুট দিল। কুরবান তাতারকে ছেড়ে না দিয়ে টেনে হিঁচড়ে মাটিতে নামিয়ে ফেলল। তারপর কুরবান যেমনভাবে ভেড়া জবাই করতে অভ্যস্ত তেমনিভাবে ছুরি দিয়ে তাকে কাটল।

কুরবান উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। আগুনের পাশে যারা বসে ছিল তাদের মধ্যে একজন পড়িমরি করে ছুটেছে, বাকিরা লুকিয়ে থেকে খাতের ওপর দিকে উঁকি মারছে। অবশেষে দু' জন এগিয়ে এলো।

"লোকটার নিশ্বাস আর পড়ছে না!" তাতারের দিকে ঝুঁকে পড়ে এক জন বলল।

"ওর যা কিছু আছে এখন তা নিয়মমতো ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে হয়," বলেই অন্য জন মৃত লোকটির কামিজ ছাড়া নগ্ন তামাটে গায়ে ভেড়ার চামড়ার যে আঙরাখাটি ছিল তা খুলে নিল।

সকলে ধাওয়া করে এসে কুরবানকে ঘোড়াটা ধরতে সাহায্য করল। তখন কুরবান বলল:

"তোমরা যা খুশি তাই নিয়ে নাও, কেবল এই কটা ঘোড়াটা আমার পেলেই হল। দেখতেই ত পাচ্ছ এটা মোঙ্গলদের ঘোড়া নয়, আমাদের

চাষী গেরস্থের ঘর থেকে চুরি করা ঘোড়া। এটা দিয়ে আমি জমি চাষ করব।”

“বরং বাজি ধরে ঠিক করা যাক,” হাতে ঘোড়ার লাগাম জড়িয়ে ধরে একজন বলল।

“আরে আরে দেখ, দেখ! তাতারটা মরে নি দেখছি, উঠে দাঁড়াচ্ছে!” কুরবান চেঁচিয়ে উঠল; শোনামাত্রই লোকটা ভয় পেয়ে লাগাম ছেড়ে দিয়ে পালাল।

ঘোড়ার পিঠে যে সব পোঁটলা-পুঁটলি ছিল সেগুলোর মধ্যে একটি, সবচেয়ে ভারী বোঝাটা বাদে আর সবগুলো বাঁধন খুলে কুরবান মাটিতে ফেলে দিল। লাফ দিয়ে জিনে চেপে বসে সে চেঁচিয়ে বলল:

“কী ঘোড়সওয়ার সেপাই রে আমার! তোরা হলি সব ভীতু পোকা-মাকড়ের জাত — লাঠি উঁচাতে দেখলেই পালাস। সিংহের মতো বুকের পাটা যদি তোদের থাকত তাহলে আমরা এক জোট হয়ে কেবল সমস্ত তাতার আর মোঙ্গলকেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করতাম না, যারা আমাদের জমি দখল করে রেখেছে তাদের সকলকে — খরেজমের সব শাহ, যত সব সুলতান, বেগ আর খানদেরও বিদায় করে দিতাম। কিন্তু তোরা হলি আরসুলা — ফাঁকে-ফোকরে সেঁধিয়ে থাকিস, সরসর শব্দ শোনামাত্রই আঁতকে উঠিস! যে কোন তাতার তোদের টিপে মেরে ফেলবে এ আর এমন কী কথা! বিদায়! দুনিয়ার মহাবীর কুরবান কিজিককে মনে রাখিস!'' এই বলে কুরবান হাত নাড়িয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরিবারের সন্ধানে কুরবান

বুখারার যত কাছাকাছি কুরবান আসতে থাকে ততই তার চোখে পড়ে গ্রামের পর গ্রামের ধ্বংসাবশেষ, মৃতদেহের ভুক্তাবশেষ। স্থূলোদর কুকুরের দল পুচ্ছদেশ মাটিতে লুটিয়ে ধীরে ধীরে মৃতদেহের স্তূপ থেকে পশ্চাদপসরণ করে নিঃসাড়ে শুয়ে পড়ছিল।

জিনের ওপর তাতারের যে চামড়ার থলিটা ছিল নির্জন জায়গায়

এসে কুরবান তার বাঁধন খুলে ফেলল, আশা ছিল তাতার তার লুট করা সোনাদানা ওটার মধ্যে রেখে দিয়েছে। থলিতে পাওয়া গেল কামারশালায় ব্যবহার করা হয় এরকম নানা আকারের তিনটে হাতুড়ি, উকো, চিমটে, গমের পুটলি, এক টুকরো সেদ্ধ মাংস আর গোটা দশেক চাপাটি। সোনাদানা গেল কোথায়? জড়ানো বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে কুরবান টাকা-পয়সা রাখার চামড়ার থলি পেল। তাতে টাকা-পয়সা ছিল — সোনা নয়, ছিল রুপোর আর তামার মুদ্রা। যা-ই হোক এই দিরহামগুলো সংসারের কাজে লাগবে, তা ছাড়া খরেজম শাহের দেওয়া সেই দিনারটা ত গালের ভেতর আছেই।

কোন কোন গ্রামের সংলগ্ন মাঠে গ্রামবাসীরা চাষবাসের কাজে নেমে গেছে। তারা কুরবানের কাছে অভিযোগ করল যে এখন নালায় জল ঠিকমতো আসে না, মাঝে-মধ্যে আসে; কতক জমি শুকিয়ে গেছে, কতক জমি জলে ডুবে যাওয়ায় চাষবাস ধুয়ে-মুছে সর্বত্র নতুন নতুন খাত দেখা দিয়েছে।

নিজের বাড়ির অনতিদূরে এক পরিত্যক্ত গ্রামে কুরবান পরিচিত চাষী কুভোন্‌চের দেখা পেল। কুভোন্‌চ তাকে ঝুলকালিমাখা পাথর ও ভস্মের একটা স্তূপ দেখাল।

"এই হয়েছে আমার বাড়িঘরের দশা!" কুভোন্‌চ বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়ে বলল। "আমি চার দিকে ঘুরি, আমার ছেলেমেয়েদের ডাকি, কিন্তু ওরা আসে না। মোঙ্গলরা যেদিন এলো আমি সেদিন মাঠে কাজ করছিলাম। ধোঁয়া আর উদ্‌ভ্রান্ত পাড়া-পড়শীকে দেখতে পেয়ে আমি পাড়ার লোকজনের পেছন পেছন ছুটতে লাগলাম, ভাবলাম আমার পরিবারও বুঝি অন্যদের সঙ্গে পালিয়ে বেঁচেছে। রাতে ফিরে এসে নিজের বাড়ি খুঁজতে গিয়ে দেখি এই পাথর আর ধিকিধিকি ছাইয়ের গাদা ছাড়া কিছুই নেই। মোঙ্গলরা আমার ছেলেমেয়েকে নিয়ে গেছে না তারা সকলে আগুনে পুড়ে মরেছে তা আমি জানি না।... কিন্তু ওরা ফিরে আসলেও আসতে পারে।..."

উদ্বেগ ভারাক্রান্ত মনে কুরবান এগিয়ে চলল, অন্ধকারেই ঠাহর করে দেখল সে জমির নালার বাঁকে পুরনো ঝাউগাছের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

নালা বয়ে জল ছুটে চলেছে। নিস্তব্ধ রাতে ক্ষীণচন্দ্র রেখার পাণ্ডুর আলোয় সে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। উঠানের দেউড়ি হাট খোলা। ঘোড়া

থেকে লাফিয়ে নেমে চালার নীচে তাকে রেখে কুরবান ঘরের দরজার দিকে চলল। দরজা আড়াআড়ি তক্তা ঠেকিয়ে বন্ধ করা। দরজার ওপারে কোন সাড়াশব্দ, জনপ্রাণীর নিশ্বাসও নেই।...

কুকুরটার পর্যন্ত পাত্তা পাওয়া গেল না।...

দু' হাত ভরা খড় জড় করে কুরবান ঘোড়ার সামনে ফেলে দিল। তারপর দেয়ালের চেনা খাঁজ বেয়ে চালে উঠল। সেখানে পুরনো ছনের গাদায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমোতে ঘুমোতে তার কানে যেন ভেসে এলো কুভোন্চের কথাগুলো: "ওরা ফিরে আসলেও আসতে পারে।"

খুব ভোরে ঠান্ডা বাতাসে কাঁপুনি ধরতে কুরবান যখন কুঁড়ে ঘরের চালার ওপর শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিল তখন দূরে থেকে ভেসে আসা কাতরানির মতো একটা আওয়াজ তার কানে এলো। কুরবান কান পেতে শুনল। আবার সেই কাতরানি। শব্দটা নীচ থেকে আসছে। কে কাতরায়? তাতারের হাতে আহত কেউ? না কি কোন মুমূর্ষু তাতার?

চালা থেকে নেমে এসে কুরবান তার ঘোড়ার দিকে ছুটল। ঘোড়াটা ইতিমধ্যে সব খড় খেয়ে ফেলে চঞ্চল হয়ে খুর ঠুকছে। চামড়ার থলি থেকে কুরবান হাতুড়ি বার করল। কুটিরের আগল খুলে সে ভেতরে ঢুকল। সেখানে অন্ধকার। তক্কপোষে হাতড়াতে গিয়ে একটা দেহ এসে ঠেকল। মুখে হাত পড়তে মা বলে চিনতে পারল। মার অবস্থা জীবন্মৃত। ক্ষীণকণ্ঠে কাতরাতে কাতরাতে বলল:

'আমি জানতাম রে বাপজান, তুই আসবি। কুরবান আমাদের ফেলে যাবে না।..."

"আর সকলে কোথায়?"

"সবাই ওখানে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেছে, আমি একা বাড়িঘর আগলানোর জন্যে রয়ে গেছি, একেবারে দুবলা হয়ে পড়েছি। আমি আর বেঁচে নেই ভেবে হয়ত ওরা দরজায় খিল এঁটে দিয়েছে। এখন বাছা তুই এসেছিস, সব ঠিক হয়ে যাবে।..."

কুরবান খুঁজে পেতে একটা হাঁড়ি বার করল, খাল থেকে জল নিয়ে এলো, কিছু কুটো-কাটা যোগাড় করে আনল। চুলোয় আঁচ দিল, হাঁড়িতে জোয়ার ফেলে দিয়ে সেটা চুলোয় চাপাল। কুটিরে আলো আর উষ্ণতার আমেজ ফুটে উঠল। মা শীর্ণ ও দুর্বল অবস্থায় পড়ে ছিল, নড়াচড়ার কোন

ক্ষমতাই তার ছিল না। তার নাকের ডগা তীক্ষ্ম হয়ে জেগে আছে, শুকনো টান-টান ঠোঁট দুটো নাড়িয়ে সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে:

"এই ত তুই এসেছিস বাপধন!"

কুরবান ঘোড়াটাকে ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে চড়ে বেড়ানোর জন্য খুঁটিতে বেঁধে রেখে দিল। পাশেই ছিল তার চাষের জমি — ছোট্ট একটা ফালি — এইটুকু ফালি থেকে কি আর পরিবারের মুখে অন্ন যোগানো যায়? তায় আবার অর্ধেক ফসল দাও জমির মালিক বেগকে! জমি এর মধ্যেই আগাছায় ছেয়ে গেছে। আরও দূরে চলে গেছে পাড়া-পড়শীদের জমি — তার চেনা জমি। সেগুলোও আগাছায় ভর্তি, অথচ লোকজন কোথাও চোখে পড়ছে না। দূরে পুড়ে খাক হয়ে পড়ে আছে পাড়ার বুড়ো তোতলা কামার সাকাউ কুলির চালাঘর, ঘরের দেয়ালে ঝুলকালি, বাড়ির চার দিকে গাছপালার পাতা আগুনে বিবর্ণ ও কোঁকড়ানো।

এমন সময় চোখে পড়ল কে একজন একা একা ধীরে ধীরে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। লোকটা থেমে পড়ল, কোদাল চালাতে লাগল — বোধহয় জলের নালাটা সাফ করছে।

"হেই!" কুরবান হাঁক দিল।

লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াল, হাত তুলে আলো থেকে চোখ আড়াল করে মনোযোগ দিয়ে দেখল।

"হেই, কুরবান কিজিক!" সে চেঁচিয়ে বলল, তারপর দু' জনেই নালা বরাবর দ্রুত একে অন্যের দিকে পা চালাল, হাত বাড়িয়ে কোলাকুলি করল। লোকটা কুরবানের পড়শী বুড়ো সাকাউ কুলি, গুটি কয়েক নাতিও তার আছে।

"ওঃ, কী অকাল পড়েছে!" বুড়ো আস্তিনে চোখ মুছে বলল।

"তোমার পরিবারের সকলে ভালো আছে ত? গরুটা কি বেঁচে আছে? গাধাটা কাজ করে কি? ভেড়াগুলো বাচ্চা বিয়াল নাকি?" কুরবান জিজ্ঞেস করল।

"চামড়ার আলখাল্লা পরা লোকগুলো এসে পাড়া-পড়শীর গরু ভেড়া নিয়ে চলে গেল, আমার চারটে ভেড়া আর এক নাতিকে জিনের ওপর বেঁধে নিয়ে গেল, পরিবারের বাকি সকলে পাহাড়ে পালিয়ে গেছে। আমি ওদের ফিরে আসার অপেক্ষায় আছি — অবশ্য যদি খিদেয় মারা না গিয়ে থাকে। গরু আর গাধা রক্ষে পেয়ে গেছে।"

"কিন্তু আমার পরিবার কোথায়?" কুরবান জিজ্ঞেস করল। সে রুদ্ধশ্বাসে উত্তরের প্রতীক্ষা করতে থাকল।

"তোমার জন্য সুখবর আছে — তোমার বিবি গতকাল ফিরে এসে আমার পোড়া বাড়ির ছাইপাঁশের গাদায় রাত কাটিয়েছে। ঐ ত মাঠ পার হয়ে আসছে।..."

দূরে থেকে বৌয়ের গায়ের পরিচিত লাল বসন কুরবানের চোখে পড়ল। ও এরকম টলতে টলতে আসছে কেন? কুরবান হঠাৎ বেশ গম্ভীর ও ভারিক্কি হয়ে উঠল — সে হল পরিবারের কর্তা, নিজের হাতে সকলের ভার নিতে হবে, ভাঙা ঘর-সংসার আবার খাড়া করে তুলতে হবে।

"ভালো কথা, সাকাউ কুলি," কুরবান বুড়োকে বলল। "তোমার গরু আর গাধা আছে, আমার আছে ঘোড়া। এসো, আমরা এক সাথে খেতে আমাদের জমি চাষ করি। চার দিকে যুদ্ধ আর হামলা; এই সেদিন ছিল কিপচাক বেগেরা, আজ এসেছে মোঙ্গল খানের দল। কবে যে এদের হাত থেকে রেহাই পাব! তবে আমরা হলাম চাষী, আমাদের কি আর হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলে? আমাদের কাজ — ফসল বোনা; আমরা নিজেরা আমাদের কথা না ভাবলে কে আমাদের খাওয়াবে বল?"

"হক কথা বলেছ! সময় নষ্ট করা চলবে না: জমির দরকার বীজ, লাঙল আর জল!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুলতানা তুর্কান খাতুনের পলায়ন

সেই ভয়ানক ড্রাগন বর্ষের (১২২০) বসন্তকালে গোটা মাভেরাল্নগর চেঙ্গিজ খানের শাসনাধীনে চলে এলো। দামী সম্পত্তির ভোগ দখল পেয়ে উদ্যোগী মালিক যা করে থাকে মোঙ্গল খানও তেমনি আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যত্ন নিল। সব শহরে চেঙ্গিজ খান তাতার রক্ষী সেনাদল রাখল, দেশীয় হাকিম নিয়োগ করল, তবে সব কিছু যাতে খান-ই-খানানের অতন্দ্র দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচরে থাকে সেই উদ্দেশ্যে হাকিমদের সঙ্গে সে নিজস্ব মোঙ্গল শাসকও রেখে দিল।

তখন পর্যন্ত চাষীদের কেউ কেউ ভীত ও সন্দিগ্ধ বটে, কিন্তু তারা

ধীরে ধীরে নিজেদের গ্রামে ফিরে এসে চাষবাসে হাত দিল। তবে নতুন করে শৃঙ্খলা গড়ে উঠতে সময় লাগছিল: দেশ জুড়ে ইতস্তত ঘুরছে ক্ষুধার্ত চোর-বাটপার আর গৃহহারা শরণার্থীর দল; মোঙ্গলদের অনুসরণে খাদ্যের সন্ধানে তারাও সর্বস্বান্ত গ্রামের ওপর লুঠতরাজ চালাচ্ছে।

খরেজমের মূল ভূখন্ড, যেখানে খরেজম শাহদের সমৃদ্ধ রাজধানী গুরগঞ্জের অবস্থান, সেই নিম্ন জাইহুন উপত্যকাই কেবল তখন পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করছে না। মোঙ্গলদের অধিকারের মাঝখানে তার অবস্থা দড়িদড়া ছেঁড়া তাঁবুর মতো। চেঙ্গিজ খান এই ভূখণ্ডের ওপর নিজের অধিকার কায়েম করার উদ্যোগ নিল, সে তার তিন পুত্র জুচি, জাগাতাই ও উগেদেইকে জেলাটির বিরুদ্ধে অভিযানের ভার দিল। নিজের বাহিনীর উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের দিল। জাগাতাই ও উগেদেই জাইহুন নদীর তীর ধরে দক্ষিণ দিক থেকে খরেজমের দিকে যাত্রা করল, এদিকে চিরকালের অবাধ্য জুচি গড়িমসি করতে লাগল, নিজের সেনাদল নিয়ে আর এগিয়ে না গিয়ে জেন্দের কাছাকাছি জায়গায় সে বুনো গাধা শিকারে মেতে উঠল, যাযাবরদের কাছ থেকে বেছে বেছে ঘোড়া নিতে লাগল, খানের প্রিয় রঙের — কেবল সাদা ও ছাইরঙা ঘোড়া যোগাড় করে দেওয়ার বায়না ধরল।

চেঙ্গিজ খান তার খাস ফৌজের অভিযান আপাতত স্থগিত রেখে জাইহুন নদীর তীরে শীত কাটাতে মনস্থ করল। খরেজম শাহের পার্শ্বচরদের মধ্যে যারা চেঙ্গিজ খানের পক্ষ অবলম্বন করেছে তাদেরই একজন — দানিশমন্দ হাজিবকে সে গুরগঞ্জে পাঠাল। বর্ষীয়সী সুলতানা তুর্কান খাতুনের কাছে উপস্থিত হয়ে দানিশমন্দ হাজিব জানাল যে খান-ই-খানানের বিবাদ তার সঙ্গে নয়, কেবল তার পুত্র খরেজম শাহ মুহম্মদের সঙ্গে, আর সেটাও সে যে অপরাধ করেছে তার জন্য ততটা নয় যতটা নিজের জননীর প্রতি অবাধ্যতা ও অবমাননার জন্য শাস্তি কামনা করে। দানিশমন্দ হাজিব আরও জানাল যে তুর্কান খাতুন যদি বশ্যতা স্বীকার করেন তাহলে তাঁর শাসনাধীন এলাকার ওপর কোন রকম হস্তক্ষেপ ও হামলা করা হবে না বলে চেঙ্গিজ খান প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

সুলতানা তুর্কান খাতুনের মতো কুটিলা কি আর তাই বলে মোঙ্গল অধিপতিকে বিশ্বাস করতে পারে? — মোঙ্গল অধিপতির সততা কেবল নিজের জাতভাইদের সঙ্গে। শিকারী যেমন ছাগল ধরে কাবাব বানানোর

উদ্দেশ্যে বাঁশি বাজিয়ে ছাগলকে প্রলোভন দেখায়, অন্য সব জাতের চেঙ্গিজ খানের মনোভাবটাও সেইরকমই।

দানিশমন্দ হাজির গুরুগম্ভ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কালিফ ে নৌকো এসে ভিড়ল। একটা নৌকোয় ছিল সাধারণ চাষীর ছদ্মবেশ ইনান্‌চ খান — খরেজম শাহের কাছ থেকে সে চিঠি নিয়ে এসেছে। বা তার মাকে জানাচ্ছে যে জাইহুন নদী তীরের নগরচৌকি সে দিচ্ছে। বিশাল ফৌজ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সে খোরাসান যাচ্ছে, তুর্কান খাতুনকে আহ্বান জানাচ্ছে তিনি যেন চেঙ্গিজ খানের বিশ্বাস না করে বাদশাহের পুরো হারেম নিয়ে তার কাছে আসেন।

এই সংবাদে তুর্কান খাতুন এতই বিচলিত হয়ে পড়ল যে ে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নিত্য ব্যবহার্য সুর্মার প্রলেপ পর্যন্ত লাগাতে গেল। খরেজমে থাকা বিপজ্জনক এটা বুঝতে পেরে বিশাল কা বোঝাই করার হুকুম দিয়ে সে খরেজম শাহের সমস্ত বিবি ও সন্ত একত্রিত করল, উটের পিঠে মূল্যবান সামগ্রী চাপিয়ে কারাকুমের মরু ভেদ করে দক্ষিণে, কোপেৎ-দাগের দিকে চলল।

যাত্রার প্রাক্কালে বর্ষীয়সী সুলতানা সম্ভাব্য সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে পৌত্রদের নির্বিঘ্ন করার সিদ্ধান্ত নিল। জল্লাদ সর্দারের প্রতি হুকুম হল: খানদানি বংশের যে সব ছেলেকে শাহ্ পরিবারে জামিন হয়েছে বয়সের কোন রকম বাছবিচার না করে তাদের সকলকে যেন করে জাইহুন নদীর গভীর কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং দু বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই বেঁধে দিয়ে সেখানে জলে ফেলে ে হয়। খরেজমের বড় বড় সামন্তের পুত্র — সাতাশ জন বালক ও সলিলসমাধি লাভ করল।

তুর্কান খাতুন এদের মধ্যে একমাত্র যাকে রেহাই দিল সে হল তুক অঞ্চলবর্তী ইয়াজেরের* শাসকপুত্র ওমর খান। তুর্কান খাতুন যে করল তার একমাত্র কারণ এই যে সে স্বয়ং ঐ দিকেই যাচ্ছিল, ওমর খান ও তার ভৃত্যদের মরুভূমির পথ জানা ছিল। কারা-কু

---

* ইয়াজেরের অবস্থান ছিল মার্ভ ও বর্তমান আশখাবাদের অন্তর্গত পর্বতে পাদদেশে।

মরুপ্রান্তরের মাঝখান দিয়ে ষোল দিন ব্যাপী দুরূহ যাত্রার সময় তারা বিশ্বস্তভাবে, মুখ বুজে বর্ষীয়সী শাহ জননীর হুকুম তামিল করে।

কিন্তু কারাভান ইয়াজের সীমান্তের কাছাকাছি আসতে মরুপ্রান্তরের অপর প্রান্তে শৈলশৃঙ্গ দেখা দিতেই তুর্কান খাতুন ওমর খানের প্রাণনাশের সুযোগ খুঁজতে লাগল। এক সময় ওমর খান ঘুমিয়ে পড়লে তুর্কান খাতুন তার মাথা কেটে ফেলার হুকুম দিল।

তুর্কান খাতুন কারাভান নিয়ে চলল এক নিঃসঙ্গ শৈলশৃঙ্গের দিকে — যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল দুর্ভেদ্য ইলাল কেল্লা। শাহ মুহম্মদের সন্ধানরত মোঙ্গল সেনাদের অগ্রবর্তী দল ধারে কাছে না আসা পর্যন্ত তুর্কান খাতুন তার সভাসদবর্গ নিয়ে এখানে বসবাস করতে লাগল।

শাহ জননীর রক্ষী সেনাদলের জনৈক নেতা তাকে অবিলম্বে সেখান থেকে পলায়ন করে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ইরানে সৈন্য সমাবেশে রত তার পৌত্র জালাল উদ-দিনের আশ্রয়ে যেতে বলল। সকলের মুখেই তার পৌরুষ ও সেনাবলের কথা, সকলেই বলে সে দুশমনদের তাড়াতে পারবে।

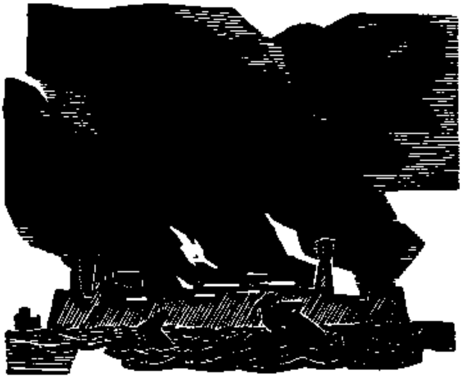
"কখনই নয়!" বৃদ্ধা ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জে উঠল। "মোঙ্গলের তলোয়ারের ঘায়ে জান যায় সেও ভালো! কী? আমি কি এতই নীচে নেমে গেছি যে জঘন্য তুর্কমেন মাগী আই জিজেকের ব্যাটার কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষে করতে যাব? আমার খানদানী কিপচাক রক্তসম্পর্কের নাতি থাকতে আমি কিনা তার আশ্রয়ে থাকতে যাব? বরং চেঙ্গিজ খানের বন্দী হয়ে অপমান ও কলঙ্কের বোঝা মাথা পেতে নেব।"

দেখতে দেখতে মোঙ্গলরা এসে কেল্লা অবরোধ করে ফেলল। পাহাড়ের চার দিকে তারা নিরেট বেড় দিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে অবরুদ্ধদের সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিল। চার মাস ধরে অবরোধ চলল, শেষকালে চৌবাচ্চা ও কুয়োর সঞ্চিত জল নিঃশেষে শুকিয়ে যেতে তুর্কান খাতুন আত্মসমর্পণ করবে বলে স্থির করল। শাহ জননীর সঙ্গে মোঙ্গলরা খরেজম শাহের গোটা হারেম ও তার অল্পবয়স্ক পুত্রদের ধরল। ছেলেদের সকলকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হল, শাহের বিবি ও মেয়েদের এবং তুর্কান খাতুনকেও চেঙ্গিজ খানের শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অনুচরবৃন্দ ও রক্ষিদলের কেউ প্রাণে বাঁচল না।

মোঙ্গল অধিপতি খরেজম শাহের দুহিতাদের অবিলম্বে নিজের

পুত্র ও অন্তরঙ্গদের মধ্যে বিলিয়ে দিল, আর খল স্বভাবের শাহ জননী তুর্কান খাতুনকে সে ধরে রাখল পান-ভোজের উৎসবে সকলের সামনে দেখানোর জন্য। তুর্কান খাতুনের কাজ ছিল তাঁবুর প্রবেশ দ্বারের প্রান্তে বসে করুণ সুরের গান শোনানো। চেঙ্গিজ খান চেটেপুটে খাওয়া হাড়গোড় তার দিকে ছুঁড়ে দিত।

একদা যে নিজেকে 'দুনিয়ার নারীসমাজের অধীশ্বরী' বলে জাহির করত খরেজমের হৃতগৌরবা সেই একচ্ছত্র কর্ত্রী তুর্কান খাতুনের এই হল পরিণতি।



দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশাল খরেজম সাম্রাজ্যের অবসান

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধং দেহি জালাল উদ-দিন

বীজ না ছড়াও যদি হবে না ফলন;
জীবনের ঝুঁকি বিনা
কে কোথায় করে বল অরিকে দমন?
(সাদী)

খরেজম শাহের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর সত্তর জন অশ্বারোহী নিয়ে জালাল উদ-দিন ও তার দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উজলাহ শাহ ও আক শাহ মানগিশ্লাকে এসে পৌঁছাল। স্থানীয় যাযাবর অধিবাসীরা তাদের নতুন ঘোড়া দিল। তাতে চড়ে শাহজাদারা কারা-কুম পার হয়ে খরেজমের রাজধানী গুরগঞ্জে এসে হাজির হল।

সেখানে তারা গণ্যমান্য বেগদের জানাল যে খরেজম শাহ মুহম্মদ

তার অছিয়ৎনামা বদল করে তখ্তের ওয়ারিশ করেছে সুলতান জালা
উদ-দিনকে। প্রাক্তন ওয়ারিশ উজলাহ্ শাহ এর সত্যতা স্বীকার করলে
কিপচাক বেগেরা কিপচাক রক্তবহির্ভূত সুলতানকে মনে প্রাণে মে
নিতে পারল না। জালাল উদ-দিনকে হত্যা করার জন্য তারা গোপন ষড়যন্
লিপ্ত হল।

কলিফ থেকে আগত ইনান্চ খান জালাল উদ-দিনকে ষড়যন্ত্র সম্পর্
সতর্ক থাকতে বলল।

"বিপদের মুখেও যেখানে একতা নেই সেই বিষাক্ত মাকড়সা
কাঁকড়াবিছেদের শহরে থেকে আমার কী করার আছে!" জালাল উদ-দি
বলল।

রাতে তিমুর মালিক ও তিনশ' তুর্কমেনের সঙ্গে সে সবার অলক্ষে
গুরগঞ্জ পরিত্যাগ করে কারা-কুমের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ দিকে যা
করল।

. ক্ষুদ্র দলটি অল্প কয়েক দিনে এমন দুর্গম পথ অতিক্রম করল
পথে যেতে কারভানকে অন্তত ষোল বার রাত্রিবাসের আয়োজন করতে হয়
অবশেষে তারা নাসা নগরে উপস্থিত হল। আগে ভাগে যে জাসুসী পাঠানে
হয়েছিল সে খবর নিয়ে এলো যে কোপেৎ-দাগ পর্বতশ্রেণীর পাদদে
সবুজ তৃণভূমিতে কাদের যেন ছাউনি দেখা যাচ্ছে, আর পাশেই খুঁ
বাঁধা অবস্থায় চরে বেড়াচ্ছে অদ্ভুত জাতের ঘোড়ার পাল। এরা মোঙ্গল বলে
মনে হয়, সংখ্যায় সাতশ'র কম নয়।

তিমুর মালিক বলল:

"কঠিন পথ চলে চলে আমাদের ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঠিকই
তবে মোঙ্গলদের শিবির ভেদ করার মতো শক্তি ওদের আছে। দুশমনদে
ধ্বংস করার মতো যথেষ্ট কৌশল অবশ্য থাকা চাই।"

"সাফল্য সাহসীকে অনুসরণ করে!" জালাল উদ-দিন উত্তর দিল

জালাল উদ-দিনের তুর্কমেন সেনাদল মরুভূমির বালি ফুঁড়ে অতর্কিতে
বেরিয়ে এসে ক্রোধে মরিয়া হয়ে মোঙ্গল শিবিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল
তুমুল সংঘর্ষ হল। দু' পক্ষই জীবনের পরোয়া না করে অস্ত্র চালাতে
লাগল। মোঙ্গলরা শেষকালে আর টিকতে না পেরে বিশৃঙ্খল অবস্থায়
ছুটতে ছুটতে সুড়ঙ্গ কাটা নালা-নর্দমার মধ্যে আশ্রয় নিতে শুরু করল
কেবল কিছু সংখ্যক প্রাণ নিয়ে পালাতে সমর্থ হল।

এটা ছিল প্রথম সম্মর্ষ যাতে তুর্কমেনরা মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হল। এর আগে পর্যন্ত মোঙ্গলরা সকলের মনে এমন আতঙ্ক সঞ্চার করেছিল যে লোকে ভাবত তারা বুঝি অপরাজেয়।

জালাল উদ-দিন বলল:

"খোলা মাঠে শিবিরে না থেকে মোঙ্গলরা যদি নাসার কেল্লার আড়ালে থাকত তাহলে আমাদের অবসন্ন ঘোড়া নিয়ে আর বেরিয়ে যেতে হত না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের ঘোড়াগুলো পাকড়াও করে জিন লাগাও! আমাদের এখনও অনেক দূর যেতে হবে।"

অশ্বারোহীরা সকলে চট্পট্ ঘোড়া বদল করে মোঙ্গলদের চাঙ্গা ঘোড়াগুলোর পিঠে উঠে বসল, পাহাড়ী পায়ে-চলা-পথ ধরে তারা দক্ষিণে নিশাপুর শহরের দিকে যাত্রা করল।

কয়েক দিন বাদে, কিপচাক খানেরা বেইমানী করতে পারে এই আশঙ্কায় খরেজম শাহের অপর দুই পুত্র উজলাহ্ শাহ ও আক শাহ গুরগঞ্জ থেকে নাসায় এসে পেঁছাল। তাদের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক অনুচর ছিল। অলক্ষ্যে মোঙ্গল টহলদার বাহিনীর পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে ধ্বংস হল।

ইতিমধ্যে জালাল উদ-দিন কোথাও না থেমে নিশাপুর, জুজেন ও হেরাত জেলা হয়ে আরও এগিয়ে চলল। এক পাহাড়ী কেল্লার সেনাপতি প্রাচীন প্রাকারের দুর্ভেদ্যতার ওপর ভরসা করে তাকে সেখানে অবস্থান করতে বলল। জালাল উদ-দিন জবাব দিল:

"সেনানায়কের কাজ খোলা মাঠে, চার দেয়ালের মাঝখানে আটকে থাকা নয়। কেল্লা যতই মজবুত হোক না কেন মোঙ্গলরা তা দখল করার উপায় বার করবেই।"

বুস্তে পেঁছাতে না পেঁছাতে খরেজম শাহের ছড়ানো-ছিটানো ফৌজ একত্রিত করে জালাল উদ-দিন উল্লেখযোগ্য সেনাদল গড়ে ফেলল। এখানে সে আমিন অল মুল্কের সেনাদলের সঙ্গে সামিল হল, কান্দাহারে অবরোধকারী মোঙ্গল সেনাদলকে বিতাড়ন করে উপস্থিত হল গজ্নীতে। একদা খরেজম শাহ্ জালাল উদ-দিনের জন্য যে রাজ্য নির্দেশ করে গজ্না ছিল তার প্রধান শহর। সেখানে স্থানীয় সমস্ত বেগ হলফ করে জালাল উদ-দিনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল।

জালাল উদ-দিনের হাতে এখন হাজার তিরিশেক তুর্কমেন সৈন্য।

আফগান, কারলুকে এবং অন্যান্য গোষ্ঠী থেকেও ঐ একই পরিমাণ সেনা তার সঙ্গে যোগ দিল।

ষাট হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহীর এই বাহিনী নিয়ে জালাল উদ-দিন মোঙ্গলদের মুখোমুখি হওয়ার তোড়জোড় করতে লাগল, কাবুল নদীতে পতিত লোগারের উৎসস্থানে পেরভান নামে এক ছোট শহরের পাশে সে শিবির ফেলল।

সেখান থেকে তোখারিস্তানের ওপর হানা দিয়ে ভারিয়ান কেল্লা অবরোধকারী মুকাজেকের মোঙ্গল সেনাদল ছত্রভঙ্গ করে দিল। সেখানে হাজার জন পর্যন্ত মোঙ্গলের প্রাণহানি ঘটল, তারা নিজেদের যাত্রাপথের পশ্চাতে সেতু ধ্বংস করতে করতে পিয়ান্দাশির নদী পার হয়ে চেঙ্গিজ খানের কাছে ফিরে এলো।

জালাল উদ-দিন দূত মারফৎ চেঙ্গিজ খানের কাছে এক সংক্ষিপ্ত পত্র পাঠাল:

"লড়াইয়ের জন্য আমরা সামনাসামনি হতে পারি এমন একটা জায়গা ঠিক কর। সেখানে আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব।"

চেঙ্গিজ খান পত্রের কোন জবাব দিল না, তবে মুকাজেকের সেনাদলের পরাজয়ে এবং জালাল উদ-দিনের সাহসিকতায় সে উদ্বিগ্ন হল। সে তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শিকি খুতুখু নোইয়নের সেনাপতিত্বে জালাল উদ-দিনের বিরুদ্ধে চাল্লিশ হাজার অশ্বারোহী পাঠাল।

জালাল উদ-দিন সাহসের সঙ্গে মোঙ্গলদের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে গেল। পেরভান থেকে এক ফারসাখ* দূরে এক উপত্যকায় সংঘর্ষ বাধল। যুদ্ধের শুরুতে জালাল উদ-দিন তার বাহিনীকে এই মর্মে আদেশ দিল:

"বাহাদুর জওয়ানেরা, ঢাকের আওয়াজ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের ঘোড়ার শক্তি ক্ষয় করো না। আওয়াজ হলেই জিনে চেপে বসবে। তার আগে পর্যন্ত ঘোড়ার লাগাম নিজেদের কষির পেছনে বেঁধে পায়ে হেঁটে লড়াই করে যাও।"

দু' দিন ধরে লড়াই চলল। মোঙ্গল সেনারা ক্লান্ত ও নিস্তেজ হয়ে পড়ছে অথচ বিরুদ্ধ পক্ষকে হটাতে পারছে না দেখে শিকি খুতুখু নোইয়ন

---

* ফারসাখ —৭ কিলোমিটার।

ছলনার আশ্রয় নিল। সে কম্বল দিয়ে পুতুল তৈরি করে বাড়তি ঘোড়াগুলোতে বসানোর আদেশ দিল। শুরুতে এই চালাকিতে কাজ হল, মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ইতস্তত ভাব দেখা দিল, কিন্তু জালাল উদ-দিন তাদের উৎসাহ দিতে তারা আবার পুরোদমে যুদ্ধে মেতে উঠল।

অবশেষে জালাল উদ-দিন ঢাক বাজানোর আদেশ দিল। সকলে ঘোড়ায় চড়ে বসতে লাগল। জালাল উদ-দিন তার অশ্বারোহীদের নিয়ে আক্রমণে নামল। নিজে মোঙ্গল বাহিনীর মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাহিনীকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলল। মোঙ্গলরা তখন 'অশ্বের খুরে খুরে স্ফুলিঙ্গ তুলে' পলায়নে প্রবৃত্ত হল। জালাল উদ-দিনের বাহিনীর ঘোড়াগুলো পরিশ্রান্ত না থাকায় তার অশ্বারোহীরা অনায়াসেই পলায়নরত শত্রুদের নাগাল ধরে তাদের হত্যা করতে লাগল। বিধ্বস্ত বাহিনীর নগণ্য অবশিষ্টাংশমাত্র নিয়ে শিকি খুতুখু নোইয়ন চেঙ্গিজ খানের শিবিরে ফিরে এলো।

পেরভানের যুদ্ধ এবং অপরাজেয় মোঙ্গলদের বিধ্বস্ত করার কীর্তিকাহিনী পর্বতশ্রেণী ও উপত্যকাভূমির ওপারেও ছড়িয়ে পড়ল। বাল্‌খ কেল্লা অবরোধকারী মোঙ্গল সেনাদল অবিলম্বে অবরোধ তুলে নিয়ে উত্তরের দিকে পলায়ন করল। মোঙ্গলদের অধিকৃত কোন কোন শহরে অধিবাসীরা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মোঙ্গল রক্ষী সৈন্যদের হত্যা করল। চেঙ্গিজ খান তখন তার স্বভাবসিদ্ধ কৌশল অবলম্বন করল: জালাল উদ-দিনের জোটভুক্ত খানদের কাছে গুপ্তচর মারফৎ সে বলে পাঠাল যে তারা যদি জঙ্গী সুলতানকে পরিত্যাগ করে তাহলে তাদের সোনাদানা বোঝাই উট দেওয়া হবে।

দেখতে দেখতে লুটের মালের বখরা নিয়ে জালাল উদ-দিনের শিবিরে কারণে-অকারণে ঝগড়া-বিবাদ বেধে গেল। আরবী ঘোড়া দখলের জন্য বাদানুবাদের সময় এক কিপচাক খান বড় এক সেনাদলের নেতা আগ্রাকের মাথায় কশাঘাত করল, জালাল উদ-দিন তাদের শান্ত করতে পারল না। এই ঘটনার পর আফগানদের নেতা মুজাফর মালিক, কারলুকদের নিয়ে আজিম মালিক এবং কেলজের সৈন্যদের নিয়ে আগ্রাক চেঙ্গিজ খানের শঠতায় বিশ্বাস করে এই অভিযোগ তুলে জালাল উদ-দিনের বাহিনী ছেড়ে চলে গেল

যে কিপচাকরা উদ্ধত প্রকৃতির ও অশিষ্ট — তারা অন্য জাতের সৈন্যদের গায়ে চাবুক মারার স্পর্ধা রাখে।

"এই তুর্কীগুলোই — মানে, কিপচাকরা — এর আগে মোঙ্গলদের ভয়ে জুজু হয়ে ছিল। ওরাই বলেছিল যে মোঙ্গলরা সাধারণ মানুষদের মতো নয়, তারা অপরাজেয়, কেন না তলোয়ারের ঘা তাদের আহত করতে পারে না। আর এই জন্যই নাকি মোঙ্গলরা দুনিয়ায় কাউকে ডরায় না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এমন কোন শক্তি নেই। আর এখন আমরা মোঙ্গলদের হারিয়ে দেওয়ার পর লোকে যখন দেখল যে আর দশ জন মানুষের মতো মোঙ্গল জাতের লোকেরাও আহত হতে পারে, তাদেরও খুন ঝরতে পারে তখন কিপচাকগুলো দেমাকে আত্মহারা হয়ে অপমান করতে শুরু করল আমাদের, যারা কিনা যুদ্ধে ওদের সাহায্য করেছে!.."

জালাল উদ-দিন কিছুই করতে পারল না। সে ওদের বৃথাই বোঝানোর চেষ্টা করল যে প্রতিটি দলের ওপর আলাদা আলাদা করে আক্রমণের সুযোগ পেলে বিরোধীদের ধ্বংস করা চেঙ্গিজ খানের পক্ষে সহজ হবে। তার বোঝানোয় কোন ফল হল না, অর্ধেক বাহিনী তাকে ছেড়ে চলে গেল। তার সঙ্গে রয়ে গেল কেবল আমিন অল মুল্‌কের তুর্কমেনরা।

শিকি খুতুখু নোইয়ন চেঙ্গিজ খানের কাছে ফিরে এসে পেরভানের যুদ্ধের বিশদ বিবরণ দিলে চেঙ্গিজ খান তার স্বভাবসিদ্ধ অবিচল ও নির্বিকার ভাব বজায় রাখল। সে কেবল বলল:

"চিরটা কাল অন্যকে হারানো আর বিজয়ী হওয়া খুতুখুর অভ্যাস। এখন পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করার পর ও যুদ্ধের ব্যাপারে আরও সতর্ক ও অভিজ্ঞ হবে।"

তবে চেঙ্গিজ খান কাল বিলম্ব না করে যতদূর সম্ভব বিরাট বাহিনী সাজিয়ে বিপুল সেনাদল নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করল। অশ্বারোহীদের সে এমন তাড়া দিয়ে নিয়ে চলল যে পথে খাবার রান্না করার পর্যন্ত অবসর হল না। খান সোজা গজ্‌নীর পথ ধরল, ঘোড়ায় টানা মালগাড়ির রাস্তা শেষ হতে গোটা গাড়ির বোঝা বাতিল করে দিয়ে সে পায়ে-চলা-পথ ধরে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সিন্ধুনদের লড়াই

অশ্ব, তুমি অশ্ব নহ, সহোদর — কিংবা
আরও বড়।

(কিতাব ই কোরকুদ)

মিত্রজোট ভেঙ্গে যাওয়ার পর জালাল উদ-দিন আগে যেরকম চেয়েছিল এখন আর সেভাবে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে খোলা মাঠে নামতে পারল না। সে দক্ষিণের দিকে যাত্রা করল। পাহাড়ের চাপে দুই তীর সংকুচিত, জলোচ্ছ্বসিত ও খরস্রোতা সিন্ধুনদ তার গতিপথে বাধা সৃষ্টি করল। বাহিনীকে পার করানোর উদ্দেশ্যে সুলতান নৌকো ও ভেলার সাহায্য নিতে গেল, কিন্তু উত্তাল তরঙ্গ সবগুলো জলযানকেই উঁচু শিলাময় তীরে আছড়ে ফেলে দিল। অবশেষে আরও একটি নৌকা যোগাড় করা হলে জালাল উদ-দিন তার জননী আই জিজ্জেক, স্ত্রী এবং তাদের অন্যান্য সহগামিনীকে সেটাতে বসানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সেটাও আঘাতে পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে ভেঙ্গে যেতে মেয়েরা ফৌজের সঙ্গে তীরে রয়ে গেল।

এমন সময় এক চর ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে আসতে চেঁচিয়ে বলল: "মোঙ্গলরা এসে গেল বলে!" এই সময় রাতও তার কালো আবরণে সব কিছু ঢেকে দিল।

সুলতান জালাল উদ-দিন সিন্ধু পার হওয়ার চেষ্টা করছে জানতে পেরে চেঙ্গিজ খান তাকে ধরবে বলে ঠিক করল। সারা রাত বাহিনী চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর ভোরের দিকে শত্রুর সন্ধান পেল। মোঙ্গলরা তিন দিক থেকে সুলতানের বাহিনীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। বাঁকা ধনুকের মতো কয়েকটি অর্ধবৃত্তাকারে মোঙ্গলরা থেমে দাঁড়াল, আর সিন্ধুনদ হল তার ছিলার মতো।

সুলতানকে তীর থেকে ঠেলে কোণঠাসা করার জন্য চেঙ্গিজ খান উনের গুলিজা ও গুগুস গুলিজাকে তাদের সেনাদল দিয়ে পাঠাল, আর নিজের ফৌজকে হুকুম দিল: "সুলতানের গায়ে যেন তীর ছোঁড়া না হয়। আমার হুকুম, ওকে জ্যান্ত পাকড়াও কর।"

জালাল উদ-দিন ছিল সাতশ' বেপরোয়া অশ্বারোহী পরিবৃত মুসলমান বাহিনীর মাঝখানে। টিলার ওপর থেকে চেঙ্গিজ খানকে যুদ্ধ পরিচালনা করতে দেখে সুলতান তার অশ্বারোহী সিপাহীদের নিয়ে এমন ক্ষিপ্তভাবে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে মোঙ্গল অধিপতি পর্যন্ত কশাঘাতে অশ্বতাড়না করে পলায়নে প্রবৃত্ত হল।

তবে দূরদর্শী ও সতর্ক চেঙ্গিজ খান যুদ্ধের আগে অতর্কিত আক্রমণের জন্য দশ হাজার বাছাই সৈন্য লুকিয়ে রেখেছিল। তারা পাশ থেকে ছুটে এসে জালাল উদ-দিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাকে হটিয়ে দিয়ে ডান পাশে আমিন অল মুল্‌কের তুর্কমেন সেনাদলের দিকে ধেয়ে গেল। মোঙ্গলরা তার সেনাদের সারি ভেঙে দিয়ে বাহিনীর মাঝখানে তাদের হটিয়ে নিয়ে গেল, সেখানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে সকলে পশ্চাদপসরণ করতে লাগল।

এর পর মোঙ্গলরা বাঁ পাশও ভেঙে দিল। জালাল উদ-দিন তার অশ্বারোহী সিপাহীদের নিয়ে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেল, সে তার স্বভাবসুলভ স্থৈর্য হারিয়ে কোণঠাসা বাঘের মতো কখনও বাঁয়ে, কখনও বা ডান পাশে আঘাত হেনে চলল।

"সুলতানের গায়ে যেন তীর ছোঁড়া না হয়" — খানের এই নির্দেশ মোঙ্গলদের মনে ছিল। জালাল উদ-দিনের চার পাশের বেষ্টনী ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসতে লাগল। শত্রুদের সারি ভেদ করে বেরিয়ে আসার উদ্দেশ্যে সে মরিয়ার মতো লড়াই করে চলল। অবস্থা শোচনীয় বুঝতে পেরে সুলতান শিরস্ত্রাণ এবং অন্যান্য যুদ্ধসজ্জা ছেড়ে দিয়ে তরবারি মাত্র সম্বল করল, ঘোড়া বদল করে তার প্রিয় তুর্কমেন ঘোড়ায় উঠে বসল। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সে অশ্বপৃষ্ঠেই উঁচু পাহাড় থেকে উত্তাল সিন্ধুর কালো তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে খাড়া পারের ওপর উঠে জালাল উদ-দিন সেখান থেকে চেঙ্গিজ খানের উদ্দেশে তরবারি দেখিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চেঙ্গিজ খান রীতিমতো হতচকিত হয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল, জালাল উদ-দিনকে দেখিয়ে তার পুত্রদের উদ্দেশে বলল:

"বাপের চাই এমনি ব্যাটা!"*

---

* রশীদ উদ-দিন।

সুলতান নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেখে মোঙ্গলরা সাঁতরে তার পিছু নিতে গেল, কিন্তু চেঙ্গিজ খান নিষেধ করল।

তারা জালাল উদ-দিনের গোটা বাহিনী ধ্বংস করল। ইতিমধ্যে জালাল উদ-দিনের পত্নী ও জননী যাতে মোঙ্গলদের হাতে না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে সৈন্যরা তাদের নদীতে ফেলে দিল।

কেবল জালাল উদ-দিনের সপ্তমবর্ষীয় পুত্র জীবিত রইল, সে মোঙ্গলদের হাতে বন্দী হল। তাকে চেঙ্গিজ খানের সামনে হাজির করা হল। বালক পাশ ফিরে নির্ভীক ও ঘৃণামিশ্রিত তির্যক দৃষ্টিতে খানের দিকে তাকাল।

"আমাদের শত্রুদের বংশকে ঝাড়ে-মূলে উচ্ছেদ করতে হবে," চেঙ্গিজ খান বলল। "এ ধরনের সাহসী মুসলমানদের বংশধররা আমাদের নাতিদের হত্যা করবে। তাই এ ছেলেটার হৃৎপিণ্ড আমার শিকারী কুকুরকে খেতে দাও।"

খান-ই-খানানের সামনে নৈপুণ্যের পরিচয় দেওয়ার সুযোগে গর্বিত হয়ে মোঙ্গল জল্লাদের মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি ফুটে উঠল, সে আস্তিন গুটিয়ে বালকের দিকে এগিয়ে গেল। বালককে ধরে চিৎ করে ফেলে সে চক্ষের নিমিষে ছুরি দিয়ে মোঙ্গল কায়দায় তার বুক চিরে ফেলল; পাঁজরের নীচে হাত গলিয়ে দিয়ে ধূমায়মান ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডটি উপড়ে এনে চেঙ্গিজ খানের সামনে রাখল।

এক ধাড়ি বন্য বরাহের মতো চেঙ্গিজ খান 'হু-হু-হু' হুঙ্কার তুলল, ছাইরঙা ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে বিরসবদনে শিলাময় পাকদণ্ডী ধরে এগিয়ে চলল।

সিন্ধুনদের এই যুদ্ধের পর জালাল উদ-দিন বহু দেশ পরিভ্রমণ করে দুঃসাহসী সেনাদল গড়ে তুলে সাফল্যের সঙ্গে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তবে মোঙ্গলদের পরাজিত করার মতো বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া তার পক্ষে আর কখনই সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুহুরী হল হাজি রাহিম

যে সন্ধ্যায় মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ মোঙ্গল প্রহরীর তরবারির আঘাত থেকে হাজি রাহিমকে উদ্ধার করে তার চরণে ঠাঁই দিল তখন থেকে দরবেশ সর্বত্র তার অনুসরণ করতে থাকে আর দরবেশের পিছু পিছু ছায়ার মতো অনুসরণ করে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তুগান।

মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ মাভেরান্‌নগর জেলার নতুন শাসক চেঙ্গিজপুত্র জাগাতাই খানের প্রধান অমাত্য হল। স্বয়ং জাগাতাই শিকারে ও ভোজে বেশি করে মেতে থাকত, আর মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ তার হয়ে রাজস্ব আদায় করত, আতাবদের দখল করা মূল্যবান সামগ্রীর হিসাব রাখত, মঙ্গোলিয়ায় দলে দলে ক্রীতদাস পাঠাত, বেগদের পরিত্যক্ত ঘর-বাড়ি ও তালুকের তালিকা তৈরি করত, নতুন খাজনা ঘোষণা করে তা আদায়ের জন্য বিশেষ ধরনের তহসীলদারদের পাঠাত।

আগেকার বেগেরা আর নিজেদের তালুকে ফিরে আসবে না এবং জমির জন্য তারা চাষীদের কাছ থেকে কর আদায়ের কোন অধিকার পাবে না এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে চাষীদের যার যার জমিতে ফিরে এসে ফসল ও তুলোর চাষ করার জন্য আহ্বান জানাল।

কিন্তু এসব বলার উদ্দেশ্য হল পলায়নোদ্যত লোকজনকে সান্ত্বনা দেওয়া, ভীতসন্ত্রস্ত চাষীরা যাতে আবার যার যার জমিতে কাজ করতে আসে এবং কারাভানের ওপর ক্ষুধার্ত, ভবঘুরে দুর্বৃত্তদলের হামলা রোধ করা। পরে দেখা গেল এসব প্রতিশ্রুতি ধোঁপমাত্র — তুর্কমেন, তাজিক ও কিপচাক বেগদের জায়গায় মোঙ্গল রাজকুমার ও খানেরা ধীরে ধীরে ভূস্বামী হয়ে দাঁড়াল আর চাষীরা ফিরে এসে আগের মতোই নিজেদের প্রায় সমস্ত ফসল তাদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের খেতমজুর হয়ে কাজ করতে লাগল।

মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ হাজি রাহিমকে তার কাছারীর মুহুরীগিরির কাজ দিল। দরবেশ আপাতত মিঠে গজল রচনা স্থগিত রেখে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যার অন্ধকার পর্যন্ত অন্যান্য মুহুরীর সঙ্গে এক সারিতে বিস্তীর্ণ শতচ্ছিন্ন ফরাসে বসে উৎসাহের সঙ্গে কাজে মন দিল; হাঁটু মুড়ে

বসে সে সম্পত্তির হিসাব, তালিকা, হুকুমনামা এবং নানারকম জরুরী দলিলপত্র তৈরি করতে লাগল।

মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ দরবেশকে কোন বেতন দিত না, এক দিন তাকে এমনও বলল:

“বেতনে আপনার কাজ কী? ধনসম্পদের ধারে কাছে যার আনাগোনা তার হাতে কিছু না কিছু সোনার গুঁড়ো ত লাগেই।...”

“শায়ের দরবেশের হাতে কিন্তু লাগে না,” হাজি রহিম জবাব দিল। “আমার পুরনো আলখাল্লায় বহু বছর ঘুরে ঘুরে পথের ধুলো ছাড়া আর কিছুই জমে নি।”

একথা শোনার পর মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ তাকে নতুন রঙিন আলখাল্লা উপহার দিয়ে বলল দুনিয়ার পথে পথে অবিরাম ঘুরে দরবেশ যে ধুলোমাটি সংগ্রহ করেছে তাতে যেন কাজের দলিল-দস্তাবেজ মাটি না হয়ে যায়, আর দরবেশ যেন পবিত্র জুম্মাদিনের আগের দিন প্রত্যেক জুম্মারাতে ভোরবেলা তার কাছে এসে রুটি, জলখাবার ও স্নানের জন্য তিনটি করে রুপোর দিরহাম নিয়ে যায়।

হাজি রহিমের জায়গায় অন্য কেউ হলে নিজেকে পরম সুখী বলে মনে করত: সে মালিকের পরিত্যক্ত এক বাড়িতে থাকত, বাড়িটাকে যদৃচ্ছ ব্যবহার করতে পারত। কাছারী থেকে ফিরে এসে সে দেউড়ির সিঁড়িতে আঙুর খেতের সামনে বসে থাকত, দেখত পুরনো দ্রাক্ষালতা গুচ্ছে গুচ্ছে সোনালি আঙুরের ভারে নুয়ে পড়ছে — সারা বছরের জন্য বাড়ির বর্তমান মালিক নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। বাড়ির পাশে বেড়ে উঠেছে এক বিশাল ঝাঁকড়া গাছ, পাশের মসজিদে তার ছায়া পড়েছে আর সে ছায়া কাঠফাটা রোদের হাত থেকে দরবেশের ছোট্ট বাড়িটাকে আড়াল করে রেখেছে। এখানেই দ্রাক্ষালতায় জলসেচের জন্য খাল বয়ে চলেছে; স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় হাজি রহিম তার ছোট ভাই তুগানকে বীজগণিত ও আরবী বর্ণমালার পাঠ দিত।

কিন্তু হাজি রহিম ত আর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধানী নয়, সে ছিল অরুপরতনের সন্ধানী। তার হৃদয়ে অশান্তির তপ্ত অঙ্গার ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে। যে কাজ সে করছিল তার সঙ্গে সে আর নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। কাছারীতে রোজ শত শত অভিযোগকারী আসে, সচরাচর তাদের অভিযোগের বিষয় হল নিরীহ জনসাধারণের ওপর মোঙ্গলদের

উৎপীড়ন। গোটা দেশের শাসনভার নতুন বিজেতাদের হাতে, জনসাধারণের প্রতি আচরণে তারা মেষচর্মে ঢাকা নেকড়ে বিশেষ।

হাজি রহিম তখন মনে মনে বলল: "যথেষ্ট হয়েছে দরবেশ! স্বজাতির শত্রুর যে সেবা করে সে প্রশংসার বদলে অভিসম্পাত কুড়ায়।" হৃদয়ের এই জ্বালার কথা মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌কে খুলে বলবে ভেবে দরবেশ তার কাছে গেল।

মাহ্‌মুদকে সে পেল প্রাসাদের বিশাল বাগানে — সেখানে সে দ্রাক্ষালতার শুকনো ডালপালা ছাঁটছিল: এ ভাবেই মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌ সারা দিনের ঝামেলার পর অবসর কাটাত। দরবেশের বক্তব্য শোনার পর মাহ্‌মুদ বলল:

"আপন মাকে আপনি ক্ষতবিক্ষত ও ব্যথায় জর্জরিত অবস্থায় ফেলে পালাতে চান?"

"আমার জাতিকে যারা গোলাম বানিয়েছে তাদের সেবা করার প্রবৃত্তি আমার নেই।..."

"আমার জাতিকে যারা গোলাম বানিয়েছে আমিও ত তাদের সেবা করছি, তার মানে আপনি আমাকেও দুর্জন বলে মনে করেন? তাহলে আমার জবাব শুনুন। আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা চেঙ্গিজ খানের প্রধান অমাত্য হলেন চীন দেশের লোক ইয়েলিউ চু-ত্‌সাই। তিনি কোনরকম ভয়-ডর না করে চেঙ্গিজ খানের মুখের ওপর সব সময় সত্যি কথা বলেন। তিনি একা শহরকে শহরের ওপর মিছিমিছি হত্যাকাণ্ড চালানোর হাত থেকে খানকে নিবৃত্ত করেন, তিনি বুঝিয়ে বলেন: 'সব লোকজনকে যদি মেরেই ফেলেন তাহলে আপনাকে আর আপনার নাতিদের খাজনা দেবে কে?' তাঁর এই কথার পর চেঙ্গিজ খান লক্ষ লক্ষ বন্দীকে দয়া করেন।... চেঙ্গিজ খানের ছেলে জাগাতাই খানের পাশে পাশে থেকে আমিও সেই একই কাজ করার চেষ্টা করি, চেষ্টা করি সমূলে ধ্বংসের কবল থেকে আমাদের মুসলমান জাতকে বাঁচাতে। জাগাতাইয়ের চেহারা আপনি দেখেছেন? দেখেছেন কি রোষে ফেটে পড়া তার উন্মত্ত চোখ জোড়া? প্রতিদিন দরবারে এসে সে কারও না কারও দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে উচ্চারণ করে: 'আলিব বারিন!' — হটাও! আর এই ভয়ঙ্কর শব্দ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেচারি লোকটাকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার জন্য ধরে নিয়ে

যাওয়া হয়। আমি প্রতি দিন তার কাছ থেকে দয়া ও অনুগ্রহ আদায়ের চেষ্টা করি।"

"আমি আমার জন্মভূমিতেই থাকছি," হাজি রহিম উত্তর দিল। 'কেবল আমাকে অন্য কোন কাজ দিন: রক্ত মাখা পোশাক-পরিচ্ছদের হিসাব লেখা আর মানুষের চোখের জল দেখার মতো শক্তি আর আমার নেই।"

"ঠিক আছে, আমি আপনার ওপর একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেব।"

"বলুন, কর্তা।"

"আমি শুনেছি যে উত্তর ও পশ্চিমের দেশগুলোর একচ্ছত্র অধিপতি, চেঙ্গিজ খানের বড় ছেলে জুচি খান খরেজমের উত্তর অংশ তার ভাগে পেয়ে সে জায়গা দখল করার জন্য এগিয়ে চলছে।"

"আমি কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে গুরেগঞ্জের কামারে আর তামা কারিগররা বুখারা ও সমরখন্দের লোকজনের মতো বিনা যুদ্ধে তাদের শহর তুলে দেবে না।"

"জুচি খানের কাছে আমি একটা চিঠি পাঠাতে চাই, কিন্তু পথে, কিজিল-কুমের মরুপ্রান্তরে এমন সব বাহিনীর উপদ্রব দেখা দিয়েছে যারা মোঙ্গলদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের ধ্বংস করছে। লোকে বলে তাদের দলপতি হল এক অদ্ভুত 'কালো ঘোড়ার সওয়ার' — তার নাম কারা বুরগুত। সে নাকি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কিজিল-কুমের নানা জায়গায় হঠাৎ হঠাৎ তার দেখা পাওয়া যায়, অবিশ্বাস্য তার গতি আর হঠাৎই সে বেমালুম উধাও হয়ে যায়। গুজব এই যে স্বয়ং শয়তান তাকে সাহায্য করে।"

হাজি রহিম বলল, "এই 'কালো ঘোড়ার সওয়ার' থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে মুসলমানদের মধ্যে এখনও বীরপুরুষ আছে।"

"আমি আপনার হাত দিয়ে স্বয়ং জুচি খানের কাছে চিঠি পাঠাব। চিঠিটাকে আপনি এমনভাবে লুকিয়ে নিয়ে যাবেন যাতে মোঙ্গল পাহারাদার বা 'কালো ঘোড়ার সওয়ার' — কারও হাতেই যেন না পড়ে অন্যথায় আপনার আমার দু'জনেরই সর্বনাশ হবে।"

হাজি রহিম চোখের দৃষ্টি নামাল। "এমন কী চিঠি, যা প্রেরকের সর্বনাশ ঘটাতে পারে?" সে চোখ তুলে তাকাল। সূর্যাস্তের সোনালি আকাশের পটভূমিকায় দ্রাক্ষালতার পাতা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে। মাহ্মুদ ইয়ালভাচ্ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, তার দৃষ্টি যেন দরবেশের ভাবনাকে

বিদ্ধ করছে। সে সময়ের ছোঁয়াচে ঈষৎ রূপোলি তার শ্মশ্রুরাজিতে হাত বুলাল, তার ওষ্ঠদেশে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

“আমি জুচি খানের কাছে চিঠি পেঁাছে দেব,” হাজি রহিম বলল, “চিঠি কারও হাতে পড়বে না। আমি আমার লাঠির ভেতর গর্ত করে চিঠিটা সেখানে পুরে মোম দিয়ে বন্ধ করে দেব। কিন্তু খানের কাছে পেঁাছান সম্ভব হবে কি? সে এখন যুদ্ধ করছে কিপচাক স্তেপে, যেখানে চোর-বাটপারের দল শিকারের সন্ধানে ছুটে বেড়ায়, পথচারীকে দেখামাত্রই হত্যা করে। আমি হলাম বাগানের রাস্তার ওপর আপনার পায়ের সামনে এই যে ক্ষুদ্র পতঙ্গটি ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার মতো। আপনার শক্তিমান হাতের প্রতিরক্ষা থেকে বেরিয়ে আসার পর আমার অবস্থাটা কী হবে? ‘কালো ঘোড়ার সওয়ারকে’ আমি ডরাই না, কিন্তু প্রথম চৌকিতেই ত মোঙ্গল পাহারাদার আমাকে ধরে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে।’’

মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ নীচু হয়ে পথ থেকে লাল রঙের কাঁচপোকাটাকে তুলে নিয়ে নিজের অল্পপরিসর শুভ্র তালুর ওপর রাখল। কাঁচপোকা আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে পাখনা ছড়িয়ে উড়ে গেল।

“এই কাঁচপোকার মতোই আপনি এমন জায়গা ভেদ করে যেতে পারবেন যেখান দিয়ে হাজার যোদ্ধা গলতে পারবে না। ধার্মিক দরবেশের মতো আপনি ফের আপনার পুরনো আলখাল্লা গায়ে চড়াবেন, শান্তশিষ্ট গাধাটাকে সঙ্গে নেবেন, তার পিঠে কিতাবের বোঝা চাপাবেন। আর মোঙ্গল পাহারাদাররা যাতে আপনাকে না ধরে তার জন্য আমি আপনাকে বাজপাখি আঁকা সোনার মোহর দেব।”

“আমার ছোট ভাই তুগানের কী হবে?”

“ওকে আপনি শাগরেদ বলে সঙ্গে নেবেন। আর জুচি খানের শিবিরে আসার পর সে যুদ্ধবিদ্যা শিখবে। অভিজ্ঞ সেপাই হবে। আপনার যাত্রাপথ সুগম হোক!”

“নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, সব হবে।”

“যাত্রাপথ শেষ হলে আমার জন্য প্রার্থনা করবেন, আমি বুড়ো মানুষ, আপনার শুভার্থী।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

'কালো ঘোড়ার সওয়ার'

হাজি রহিম ও তুগান সন্ধ্যা নাগাদ পথ ধরল এবং যে সব চাষী বাজার থেকে শূন্য ঝুড়ি নিয়ে ফিরছিল তাদের দলে ভিড়ে গেল। একে একে সব সঙ্গীই এদিক-ওদিক যে যার পোড়া গাঁয়ের দিকে ফিরে গেল।

হাজি রহিম অভ্যাসমতো আরবী গান গেয়ে সমান তালে মাপা পদক্ষেপ ফেলে এগিয়ে চলল। তুগান ইতিমধ্যেই বেশ বড় হয়ে উঠেছে। নীল উষ্ণীষের আড়াল থেকে যুবসুলভ দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ বেরিয়ে এসে কাঁধের ওপর স্খলিত হয়ে পড়েছে। মুসাফিরের ঝুলি কাঁধে ফেলে দীর্ঘ যষ্টিতে ভর দিয়ে সে অবলীলাক্রমে ছুটে ছুটে সামনের টিলাগুলোর মাথায় উঠছিল, দূর নীলিমার অন্তরালে বিলীয়মান পাহাড়ের সারি লক্ষ্য করছিল, চার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সব কিছু ভালো করে দেখার ও বোঝার চেষ্টা করছিল। তার জীবন এখন পরিপূর্ণ সুখের, গুরগঞ্জের অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে জিন্দানে কাটানোর পর এ জীবন তার কাছে বিশেষ করে আনন্দের বলে মনে হল।

কৃষ্ণকায় গর্দভ তার দীর্ঘ কর্ণ দু'টি দুলিয়ে শক্ত খুর ফেলে ফেলে মন্থর গতিতে পথ চলছিল। পিঠে বোঝাই করা বস্তায় ছিল আরবী ও ফারসী শায়েরদের রচনা সংবলিত পুঁথিপত্র এবং বেশ কিছু দিনের উপযোগী খাদ্যসামগ্রী।

কখনও কখনও দূরে ধূলিজাল দেখা যায়, তারপর গাছপালার আড়াল থেকে হাজির হয় কয়েক জন মোঙ্গল অশ্বারোহী — তাদের মাঝখানে থাকে গণ্যমান্য দলপতি দারোগা কিংবা তারা পাহারা দিয়ে চলে শস্যের বস্তা বোঝাই মন্থরগতি উটের সারি। মোঙ্গলদের মধ্যে একজন দল থেকে বেরিয়ে হাজি রহিমের দিকে ছুটে আসতে হাঁক দেয়:

"কে তুই? কোথায় চলেছিস?"

হাজি রহিম বিনা বাক্যব্যয়ে টুপিটা মাথার পেছন দিকে সরিয়ে দেয়, তার ললাটদেশে সরু বন্ধনীর সঙ্গে লটকানো উড়ন্ত বাজপাখি আঁকা সোনার ফলক দেখা মাত্রই মোঙ্গল ধীরে ধীরে হাতের চাবুক নামিয়ে "বাইয়ার্তাই! উরাগশ!" — "বিদায়! এগিয়ে চল!" — এই কথা চেঁচিয়ে বলে অকস্মাৎ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে নিজের দলের নাগাল ধরতে যায়।

দরবেশ তার চোঙ্গা টুপিটা কপালের ওপর নামিয়ে আনে, আবার পথ চলে, চলতে চলতে নতুন গান ধরে:

চিকন কালা বকির আমার গানের তালে ফেল চরণ,
চলরে ভ্রমি সেথায় যেথা যেতেও পারে প্রাণটা তোর।
শধ্যাতে হয় কত লোকের জীবনলীলা সংবরণ,
ভীরুর কাছেই মরুর বালি ঠেকবে বড় ভয়ঙ্কর...

একটা জনশূন্য জায়গায় টিলার আড়াল থেকে আচমকা চার জন অশ্বারোহী বেরিয়ে এসে পথের আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল।

''দাঁড়াও!'' তাদের মধ্য থেকে এক প্রবীণ চেঁচিয়ে বলল। লোকটার রোদে পোড়া মিশমিশে কালো মুখে গভীর বলিরেখা। "তোমার নাম কী?" সে জিজ্ঞেস করল।

"তোমার সুখ, সমৃদ্ধি ও কুশল কামনা করি!" দরবেশ উত্তর দিল। "আমার নামে তোমার কাজ কী?"

• "আমি তোকে চিনতে পেরেছি! আমার কাছ থেকে পালাবি ভেবেছিস! তুই ছিলি সেই মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচের মুহুরী, যে মান-সম্মান খুইয়ে মোঙ্গলদের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। তুই তাকে লোকজনের ওপর লুঠতরাজে সাহায্য করেছিস, তার প্রতিদানে এখন আমার তলোয়ারের ধার টের পাবি।"

"তোমার কথায় দু' ফোঁটা নির্মল সত্য আছে, বাদবাকি সমস্তটাই হল ডাহা মিথ্যের ঘোলা স্রোত।"

"মিথ্যে মানে?" প্রবীণ ক্রোধে চেঁচিয়ে উঠে খাপ থেকে বাঁকা তরবারি টেনে বার করল।

"এটা ঠিক যে আমি মুসলমান মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচের মুহুরী ছিলাম, এটা ঠিক যে আমার মরণ হওয়া উচিত, আর তা হবেও — কে-ই বা তাকে এড়াতে পারে? কিন্তু আমি কখনই কারও ওপর লুটতরাজ করি নি, আমি কেবল লম্বা পাকানো কাগজের ওপর মোঙ্গলদের লুঠ করা জিনিসপত্রের ফর্দ করে রাখতাম, আর ক্ষতিগ্রস্ত যে সব লোকে অভিযোগ নিয়ে এবং তাদের পক্ষ সমর্থনের আর্জি নিয়ে মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচের কাছে আসত তাদের সকলের দরখাস্ত লিখতাম।"

প্রবীণ তারস্বরে বলে চলল:

"ওরে দরবেশ, এই খানে, এই দণ্ডে তাজসুদ্ধ মাথাটা দেওয়ার সাধ

যদি তোর না থাকে তাহলে পালানোর কোন রকম মতলব না করে এক্ষুনি আমার পিছু পিছু চল।"

"যারা আমাকে ডাকে আমি সব সময়ই তাদের কাছে যাই," দরবেশ বিচলিত না হয়ে বলল। "তুমি কিন্তু তোমার নামটা বললে না। ধ্বংসের অতল গহ্বরে তুমি যদি আমাদের নেহাৎই ফেলে দাও তাহলে কার বিরুদ্ধে আল্লাহের কাছে নালিশ জানাব?"

"আল্লাহ তোর বিচার করার আগে 'কালো ঘোড়ার সওয়ারের' তলোয়ার তোর বিচার করবে," অশ্বারোহীদের একজন উত্তর দিল। "আমাদের সর্দারের সঙ্গে আর তোকে ঠাট্টা-মস্করা করতে হচ্ছে না।"

অশ্বারোহীরা পথ থেকে বাঁক নিয়ে সোজা উত্তরের দিকে আতপ্ত হলুদে মরুপ্রদেশের আরও গভীরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বিরল রুক্ষ ঘাস, কোথাও কোথাও ঝিরঝিরে ঝাউ গাছের ঝোপঝাড়, দ্রুত ধাবমান গিরগিটির দল জায়গাটাকে কেমন যেন ম্লান ও হতশ্রী করে তুলেছে। তুগান ফিস্‌ফিস্ করে হাজি রহিমকে বলল:

"আমরা কি সত্যিই মরতে চলেছি? এই উটকো কাজ নেওয়ার কী দরকার ছিল? সমরখন্দে আমরা কী নির্ঝঞ্ঝাটে আর সুখেই না ছিলাম!"

"আগে থাকতে গজগজ করে কাজ নেই," দরবেশ উত্তর দিল। "আজকের দিন এখনও শেষ হয় নি, আর ভবিষ্যৎ? — সেখানে যে কত আকস্মিকতা আছে কে জানে?"

মুসাফিররা ক্রমাগত উত্তরের দিকে চলল। অবশেষে দু'টি অদৃশ্যপ্রায় পায়ে-চলা-পথের সংযোগস্থলে এসে অশ্বারোহীরা থামল। অশ্বারোহীদের একজন একটা টিলার ওপর উঠে গিয়ে অনেকক্ষণ চার দিক নিরীক্ষণ করে দেখল, অবশেষে পশ্চিম দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল:

"জলদি, জলদি ঐ দিকে! সূর্য অস্ত যাচ্ছে।"

ইতিমধ্যে পুরো অন্ধকার যখন হয়ে এসেছে তখন অন্যান্যদের সঙ্গে হাজি রহিমও আরক্তিম অগ্নিশিখার দিকে এগিয়ে চলল। তারা চলেছে একটা শুকনো খাতের ভেতর দিয়ে। দরবেশ ও তুগানের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, বন্দীরা যাতে অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দেওয়ার মতলব না আঁটে তার জন্য গলায় দড়ির ফাঁস বাঁধা আছে। যে প্রবীণ লোকটি তাদের

ধরে নিয়ে আসছিল সে দু' জনকেই আগুনের একেবারে সামনে নিয়ে এসে নতজানু হওয়ার হুকুম দিল। গাধাটিকে তাদের পাশে রাখা হল।

আগুনের পাশে ছোট আসনের ওপর পা মুড়ে বসে ছিল রোগাটে, বিষণ্ণ চেহারার এক তুর্কমেন। তার রোদে পোড়া তামাটে মুখের ওপর উজ্জ্বল গোল গোল চোখ জোড়া তীব্র হয়ে জেগে আছে। আসনের ওপর পাশেই আছে ঋজু খঞ্জর।

"এই গর্বিত বীরপুরুষকে কোথায় দেখেছি?" তুর্কমেনকে নিরীক্ষণ করতে করতে হাজি রহিম ভাবল। "এই লোকটাই যে 'কালো ঘোড়ার সওয়ার' তাতে কোন সন্দেহ নেই।..."

তার গায়ে কালো চাপকান, মাথায় কালো টুপি — পেছন দিকে হেলানো; অদূরেই বাঁধা ছিল এক দীর্ঘকায় কালো মিশমিশে ঘোড়া। আগুনের চার ধারে অশ্বারোহীর বেশধারী জন বিশেক সৈনিক বসে ছিল, অদের গায়ে শতচ্ছিন্ন পোশাক অথচ সঙ্গে রূপোর অপূর্ব ঝকঝকে অস্ত্রশস্ত্র। বন্দীদের নিয়ে আসা হলে তাদের দিকে কেউ কেউ তাকাল তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে, কেউ বা হিংস্র দৃষ্টিতে।

জওয়ানদের একজন গাধার পিঠ থেকে কম্বলের থলি উঠিয়ে নিয়ে তা ঝাড়া দিয়ে ফেলল এক গোছা চাপাটি, কিসমিসের পুটলি, খরমুজা আর এক টুকরো পনীর। তারপর আটার বস্তাটি সন্তর্পণে নামিয়ে রাখল। কম্বলের তৈরি আরও একটা থলি ছিল, সেটা ঝাড়া দিতে পাওয়া গেল কলমদানী ও দোয়াত, গোটা কয়েক বই, পাকানো কাগজ ও অস্ত্রকারের যন্ত্রপাতি।

যে বীরপুরুষটির চোখ জোড়া গোল গোল সে একটি বই হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, কয়েক পাতা উল্‌টে বলল:

"এখানে বুঝি লেখা আছে হাদিস আর যত সব উপদেশ, লম্বা দাড়িওয়ালা মোটা মোটা ইমামের দল যেগুলো তাদের হাড্ডিসার, বুভুক্ষু চেলাদের মাথায় ঠাসে?"

"না হুজুর," হাজি রহিম উত্তর দিল। "এই কিতাবে আছে দিগ্বিজয়ী মহাবীর ইস্কান্দারের কথা!"

"এই বীর যোদ্ধার কথা শোনার আমার বড় ইচ্ছে ছিল! কিন্তু তোর আর সে সময় হবে না। এখুনি ইজরাইল তোর প্রাণটা ছিনিয়ে নেবে।"

যে প্রবীণ লোকটি হাজি রহিমকে নিয়ে আসে সে গাধাটাকে একটু

সরিয়ে দিয়ে ধীরে সুস্থে কোমরবন্ধনী থেকে একটা ছুরি বার করল — সেরকম ছুরি দিয়ে সচরাচর কসাইরা ভেড়া জবাই করে। লোকটা নির্মম হাতে দরবেশের থুতনি চেপে ধরল।

"হেই বুড়ো কর্তা, রসো, এখুনি কাটতে হবে না!" কে যেন চেঁচিয়ে বলল। "আমাদের সর্দার জানতে চান অন্য কিতাবগুলোতে কী লেখা আছে।"

দরবেশের ততক্ষণে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। সে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল:

"একটাতে আছে মরুভূমির নামজাদা শিকারী চিতা, কারাভানের আতঙ্ক কারা বুরগুতের কীর্তি কাহিনী।..."

"দাঁড়াও! ওকে ছাড় দেখি বুড়ো!.." এই বলে দলের সর্দার মনোযোগ দিয়ে বইটার পাতা ওল্টাতে লাগল, সৈন্যদলের লড়াইয়ের ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে চলল।

প্রবীণ তখন হাজি রহিমকে ধাক্কা মেরে পাশে সরিয়ে দিল, গালাগাল দিতে দিতে সরে দাঁড়াল।

হাজি রহিম উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাল, সে তাকাল মড় মড় শব্দে পরিপূর্ণ অগ্নিকুণ্ডের লাল শিখার দিকে, উপবিষ্ট লোকজনের কঠিন মুখাবয়ব এবং চতুর্দিকের মরুবালুকার দিকে, আর মনে মনে ভাবল: "বাঁচার আশাই বা কোথায়? আচ্ছা, আমার মতো ভবঘুরেকে না হয় দয়া না-ই করল, কিন্তু শাহের জিন্দানের অন্ধকার থেকে এই যে অস্ত্রকার ছেলেটি বেরিয়ে এসেছে অন্তত তার প্রতি ত এই যোদ্ধাদের অনুকম্পা হওয়া উচিত! তবে হ্যাঁ, খাদে পড়তে পড়তেও দরবেশকে হতাশ হলে চলবে না — বলা যায় না, উঁচিয়ে থাকা কোন পাথরের চাঁইয়ে তার আলখাল্লা জড়িয়ে যেতে পারে কিংবা উড়ন্ত ঈগলের ডানা ধরে সে বেঁচে যেতে পারে।..." এদিকে তুগান পাশে দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে:

"দেখতে পাচ্ছ না আমাদের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে?"

"দিন এখনও শেষ হয় নি," দরবেশ উত্তর দিল। "সামনে দীর্ঘ রজনী। কে আগে থাকতে বলতে পারে সে কী নিয়ে আসবে?"

'কালো ঘোড়ার সওয়ার' হলুদ চামড়া বাঁধানো বইটা নিজের সামনে আসনের ওপর রেখে বলল:

"শুকতারা উঠতে আর বিশেষ দেরি নেই। কাফেরদের এই গোলামটাকে সাজা দেওয়ার ব্যাপারে তেমন তাড়াহুড়ো না করলেও চলবে। আমরা বরং এই ভবঘুরের কথা শুনি, ও কোন সাহসী মহাবীরের কাহিনী আমাদের বলুক।"

তুগান ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল:

"এমন ভাবে নিজের মান-সম্মান খুইয়ে হাঁটু মুড়ে দাঁড়িয়ে ওদের গল্প শোনাবে নাকি? একটা কথাও বলো না। ওরা আমাদের এক্ষুনি মেরে ফেলুক তাও ভালো!"

"ধৈর্য ধর," হাজি রহিম উত্তর দিল। "রজনী দীর্ঘ, ভবিষ্যৎ অসাধারণ হয়ে দেখা দিতে পারে।..."

"বলুক, বলুক!" অনেকগুলো কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "দেখা গেছে কোন কোন পাখি ছাড়া অবস্থার থেকে খাঁচায় ভালো গায়।"

"তাহলে শোন," হাজি রহিম শুরু করল। "আমি তোমাদের জুলকার্ণাইন ইস্কান্দারের কথা বলব না, সোরাব ও রুস্তমের কাহিনীও বলব না, বলব স্তেপের দুর্ধর্ষ দস্যু কারা বুরগুত আর তুর্কমেন মেয়ে গুল জামালের কীর্তিকাহিনী।..."

গুল জামালের নাম শোনা মাত্র দলপতি দ্রুত দরবেশের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, বিস্ময়ে তার চোখ কপালে উঠল। সে ডান পাশে কাত হল, কনুইয়ে ভর দিয়ে গণ্ডদেশ করতলে রাখল। তার জ্বলন্ত কালো চোখ মেলে আগ্রহোদ্দীপক দৃষ্টিতে কথককে দেখতে লাগল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হাজি রহিমের কথন

> সে চপল চরণে আমার পাশ দিয়ে চলে
> যেতে তার আঁচল আমাকে ছুঁয়ে গেল।
>
> (প্রাচ্যদেশীয় রূপকথা থেকে)

হাজি রহিম সুরেলা গলায় বলতে শুরু করল:

"গুল জামাল ছিল তুর্কমেনিয়ার বিশাল মরুভূমির কোন এক রিক্ত গাঁয়ের এক গরিব রাখাল মেয়ে। গুল জামাল অনেক গান জানত।

"তার বিশেষ প্রিয় গান ছিল মেষশাবকদের জলের ধারে নিয়ে যাওয়ার গান। প্রশান্ত ও আনন্দমুখর অন্য একটি গানের বিষয় ছিল মেষশাবকেরা যেন শান্তভাবে চরে, তারা যেন দলছুট হয়ে দূরে চলে না যায়।

"কিন্তু একটা গান ছিল ভীতিজনক, বিষণ্ণ ও ছাড়াছাড়া সুরের সেই গানে পথহারাদের এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হত যে কাছেই আছে হিংস্র নেকড়ে। পাতলা ঝোপের ছায়ায় নিশ্চিন্ত তন্দ্রায় অভিভূত মেষশাবকের দল এই গান শোনা মাত্র উঠে পড়ে দ্রুত ছুটত টিলার দিকে, যেখানে গুল জামাল লম্বা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকত আর তিনটি প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া কুকুর পিছিয়ে পড়া মেষশাবকদের চার ধারে হাঁকডাক তুলে ছুটোছুটি করত, গোটা পালকে এক জায়গায় জড় করত।

"সবগুলো গানই গুল জামাল শেখে তার দাদু কোরকুদ চোবানের কাছে। কোরকুদ চোবান নিজেও বহু বছর রাখালের কাজ করে, দীর্ঘ বাঁশীতে গানের সুর বাজায়। সে বহু বছর বাঁচে, সারা জীবন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটায়, সারা গাঁয়ের রাখাল হিশেবে ভাড়া খাটে, পালা করে আজ এ ছাউনি কাল ও ছাউনি থেকে অন্ন সংস্থান করে, যদিও গ্রামের প্রান্তে নিজের দেহের মতোই জরাজীর্ণ নিজস্ব একটি ছাউনি তার ছিল।

"প্রথমে তার বৌ মারা গেল, তারপর স্বাধীন আফগান পাহাড়ীদের সঙ্গে খরেজম শাহের যুদ্ধে তার দুই ছেলে মারা যাওয়ার পর থেকে সে একা পড়ে গেল।

"মেয়ের বিয়ে সে দিয়েছিল দূরের এক যাযাবর আস্তানায়, এক দিন সে একরত্তি মেয়েকে কোলে নিয়ে বাপের কাছে চলে এলো, দিন কয়েক রোগে ভুগে বেচারি সেখানেই মারা গেল। যখন এসেছিল তখন তার মুখময় ছিল কালশিটে আর রক্তের দাগ। কী যে তার হয়েছিল তা কেউ জানত না, তবে বুড়ো কোরকুদ চোবান প্রশ্নের উত্তরে বলত:

'সবই আল্লার মর্জি! সব মেয়েরই ত আর ভালো স্বামী জোটে না!' এই বলে সে চওড়া আস্তিনে তার বলিরেখা আঁকা পোড়াটে মুখ ঢাকত।

"কোরকুদ চোবান খোঁড়া মেষকে যেভাবে পরিচর্যা করত প্রথম প্রথম সেইভাবে নাতনীকে আদর-যত্ন করতে লাগল। সে যখন ভেড়ার পাল নিয়ে স্তেপে ঘুরত তখন মেয়েটাকে চামড়ার ঝুলিতে করে পিঠে বয়ে নিয়ে বেড়াত, কখনও ঝুলিতে মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে ডাকতে ডাকতে চলত কোন রুগ্ন মেষশাবক।

"ধীরে ধীরে গুল জামাল বড় হতে লাগল, তারপর সে দাদুর পাশে পাশে ছুটে চলে। দাদু যখন বাঁশিতে সুর বাজায় সে তখন সরু গলায় গান ধরে, কুকুর সঙ্গে নিয়ে সে পিছিয়ে পড়া মেষশাবকদের অনুসরণ করে। গুল জামাল আরও একটু বড় হলে কোরকুদ হঠাৎ বলে বসল যে সে আর রাখালী করবে না, সে ঠিক করেছে এখন থেকে নিজের পুরনো ছাউনির কাছে কম্বলে শুয়ে শুয়ে আয়েস করবে আর তার বদলে মেষশাবক চরাতে যাবে তার নাতনী। ইতিমধ্যে এক রোঁয়া ওঠা গাধায় চেপে তার বড় বোন এসে হাজির, সে ভাইয়ের ছাউনিতে এসে তার সঙ্গে বাস করতে লাগল। গাঁয়ের সবাই বলাবলি করতে লাগল যে কোরকুদ স্তেপে শয়তানের দেখা পেয়েছে এবং নাতনীকে শয়তানের কাছে বৌ করে বেচে দিয়েছে। কেউ কেউ বলল দাদু নাকি পুরনো এক ঢিবির তলায় গুপ্তধন পেয়েছে, এই রকম আরও বহু গালগল্প তাকে নিয়ে চলল। তবে এটা ঠিকই যে কোরকুদ হঠাৎ এক তামার ডেকচির মালিক হয়ে বসেছে, তার ছাউনির ওপর সব সময় ধোঁয়া উঠতে দেখা যায় আর গরিব রাখাল অতিথিদের সে চা পানে আপ্যায়ন করে।

"অবশেষে বুড়োর পক্ষে এক জরুরী সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এলো — নাতনী বড় হয়েছে, তাকে এখন বিয়ে দিতে হয়। এমন মেয়ের জন্য মোহরানা হিশেবে সে সঙ্গে সঙ্গে পেতে পারে উট, ঘোড়া, গোরু, ভেড়া — কী চাই! তখন দাদু সম্পূর্ণ সচ্ছল হবে। সে কেবল কম্বলের ওপর শুয়ে শুয়ে খুশিমতো ঘোলের সরবত খাবে, দিনে আকাশে মেঘের খেলা আর রাতে তারার মেলা দেখবে। গোরু ভেড়ার দেখাশোনা করবে তার বোন, নাতনী আর জামাই।

"কোরকুদ কিন্তু নাতনীর বিয়ের ব্যাপারে কোন তাড়াহুড়ো করল না, গুল জামালের সম্বন্ধ নিয়ে যে সব ঘটক এলো বুড়ো তাদের কাছে উত্তরোত্তর মোহরানার দাম চড়াতে লাগল, ফলে এক কালের রাখাল এই বুড়োর লোভ দেখে বিস্মিত সব ঘটকই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। একজন পাণিপ্রার্থী কিন্তু ফিরে এসে আবার কথা তুলল। সে হল সকলের পরিচিত রাহাজান চিতা, কারাভানের সন্ত্রাস, দস্যু কারা বুরগুত — কালো ঈগল।

"কারা বুরগুতের কথা হল, 'যে মেয়েকে ভালোবেসেছি যৌতুকের জন্য তাকে নিয়ে দরাদরি করা শোভা পায় না।' তাই সে বুড়ো কোরকুদ

যা চায় তা-ই দিতে রাজি হল। প্রতিরাতেই দস্যু যখন আসে বুড়ো কিন্তু আর শেষ কথা বলে না, বলে ভেবে দেখবে।

"এদিকে শয়তানই বুঝি বুড়োকে নিয়ে তামাশা করল। বুড়ো তারার দিকে চেয়ে চেয়ে এত যে উট, ঘোড়া আর ভেড়া গুনল, সে সবই একচোটে হারাল। স্বয়ং খরেজম শাহের ঘোড়সওয়াররা গত বছরের, চলতি এবং আগামী বছরের খাজনা আদায় করার জন্য গাঁয়ে এলো। বহু ঘোড়া আর গোরু ভেড়ার দল ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা গুল জামালকেও এই বলে নিয়ে গেল যে সর্বশক্তিমান শাহকে প্রজারা সেরা সেরা সুন্দরী যোগান দিতে বাধ্য।

"মাঝরাতে দস্যু কারা বুরগুত ঘোড়া ছুটিয়ে কোরকুদ চোবানের ছাউনিতে এলো। সে সারা রাত আসনের ধারে বসে যে সব ঘোড়সওয়ার এসেছিল তাদের সম্পর্কে, তাদের দলপতি কে ছিল, ঘোড়াগুলো কেমন ছিল এবং ঘোড়ার জিন ও সাজসজ্জাই বা কেমন ছিল — সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করল। সে একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে বুড়োর কাছ থেকে কৌশলে সমস্ত সংবাদ টেনে বার করল, তারপর বলল:

'এখন আমি রাতের অন্ধকারেও ওদের সকলকে চিনতে পারব, একে একেই হোক বা এক সঙ্গেই হোক সব ক'টাকে দেখে নেব — খরেজম সাগরের তলে গা ঢাকা দিয়েও আমার হাত থেকে ওরা রেহাই পাবে না। আর গুল জামালকে খুঁজে বার করে তোমার কাছে এনে দেব, কোরকুদ দাদু। তারপর আমরা বড় করে উৎসব করব, গুল জামালকে বৌ করে আমার ঘরে তুলব। আমি তোমাকে উট, মাদী ঘোড়া, ঘোড়ার বাচ্চা, গোরু ও বাছুর আর নয়টা ভেড়া দেব বলে কথা দিয়েছিলাম, এখন তার নয় গুণ বেশি মোহরানা দিতে রাজি আছি; কেবল আমাকে ছাড়া অন্য কারও হাতে নাতনীকে দেওয়া চলবে না বলে রাখলাম!'

"বায়না হিশেবে বুড়োর কোলের ওপর এক থলি রুপোর দিরহাম ফেলে দিয়ে কারা বুরগুত লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠে রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল।..."

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিবরণদাতা হাজি রহিম বাকশক্তিরহিত হয়ে কাতরে উঠল, দুমড়ে বেঁকে গিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল।

"তারপর কী হল? দস্যু কি মেয়েটাকে খুঁজে পেল?" আগুনের চার পাশে উপবিষ্ট যোদ্ধারা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

"ওরে ব্বাপ্সে! সেই বাহাদ্দর দস্যু আর স্কুন্দরীর জীবনে কত কিছ্কুই না ঘটল!" গোঙাতে গোঙাতে হাজি রহিম উত্তর দিল। "কিন্তু আর কিছ্কু বলতে পারছি না: দড়ি আমার শরীরে কেটে বসেছে, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

"ওর বাঁধন খ্কুলে দাও!" 'কালো ঘোড়ার সওয়ার' হ্কুকুম দিল।

"আমার ছোট ভাইটির কাটাছেঁড়া হাতও খ্কুলে দিতে আজ্ঞা হোক!" এই বলে উপ্কুড় হয়ে হাজি রহিম চোখ বন্ধ করল।

প্রবীণ তুর্কমেন বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করতে করতে দ্কুই বন্দীরই হাতের বাঁধন খ্কুলে দিল। ওরা খানিকটা আয়েস করে বালির ওপর বসল, দরবেশ বলে চলল:

"ভোরবেলা স্তেপের ওপর দিয়ে যেতে যেতে খোদ বাদশাজাদা জালাল উদ-দিনের সঙ্গে কারা ব্কুরগ্কুতের দেখা হয়ে গেল। য্কুবক ব্কুনো ছাগলের পেছনে তাড়া করতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে, তার সঙ্গী-সাথীরা পিছিয়ে পড়ে। ক্লান্ত ঘোড়াকে লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে সে ক্ষ্কুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ে, এমন সময় তার চোখে পড়ল ব্কুড়ো কোরকুদ চোবানের ছাউনিটা। কোরকুদ তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল, তাকে বিশ্রাম করতে দিল, তাকে আর তার ঘোড়াকেও ভোজনে পরিতৃপ্ত করল। এমন সময় ঘটনাচক্রে কারা ব্কুরগ্কুতও সেখানে এসে হাজির। এই য্কুবক যে তার শত্কুর প্কুত্র সে রকম কোন সন্দেহ না করেই কারা ব্কুরগ্কুত অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। বিদায় নেওয়ার সময় শাহের তর্কুণ ওয়ারিশটি কারা ব্কুরগ্কুতকে তিল্লালায় নিজের পল্লীপ্রাসাদে আসার আমন্ত্রণ জানাল। দস্যু তখনই জানতে পারল যে এই য্কুবক হল ঘৃণ্য শাহের প্কুত্র। কিন্তু আতিথেয়তার নিয়ম অন্কুযায়ী অতিথিকে প্কুরো মর্যাদা দিতে হয়, তাই কারা ব্কুরগ্কুত তাকে অপমান না করে অবশ্যই য্কুবক খানের আতিথ্য গ্রহণ করবে বলে কথা দিল।

"শিগ্‌গিরই শাহজাদার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে কারা ব্কুরগ্কুত রাজধানীতে গেল। কিন্তু শাহজাদা তখন শাহের বিরাগভাজন — শাহের বিরক্তির কারণ হল শাহজাদার দোস্তী সাধারণ লোকজনের সঙ্গে, সে তার পল্লীপ্রাসাদে মর্কুভূমির যত রাজ্যের যাযাবর লোকজন, ভবঘ্কুরে দরবেশ আর দ্কুর দ্কুরে দেশের ম্কুসাফিরদের ডেকে আনত। প্কুত্র পিতার বির্কুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে এই ভয়ে শাহ তার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজর

রাখত। এই কারণে তার প্রাসাদ ও বাগানের চার ধারে প্রহরীর দল লুকিয়ে থেকে সমস্ত যাতায়াতকারীকে লক্ষ্য করত।

"কারা বুরগুত তিল্লালার প্রাসাদের এলে শাহজাদা তাকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা জানাল, ভূরিভোজে আপ্যায়ন করল, তার সম্মানে প্রাচীন যুদ্ধ সঙ্গীতের মাইফেল বসাল। রাতে কারা বুরগুত বিদায় নিতে গেলে খান তাকে সকাল পর্যন্ত থেকে যেতে বলল — বলল, তাহলে কারা বুরগুত যাতে নির্বিঘ্নে নগর সীমানায় পৌঁছুতে পারে তার জন্য সে রক্ষী দেবে।

" 'কারা বুরগুতকে স্পর্শ করে এমন হিম্মৎ কার?' দস্যু বলল। 'বিশ জন জওয়ান যদি আমাকে আক্রমণ করার মতলব আঁটে তাতেও আমার তলোয়ার ডরায় না।...' এই বলে বাগানের ফটক থেকে সে বেরিয়ে এলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মাছ ধরার জাল তার ওপর এসে পড়ল আর তাতে তার হাত জোড়া এমন ভাবে জড়িয়ে গেল যে সে তলোয়ার টেনে বার করারও সময় পেল না। ঘোড়সওয়াররা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাঁধা অবস্থায় বিচার ও শাস্তির ঘরে এনে ফেলল।

"রাতে জল্লাদদের সর্দার, 'উগ্রচণ্ড' জাহান পহলবান স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য কারা বুরগুতের দেহে জ্বলন্ত কয়লার ছেঁকা দিয়ে জেরা করতে লাগল কেন সে শাহজাদার বাগান বাড়িতে গিয়েছিল।

" 'আমি তাতার খানের ঘোড়ার পাল থেকে ভালো ভালো ঘোড়া চুরি করে এনে দেব বলে বেগকে কথা দিয়েছিলাম,' কারা বুরগুতের এক কথা।

"শেষকালে এই একরোখা বীরপুরুষের ওপর জেরা ও নির্যাতন করতে করতে হয়রান হয়ে গিয়ে জাহান পহলবান তাকে 'প্রতিহিংসার কারামিনারে' নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিল।

"কারা বুরগুতকে অন্ধকারের মধ্যে উঁচু মিনারের দিকে নিয়ে যাওয়া হল; জল্লাদরা তার চার ধারে ঘন বেড় দিয়ে চলছিল। এমন সময় কে যেন তাকে কানে কানে বলল: 'ডান দিকে হাত বাড়িয়ে লোহার আংটা আঁকড়ে ধরবে।' তখনই সে অনুভব করল অদৃশ্য বন্ধু শক্ত পাকে জড় করে বাঁধা তার হাত জোড়ার বাঁধন কেটে আলগা করে দিল। এখন যে সে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত এমন কোন আভাস না দিয়ে কারা বুরগুত বাঘের মতো বুরুজে উঁচু ঘোরানো সিঁড়ি বয়ে ওপরে উঠল। ওপরে মশালের আবছা আলোয় একটা ছোট দরজা খোলা হল। ঐ দরজা দিয়ে

ঠেলে ফেলে দেওয়ার সময় দস্যু সর্বশক্তিতে বাধা দিতে লাগল। মশাল অকস্মাৎ নিভে গেল। দস্যু দ্রুত একটা হাত ছাড়িয়ে নিল, সহজেই হাতড়ে ডান দিকে লোহার বড়সর আংটা পেল। কে যেন চেঁচিয়ে বলল: 'একটা কুত্তা কমল!' দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারা বুরুজের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঝুলতে লাগল, অনুভব করল পায়ের তলায় কোন অবলম্বন নেই।...

"কারা বুরুজে ঝুলতে ঝুলতে দড়ির বাঁধন থেকে বহু কষ্টে তার বাঁ হাত ছাড়িয়ে আনল, তখন দু' হাতে ধরে ঝুলতে খানিকটা সহজ হল। ভোর হয়ে আসতে পুরনো বুরুজের ফাটল ভেদ করে যখন সূর্যের প্রথম রশ্মিরেখা প্রবেশ করল তখন বীরপুরুষটি বুঝতে পারল যে সে ছাদের ঠিক নীচে ঝুলছে: পায়ের তলায় অতল গহবর, সেখান থেকে ভেসে আসছে ভাঙা ভাঙা আর্তনাদ। সেখানে ঘুরছে কালো কালো ছায়া, চোখে পড়ছে হাড়ের স্তূপ। গোপন বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য না এলে এভাবে আংটা আঁকড়ে ধরে আর বেশিক্ষণ ঝুলতে হবে না।"

"তারপর কী হল?'' হাজি রহিমকে আবার নীরব হয়ে উদাসীনভাবে আগুনের দিকে তাকাতে দেখে সকলে সমস্বরে জিজ্ঞেস করল। "কারা বুরুজে আর গুলে জামালের কী হল? শিগ্‌গির বল!"

"এই ছোট ছেলেটাকে কিছু জল আর রুটি দেবে কি? আমারও গলাটা ভেজানো দরকার, সকাল থেকে এক ঢোকও পেটে পড়ে নি।..."

"ওকে চাপাটি, শুকনো আঙুর, আর যা যা আমার কাছে আছে দাও," 'কালো ঘোড়ার সওয়ার' হুকুম দিল। "বলে যাও দরবেশ, সূর্য প্রায় ওঠে ওঠে।..."

হাজি রহিম ধীরে সুস্থে ঘোল পান করার পর বলে চলল:

"শাহজাদা তখন নিবিড় পল্লবে ঢাকা গাছের নীচে বসে নিশ্চিন্তে আমোদ প্রমোদ করছে, পেয়ারের তেজীয়ান ঘোড়াগুলোকে তরমুজের ফালি খাওয়াচ্ছে। এমন সময় তার বিশ্বস্ত যে সব বন্ধুবান্ধব সর্বত্র ঘোরাফেরা করত তাদের একজন চোখের নীচ অবধি চাদর মুড়ি অবস্থায় তার কাছে হাজির হয়ে নীচু গলায় বলল যে মরুভূমি থেকে আগত অতিথিটিকে তার বাগানের প্রাচীরের বাইরে ধরে শাহের রক্ষিদলের নেতার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখান থেকে তাকে চালান করে দেওয়া হয়েছে 'প্রতিহিংসার কারামিনারে'।

"শাহজাদা ক্রোধে জ্বলে উঠল। সে তার সমস্ত জওয়ানকে ঘোড়ায় উঠে বসে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হতে বলল। একশ' সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার নিয়ে জালাল উদ-দিন শহরের দিকে ছুটল। রাস্তার চৌকিদাররা ছুটে এসে মুখোমুখি হতে গেলে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে দিতে সে সোজা পুরনো আমলের উ'চু দুর্গমিনারের দিকে, মুক্তালের কাছে এগিয়ে গেল। বিকটদর্শন প্রহরী ভয়ে পালাল, যোদ্ধারা কুঠার দিয়ে প্রবেশদ্বার ভেঙ্গে ফেলল। জালাল উদ-দিন সি'ড়ি বয়ে দুর্গমিনারের চূড়ায় উঠে গেল, সেখানে দ্বিতীয় দরজাটি ভাঙ্গতে হল।

"দরজা খুলেই সকলকে পিছিয়ে যেতে হল: চৌকাঠের ওপারেই শুরু হয়েছে কালো গহ্বর, আর ডান দিকে, দেয়ালে লোহার আংটা ধরে ঝুলছে একটি লোক। যোদ্ধারা সাবধানে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে সি'ড়ির ওপর টেনে আনল। জালাল উদ-দিন জ্বলন্ত মশাল নিয়ে নীচে উ'কি মেরে দেখতে গেল। গহ্বর থেকে চেয়ে রয়েছে কয়েক জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ, কানে আসে ক্রুদ্ধ গর্জন। খান জ্বলন্ত মশাল ছু'ড়ে ফেলে দিল। মশাল ঘুরতে ঘুরতে নীচে গিয়ে পড়ল, বিশাল বিশাল লোমশ, মানুষখেকো কুকুরগুলো কে'উ কে'উ করতে করতে পাশে সরে গেল।

"জালাল উদ্-দিন বলল:

'হলফ করে বলছি, যারা এই মিনার ভেবে বার করেছে আমি শাহ হলে তাদের ছি'ড়ে ছি'ড়ে খাওয়ার জন্য এই ভয়ংকর কুকুরগুলোকে রাখতাম।'

"তরুণ খান মিনার থেকে নেমে ঘোড়ায় চেপে বসল। কারা বুরগুতের জন্য একটি ঘোড়ায় জিন দেওয়াই ছিল। যোদ্ধারা ঘনবদ্ধ হয়ে শহর পেরিয়ে গেল। পাথরের ফটক পার হয়ে আসার পর সামনে যখন স্তেপের অনন্তপ্রসারিত সমভূমি দেখা দিল কেবল তখনই জালাল উদ-দিন উদ্ধারপ্রাপ্ত কারা বুরগুতকে বলল:

'তুমি বোধ হয় ভেবেছিলে আমি অভিসন্ধি করে তোমাকে নিজের প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, যাতে তুমি শাহের জল্লাদদের খপ্পরে গিয়ে পড়? আমার ইচ্ছে ছিল আবার তোমাকে তিল্লালায় আমার বাগানে আমন্ত্রণ জানাই, কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে তুমি আবার জল্লাদ জাহান পহলবানের সেবক ঐ কুকুরগুলোর কবলে পড়বে।...'

'এরকম কুৎসিত চিন্তা আমার মাথায়ও আসে নি। আমাকে আমার আপন মরুভূমিতে ফেরার অনুমতি দিন। সেখানে ধু-ধু বালি, ঘাস অতি সামান্যই ফলে, সেখানকার জল নোনা, কিন্তু সেখানে এখানকার চেয়ে, সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, উঁচু উঁচু দুর্গমিনার আর কঠিন প্রাচীরে ঘেরা এ জায়গার চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনতা ও সুখ আছে।'

'আমি তোমাকে ধরে রাখব না। আমার ইচ্ছে, তোমার আরও কোন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করি, কেন না আমার জন্যই তোমাকে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে।'

'আমার একটি মাত্র অনুরোধ আছে। আমার ওপর যে লোকগুলো অত্যাচার করেছে মাছ ধরার জাল দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরার পর তারা আমার চমৎকার খঞ্জরটা কেড়ে নেয়। ওটা ঝোলানোর মতো স্পর্ধা যার হয়েছে সেই হামবড়ার কাছ থেকে যতক্ষণ তা ছিনিয়ে না নিতে পারছি ততক্ষণের জন্য এই যোদ্ধাদের একজনের কাছ থেকে ঝক্‌ঝকে একটা তলোয়ার ধার পেতে পারি কি?'

"তরুণ খান কোমরবন্ধনী থেকে নীলকান্তমণি, চুনি ও পান্নায় অলঙ্কৃত নিজের তলোয়ার খুলে কারা বুরগুতকে দিল।

'এই তরবারি তোমাকে কীর্তিমান করুক! খাপ থেকে এটাকে যেন বার করা হয় কেবল আমাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে, কারাভানের নিরীহ মুসাফিরদের বিরুদ্ধে নয়। কালো কুচ্‌কুচে এই যে জাত ঘোড়াটার ওপর তুমি বসে আছ এটাও এখন থেকে তোমার। এই ঘোড়ায় চড়ে তুমি জন্মভূমির শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে।'

'আপনার কাছে আমার আরও একটি অনুরোধ আছে,' কারা বুরগুত বলল।

'বল!'

'শাহের প্রাসাদে যা যা হয় তার সমস্তই ত আপনি অবগত আছেন। আমাদের তুর্কমেন জাতের গুল জামাল নামে মেয়েটার কী দশা হল তা কি আপনি বলতে পারেন? শাহের ডাকাতরা জোর জবরদস্তি করে এই বলে ধরে নিয়ে গেছে যে সে প্রাসাদে বুড়ো শাহকে আমোদ দেবে।'

'জানি। গুল জামাল নামে এই মেয়েটির জন্য শাহ প্রাসাদের এক বাগানে বিশেষ ছাউনি করে দেওয়ার হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু মেয়েটির গর্ব আছে, সে বশও মানে না। আমি আশঙ্কা করছি যে সব বন্দিনী শাহের

আজ্ঞা অমান্য করে তাদের সকলের যে শোচনীয় পরিণতি ঘটে এই মেয়েটির কপালেও তা-ই আছে।'

'ধন্যবাদ মহামতি ত্রাণকর্তা!' কারা বুরগুত বলল। 'আমার জান যদি কখনও আপনার কাজে লাগে তা হলে আমাকে ডেকে পাঠাবেন, আমি তৎক্ষণাৎ হাজির হব, পাহাড়-পর্বত ও খাত ডিঙিয়ে আসতে হলেও আসব।'

"কারা বুরগুত মিশ কালো ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে মরুভূমির দিকে চলল। শিগ্‌গিরই সে দিক পরিবর্তন করে বড় রাস্তায় উঠে এসে বাগিচায় ঢাকা পরম রমণীয় নগরী সমরখন্দের পথ ধরল।

"ঘোড়া মৃদুমন্দ গতিতে চলল আর ঘোড়সওয়ার গান ধরল:

সমীরণ দেয় আনি দয়িতার বাণী...
সেই গীতমন্ত্রে আমি দিনু আজি ধরা।
পথে পথে মরণের ভীতি আছে জানি,
এও জানি, আছে তার নীরব প্রহরা...*

"কারা বুরগুত ভাবনায় এমনই মগ্ন হয়ে পড়েছিল যে একদল ঘোড়সওয়ার আর একটু হলেই তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছিল আর কি! ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে তারা চিৎকার করতে করতে যাচ্ছিল:

'তফাৎ যাও! তফাৎ যাও! বাদশাহের কাছে দূত চলেছে! খোদ বাদশাহের হাতে চিঠি দিতে হবে!'

"জন কয়েক অশ্বারোহী পেছন পেছন ফাঁসদড়ি টানতে টানতে ধুলোর ঝড় তুলে ঘোড়া হাঁকিয়ে যাচ্ছিল, দড়ির প্রান্তভাগ ছিল জিনের সঙ্গে পাক দিয়ে বাঁধা। ঘোড়ার সঙ্গে দড়িবাঁধা দূত ঘোড়ার প্রতিটি লম্ফনে জিনের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ছিল, তার সর্বাঙ্গ ও মাথা অনবরত দুলছিল।

"স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল দূতের ঘোড়া শহরের ফটক অবধি যাওয়ার জন্য শেষ শক্তি প্রয়োগ করছে। ঘোড়াটার নাভিশ্বাস উঠছিল, তার লেজ এদিক-ওদিক আছড়ে পড়ছিল, সে যে ছুটছিল তার একমাত্র কারণ এই যে সামনের ছুটন্ত ঘোড়সওয়াররা তাকে ফাঁসদড়ি ধরে টানছিল। শাহের দূত এক পল্লী থেকে অপর পল্লীতে যাওয়ার সময় এরকম কিছু ঘোড়সওয়ার সচরাচর তার সঙ্গী হিশেবে যায়।

---

* প্রাচীন আরবী গীত থেকে।

"পুরোদমে চলার মুখে ঘোড়াটা হঠাৎই মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। অশ্বারোহীরা ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল, বৃথাই তারা ক্লান্ত অবসন্ন ঘোড়াকে তোলার চেষ্টা করল। তার নাক থেকে ধূসর পথের ওপর রক্তবিন্দু গড়িয়ে পড়ল।

"দূত যেমন পড়ল তেমনই পড়ে রইল। সে কেবল বলল: 'শাহ্‌জাদীকে বিদ্রোহীরা কেল্লার বুরুজে ঘেরাও করে রেখেছে, তিনি শাহকে জরুরী চিঠি পাঠিয়েছেন। শাহের জল্লাদ আর খাজনা আদায়কারী হাসিবদের বিরুদ্ধে গোটা সমরখন্দ জুড়ে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। লোকে তাদের কেটে কেটে শরীরের টুকরো টুকরো অংশ উঁচু উঁচু গাছের আগায় ঝুলিয়ে রাখছে। আর আমার কপালে ত মরণ আছেই।...'

"এই বলে দূত করতলে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করল। কারা বুরগুত দূতের সামনে এসে বলল:

'আমাকে তোমার চামড়ার থলেটা দাও। আমি নিজে বাদশাহের হাতে চিঠি দেব। এখানে মরণাপন্ন ঘোড়াটার পাশে গড়াগড়ি দিয়ে আর তোমার কাজ নেই, তুমি বরং ঐখানে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ে তোফা একটা ঘুম দাও। জানি, চিঠি দেওয়ার ব্যাপারে তোমার মোটেই কোন তাড়াহুড়ো নেই, তোমাকে তাই জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কেন না দুঃসংবাদ বহনের জন্য শাহ দূতের গর্দান নেবেন।'

'আমারও মনে হয় এখানে বিশ্রাম করাই আমার পক্ষে ভালো,' এই বলে ধূলিধূসরিত দূত কারা বুরগুতের হাতে তার থলে তুলে দিল। এক পাশে সরে গিয়ে সে গাছের তলায় ঘাসের ওপর দেহ এলিয়ে দিল, নাক ডাকাতে লাগল।

"কারা বুরগুত ফাঁসদড়ির খুঁট জিনের সঙ্গে আটকে দিয়ে হাঁক পাড়ল: 'আগে বাড়!' অশ্বারোহীরা সকলে আবার শাহের রাজধানী অভিমুখী পথ ধরে ছুটে চলল।

"সঙ্গী অশ্বারোহীদের সঙ্গে কারা বুরগুত প্রাসাদের উঁচু ফটকের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। শাহজাদীর কাছ থেকে জরুরী বার্তা বহনকারী দূতের সামনে সমস্ত দ্বার অবারিত হল। বুড়ো খোজা চাবির গোছায় ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ তুলে আঁকাবাঁকা অলিগলি দিয়ে দূতকে নিয়ে চলল। কারা বুরগুত দেশশাসকের রক্তচক্ষুর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, এমন

সময় দেয়ালের ওপার থেকে তার কানে এলো নারীকণ্ঠের আর্তনাদ: 'বাঁচাও! গেলাম!'

"যে কোমল কণ্ঠস্বর থেকে এখন এই আর্ত ও করুণ মিনতি শোনা গেল সে কণ্ঠস্বর কি কারা বুরগুত না চিনে পারে! জালাল উদ-দিনের কাছ থেকে উপহার পাওয়া তলোয়ারখানা বার করে বুড়ো চাবিয়াল খোজার মাথার ওপর তুলে সে তাকে দরজা খুলতে হুকুম করল। বাঘের মতো লম্ফ দিয়ে কারা বুরগুত দেয়ালজোড়া গালিচায় আষ্টেপৃষ্ঠে আঁটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। শাহকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কারা বুরগুত তার খোঁজ করতে লাগল, কেন না তার দৃঢ় বিশ্বাস, শাহই তাদের তুর্কমেন মেয়েদের ওপর এই রকম নিষ্ঠুর পরিহাস করতে পারে। ঘরে কিন্তু একটা লোককেও দেখা গেল না। কেবল এক কোণে পারসী শালের স্তূপের ওপর শুয়ে হলুদ-কালো ছোপের এক তুষার চিতা তার নখ দিয়ে গালিচা ছেঁড়ার চেষ্টা করছে আর গালিচার নীচ থেকে ভেসে আসছে চাপা আর্তনাদ।

"তলোয়ারের দুই কোপে যোদ্ধা জন্তুটাকে হত্যা করে গালিচা সরিয়ে ফেলল। তার সামনে পড়ে রয়েছে গুল জামাল — তার শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম, মুখবর্ণ পাণ্ডুর।

'কে সেই ইতর, যে অবলা নারীর পেছনে হিংস্র জন্তু লেলিয়ে দিতে পারে!' কারা বুরগুত চেঁচিয়ে উঠল, যে নারী এত কাল তার সমস্ত ভাবনা-চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

"দীর্ঘ পদক্ষেপে স্বয়ং শাহ গালিচা মহলে প্রবেশ করলেন। তাঁর পেয়ারের তুষার চিতাকে যে বধ করেছে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে সেই মুহূর্তেই তিনি তাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু কারা বুরগুত গম্ভীর ভঙ্গিতে তাঁর হাতে চিঠি তুলে দিল। সমরখন্দের বিদ্রোহ এবং তাঁর কন্যার ওপর আক্রমণের সংবাদে হতচকিত শাহ অবিলম্বে বিদ্রোহীদের দমন করা ও শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে অভিযানের প্রস্তুতি নিতে তাঁর সেনাপতিকে আদেশ দিলেন, কারা বুরগুতের দিকে তিনি আর দৃষ্টিই দিতে পারলেন না। এদিকে কারা বুরগুত গুল জামালকে উঠিয়ে নিজে কোলে করে ফলবাগিচার মাঝখানে খাটানো সাদা ছাউনিতে নিয়ে গেল, বাঁদীকে বলল যে আগামীকাল গুল জামালের মর্যাদার উপযোগী এক কারাভান নিয়ে মরুভূমির প্রবীণ লোকজন আসবেন, তাঁরা ওকে ওর জন্মস্থানে নিয়ে যাবেন।

"কিন্তু পরদিন সেই লোকজনকে আর গ্ল জামালের কাছে যেতে দেওয়া হল না, প্রাসাদ থেকে তাঁদের ঠেলে বার করে দেওয়া হল। তাঁদের জানানো হল যে শাহেনশার প্রাণনাশের চেষ্টা করার অপরাধে গ্ল জামালকে 'চিরবিস্মৃতির কারামিনারে' আটকে রাখা হয়েছে, 'আজীবন ও আমরণ' তাকে সেখানেই থাকতে হবে।"

"সে কি ওখানেই মারা গেছে?" কে যেন জিজ্ঞেস করল।

হাজি রহিম কিছুটা বিলম্ব করে বলল:

"না, গ্ল জামাল এখনও গুরগঞ্জের পাষাণ মিনারে বন্দিনী, বেঁচে আছে। কুচক্রী শাহ জননী তুর্কানে খাতুন তাকে ওখানে আটকে রাখার হুকুম দিয়েছে, বুড়ি নিজে ভীরু হায়নার মতো খরেজমের রাজধানী থেকে পালিয়ে গেলে কী হবে নির্বোধ হাকিম, রইস আর পাহারাদারদের সাধ্য কি ঘৃণ্য শাহ জননীর হুকুম নড়চড় করে, তাই আরও বহু নিরপরাধ বন্দীর মতো গ্ল জামালকেও তারা কারাগারে ধরে রেখেছে।"

"দরবেশ, আমাকে বল দেখি এত কথা তুমি জানলে কোথা থেকে?" আসন থেকে গাত্রোত্থান করে 'কালো ঘোড়ার সওয়ার' জিজ্ঞেস করল। "তুমি যা যা বললে তা কোন গল্পকথা নয়, সত্যি ঘটনা।"

"আমরা, ভবঘুরেরা, লোকজনের মধ্যে ঘোরাফেরা করি, নানারকম কথাবার্তা শুনতে পাই। তা ছাড়া মরুভূমির হাওয়া বহুবার আমাকে এই গীতিকা গেয়ে শুনিয়েছে।"

"ওহে জওয়ান বেগের দল!" 'কালো ঘোড়ার সওয়ার' উপবিষ্টদের উদ্দেশে বলল। "তৈয়ার হও! ভোরবেলা গুরগঞ্জ যাত্রা করছি।"

"গুরগঞ্জে যেতে হলে আর দেরি করো না," হাজি রহিম বলল। "তাতার খানের ছেলেরা বিশাল ফৌজ নিয়ে তিন দিক থেকে গুরগঞ্জ আক্রমণ করতে চলছে। শহরের চার দিকে তারা ঘন বেড় দিচ্ছে, তখন আর শহরে তোমাকে ঢুকতে হচ্ছে না।"

"আর দরবেশ, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে," 'কালো ঘোড়ার সওয়ার' বলল। "আমি তোমাকে ও তোমার সঙ্গীকে এক জোড়া ঘোড়া দেব, তিন দিনের মধ্যে আমরা গুরগঞ্জের ফটকে পৌঁছে যাব। আর তোমরা, আমার দোস্তরা, যে যার আস্তানায় ফিরে গিয়ে আমার ডাকের অপেক্ষায় থাক। আমি আদৌ ফিরব কিনা কিংবা ইজরাইল আমাকে আগুনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন!.."

গ্রগঞ্জের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ

চেঙ্গিজ খান তার কনিষ্ঠ পুত্র তুলি খানকে প্রাচীন নগরী মার্ভ দখল করে তার ওপর লুঠতরাজ চালানোর আদেশ দিল আর জ্যেষ্ঠ তিন পুত্র জুচি, জাগাতাই ও উগেদেইয়ের ওপর হুকুম হল তারা যেন নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে খরেজমের রাজধানী গুরগঞ্জ জয় করতে যায়।

সব মোঙ্গলেরই ইচ্ছে গুরগঞ্জ অভিযানের শরিক হয়, কেন না গুরগঞ্জ ছিল মুসলিম জাহানের সমৃদ্ধতম নগর, সূক্ষ্ম বস্ত্রের সম্ভার নিয়ে তার কারাভান দুনিয়ার সর্বত্র যেত, লোহার জালিচর্ম এবং অন্যান্য মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের জন্য তার খ্যাতি ছিল। আক্রমণে যারা যারা যোগ দেবে তাদের প্রত্যেকেই সেখান থেকে নিয়ে আসবে নিদেন পক্ষে রেশমী জামাকাপড়ে, চুনি ও পান্নার তৈরি কণ্ঠমালায়, পানপাত্র ও অন্যান্য মহার্ঘ দ্রব্যে বোঝাই এক জোড়া ঘোড়া কিংবা উটের সারি; পরন্তু প্রত্যেকে দেশে নিয়ে আসবে কয়েক জন করে শিল্পনিপুণ ক্রীতদাস -- যারা কাপড় বুনবে, জুতো কিংবা পশুলোমের আংরাখা সেলাই করবে, তাদের প্রভুরা তখন যুদ্ধের জায়গা থেকে নিয়ে আসা গালিচার ওপর চুপচাপ শুয়ে শুয়ে বীণার বাজনা শুনবে, আর সে বীণাও বাজাবে গুরগঞ্জ থেকে যে সব বাদ্যকর বন্দী করে আনা হয়েছে তারা।

উত্তরে জাইহুন নদীর উপকূল ধরে খরেজমের সমৃদ্ধ প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হতে হতে মোঙ্গল সৈন্যরা এই স্বপ্নেই বিভোর হয়ে ছিল।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জুচি উপস্থিত হওয়ার আগেই এই শহর দখল করার জন্য চেঙ্গিজ খানের অপর দুই পুত্র জাগাতাই ও উগেদেই ব্যস্ত হয়ে উঠল; কেন না মহামান্য মোঙ্গল খানের অসিয়ৎনামা অনুযায়ী কিপচাক স্তেপসমেত গোটা খরেজমের সম্পূর্ণ অধিকার তার হাতে গিয়ে পড়ছিল।

নিজের রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজধানীতে ধনসম্পদের ভাগ বাঁটোয়ারায় ভ্রাতাদের শরিক হতে দেওয়া হয়েছে শুনে ক্রুদ্ধ জুচি খান ঠিক করল ব্যস্ত হয়ে কাজ নেই। সে তার প্রিয় আমোদ প্রমোদে — বুনো ঘোড়া শিকারে মেতে উঠল, আর উদাসীনভাবে বলতে লাগল:

"যাই হোক না কেন, আমার সাহায্য ছাড়া গুরগঞ্জ আর ওদের নিতে হচ্ছে না। ওরা আগে মাথা ঠুকে মরুক!"

এদিকে ঈর্ষাপরায়ণ ও লোভী জাগাতাই পানোৎসবের সময় শপথ নিয়ে বলল:

"জ্বচি রাজ্যের খ্বই বড় একটা ভাগ পেয়েছে, সে চায় একা সমস্ত সেরা অংশ দখল করবে। সেটি হবে না। আমি তাকে গ্রগঞ্জ দিচ্ছি না, প্রথম ধাক্কায় এই শহরকে গ্ঁড়িয়ে দেব।"

মোঙ্গলদের মাজেন্দ্রান্ নগর অভিযানের পর খরেজম শাহ বংশের রাজধানী, আড়ম্বরপ্র্ণ কিপচাক খান, ধনী বণিক, হ্নরী আর বহ্জাতীয় ক্রীতদাসের শহর গ্রগঞ্জের অবস্থা উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছিল।

এ যাবৎ শহরটা যার নিষ্ঠুর শাসনাধিকারে ছিল সেই শাহ জননী তুর্কান খাতুনের পলায়ন এবং খরেজম শাহ বংশের সকলের নগর পরিত্যাগের পর জনবহ্ল রাজধানীটি কিপচাক সর্দারদের শাসনাধিকারে থেকে গেল। তাদের প্রত্যেকেরই স্বপ্ন অন্তত এক দিনের জন্য হলেও ম্সলিম জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি হয়। এদিকে খান ও বেগেরা যখন ঝগড়া-বিবাদে ব্যস্ত ততক্ষণে কিপচাক বেগ খ্মার তেগিন 'সম্মানের শ্ব্র আসনে' বসার জন্য আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করে নিজেই নিজেকে খরেজমের স্লতান বলে ঘোষণা করল। সকলেই বিনা বাক্যব্যয়ে তার বশ্যতা স্বীকার করল, শ্বেতশ্মশ্র্ধারী ইমামের দল উৎসাহের সঙ্গে মসজিদে মসজিদে তার জন্য মোনাজাত করতে লাগল।

খরেজমের নতুন অধিপতি খ্মার তেগিন শাসনক্ষমতার সর্বপ্রথম পরিচয় প্রকাশ করল ইসলাম ধর্মের প্রতি তার অতি উৎসাহ দেখিয়ে: তার হ্কুম হল যারা প্রতিদিন মসজিদের নামাজে যায় না তাদের খ্ঁজে খ্ঁজে বার করে যেন দ্র্গমিনারে বন্দী করে রাখা হয়। সশস্ত্র প্রহরীদের নিয়ে রইসদের দলবল শহরময় ঘ্রে বেড়াতে লাগল। তারা লাঠির গ্ঁতো মেরে ব্যবস্থা চাল্ করতে লেগে গেল। যাকেই যথেষ্ট পরিমাণ ধার্মিক নয় বলে মনে হল, তাকে শাস্তি দিল। নতুন স্লতান তার জনৈক জ্ঞাতি আলা উদ্-দিন আল হাইয়াতিকে রক্ষিবাহিনীর নেতা করে দিল এবং নতুন নতুন কর প্রচলনের সাহায্যে নৈশ প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করল। শহরের মধ্যে ল্টপাট কিন্তু তাতে বিন্দ্মাত্র কমল না, বিশেষ করে চাল এবং অন্যান্য শস্যের ভাঁড়ার ল্ট হতে লাগল। উদ্বেগ বেড়ে চলল — সকলেরই ভয় ভয়াবহ মোঙ্গল অশ্বারোহীরা আসার পর এই বিশাল শহরের অধিবাসীদের কী হাল হবে।

নকিব ও ইমামদের মাধ্যমে সুলতান খুমার তেগিন জনসাধারণকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে লাগল যে মোঙ্গলরা গুরগঞ্জ অবধি মোটেই আসবে না, বুখারা, সমরখন্দ ও মার্ভ লুট করে তারা ইতিমধ্যে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, এখন তারা নিজেদের স্তেপভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।

বাইরে থেকে দেখতে গেলে গুরগঞ্জের জীবনযাত্রা আগের মতোই চলতে লাগল: মিনারের চূড়া থেকে মুয়াজ্জিনরা বরাবরের মতো ইমানদারদের উদ্দেশে আজান দেয়, বাজারেও আগের মতোই বেসাত সাজিয়ে বসে পসারীরা খরিদ্দার জড়ো করার জন্য হাঁক-ডাক তোলে, আগের মতোই শহরের সংকীর্ণ রাস্তায় রাস্তায় পথচারীর অবিরাম ভিড়; কিন্তু শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরি জীবন দিনের পর দিন অচল হয়ে আসতে লাগল।

বণিকদের অভিযোগ হল ব্যবসা-বাণিজ্য পড়ে যাচ্ছে আর কোন কোন ব্যবসা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। খরিদ্দাররা দাম জিজ্ঞেস করে মাত্র, ঠোঁট দিয়ে অব্যক্ত শব্দ করে মাথা নাড়িয়ে চলে যায় অথচ জিনিসপত্রের দাম ইতিমধ্যে অর্ধেক হয়ে গেছে।

কেবল খাদ্যদ্রব্যের দাম ক্রমেই বেড়ে চলে এবং রসদ আসা বন্ধ হয়ে যাবে অনুমান করে শহরবাসীরা তাড়াতাড়ি করে ময়দা, জোয়ার ও শুকনো আঙুর কিনে জমাতে থাকে।

রাস্তার মোড়ে লোকজন জমা হয়ে কানাকানি করতে থাকে:

"তাতাররা আর বেশি দূরে নেই। তাতাররা বিরাট দলবল নিয়ে আসছে। তাতাররা আমাদের শহর ঘেরাও করবে। দেয়ালগুলো উঁচু, মজবুত, ঘেরাও বহু দিন চলবে। আমরা আমাদের সব ভেড়া ও ঘোড়া খেয়ে ফেলব, তারপর? কোথায় লুকাব? পালাবে কোথায়?"

নানা রকম অবিশ্বাস্য গুজব শহরবাসীদের উত্তেজনা ও আনন্দের খোরাক যোগায়। কেউ কেউ বলে:

"জালাল উদ-দিন পাঁচ লক্ষ সৈন্যের ফৌজ তৈরি করে ফেলেছেন। তিনি গুরগঞ্জের দিকে রওনা হয়ে গেছেন। জালাল উদ-দিন তাতারদের একটা বড় ফৌজ ধ্বংস করে দিয়েছেন, তারা পুবের দিকে পালিয়েছে।..."

অন্যেরা বলে:

"তাতাররা দেয়ালের চার দিকে হন্যে হয়ে ঘুরবে কিন্তু দখল করতে

পারবে না। গুরগঞ্জ দখল করা কি খেলা কথা? ওরা উত্তরে চলে যাবে। বুড়োদের কথাই ঠিক।...”

শহর থেকে একের পর এক বেরিয়ে আসতে থাকে উটের সারি। মালপত্রের বদলে উটের কুঁজের দু' পাশে ঝুড়ি ঝুলতে দেখা যায়; সেগুলোর ভেতর থেকে নারী ও শিশুরা উঁকি মারতে থাকে — তারা চলেছে মান্‌গিশ্‌লাকে, তুর্কমেনদের কাছে। সেই সঙ্গে শহরে আসে অন্য দলবল — ঘোড়ায় চড়ে, গাড়িতে ও গাধায় চড়ে — এরা হল খানদানি বেগদের পরিবারবর্গ — নিজেদের তালুক থেকে তারা পালিয়ে পড়িমরি করে ছুটে এসেছে গুরগঞ্জের মজবুত, উঁচু উঁচু প্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় নিতে।

বাজারে রুটির দেখা নেই, রুটির দোকান বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। ভেড়া ও ঘোড়ার দাম চড়ে গেল। এই সেদিনও একটা ভালো ঘোড়ার যে দর ছিল আজ সাধারণ একটা গাধা পর্যন্ত সেই দরে বিকোতে লাগল।

মোঙ্গলরা অতর্কিতে দিনে-দুপুরে শহরের সামনে এসে উপস্থিত হল। চট্‌ করে কেউই বুঝে উঠতে পারল না ব্যাপারটা কী। একদল যাযাবর স্তেপ থেকে গোরু-ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে দক্ষিণ ফটকের কাছাকাছি এলো। পাহারাদাররা যতক্ষণ রাখালদের কাছ থেকে শহরে প্রবেশের জন্য পাওনা আদায় করতে লাগল গোরু-ভেড়াগুলোকে ততক্ষণ খালের সেতুর ওপর থামিয়ে রাখা হল।

এমন সময় গোরু-ভেড়ার পালের খুরে উত্থিত সাদা ধুলিজালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো শ' দুয়েক অশ্বারোহী। তাদের পরনে অপরিচিত বেশ — না তুর্কমেনদের মতো, না কিপচাকদের মতো। ছোটখাটো অথচ দ্রুতগামী অশ্বের আরোহী এই লোকগুলো নিজেদের জিনের ওপর ভেড়া টেনে ওঠাতে লাগল এবং রাখালদের ধাক্কা দিয়ে ও তাদের ওপর মারধোর করে বাকি পশুপালকে উল্‌টো দিকে খেদিয়ে নিয়ে চলল।

অতঃপর যে সব রাখাল অশ্বারোহীদের সঙ্গে বাদানুবাদ করতে এলো তাদের কয়েক জনকে হত্যা করে আন্দোলিত চাবুকে শনশন আওয়াজ ও শিস তুলে ধীরে সুস্থে পশুগুলোকে শহরের মুখ থেকে যে পথে

তারা এসেছিল সে পথে তাড়িয়ে নিয়ে গেল; তারা বড় খালের সেতু পার হয়ে ধীরে ধীরে দূরে চলে গেল।

শহরে বিপদ-সঙ্কেত উঠল। উদ্ধত দস্যুদের নাগাল ধরার জন্য সুলতান খুমার তোগিন এক হাজার কিপচাককে পাঠাল, হুকুম দিল শাস্তি দেওয়ার জন্য ওদের যেন জীবন্ত তার কাছে ধরে আনা হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রূপকথার উপসংহার সন্ধানে কারা কন্‌চার

মরালগামিনী তারে স্মরি হায় দুই আঁখি ঝুরে,
হিয়া মোর দিব ডালি অধরের কলধ্বনি তরে।

(পারসীক গীত থেকে)

মোঙ্গলদের দৃষ্টি এড়িয়ে মরুপ্রান্তর ভেদ করে কারা কন্‌চার জাইহুন নদীর দিকে চলল। মাঝে মাঝে দূরে মোঙ্গল সেনাদলের বিস্তৃত শ্রেণী চোখে পড়ছিল। তারা সকলে উত্তরে, গুরগঞ্জের দিকে এগিয়ে চলেছে। আবার মরুভূমিতে ফিরে গিয়ে অনেকখানি ঘুরপথ ধরতে হয়, পথে দৈবাৎ যে সব যাযাবরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাদের কাছে জিজ্ঞেসবাদ করতে হয়। যারাই ক্‌জিল-কুমের ওপর দিয়ে আসে তারা আতঙ্কগ্রস্ত, কেন না চার দিক থেকে মোঙ্গলরা এগিয়ে আসছে।

কারা কন্‌চারের সঙ্গে ভেড়ার চামড়ার বড় বড় টুপি মাথায় দিয়ে চলেছে রোদে পোড়া দুই তুর্কমেন — এক জন হল সদা বিষণ্ণ বালক, অপর জন শ্মশ্রুধারী দরবেশ।

রাতে আধখানা চাঁদের আবছা আলোয় মুসাফিররা অলক্ষ্যে জলভারাক্রান্ত স্ফীতকায় নদীর তীরে এসে পৌঁছাল। উঁচু উঁচু নলখাগড়ার বনের ভেতর দিয়ে বন্য বরাহ যাতায়াতের পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার পর তারা জলের কাছাকাছি উপস্থিত হল। সম্মুখভাগ উঁচানো কয়েকটি বড় বড় কদাকার নৌকো পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সেগুলোর ভেতরে লোকজন, ভেড়া ও ঘোড়ার ভিড় নজরে পড়ছিল। নৌকোর

তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ ও চিৎকার-চেঁচামেচির জবাবে সেখান থেকে বলা হল: "আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হোন, আমাদের এখানে জায়গা নেই।"

একটা নৌকো ডাকে সাড়া দিল।

"ইমানদার কখনও ইমানদারকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে যায় না।" এই বলে মাঝি নৌকো ডাঙায় ভিড়াল। সে সকলকে একেবারে গুরগঞ্জ অবধি পৌঁছে দিতে রাজি হল।

"এর জন্য কত চাস?" কারা কন্‌চার জিজ্ঞেস করল।

"এঃ, কী কথাই না বললে! টাকা-পয়সাই বল, জিনিসপত্র আর গোরু-ভেড়াই বল — আজ আর কোনটারই দাম নেই, সব গুলিয়ে গেছে। তুমি এখন বিপদে পড়েছ, আমিও তেমনি বিপদে পড়েছি: আমার ঘরবাড়ি গেছে, পরিবারের সকলে খুন হয়েছে। কেন আর কার জন্যই বা টাকা-পয়সা জমাব? উঠে পড়!"

মজবুত বড়সড় নৌকোয় মুসাফিরদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘোড়াগুলোরও ঠাঁই হল। নৌকো প্রশস্ত জাইহুনের ঘোলা ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে দ্রুত ভেসে চলল। মাঝে মাঝে দক্ষিণ তীরে মোঙ্গল টহলদারদের দেখা যায়। তখন নৌকো বাম তীর ঘেঁষে চলে। চার দিন পর নৌকো এক প্রশস্ত খালে প্রবেশ করল। এই খাল গুরগঞ্জকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে: উঁচু প্রাচীরে ঘেরা প্রাচীন শহর এবং শহরতলী, যেখানে তুত গাছের বাগানে বাড়িঘর ঢাকা পড়ে আছে।

কারা কন্‌চার তার কোমর থেকে দড়ি দিয়ে কসে বাঁধা একটা চামড়ার থলে বার করে দশটি সোনার দিনার গুনে নৌকোর মালিকের প্রসারিত করতলে তুলে দিল।

"তোর সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা কে জানে। তোর নামটা অন্তত বল।"

কর্ণধার ঈষৎ হেসে তার লাল রঙের পাগড়িটা মাথার পেছন দিকে সরাল।

"আমার নাম করিম গোলাম, আমি একজন কামার। তুমি তোমার নাম না বললেও আমি কিন্তু তোমাকে চিনতে পেরেছি। তোমার এই মিশকালো ঘোড়া, যার ঠ্যাংগুলো এমন সরু, রাজহাঁসের মতো যার ঘাড় তা একমাত্র তারই হতে পারে যাকে নিয়ে লোকে রূপকথা বলে, গান গায়। তুমি যদি এখানে কাফেরদের সঙ্গে লড়, তাহলে আমি তোমার দলে ভিড়ব।"

সে কথাটা আর কারা কন্‌চারের কানে গেল না। সে ভালো করে দূরের দিকে দেখছিল — সেখান থেকে খালের অপর পার ধরে এগিয়ে আসছিল ধুলোর মেঘ।

স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ঘোড়ার মুখ এবং ঘোড়ার কেশরের ওপর ঝুঁকে পড়া কিপচাক অশ্বারোহীর দল। তারা হাঁকডাক তুলে ঘোড়াগুলোকে চাবুক মারছিল, দূরে থেকে ভেসে আসছিল চাপা আওয়াজ এবং ভাঙা গলার গর্জন।

সামনে বিশাল সাদা ঘোড়ায় চেপে একজন চলছিল। সে জিনের ওপর এমনভাবে দুলছিল যেন এই বুঝি আছড়ে পড়ে। তার সাদা উষ্ণীষ ও হলুদ জোব্বায় ছোপ ছোপ রক্ত; ঘোড়ার সর্বাঙ্গে রক্তবন্যা বয়ে চলেছে, তার ঘাড়ে একটি দীর্ঘ তীরের ফলা বিদ্ধ হয়ে আছে।

কিপচাক অশ্বারোহীরা ঘূর্ণিবায়ুর মতো সেতুর ওপর দিয়ে ছুটে চলল।

"ওরা এলো বলে, ওরা আমাদের পিছু পিছু আসছে! প্রাণ নিয়ে পালাও!" তাদের মরিয়া চিৎকার ভেসে এলো।

ধাবমান ঘোড়াগুলোকে দেখে কারা কন্‌চারের মিশকালো তেজীয়ান ঘোড়াটা উত্তেজিত হয়ে লাফালাফি করছিল। কারা কন্‌চার শহরের ফটকের সামনে তার লাগাম টেনে ধরল।

কিপচাকরা হুড়মুড় করে ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়ল, কারা কন্‌চারও তার সঙ্গীদের নিয়ে ওদের পেছন পেছন শহরে ঢুকল। ফটক আর্তনাদ তুলে মন্থর গতিতে বন্ধ হয়ে গেল, চৌকিদাররাও ভারী কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তার খিল এ'টে দিল।

একজন অশ্বারোহী চৌকিদারদের সামনে থেমে দাঁড়িয়ে বলে চলল:

"নতুন সুলতান খুমার তেগিন দু'শ' মোঙ্গলকে ধরে আনার জন্য আমাদের পাঠান। ওরা আমাদের গোরু-ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে তারা লুটের মাল ছেড়েছুড়ে তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মতো পালিয়ে যায়। কে জানত যে তারা আমাদের ধ্বংস করার জন্য ফাঁদ পেতেছে। তিল্লালার বাগানের কাছে হাজার দুয়েক ক্ষিপ্ত কাফের আড়াল-আবডাল থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা চার দিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলে, দূর থেকে লম্বা লম্বা তীর ছুঁড়ে আমাদেরে ঘায়েল করে। ঘোড়সওয়াররা পড়ে যেতে তাদের

ঘোড়া দখল করতে থাকে। আমাদের সব বড় বড় বীর সেখানে মারা গেছে! আমাদের দলের এইটুকু মাত্র রয়ে গেছে। সুলতান আমাদের এই কসাই-খানায় ঠেলে দিলেন কেন?”

“এরকম হারামজাদা লোককে তোমরা সুলতান করেছই বা কেন?” কারা কন্‌চার চেঁচিয়ে বলল।

সকলেই ফিরে তাকাল: সুলতান সম্পর্কে এমন কথা উচ্চারণ করার সাহস কার হল?

কারা কন্‌চার গলা চড়িয়ে বলে যেতে লাগল:

“ভীরুতার জন্যই আল্লাহ ঐ কুচক্রী কুত্তি সুলতানা তুর্কান খাতুনকে আর তার পরগাছার গোটা দঙ্গলকে খরেজম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ধুমসো শাহ মুহম্মদও পালিয়েছে; এখন কুকুরের দল তার লাশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে! ঝড়ের হাওয়ায় শেয়ালের দল যখন ঝেঁটিয়ে বিদায় হয়েছে তখন কিনা তোমরা নতুন একটা কাক তাড়ুয়া — খুমার তেগিনকে বসিয়েছ! বুদ্ধিমান কোন গেরস্ত একপাল রোঁয়া ওঠা ছাগলের ভারও তাকে দেবে না, আর তোমরা কিনা তাকে বাহিনীর সেনাপতি করেছে, তোমরা তারই হাতে শহর রক্ষার ভার তুলে দিয়েছ!.. তোমরা গোলামের জাত! লাঠির ঘা ছাড়া বাঁচতে পার না।...”

কারা কন্‌চারের সঙ্গী দুই ঘোড়সওয়ার তাকে বাধা দিয়ে বলল:

“চুপ্, কারা কন্‌চার! এখানে চার দিকেই কিপচাক। তারা সব শাহের জাতি-গোষ্ঠী। এখান থেকে চল!”

সৈন্যদল ও চৌকিদারেরা ‘কালো ঘোড়ার সওয়ারের’ কথায় হতবাক:

“ঘোড়সওয়ারটির বুকের পাটা আছে দেখছি! ঠিকই ত বলেছে। খুমার তেগিন আগে যুদ্ধে কোন বাহাদুরীর পরিচয়টা দিয়েছে শুনি? তার নিঃস্বার্থপরতা বা বুদ্ধির কথাও শুনেছি বলে ত মনে পড়ে না। তার সমস্ত শক্তি এখানেই যে সে সুলতানা তুর্কান খাতুনের তল্পিবাহক হয়ে ঘুরত। এরকম সুলতান নিয়ে আমরা সকলেই ডুবব।”

কারা কন্‌চার মৃদুমন্দ গতিতে গুরগঞ্জের সদর রাস্তার ওপর দিয়ে যেতে যেতে কালো চোখের কঠিন দৃষ্টিতে রাস্তার ভিড়ের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকে। সঙ্গীদের সে বলল:

“বাজারে গিয়ে মের্দানের চাখানা খুঁজে বার কর। সকলে ওকে জানে। সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা কর। এখন আমি একা যাব।”

বাজারের অর্ধেক দোকানই বন্ধ। যে সব দোকানে রেশম ও মিহি পশমী থানের স্তূপ পড়ে ছিল সেখানেও দোকানীরা আর খরিদ্দারদের উদ্দেশে হাঁকাহাঁকি করছে না। তারা মুখ বেজার করে গোল হয়ে বসে আলোচনা করছিল কী হবে।

"দুশমন শহর ঘেরাও করলে আমাদের এক গিরা কাপড়ও বিক্রি হবে না। বুনো জানোয়ারের মতো এই কাফেররা যখন আমাদের শহরে ঢুকে পড়ে সবই অমনি অমনি নিয়ে নেবে তখন সাধ করে কে কিনতে যাবে? এখন আমাদের মাথা আস্ত থাকলেই হয়!"

খরেজম শাহের প্রাসাদের কাছেই 'চিরবিস্মৃতির কারামিনারের' অবস্থান। তার একটি পাশ চত্বরের দিকে মুখ করা। জানলার জায়গায় ছোট ছোট যে সব ঘুলঘুলি তার গায়ে ছিল সেগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কারা কন্চার ভাবতে লাগল: "কোথায়, কোন জানলার ওধারে মরুভূমির সেই ফুলকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে? সে কি বেঁচে আছে? আর বেঁচেই যদি থাকে তার সেই মধুর, নির্মল মুখ, উজ্জ্বল চোখ জোড়া, কিশোরীর সেই কোমল হাত কি আছে?এই ভয়ঙ্কর কারামিনারে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়, যুবতী লোলচর্ম বৃদ্ধা হয়ে যায়।... শেকলে বাঁধা গুল জামালও হয়ত এত দিনে..." কাকে সে দেখতে পাবে, একথা ভেবেই সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তাকে, তার জীবনের আলোকে অন্য কোনরকম, কদাকার, উন্মাদিনী রূপে দেখার চেয়ে এই মুহূর্তে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়।...

কারামিনারে পাদদেশে, লোহার নীচু দরজার কাছে সিঁড়ির ওপর বসে বসে কোলের ওপর সাবেকী আমলের বাঁকা তলোয়ার রেখে শ্মশ্রুধারী চৌকিদার ঢুলছিল। তার পাশেই আসনের ওপর কয়েকটি শুকনো চাপাটি আর কাঠের পাত্রে দুটি কালো রঙের তামার দিরহাম পড়ে ছিল। বন্দীদের আত্মীয়স্বজন এখন আর তাদের তেমন দেখাশোনা করে না! কেবল নিজেদের কথা ভাবে, যে যার প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত! এদিকে দেয়ালের ঝরকা থেকে বেরিয়ে আসে হাড়জিরজিরে শুকনো হাত, শোনা যায় চিৎকার-চেঁচামেচি:

"দুঃখীদের দিকে একটু ফিরে তাকাও! আমরা যারা অন্ধকারে আছি তাদের এক টুকরো রুটি দাও!"

"অ্যাই বুড়ো, এদিকে আয় দেখি!" কারা কন্চার চৌকিদারকে বলল।

বুড়োর ঘুমের চটক ভাঙল, সাদা দাড়ি দুলিয়ে সে ঘোড়সওয়ারটির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল, দাঁড়াবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

"কী দরকার রে তোর?"

কারা কন্‌চার বুড়োর আরও কাছে এগিয়ে আসতে সে খানিকটা উঠল।

"এই টাকাটা নে, আমাকে বল, নতুন কয়েদী এখানে অনেক এসেছে কিনা।"

"অনেক যদি হয়ও তোর তাতে কী রে?"

"তা পুরনো কয়েদীও নিশ্চয়ই বেশ কিছু রয়ে গেছে?"

"আবর্জনার স্তূপে, এঁটুলির কামড় আর খিদের কেউ মরে গিয়ে না থাকলে এখনও আশার আগুটা ধরে ঝুলছে।"

"তোকে আরও একটি দিনার দিচ্ছি। বল দেখি, কয়েদীদের মধ্যে কোন মেয়ে আছে কিনা।"

"দুই বুড়ি আছে; তুকতাক করে আমাদের নতুন সুলতানকে রোগে ফেলার মতলব আঁটছিল বলে তিনি ওদের কয়েদ করে রেখেছেন।"

"কম বয়সী মেয়ে নেই?"

"মহা জ্বালা দেখি। তুই কে রে বাপু? — কাজি, জল্লাদ সর্দার না মসজিদের বড় ইমাম? তোর সঙ্গে কথা বলতে আমার ভরসা হচ্ছে না। তুই বোধহয় কোন ডাকাত-টাকাত; লোকজনের গলা যারা কাটে এমন আরও কিছু স্যাঙাতকে ছাড়াতে এসেছিস। তোর ঐ সব টাকা-পয়সা ফিরিয়ে নিয়ে মানে মানে এখান থেকে বিদেয় হ।"

কারা কন্‌চার চাবুক তুলে চৌকিদারকে আঘাত করতে যাচ্ছিল, এমন সময় কার যেন আলতো হাতের বাধা তাকে আটকে দিল। সে ফিরে তাকাল। কারা কন্‌চারের ক্রুদ্ধ চোখের সামনে পড়ল এক দীর্ঘকায় প্রবীণ। তার দীর্ঘ কেশরাশি কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছে, পরনে জীর্ণ বসন, দুই চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি।

"এখানকার নিয়ম কানুন তুমি জান না বলেই মনে হচ্ছে, তাই এই বুড়োর সঙ্গে এভাবে কথাবার্তা বলছ। এখান থেকে তফাতে যাই চল, আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব। দেখ, তুমি যতক্ষণ কথাবার্তা বলছিলে সেই সময়ের মধ্যে ফটক থেকে জন দশেক জল্লাদ — সুলতানের জাসুসীরা বেরিয়ে এসেছে; তারা সব সময় এদিকে নজর রাখছে, তোমার ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি। চল, শিগ্‌গির এখান থেকে সরে পড়ি, আমার কথা শোন, আমার পেছন পেছন এসো।"

কারা কন্‌চার ঘোড়া চালিয়ে অদ্ভুত বৃদ্ধটির অনুসরণ করল। গলিতে এসে বৃদ্ধ পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল, দেখতে দেখতে একটা কানা গলিতে গিয়ে বাঁক নিল। এখানে সে থামল।

"আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি তাতে অবাক হয়ো না। গত এক বছর হল আমি কয়েদখানার ওখানে যাতায়াত করছি, জিন্দানে আটক আমার প্রভুকে রুটি দিয়ে আসি। তাঁর নাম মির্জা ইউসুফ; তিনি ছিলেন খরেজম শাহের মুন্‌শী। শাহ তাঁকে দয়াদাক্ষিণ্য ও স্নেহ করতেন। কিন্তু বুড়ি নেকড়ে তুর্কান খাতুন যখন খরেজমে 'রোষের বিপুল তলোয়ার ও শক্তির বর্শা' হয়ে বসল তখন সে মির্জা ইউসুফের সাদা দাড়ি বা তাঁর দুর্বল শরীরের জন্য বিন্দুমাত্র অনুকম্পা না দেখিয়ে তাকে জিন্দানে ঠেলে দিল।..."

"কিন্তু কেন?"

"তার কারণ হল এই যে মির্জা ইউসুফ তাঁর কিতাবে ঐ বুড়িকে 'পরাক্রান্ত খরেজমের কলঙ্ক' বলে বর্ণনা করেছেন। ধর্মের ধ্বজাধারী ইমামরা কথাটা সুলতানার কানে লাগায়, এখন আমি শহরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করে যা পাই তা কয়েদ ঘরে নিয়ে আসি, অসহায় বুড়োকে খাওয়াই। আমি অপেক্ষা করে আছি কবে অচেনা যাযাবরের দল এই শহরে এসে ঢুকবে। ওরা যখন শহরের লোকজনকে খুন করতে থাকবে, জাসুসীরা যখন ইঁদুরের মতো এদিক-ওদিক ছিটকে পালিয়ে যাবে তখন আমি কয়েদখানায় ছুটে এসে নিজের হাতে এই ইতর চৌকিদারটাকে গলা টিপে মেরে ফেলব আর বুড়ো মির্জা ইউসুফের সঙ্গে সঙ্গে সব কয়েদীকে ছেড়ে দেব। আমি নিজেও তখন আমার দেশে চলে যাব।"

"তোমার দেশ কি অনেক দূরে?"

"অনেক দূরে! আমি রুশদেশের লোক, আমার নাম সাক্‌লাব, তবে আমাদের ভাষায় স্লাভ্‌কো দাদু।"

কারা কন্‌চার চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল।

"ওহে বেগ, বল দেখি তুমি কার খোঁজ করছ?" বুড়ো বলে চলল। 'আমি হয়ত তোমাকে সাহায্য করলেও করতে পারি।"

"কয়েদখানায় কি অনেক মেয়েলোক আছে? চৌকিদার বলল যে সেখানে মাত্র দু' জন বুড়ি আছে।"

"ও মিথ্যে কথা বলেছে! লক্ষ্য করে দেখেছ কি দুর্গে মিনারের অনেক ওপরে ছাদের ঠিক নীচেই ছোট ছোট ঝরকা আছে? সেখানে আছে ছোট ছোট কামরা। ঐ সব কামরায় বন্দী করে রাখা হয়েছে শাহের হারেমের সেই সব মেয়েকে যারা শাহের বশ মানতে চায় নি।"

"তাদের মধ্যে কোন তুর্কমেন মেয়ে আছে কি?"

বুড়ো খানিকক্ষণ ভাবল।

"আমি সমস্ত জেনে নেব। এই চৌকিদার টাকা-কড়ি ভালোবাসে। গায়ের জামা-কাপড় ছেঁড়া খোঁড়া হলে কী হবে লোকটা বড়লোক। কয়েদীদের যা ভিক্ষে দেওয়া হয় ও তার অর্ধেকও তাদের দেয় কি দেয় না, বাকি সবটাই নিজে নিয়ে নেয়। ওর বাড়ি ও বাগান আছে, হারেমে আটটা বিবি আছে।... আমি তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব। গাছের নীচে এই পুরনো ফটকটা দেখছ ত — এখানে আগে আমার প্রভু মুন্শী মির্জা ইউসুফ থাকতেন। আমি তার ঘরবাড়ি আর কিতাব আগলে আছি।... উনি একটা মেয়েকে নিজের হাতে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে তুলেছিলেন, তার নাম বেস্ত জানকিজা; মেয়েটি তাঁকে পুথি নকল করতে সাহায্য করত। সে বুখারায় চলে গেছে, তারপর তার আর কোন পাত্তা নেই। আমি একা পড়ে আছি।..."

"আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি বুড়ো সাক্‌লাব, আমার মনে হয় না যে তুমি আমার মৃত্যু চাও। কাল সকালে আমি এখানে আসব।..."

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গুরগঞ্জ দখলের উপায় — তার বিনাশসাধন

খরেজমে উপস্থিত হওয়ার পর মোঙ্গল বাহিনী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী অবরোধের কাজে নামল না। মোঙ্গলরা প্রথমে গুরগঞ্জের সন্নিহিত পল্লীগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল, তারা পল্লীবাসীদের বন্দী করে নিজেদের শিবিরে তাড়িয়ে নিয়ে আসতে লাগল। চেঙ্গিজ খানের দুই পুত্রই — উগেদেই ও জাগাতাই তিল্লালার পল্লীপ্রাসাদে ঠাঁই নিল, আর কাদান,

বোগ্‌র্চি, তুলেন জের্বি, তাজিবেক প্রমুখ সেনাপতি এবং অন্যান্যেরা অবরোধের যন্ত্রপাতি, অস্ত্রনিক্ষেপ যন্ত্র এবং 'কচ্ছপ' শকট তৈরি করার কাজে উঠে পড়ে লেগে গেল। বহু দূর থেকে যে সব চীনা কারিগর নিয়ে আসা হয়েছিল তারা যাতে দ্রুত শহর দখল করা যায় আক্রমণের জন্য সেই ধরনের যন্ত্রপাতি বানানোর ভার নিল।

অসুবিধাটা হল এই যে ধারে কাছে পাথর ছিল না অর্থাৎ নিক্ষেপ করার মতো কিছুই পাওয়া গেল না। তখন চীনারা প্রস্তাব দিল তুত গাছ কেটে বড় বড় গোলা তৈরি করে সেগুলো যতক্ষণ রীতিমতো ভারী না হয়ে ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত জলে ভিজিয়ে রাখা হোক।

মোঙ্গলদের বিচ্ছিন্ন দলগুলো নানা দিক থেকে শহরের চার ধারে দেখা দিয়ে ফটক থেকে যে সব অশ্বারোহী দল বেরিয়ে আসে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হল, তারা পরক্ষণেই দ্রুত উধাও হয়ে গিয়ে ওদের আবার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু গুরগঞ্জের সৈন্যরা ইতিমধ্যেই সতর্ক হয়ে পড়ল, তারা প্রাচীরের নিরাপদ আড়ালে ফিরে গেল।

শহরে সেনাবাহিনীর প্রধান ছিল সুলতান খুমার তেগিন আর তার অন্তরঙ্গ সহযোগীদের মধ্যে ছিল বুখারা প্রতিরক্ষার জনৈক যোদ্ধা ওগুল হাজিব, এর বুকো পহলবান ও আলি দুরুগি। সামরিক পরামর্শ সভায় খুমার তেগিন মোঙ্গলদের কাছ থেকে পাওয়া কতকগুলো বেনামী চিঠি দেখাল। ঐ সব চিঠিতে অধিবাসীদের বলা হয়েছে তারা যেন মোঙ্গলদের ওপর ভরসা করে ফটক খুলে দেয় — মোঙ্গলরা কারও কোন ক্ষতি করবে না।

"ওদের সঙ্গে কথা বলেই দেখা যাক না।" সুলতান বলল। "সমস্ত লোককে আক্রমণ, হত্যা আর অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্কের মধ্যে না ফেলে ওদের কাছে বড়রকমের ভেট নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা নির্ঝঞ্ঝাটে মিটিয়ে ফেলাই বরং ভালো।"

ওগুল হাজিব এবং অন্যেরা তাতে বাধা দিয়ে বলল:

"বাদশাহ, আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন বুখারা, সমরখন্দ, মার্ভ এবং অন্যান্য শহরের বেলায় মোঙ্গলরা কী করেছে? সেখানেও বাসিন্দারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, অস্ত্র সংবরণ করে। মোঙ্গলরা সুন্দরীদের বেছে নিয়ে মোঙ্গলিয়ায় পাঠিয়ে দেয়, আর বাদবাকিদের লোহা বাঁধানো মুগুরের ঘায়ে পিটিয়ে শেষ করে।"

"তবু, মোঙ্গলরা কী চায় জানা দরকার।"

রাতে ছোটখাটো অনুচরদল সঙ্গে নিয়ে সুলতান খুমার তেগিন গুরগঞ্জ থেকে বেরিয়ে জাগাতাই ও উগেদেই যেখানে ভোজোৎসবে ব্যস্ত ছিল সেই প্রাসাদে এসে উপস্থিত হল। সে উমেদারের ভঙ্গিতে বুকের ওপর দু' হাত ভাঁজ করে তাদের সামনে দাঁড়াল।

"আমাদের জন্য কী এনেছ?" উগেদেই ঠাট্টা করে হেসে জিজ্ঞেস করল। "ফটকের সোনার চাবি কোথায়?"

"পুব দেশের অধিপতি চেঙ্গিজ খানের মহিমা ও পরাক্রমের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, অন্য সব বেগের মতো আমিও তার সেবা করতে চাই।"

"আমাদের দরকার হল গুরগঞ্জ শহর, তোর মতো এই রকম যখন তখন ভোল পাল্‌টানো লোক নয়!" বিরস বদনে জাগাতাই উত্তর দিল। "যে নিজের জাতকে ছেড়ে এসে তার বিরুদ্ধে নামতে পর্যন্ত প্রস্তুত তার মুখের কথায় বিশ্বাস কী? ধর ওকে!"

জল্লাদরা খুমার তেগিন আর তার গোটা দলবলকে পাকড়াও করল। জল্লাদরা তাদের গা থেকে পোশাক খুলে নিল, বিনা রক্তপাতে তাদের শিরদাঁড়া ভেঙে খাতের মধ্যে ফেলে দিল, সেখানে তাদের অর্ধমৃত দেহগুলো শেয়াল-কুকুর ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল।

চেঙ্গিজ খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র জুচি খান যখন তার বাহিনী নিয়ে গুরগঞ্জ উপস্থিত হল ততক্ষণে গুরগঞ্জ মোঙ্গল সেনাদলের বেষ্টনীতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গেছে। অস্ত্র নিক্ষেপের যন্ত্রগুলো প্রাচীরের কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য তিন হাজার মোঙ্গল সৈন্য এবং বন্দীদের একটা জনতা খালের সেতু মেরামতের কাজে লেগে গেল। এমন সময় গুরগঞ্জের ফটক থেকে তুর্কমেন কারা কন্‌চারের নেতৃত্বে সাহসী অশ্বারোহীদের একটি দল হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো। অশ্বারোহীরা কর্মরত মোঙ্গলদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সকলকে হত্যা করল; সেতুর ওপর মৃতদেহের বিশাল স্তূপ পড়ে রইল। এই সাফল্যে অবরুদ্ধ লোকজনের মধ্যে উৎসাহ জাগল।

মোঙ্গলরা তখন তাদের সমস্ত বাহিনীকে শহরের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল, হাজার হাজার ধৃত পল্লীবাসীকে আগে আগে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে প্রাচীরের চার দিকে পরিখা বুজানোর কাজে লাগিয়ে দিল। এর পর অবরোধের যন্ত্রপাতি টেনে নিয়ে গিয়ে শহর আক্রমণ করা সম্ভব হল।

অস্ত্রনিক্ষেপের যন্ত্রগুলো ভিজে কাঠের গোলার সঙ্গে সঙ্গে দাহ্য তরল পদার্থে ভর্তি চীনদেশীয় ঘড়া ছুঁড়ে মারতে লাগল। সেগুলো থেকে এমন ভয়ঙ্কর আগুন জ্বলে উঠল যে কাঠের দালান কোঠা উজ্জ্বল অগ্নিশিখায় ছেয়ে গেল, সে আগুন নেভানো অসম্ভব হয়ে পড়ল।

উত্তর দিক থেকে জুচি খানের বাহিনীর আক্রমণ হল আরও চূড়ান্ত। সেখানে শহরের দেয়ালের নীচে বন্দীদের দিয়ে সুড়ঙ্গ খোঁড়া হল। মোঙ্গলরা শহরের ভেতর ঢুকে পড়ল এবং মরিয়া সঙ্ঘর্ষের পর দেখতে দেখতে উত্তরের চৌকি বুরুজের শীর্ষে মহামান্য মোঙ্গল খানের পুত্রের বিশাল শ্বেত পতাকা উড়ল।

এতে জাগাতাইয়ের ঈর্ষা ও ক্রোধের আর অবধি রইল না। গুরগঞ্জের প্রাচীরের গায়ে সে সারি সারি সৈন্য এনে ফেলল, কিন্তু প্রাকারে রক্ষাকারীরা অবিশ্বাস্যরকম দৃঢ়তার পরিচয় দিল — যে সব মোঙ্গল দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠতে গেল তাদের ইঁট দিয়ে আঘাত করল, গায়ে টগ্‌বগে গরম আলকাতরার ধারা ঢালতে লাগল আর তার ফলে আক্রমণকারীরা পুড়ে, সেদ্ধ হয়ে একের পর এক মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল।

নবম পরিচ্ছেদ

'চিরবিস্মৃতির কারামিনারে' কারা কন্‌চার

বুড়ো সাক্‌লাবের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে কারা কন্‌চার বেশ কয়েকবার গাছের নীচের সাবেকী ফটকটার কাছে এসে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। অবশেষে তার দেখা মিলল। বুড়োর গায়ে এখন আর আগের মতো ছেঁড়া খোঁড়া জামা-কাপড় নেই, তার গায়ে চড়েছে ডোরা কাটা জোব্বা, মাথায় নীলরঙা পাগড়ি। তাকে দেখে চট্ করে চেনার জো নেই।

"বাহাদুর বেগ, আমি যা যা জেনেছি আর যা যা করেছি তা শিগ্‌গির-শিগ্‌গির তোমাকে যে বলতে পারি নি তার জন্য মাফ চাইছি। কয়েদখানার চৌকিদার মুখে যেন ঠিক কুলুপ এঁটে আছে। মনে হল সে জাসুসীদের ভয় পাচ্ছে, কিংবা ওদের সঙ্গে তার সাঁট আছে। কত ভাবেই না লোকটার সঙ্গে কথা বলে দেখলাম! বললাম, কয়েদখানা সাফ করে দেব, তাতে

ত সে রেগেই আগুন। কিন্তু যখন আমি বললাম রোজ এক জোড়া করে চাপাটি পেলে ওর বাসায় কাজ করতে পারি তখন খুশি হল, তার আটটা বিবি দেখাশোনা করার ভার আমার ওপর দিল।... আমি তার দজ্জাল বড় বিবিটাকে ধোলাই দিয়ে দিতে ও আমাকে এই জোব্বা আর পুরনো পাগড়ি উপহার দিল।...”

“কোথাকার কোন বিবি আর জোব্বা নিয়ে কী সব আবোল-তাবোল বকছিস!” কারা কনচার ক্রোধে ফেটে পড়ল। “আমি তোকে পাঁচটা সোনার দিনার দিয়েছিলাম। তুই কী করলি? যা যা জানা দরকার জেনেছিস কি?”

“জেনেছি বৈ কি! নজর নানা চুপচাপ থাকলে কী হবে, তার বিবিরা কি আর মুখ বুজে থাকার পাত্রী? তারা অনেক আগেই ওর কাছ থেকে সব ব্যাপার-স্যাপার জানে, আর আমি ওদের কাছ থেকে জেনে নিলাম।... এই কয়েদ মিনারে বেশ কয়েকটি কুঠুরি আছে, চড়ুই পাখির বাসার মতো সেগুলো দেয়ালের ভেতরে গাঁথা। আর মিনারের কড়িকাঠ পচে গেছে, মেঝে ভেঙেচুরে পাতাল ঘরে গিয়ে পড়েছে।”

“শয়তান সেই সঙ্গে তোকেও সেখানে ফেলে দিক!”

“এই কুঠুরিগুলো পর্যন্ত পৌঁছানো কঠিন, পচা দড়িতে বাঁধা কাঠের মই বেয়ে উঠতে হয়। আগে চৌকিদার নজর নানা নিজেই ঐ মই বেয়ে উঠত, এখন সেও ভয় পায়।...”

“ঐ কুঠুরিগুলোতে কারা আছে?”

“আছে সেই সব মানুষ যারা খরেজম শাহের বিষ নজরে পড়েছে। ছাদের ঠিক নীচেই একটা কুঠুরিতে আটকে রাখা হয়েছে এক অল্পবয়সী তুর্কমেন মেয়েকে।...”

“তার নাম বল!” কারা কনচার বুড়োর কাঁধ চেপে ধরল।

“লোকে বলে তার নাম হল... গুল জামাল।”

“এক্ষুণি আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।”

“আরে এখন হয় না কি? প্রাসাদের ফটকের কাছেই দু'শ' জাসুসী বসে আছে, তারা স্রেফ কাজ না করে করে হাঁপিয়ে পড়েছে। অপেক্ষা করছে কার টুঁটি টিপে ধরা যায়, আর তুমি কিনা সটান সেখানে ঢুকতে চাও। শেষকালে নিজেই জিন্দানে গিয়ে আটকে পড়বে।”

"চোপ রও, ভীতু কোথাকার! কয়েদখানার সামনে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কর। আমি এক্ষুনি ওখানে গিয়ে সকলের ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেব!" এই বলে কারা কন্‌চার ঘোড়ার পিঠে চাবুক হাঁকিয়ে, ধুলোর ঝড় তুলে সরু রাস্তা ধরে চলে গেল।

শহরের যে মহল্লায় নানা জাতের হুনুরীর — কামার, তামার কারিগর, অস্ত্রকার এবং লোহার জালিবর্ম, অন্যান্য বর্ম ও ঢাল তৈরির নিপুণ ওস্তাদ্‌দের বসতি ও কাজের জায়গা ছিল কারা কন্‌চার সেখানে এসে হাজির হল। নেহাইয়ের ওপর অসংখ্য হাতুড়ির আঘাতের ঠক্‌ঠক্‌ ও ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে কানে তালা লাগার উপক্রম।

এখানে কর্মচাঞ্চল্য অর্ধেক মাত্র। যে সব কারিগর অস্ত্র বানিয়ে থাকে কেবল তাদের কাজকর্মই জোর চলছিল। মরুতে বসে কার দরকার পড়েছে তামার তৈরি নানা ধরনের গামলা, কলসী কিংবা ঘোড়ার জন্য পরিপাটি সাজসজ্জা?

কারা কন্‌চার কোলাহল ও তর্কবিতর্ক রত কামারদের একটা ভিড় দেখতে পেল। গম্ভীর চেহারার অশ্বারোহীর আবির্ভাব কৌতূহল জাগিয়ে তুলল, তারা চুপ করে গেল। মিশ কালো ঘোড়ার এই সওয়ার এখানে কী চায়?

কারা কন্‌চার ঘোড়া ছুটিয়ে ভিড়ের মাঝখানে ঢুকে পড়ল, তারপর উত্তেজিত স্বরে বলতে লাগল:

"ওহে ওস্তাদের দল! তোমাদের হাতের মুঠো না লোহার মতো, বুকের পাটা না তামার মতো? এই খানেরা ও বেগেরা আর কত দিন তোমাদের নিয়ে তামাসা করবে? প্রথমে ত খরেজম শাহ তোমাদের শোষণ করেছে। সিন্দুকভর্তি সোনাদানা নিয়ে সে ইরানে পালিয়েছে। সুখের বিষয় এই যে তার সঙ্গে সঙ্গে কুচক্রী নেকড়ে — তার মাও বিদেয় হয়েছে। এখন জালিয়াত সুলতান খুমার তেগিন আমাদের দুশমনদের দলে গিয়ে ভিড়েছে, তাদের বলে দিয়েছে কোন দিক থেকে গুরগঞ্জের দেয়াল ভাঙা সহজ। আর কতদিন তোমরা চোখ বুজে অপেক্ষা করবে কবে কোন নতুন সুলতান এসে আবার তোমাদের বিকিয়ে দেবে? তোমরা কিসের অপেক্ষায় আছে? চল, আমরা প্রাসাদে ঢুকি, এই সাপের ডেরাটাকে ভেঙে তছনছ করে দিই, সেই সঙ্গে জিন্দানের লোহার দরজা ভেঙে পাতাল ঘর থেকে বন্দীদের উদ্ধার করি। সেখানে যারা কষ্ট ভোগ করছে তারা ডাকাত

নয়, খুনেও নয়, তারা হল সেই সব মানুষ যারা সুলতানের মুখের ওপর অপ্রিয় সত্যি কথা বলেছে।''

"চল, চল! খরেজম শাহের প্রাসাদ ভেঙে চুরমার করব!" উপস্থিত সকলে চেঁচিয়ে উঠল। "জিন্দান ভাঙতে হবে!"

"হাতুড়ি নাও, সাঁড়াশি আর বাটালি নাও, শেকল ভাঙার জন্য যা যা দরকার সঙ্গে নাও। জিন্দানে আমাদের ভাইরা মরতে বসেছে — তাদের বার করে আনার জন্য যা কিছু দরকার হাতে নাও।"

হাতুড়ি, তরবারি ও বর্শা যে যা হাতের কাছে পেল তুলে কামার ও অস্ত্রকার, তামার কারিগর এবং অন্যান্য কারিগর — সকলে মিলে প্রাসাদের দিকে ছুটল।

সশস্ত্র রক্ষীদের কেউ কেউ এগিয়ে এসে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু উল্টে তারাই প্রহারে জর্জরিত ও পদতলে পিষ্ট হল। কামারের দল যতক্ষণ প্রাসাদে তাণ্ডব চালাল ততক্ষণে কয়েক জন লোক বন্দীশালার লৌহকপাট খোলার কাজে কারা কন্‌চারকে সাহায্য করতে লাগল। চৌকিদার নজর নানা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে হলফ করে বলে যাচ্ছিল যে বরাবর নিজের ছেলেপুলেদের মতোই বন্দীদের যত্ন-আত্তি করে এসেছে।

কামাররা চট্‌পট্ লৌহকপাট খুলে ফেলল।

কামারদের সঙ্গে সঙ্গে নীচে দৌড়ে এসে তুগান চেঁচিয়ে বলল:

"জলদি নীচে, পাতাল ঘরে চল! সেখানে অসহায় অবস্থায় আমার বন্ধুরা পড়ে আছে, ঘন অন্ধকারে থেকে থেকে তারা অন্ধ হয়ে গেছে। অনেকেরই নিজে নিজে বের হওয়ার ক্ষমতা নেই, তাদের পা কেটে ফেলা হয়েছে।..."

কয়েক জন লোক পাতাল ঘরের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোটরে নেমে গেল।

সেখান থেকে জড়াজড়ি করে ধুলো কাদা মাখা কয়েদীর দল আলুথালু বেশে বেরিয়ে আসতে লাগল; তাদের হাতে পায়ে দীর্ঘ ধারালো নখ, চুলে জটা। বছরের পর বছর অন্ধকারে থাকার ফলে তারা চোখে ভালো মতো দেখতে পায় না, তাদের মাথা ঠুকে যায়, সকলে হাতড়ে হাতড়ে চলে, আবার মুক্ত লোকজনের মাঝখানে আকাশের তলে, সূর্যালোকে বেরিয়ে আসার এ সৌভাগ্য বিশ্বাস করতে না পেরে তারা কাঁদে আর হাসে।

"বাজারের মাঝখান দিয়ে যাও," জনতা চেঁচিয়ে বলল। "সকলে

দেখুক খরেজম শাহে তার প্রজাদের কী হালে রেখেছিল! ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পরিষ্কার জামা আর সালোয়ার চেয়ে নাও।"

কারা কন্‌চার জ্বলন্ত মশাল নিয়ে মিনারের ভেতর পা বাড়াল। সেখান থেকে ঠাণ্ডা ও সে'তসে'তে দমকা হাওয়া ভেসে এলো। আতঙ্কগ্রস্ত চৌকিদার বারবার প্রার্থনা উচ্চারণ করতে করতে কারা কন্‌চারের ঠেলা খেয়ে আগে আগে চলতে লাগল। সে নড়বড়ে সি'ড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। তার পিছু পিছু তুগান হাতুড়ি দিয়ে কয়েদীদের দরজার তালা ভেঙে চলল। ছিন্নবস্ত্র পরনে অবসন্ন, শীর্ণ ও করুণ চেহারার মেয়েরা দলে দলে বেরিয়ে আসতে লাগল। কান্নার রোল তুলে টলতে টলতে, দেয়াল ধরে তারা নীচে নামল।

ছাদের খিলানের ঠিক তলদেশ পর্যন্ত কারা কন্‌চার যখন উঠে এসেছে তখন চৌকিদার লৌহ কপাটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে ছোট্ট একটা চৌকো কোটর লোহার গরাদে ঢাকা।

চৌকিদার বলল:

"এখানে প্রাসাদের হারেমের একটা মেয়েকে 'আজীবন ও আমরণ' আটক করে রাখা হয়েছে। মেয়েটির এত দুঃসাহস যে খোদ শাহ মুহম্মদের গায়ে হাত তুলেছিল।"

"দাঁড়িয়ে রইলি কেন? দরজা খোল!"

"রাগ করবেন না হুজুর, এ দরজার চাবি বাদশাহের কাছে থাকে।"

"তার মানে, তোর কাছে চাবি নেই?"

"না কর্তা। আল্লাহের দিব্যি, নেই!"

"তাহলে জাহান্নামে যা!" এই বলে কারা কন্‌চার চৌকিদারকে ঠেলে ফেলে দিল। মরিয়া আর্তনাদ করতে করতে সে নীচে গিয়ে পড়ল, পড়তে পড়তে কড়িকাঠে ধাক্কা খেল, তারপর আতঙ্কগ্রস্ত কুকুরের দলের করুণ আর্তনাদ ও গর্জনের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কারা কন্‌চার দরজার ছোট ফোকরে চোখ রাখল। সূর্যের বাঁকা আলোয় তার নজরে পড়ল পুরনো ফরাসের একটা টুকরো মাত্র।

"ও কোথায়?" কারা কন্‌চার ভাবল। "কুঠুরি ত খালি দেখছি।... তাহলে কি বেঁচে নেই?"

এমন সময় তার সামনে ছায়া ভেসে উঠল, তামাটে রঙের একটা মুখ

দেখা গেল। কালো রঙের বড় বড় দু'টি চোখের অপলক দৃষ্টি তার দিকেই নিবদ্ধ।

কারা কন্‌চার অনেক দিন ধরে প্রাচীন গীত থেকে কত সুন্দর সুন্দর কথাই না মনে মনে তৈরি করে রেখেছিল! কিন্তু ভয়চকিত মৌমাছির ঝাঁকের মতো সে সব আজ কোথায় উড়ে চলে গেল! তার মুখ থেকে শুধু বেরিয়ে এলো:

"আমি!"

একটা লাজুক, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ফিস্‌ফিসিয়ে বলল:

"আলো জ্বালাও, দেখি তোমার মুখ দেখে চিনতে পারি কি না।"

কারা কন্‌চার একটু সরে গিয়ে জ্বলন্ত মশাল তুলে নিল।

"তোমার মুখজোড়া বুনো জানোয়ারের থাবার আঁচড় দেখে তোমাকে চিনতে পারলাম। এ ত তুমিই, যাকে কেউ ধরে রাখতে পারে না, কোন কিছুই বাধা দিতে পারে না!"

"দরজা থেকে সরে দাঁড়াও, এখনই তোমাকে বার করে আনছি।"

কারা কন্‌চার লক্ষ্য করল এক অতি শীর্ণকায় তরুণীর ছিমছাম ছায়া পেছনে সরে গেল, দেখত পেল ধীরে ধীরে সে রঙিন ফরাসের ছেঁড়া টুকরোর ওপর বসে পড়ল। তার তামাটে অর্ধনগ্ন শরীরে সূর্যের আলো এসে পড়ল। রক্ত বর্ণের শতচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড এবং নীলরঙা পুঁতির মালার কয়েক পলতা সুতো তার দেহের লজ্জা কোনরকমে নিবারণ করে রেখেছে। তার আয়ত কালো চোখে বিষাদ ও উৎকণ্ঠার ছায়া।

"আমাকে একবার দাও দেখি কারা কন্‌চার," সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলল। "কারা-কুমের মহাবীরের চেয়ে তালা খোলার ব্যাপারে কামার অনেক বেশি ওস্তাদ।"

কামার হাতুড়ির ঘায়ে তালা ভাঙল। লৌহকপাট খুলে গেল। গুল জামাল দু' হাতে দেহ ঢেকে বসেই রইল।

"আমার পরনের কাপড় বলতে আর কিছুই বাকি নেই। তোমার সামনে আমি দাঁড়াতে পারছি না।"

কারা কন্‌চার পিছু হটে এসে অল্পবয়সী কামারকে বলল:

"মেয়েলোকের দিকে অমন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকবি না। তোর চাপকানটা ওকে দে দেখি, আমি তোকে পরে রেশমের চাপকান দেব।" এই বলে সে ঘুরে বিধ্বস্তপ্রায় সরু সিঁড়ি বেয়ে মিনারের ছাদে উঠল।

সেখান থেকে সে দেখতে পেল চার দিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে, স্ফুলিঙ্গ ও লেলিহান শিখা নিয়ে সে কুণ্ডলী ঘূর্ণিবেগে আকাশের দিকে ধেয়ে চলেছে। শহর দাউদাউ জ্বলছে। শহরের প্রাচীরের চার ধারে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে অশ্বারোহী দল ছুটছে। দূরে বুরুজশীর্ষে জুচি খানের সাত পুচ্ছবিশিষ্ট শ্বেত পতাকা উড়ছে।...

গুল জামাল ছাদের চত্বরে বেরিয়ে এলো। নীল পাগাড় আর পুরুষের চাপকানে তাকে দেখাচ্ছে ছিপছিপে এক বালকের মতো। বিস্ময়ে ভ্রূধনু ভঙ্গিমা করে সে দূরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

"গুরগঞ্জে কী হচ্ছে? শহরের দেয়ালের সামনে এই বিদ্‌ঘুটে লোকগুলো কোত্থেকে?"

"যুদ্ধ এখানেও এসে গেছে," কারা কন্‌চার উত্তর দিল। "দুশমনরা গুরগঞ্জ ঘেরাও করেছে।... এখন আমি আর তুমি সব সময় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করব। যুদ্ধের আগুন আর তোমার বিষণ্ণ চোখের জল আমাদের মিলন ঘটিয়েছে।"

"এই ভয়ঙ্কর মিনারে থেকে থেকে আমি সব কিছু ভুলে গেছি, শিখেছি কেবল ঘৃণা করতে। আমি আর আগেকার সেই অবলা গুল জামাল নই, ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মতো সব জায়গায়ই তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব।"

গুল জামালের কথার দিকে কারা কন্‌চারের আর মনোযোগ ছিল না। করতলে চোখ আড়াল করে উত্থিত ধোঁয়া ও ধুলোর কুণ্ডলী ভেদ করে সে এক পাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

"এই বদ্ধ উন্মাদগুলো করেছে কী! দেখ! — মহানদী জাইহুন কূল ছাপিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।... বাড়িঘর ধুয়ে মুছে যাচ্ছে, খেলার ঘরের মতো চুরমার হয়ে পড়ে যাচ্ছে! ঐ দেখ! — উঁচু উঁচু গাছ মড়মড় শব্দে কাটা গাছের মতো ভেঙে পড়েছে।... হাজার বছর ধরে যে পুরনো বাঁধ জলভরা উত্তাল নদীর ধারা বেঁধে রেখেছিল এই নিরেট, নির্মম জংলীগুলো তা ভেঙে দিয়েছে।...* এখন নদী পথে সমস্ত কিছু তছনছ করে লোকজনে জমজমাট গোটা শহরকে ডুবিয়ে দেবে, ধ্বংস

---

* 'মোঙ্গলরা নিজেরাই বাঁধ ধ্বংস করে, তার ফলে জল ঢুকে পড়ে গোটা শহর ডুবিয়ে দেয়। বাড়িঘর ধসে পড়ে এলাকা জুড়ে থেকে যায় জলরাশি।' (ইবন আল-আসির, ত্রয়োদশ শতক)

করবে।... গুল জামাল, আর দেরি না করে এই পুরনো মিনার থেকে পালাতে হয় : জলের চাপে এটা ভেঙে পড়বে আর আমরাও চাপা পড়ব।..."

মোঙ্গলরা যে সমস্ত বন্দীকে আক্রমণ করার জন্য ঠেলে দিয়েছে তাদের অবিরাম আঘাতে শহরের একটা বড় অংশ ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও গুরগঞ্জের অধিবাসীরা প্রবলভাবে বাধা দিয়ে চলেছে। মোঙ্গলরা মহল্লার পর মহল্লা দখল করছে। খোলা মাঠে ঘোড়ায় চেপে লড়াই করতে অভ্যস্ত মোঙ্গলরা জ্বলন্ত দালান কোঠার ধ্বংসস্তূপে রুদ্ধ সংকীর্ণ রাস্তার ওপর দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে চলল, তবে তাদের তুমুল আক্রমণে ছেদ পড়ল না, দীর্ঘ তীরের মোক্ষম আঘাতে তারা প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে লাগল।

গুরগঞ্জের কারিগররাই ছিল সবচেয়ে মারমুখো যোদ্ধা। বন্দী হলে যে কপালে কী আছে তা তাদের জানা ছিল : যারা বেশ দক্ষ ও শক্তসমর্থ, মোঙ্গলরা তাদের ধরে বহু দূরে নিজেদের দেশে চালান করে দেবে আর বাদবাকি অযোগ্যদের মেরে ফেলবে।

ঘরের মেয়ে-বৌরাও বাড়ির দেয়াল ও ছাদের ওপর তাদের পিতা, স্বামী ও ভ্রাতাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করে চলল। তাদের মধ্যে কেউ তীরবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেলে মেয়েরা নির্ভয়ে এগিয়ে এসে নতুন করে তীরের আঘাত থেকে আহতকে রক্ষা করার জন্য তার সামনে ইঁট ও মাটি দিয়ে দেয়াল গড়ে তোলে।

গুরগঞ্জের বীরোচিত প্রতিরোধ বিশাল খরেজম সাম্রাজ্যের শোচনীয় পতনের কাহিনীতে এক অসাধারণ অধ্যায় সংযোজন করল। অন্যান্য শহর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোঙ্গলদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস, ভীরুতা ও দৌর্বল্যের পরিচয় দিয়ে নিজেদের গ্লানিকর পতন ডেকে আনে। গুরগঞ্জের চতুর্দিকে মোঙ্গলরা অনেক অনেক সৈন্য হারায়, নিহতদের অস্থিপঞ্জরের সারি সারি স্তূপ জমে ওঠে; বহু বছর পরেও ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে সেগুলো চোখে পড়ত।

আর মাত্র তিনটি মহল্লা যখন মোঙ্গলদের হাতে যেতে বাকি তখন গুরগঞ্জের ক্ষতবিক্ষত প্রতিরোধকারীরা আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিল। তারা বাছাই করা কয়েক জন লোককে দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষার প্রার্থনা জানানোর জন্য জুচি খানের কাছে পাঠাল। চেঙ্গিজ খানের পুত্র তার উত্তরে বলল :

"তোমরা তা হলে আগে কী ভেবেছিলে? আমার ফৌজ যখন শহরের

দিকে এগিয়ে এলো তখনই তোমরা বশ মানলে না কেন? এখন আমার এত সেরা সেরা যোদ্ধা হারানোর পর কি আমি আমার সৈন্যদের মনের সুখে ক্রোধ মেটানো আর লুটতরাজের কাজে বাধা দিতে পারি? কোন ক্ষমা নেই।"

শহরের যে অংশটা তখনও টিকে ছিল মোঙ্গলরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রতিরোধকারীদের কাউকে বন্দী করল, কাউকে বা হত্যা করল, সমস্ত ধনসম্পদ লুটপাট হয়ে গেল।

খরেজম রত্ন গুরগঞ্জ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হাতে গিয়ে পড়ে এমন ইচ্ছে খান জাগাতাইয়ের ছিল না, তাই খরেজম জুড়ে জলবণ্টনের যে প্রধান বাঁধ ছিল তার হুকুমে মোঙ্গলরা সেটা ভেঙে দিল। বিশাল শহর জলমগ্ন হল, ঘরবাড়ি ধুয়ে মুছে গেল। বহু বছর বাদেও শহরের জায়গাটা জলময় হয়ে পড়ে ছিল। তাতারদের হাত থেকে যারা উদ্ধার পেল তারা হয় কূলপ্লাবী নদীর ঢেউয়ের আঘাতে ডুবল কিংবা ধ্বংসস্তূপের নীচে প্রাণ হারাল। রক্ষা পেল মাত্র গুটিকয়েক ইমারত — ইঁটে তৈরি প্রাচীন প্রাসাদ কেশাকি আকচাকের একাংশ এবং শাহ পরিবারের দু'টি সমাধি ভবন।

নদীর উত্তাল জলস্রোত খরেজমের আরও কয়েকটি শহরকেও ডুবিয়ে দিল, আর নদীর গতিপথও পালটে গেল — এর পর বহুকাল ধরে মরু বালুরাশি ভেদ করে নদী আবেস্কুন সাগরের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে।

গুরগঞ্জের মরণপণ প্রতিরোধের সময় হাজি রহিম প্রতিরোধকারীদের সঙ্গে নগর প্রাকারের ওপর ছিল। ক্ষতবন্ধন ও ক্ষতচিকিৎসার আরবী পদ্ধতি তার জানা থাকার ফলে সে আহতদের শুশ্রূষা করতে লেগে গেল।

অতর্কিতভাবে জাইহুন নদীর প্লাবন দেখা দিলে সে দু'দিন শাহ তাকাশের সমাধির ইঁটে তৈরি উঁচু ভবনের শীর্ষে উঠে বসে রইল। পাশ দিয়ে একটা নৌকা যাচ্ছিল — দেখা গেল তার কর্ণধার দরবেশের সেই পূর্বপরিচিত কামার করিম গোলাম। করিম গোলাম তাকে নিজের নৌকোয় উঠিয়ে নিল, উন্মত্ত জলরাশির ওপর দিয়ে একসঙ্গে নৌকো ভাসিয়ে যেতে যেতে তারা যাকে যাকে পারল বাঁচাল। কারা কন্‌চার ও গুল জামালের দেখা তারা আর পেল না। বহু দিন পরে সে চারণকবিদের মুখে একাধিকবার শুনেছে কারা-কুমের বুকে মোঙ্গলদের পশ্চাদ্ধাবনরত কারা কন্‌চারের কীর্তিকাহিনী, শুনেছে শেষ খরেজম শাহের হারেমে বন্দিনী রাখাল মেয়ে গুল জামালের প্রতি তার অপরিসীম প্রেমের কাহিনী।

চারণকবির গাথার উপসংহারে বর্ণনা থাকত সেই ভয়াবহ জলপ্লাবনের, যাতে খ্যাতিমান ও সমৃদ্ধ নগর গুরেগঞ্জ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কারা কন্‌চার এই উত্তাল জলরাশির বন্যাস্রোতে পড়ে যায়। কেউ কেউ তাকে গুল জামালকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে তরঙ্গের সঙ্গে যুঝতে দেখেছে, শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড বন্যাস্রোতে নাকি দু'জনেই অদৃশ্য হয়ে যায়।... জলের ওপর জেগে থাকা একটা উঁচু মতো জায়গায় দু'টি প্রাণহীন দেহ পাওয়া যায়: গুল জামাল ও কারা কন্‌চার পাশাপাশি শায়িত। তুর্কমেন কিশোরীর ক্ষুদ্র হাতেটি কারা কন্‌চারের দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরা।...

চারণকবি তার গাথা শেষ করত এই উপদেশ দিয়ে: "সত্যিকারের টান সেই প্রেমেই আছে যার একমাত্র বিচ্ছেদ — মরণে।"* এতে মেয়েরা অশ্রুবিসর্জন করলে চারণকবি বলতে: "অবশ্য ওয়াকিবহাল লোকজন আমাকে অন্য কথাও বলেছে। তাদের কথায়, জাইহুনের ঢেউয়ে কারা কন্‌চারের মৃত্যুর সংবাদটা বিশ্বাসযোগ্য নয় — সে বন্যাস্রোত থেকে সাঁতরে তার মিশকালো ঘোড়ায় চড়ে বসে, গুল জামালকে বাঁচায়। গুল জামালকে নিয়ে সে চলে যায় কারা-কুমের গহনে, বালা-ইশাম কুয়োর অদূরে নিজের ছাউনিতে। সেখানে তারা বহু বছর সুখে বসবাস করে। তোমাদের সকলেরও সেই সুখ কামনা করি!"

দশম পরিচ্ছেদ

বালক বাতু খান সকাশে হাজি রহিম

> দুর্বল শিশুকে অবজ্ঞা করো না — সে
> শিশু সিংহশাবকও হতে পারে।
>
> (আরবী প্রবচন)

হাজি রহিম কষ্টেসৃষ্টে মোঙ্গল সেনাদলের হৈ-হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে জুচি খানের শিবিরে এসে পৌঁছাল। দরবেশের তাজে বাজপাখি খোদাই করা সোনার ফলক বাঁধা থাকায় সে বেঁচে যায় এবং শেষ পর্যন্ত বিশাল

* ইবন-হাজমের (একাদশ শতক) হিতোপদেশ থেকে।

মোঙ্গল সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম উলুসের শাসকের শ্বেত ছাউনিতে উপনীত হতে পারে। হাজি রহিম শুনেছিল যে ভয়ঙ্কর চেঙ্গিজ খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র জুচি খানই হল মোঙ্গল অধিপতির পার্শ্বচরদের মধ্যে একমাত্র লোক যে তার সঙ্গে বাদানুবাদ করার সাহস রাখে। তবে লোকে একথাও বলে যে জ্যেষ্ঠের ওপর চেঙ্গিজ খানের আস্থা নেই, তার সব সময়ই সন্দেহ এই বুঝি জুচি ষড়যন্ত্র করার মতলব আঁটছে। এই কারণে চেঙ্গিজ খান তাকে দূরতম এমন এক প্রত্যন্ত উলুসের শাসক করে দেয় যেখানকার বেশির ভাগই তখনও জয় করা হয় নি। চেঙ্গিজ খান তখন পুত্রকে বলে: "পশ্চিমে যত দূর মোঙ্গলদের অশ্বখুর পড়তে পারে ততদূর পর্যন্ত সমস্ত জমি তোমাকে দিলাম!"

শ্বেত ছাউনিতে নীচু মতো একটা তখ্‌তে পা গুটিয়ে বসে ছিল জুচি খান। সে তার পিতার মতোই দীর্ঘকায়, তার চালচলনও সেই রকম ভালুকের মতো, সেইরকমই ঈষৎ সবুজ তার চোখের নিরাবেগ দৃষ্টি। শ্মশ্রুগুম্ফহীন মোঙ্গলদের সঙ্গে তার প্রভেদ দীর্ঘ গোঁফের রেখায় এবং ছুঁচাল কালো দাড়িতে। দাড়ির সঙ্গে নিপুণভাবে পাকানো ঘোড়ার চুলের একটি সরু বিনুনি — বিনুনিটাকে জুচি ডান কানের ওপর ফেলে রাখে। তখ্‌তের সামনে উমেদারদের একটা জনতা হাঁটু মুড়ে আভূমি নত হয়ে বিনীতভাবে মহামান্য শাসকের অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় অপেক্ষা করছিল। তাদের মধ্যে ছিল খান ও আলিমের দল, ছিল বণিক আর সাধারণ খরেজমবাসী।

উমেদারদের কাঁধ ডিঙিয়ে যেতে যেতে হাজি রহিম বারবার দরাজ গলায় হাঁক দিতে লাগল "ইয়া-হু-উ-উ! ইয়া-হাক্!" সটান জুচি খানের তখ্‌তের সামনে এসে যষ্টিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

জুচি খান কঠিন অপলক দৃষ্টিতে দরবেশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

"কী চাই তোর, কিপচাক শামান?"

হাজি রহিম বলল যে সে খাস উজির মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচের নিজের হাতে লেখা চিঠি নিয়ে এসেছে।

"এত দেরি কেন? আমি অনেক দিন ধরে চিঠির অপেক্ষায় আছি।"

"গুরগঞ্জে আটক পড়ে গিয়েছিলাম।"

"তার মানে তুই আমার দুশমনদের সঙ্গে ছিলি?"

"হ্যাঁ, আমি হেকিম হয়ে আহতদের চিকিৎসা করেছিলাম।"

হাজি রহিম তার যষ্টির মোমে ঢাকা অগ্রভাগ খুলে লাল ছাপ মারা কাগজের মোড়ক টেনে বার করল। জুচি খানের কলমচী কাগজটা মেলে ধরে দেখার পর অবাক হয়ে গেল।

"এখানে সাকুল্যে তিনটি কথা লেখা আছে: 'একে বিশ্বাস করবেন!'"

"সাফ কথা, যথেষ্ট!" জুচি বলল। "আমার ছেলে বাতু খানকে নিয়ে এসো!"

নোকররা ছুটে গেল, শিগ্‌গিরই ফিরে এলো। তাদের সামনে লাফাতে লাফাতে আসছে বছর নয়েকের এক বালক — তার কাঁধে মাঝারি আকারের ধনুক, সঙ্গে তিনটি লাল তীর।* দুই বুড়ো নোকর তাকে হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু বালক তাদের নাগাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করতে থাকে। জুচি খানের সামনে ছুটে গিয়ে সে তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে নতজানু হয়ে গালিচায় মাথা ঠেকিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল, বাদামী রঙের উজ্জ্বল চোখ দু'টি বিস্ফারিত করে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখতে লাগল।

"এই হল আমার ছেলে বাতু খান!" জুচি আড়চোখে বালকের দিকে চেয়ে বলল। "আমি আমার অনুগত মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌কে বলেছিলাম এমন একজন জ্ঞানী-গুণী মির্জা পাঠাতে যে আমার ছেলেকে আমার নতুন প্রজাদের ভাষা — খরেজমের লোকজনের ভাষা লিখতে ও বলতে শেখাতে পারে। তুমি কি তা পারবে?"

"আমি এই বাচ্চাকে তুর্কমেন, ফারসী ও আরবী ভাষার কিতাব পড়তে শেখাতে পারি, আর সে কাজ আমি সানন্দেই করব," হাজি রহিম উত্তর দিল। "তবে আমি মসজিদের ইমামদের মতো ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা করতে পারি না। আমার কারবার হল সেই সব কিতাব নিয়ে যেখানে বিশ্ব ভ্রমণের বর্ণনা আছে, যেখানে ভালো ও মন্দ কাকে বলে, স্বদেশপ্রেম কী জিনিস, প্রতিটি মানুষের কর্তব্য কী তা বোঝানো হয়েছে।..."

"এটা উপকারী, ভালো!" জুচি বলল। "এধরনের গুরু পেলে স্তেপের বুনো ছালচামড়া ছাড়িয়ে আমার ছেলেকে শাসকের জাতে তোলা

---

* তিনটি লাল তীর — উচ্চ খান বংশের প্রতীক।

শাবে। বাতু, তোমার নতুন গুরুমশায়ের কথা মন দিয়ে শুনবে কিন্তু! আর মির্জা, দরকার হলে ওকে বেতও মারতে পার।...”

বালক মুখ ফিরিয়ে নিল।

“ও যদি আমাকে মহাবীরদের কথা, যুদ্ধের গল্প শোনায় তাহলে ওর কথা হয়ত শুনতে পারি।”

হাজি রহিম বালককে জবাব দিল:

“আমি তোমাকে রুমি সেনানায়ক জুলকার্ণাইন ইস্কান্দারের দিগ্বিজয়ের গল্প বলব। এই রাজা যখন নেহাৎই ছেলেমানুষ তখনই তিনি অনেক অনেক দেশ জয় করেন — সে সব দেশের রাজারা, কী অস্ত্রশস্ত্রে, কী ধনসম্পদে আর কী সেনাদলে তার চেয়ে বড় হলে হবে কী ইস্কান্দারের কাছে তাঁদের সব্বার হার হল।...”

বালক দরবেশের দিকে মুখ ফিরিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

“খান ইস্কান্দার কী করে এমন দিগ্বিজয়ী হল?” জুচি খান জিজ্ঞেস করল।

“লোকে বলে স্বয়ং ইস্কান্দারকে যখন এ প্রশ্ন করা হয় তখন না কি তিনি উত্তরে বলেছিলেন: ‘আমি বিজিত দেশের প্রজাদের ওপর অত্যাচার করি নি’।”

জুচি খান তার পুত্রের দিকে তাকিয়ে বলল:

“আমার পিতা অদ্বিতীয় ও মহামান্য চেঙ্গিজ খান দুনিয়ার অর্ধেক জয় করে নিয়েছেন, আর বাকি অর্ধেকটা নিয়েছেন জুলকার্ণাইন ইস্কান্দার। তাহলে তোর আর জয় করার কী পড়ে থাকছে, বাতু খান?”

বালক কোন রকম ইতস্তত না করে বলল:

“আমি ইস্কান্দারের কাছ থেকে সব জমি কেড়ে নেব!..”

সেই দিন থেকে হাজি রহিম জুচি খানের পুত্র বাতুর শিক্ষাগুরু হয়ে তার শিবিরে থেকে গেল। বেশ কয়েক বছর হাজি রহিম বালককে তালিম দিল। কিন্তু ইতিমধ্যে এক দিন গুপ্ত হত্যাকারীর হাতে অকস্মাৎ জুচি খানের প্রাণনাশ হল। জঙ্গলে বেড় দিয়ে শিকার করতে গিয়ে হরিণের পিছু ধাওয়া করে নলখাগড়ার বনে জুচি খান নোকরদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক কষ্টে তার সন্ধান পাওয়া গেল। শিরদাঁড়া ভাঙা অবস্থায় সে পড়ে ছিল — এটা মোঙ্গলদের মধ্যেই প্রচলিত হত্যাপদ্ধতি।

গুপ্ত হত্যাকারীরা গা ঢাকা দেয়, তাদের আর সন্ধানে মেলে না। কেউ কেউ কানাকানি করে যে স্বয়ং চেঙ্গিজ খান তাদের পাঠায়।* জুচির দেহে তখনও প্রাণ ছিল, কিন্তু সে কোন কথা বলতে কিংবা হাত নাড়াতে পারল না। তবে দু' চোখ চিরকালের জন্য মুদিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তাদের দৃষ্টিতে গভীর দুঃখ ও বিষাদের চিহ্ন ফুটে ওঠে।

এই সময় পশ্চিমের অভিযান থেকে খ্যাতনামা সেনানায়ক সুবুদাই বাহাদুর প্রত্যাবর্তন করল। সে বালক বাতু খানকে জিনের ওপর তুলে নিয়ে বলল:

"আমার প্রভু জুচি খানের যে পরিণতি ঘটেছে এখানে থাকলে তোমার কপালেও তা-ই আছে। তুমি আমার সঙ্গে চীনে যাবে, সেখানে যুদ্ধবিদ্যা শিখবে। আমি তোমাকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করব, তোমাকে সেনানায়ক তৈরি করব।"

বাতু খানের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর হাজি রহিম আবার নিঃসঙ্গ মুসাফির হয়ে পড়ল। গুরগঞ্জে জলপ্লাবনের সময় কনিষ্ঠ ভ্রাতা তুগানের কোন সন্ধান না মেলায় তার বড়ই মনোকষ্ট হতে লাগল। তুগান কি মারাই গেল, নদীর ঢেউ আর মোঙ্গলদের তরবারির আঘাত থেকে সে কি প্রাণে বাঁচতে পেরেছে? সে কি স্বাধীনভাবে অন্য কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে, না ক্রীতদাস হয়ে কোথাও চালান হয়ে গেছে? হাজি রহিম সব সময় মনে মনে এই সব কথা ভাবতে থাকে, অপেক্ষা করতে থাকে আবার কবে তার সঙ্গে দেখা হবে।

হাজি রহিম নানা শহর পর্যটন করে, নৃশংস মোঙ্গলদের অভিযান কালে খরেজমের জনসাধারণের যে শোকাবহ অভিজ্ঞতা হয়েছিল সর্বত্রই প্রত্যক্ষদর্শীদের ধরে ধরে সেই ব্যাপারে সে জিজ্ঞেসবাদ করে। সে বিশ্বস্ত লোকজনের মৌখিক বিবরণী লিখে নিতে থাকে, অবশেষে চেঙ্গিজ খান সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত নেয়। চেঙ্গিজ খান কীভাবে প্রবল পরাক্রান্ত হল, সারা দুনিয়া জয়ে অভিলাষী হল এবং মোঙ্গলরা যে যে জায়গার ওপর দিয়ে যায় সেখানে কীরকম ধ্বংসের তাণ্ডব চলে, কীভাবে সব কিছু মরুভূমিতে পরিণত হল সে সব বিবরণ এতে লিপিবদ্ধ হবে।

---

* জুবাইনি (ত্রয়োদশ শতক) প্রমুখের প্রাচ্যদেশীয় ঘটনাপঞ্জীতে এর উল্লেখ আছে।



তৃতীয় অধ্যায়

কাল্‌কা নদীর লড়াই

প্রথম পরিচ্ছেদ

চেঙ্গিজ খানের হুকুমনামা

> ...যমদূতের মতো আতঙ্কসৃষ্টিকারী তাদের মূর্তি। তারা শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য, কেবল কারও কারও ওষ্ঠের উপরাংশে ও চিবুকে অর্থাৎ কয়েক গুচ্ছ কেশ। তাদের চেরা চোখের গতি চঞ্চল, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও তীব্র, আকৃতি মজবুত ও পাকাপোক্ত।
>
> (কিরাকোস, আর্মেনীয় ইতিহাসবিদ, ত্রয়োদশ শতক)

ড্রাগনবর্ষ নামে পরিচিত ১২২০ সনের বসন্তকালে, সফর মাসে অর্থাৎ চৈত্রমাসে নাগাদ চেঙ্গিজ খান কঠিনতম দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে অভিজ্ঞ দুই

সেনানায়ককে — এক চক্ষুহীন প্রবীণ সুবুদাই বাহাদুর ও যুবক জেবে নোইয়নকে ডেকে পাঠাল।*

তারা অবিলম্বে 'জগৎ আলোড়নকারীর' রেশমী ছাউনিতে উপস্থিত হয়ে স্বর্ণ সিংহাসনের সামনে কম্বলের ওপর প্রণত হল। চেঙ্গিজ খান তার ডান হাঁটু জড়িয়ে ধরে বাঁ পায়ের গোড়ালির ওপর বসে ছিল। বিশাল পান্না বসানো মসৃণ গোলাকার টুপি থেকে দামী রুপোলি শেয়ালের পুচ্ছ ঝুলছে। হলদেটে সবুজ রঙের মার্জার চক্ষুর নির্লিপ্ত দৃষ্টি অভিবাদন অবনত দুই অপরাজেয় বাহাদুরের ওপর পড়ল। 'অদ্বিতীয় ও মহামান্য' মোঙ্গল খান নীচু ভাঙা গলায় বলল:

"গুপ্তচরেরা আমাকে জানিয়েছে যে কান কাটা কুত্তার বাচ্চা খরেজম শাহ মুহম্মদ গোপনে তার ফৌজ ছেড়ে চলে গেছে। সে তার পালানোর পথের কোন চিহ্ন রাখে নি, তবে কিছু দিন আগে তাকে জাইহুন নদীর ঘাটে দেখা গেছে। একশ' বছর ধরে খরেজম শাহদের সঞ্চয় করা প্রচুর ধনদৌলত সে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বার বড়রকমের ফৌজ যোগাড় করার আগেই তাকে ধরা চাই।... তোমাদের বিশ হাজার ঘোড়সওয়ার দিচ্ছি। যদি দেখা যায় শাহেরও এই পরিমাণ ফৌজ আছে তাহলে ভেবে-চিন্তে দেখো যুদ্ধ করা ঠিক হবে কিনা, দরকার হলে যুদ্ধ এড়িয়ে যেও।... তবে আমাকে জানাবে!.. তাহলে আমি তখুচার নোইয়নকে পাঠাব, তোমরা দু' জনে মিলে যেখানে জিততে পারবে না সে একাই সেখানে পেরে উঠবে।... অবশ্য আমার মনে হয় আমার এই হুকুমের জোর মুহম্মদের সমস্ত ফৌজের থেকেও বেশি। মোট কথা মুহম্মদকে শেকলে বেঁধে না এনে ফিরবে না!.. তোমাদের কাছে হেরে গিয়ে শাহ যদি গুটিকয়েক সঙ্গীসাথী নিয়ে পালিয়ে গিয়ে দুর্গম পাহাড়ে বা অন্ধকার গুহায় আশ্রয় নেয় কিংবা ধূর্ত যাদুকরের মতো লোকের চোখের ওপর হাওয়ায় মিলিয়ে যায় তা হলে তোমরা তার রাজ্য জুড়ে তাণ্ডব শুরু করে দাও।... যে যে শহর বশ্যতা স্বীকার করেছে তার দিকে কৃপাদৃষ্টি দিও, সেখানে ছোটখাটো রক্ষিবাহিনী আর এমন শাসক রেখে যাও যে হাসতে জানে না।... কিন্তু যে শহরই বাধা দেবে তা আক্রমণ করে দখলে আনা চাই!

---

* কথিত সময়ে বুখারা ও সমরখন্দ অধিকার করে চেঙ্গিজ খান হিন্দুস্তানের দিকে অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

সেখানে কোন কিছু যেন আস্ত না থাকে, সব পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে!.. আমার মনে হয় এই আদেশ পালন করা তোমাদের পক্ষে কঠিন হবে না।..."

জেবে নোইয়ন সিধে হয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল:

"খরেজম শাহ মুহম্মদ যদি ভেল্কিবাজির মতো আমাদের কাছ থেকে পালাতে পালাতে ক্রমাগত পশ্চিমের দিকে যেতে থাকে তাহলে কত দূর পর্যন্ত আমরা তাকে ধাওয়া করব, আপনার সোনালি ছাউনি ছেড়ে কত দূরে যাব?''

"এমন হলে জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত, যতক্ষণ 'শেষ সাগর' চোখে না পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ধাওয়া করবে।"

ন্যুব্জপৃষ্ঠ এবং পার্শ্বদেশে ঈষৎ আনত সুবুদাই বাহাদুর অস্ফুট কাতরোক্তি করে মাথা তুলল, ভাঙা ভাঙা গলায় বলল:

"শাহ মুহম্মদ যদি মাছ হয়ে গিয়ে সাগরের তলায় ডুব মেরে থাকে?"

চেঙ্গিজ খান নাক চুলকে সুবুদাইয়ের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল:

"তার আগেই তাকে ধরা চাই! যাও বলছি!"

দুই সেনানায়কই উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পিছু হটল।

সেই দিনই বিশ হাজার মোঙ্গল ও তাতার অশ্বারোহীসহ তারা পশ্চিমের পথ ধরল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'মহামান্য' সমীপে নিবেদন

চেঙ্গিজ খানের আজ্ঞাক্রমে দুই তোমেন অশ্বারোহী সম্বল করে তার দুই সেনানায়ক জেবে নোইয়ন ও সুবুদাই বাহাদুর খরেজমের পলাতক অধিপতি শাহ মুহম্মদের সন্ধানে দু' বছর উত্তর ইরানের উপত্যকা ও পার্বত্য বনভূমি তোলপাড় করে বেড়াল। তারা কিছুই খুঁজে পেল না। কিন্তু জনশ্রুতি থেকে তারা জানতে পারল যে জন্মভূমি ছেড়ে আসার পর তার সঙ্গীসাথীরাও তাকে ছেড়ে চলে যায়, আবেস্কুন সাগরের এক নির্জন দ্বীপে শেষ পর্যন্ত তার জীবনাবসান হয়।

জেবে ও সুবুদাই তখন যুদ্ধবিগ্রহে মহাবীরদের কীর্তিকাহিনী নিয়ে প্রাচীন গীত গেয়ে শোনানোর ব্যাপারে পারদর্শী এক মোঙ্গলকে ডেকে পাঠাল। তারা 'অদ্বিতীয় ও মহামান্য' মোঙ্গল খানের সমীপে তাদের বৃত্তান্তটি ধীরে ধীরে গায়ককে গেয়ে শোনাল। গায়ক বৃত্তান্তের শব্দগুলো নয় গুণ নয় বার* আবৃত্তি করে শোনাতে বাধ্য হল। অবশেষে তাকে নেসেফ** শহরের অনতিদূরে শ্যামল তৃণভূমি ও কাকচক্ষু জলাশয়ে সমৃদ্ধ এক প্রান্তরে চেঙ্গিজ খানের কাছে তার শিবিরে পাঠানো হল। মোঙ্গলদের আক্রমণে দগ্ধ শহরগুলো থেকে পলাতক দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোকজনের সদলবলে হামলা ও লুঠতরাজের দরুন যাতায়াতের পথ আরও বিপদসঙ্কুল হয়ে দাঁড়ানোয় দূতের সঙ্গে প্রহরী হিশেবে তিনশ' নির্ভরযোগ্য নোকর দেওয়া হল।

বার্তাবহ আগাগোড়া তার যাত্রাপথে প্রাচীন গীত গেয়ে চলল — সে সব গীতের বিষয়বস্তু ছিল মোঙ্গলদের নীল স্তেপভূমি, পার্বত্য বনভূমি আর রক্তিম বহ্নিশিখা তুল্য কেরুলেন বালা; কিন্তু বাহাদুরদের পাঠানো বার্তা তার মুখে একবারও শোনা গেল না। মহামান্য মোঙ্গল খানের শিবিরে উপস্থিত হওয়ার পর দেহরক্ষীদের আটটি চৌকি অতিক্রম করে, পবিত্র ধুনির ধোঁয়ায় শুদ্ধ হয়ে বার্তাবহ হলুদ তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল এবং সোনালি দরজার সামনে থামল। প্রবেশ-পথের দু' ধারে দাঁড়িয়ে ছিল দু'টি অপূর্ব সুন্দর ঘোড়া — একটি দুধের মতো সাদা, অন্যটি ছাইরঙা। দু'টি ঘোড়াই সাদা চুলের পাকানো দড়ি দিয়ে ঢালাই সোনার খুঁটিতে বাঁধা।

এরকম জাঁকজমকে হকচকিয়ে গিয়ে বার্তাবহ মোঙ্গল দণ্ডবৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল; যতক্ষণ পর্যন্ত না দুই তাগড়াই দেহরক্ষী এসে তাকে বাহুলগ্ন করে ধরে তুলল এবং টেনে তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গিয়ে চেঙ্গিজ খানের সামনে পাতা গালিচার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল ততক্ষণ সে ঐ ভাবেই পড়ে

---

* জরুরী বার্তা লিখে পাঠানোর মতো বিদ্যা মোঙ্গল অধিনায়কদের জানা না থাকায় এবং বার্তাবহ তাকে বিকৃত করে ফেলতে পারে এই আশঙ্কায় তারা বার্তাটিকে গীতের আকারে রচনা করত। বার্তাবহকে সেটা মুখস্থ করে নিতে হত। নয় সংখ্যাটি মোঙ্গলদের কাছে পবিত্র বলে গণ্য হত।

** নেসেফ — বর্তমানে বুখারার দক্ষিণে কার্শি শহর।

রইল। মোঙ্গল খান সোনার কাজ করা এক বিশাল সিংহাসনের ওপর দুই পা গুটিয়ে বসে ছিল।

বার্তাবহ চোখ বন্ধ করে নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে যেমনভাবে প্রাচীন মোঙ্গল গীতি গাইতে অভ্যস্ত সেই ভঙ্গিতে গলা চড়িয়ে শেখানো বার্তাটা গেয়ে গেল:

মহামান্যের চরণে বিনীত নোকের মোরা —
সুবুদাই বাহাদুর, জেবে নোইয়ন করি নিবেদন:
লেজ কাটা শেয়ালের ছানা খরেজম শাহ মুহম্মদ
কুষ্ঠ কুটিরে তার হারায়েছে পৈতৃক প্রাণ।
কেউটে ছানা দুর্দান্ত জালাল
পলায়েছে ইরানের পাহাড় ডিঙিয়ে,
সেখানে ধোঁয়ার মতো হয়েছে উধাও
এখানের পাট শেষ! যাব ককেশাস,
পথে যারা বাধা দেবে পাবে প্রতিঘাত।
দেখি কার বল কত, কত সেনা আছে।
তারপর দ্রুত যাব কিপচাক স্তেপে —
অশ্বদল সেই খানে বিশ্রাম নেবে।
পথঘাট দেখে নেব, তৃণভূমি সোনালি ঘোড়ার —
তাও দেখে রেখে দেব। এ সবেরই আয়োজন
পশ্চিমে তোমার বজ্র হানার তরে,
এবং দুনিয়া যাতে নতজানু হয়,
সবই যাতে আসে শেষে মোঙ্গলের বশে।*
সাধ্য কার রোখে এই দুর্বার গতি
'শেষ সাগরের' পানে —
যেখানে সবুজ ঢেউ ধুয়ে দেবে অশ্বখুর।
আমদের হাতে কাটা নরমুণ্ড স্তূপে
গড়ে ওঠে বিপুল পাহাড়।

---

* কোন কোন সামরিক ইতিহাসবিদের মতে কাল্কা নদীর লড়াইয়ে সুবুদাই বাহাদুরের যে অভিযান সমাপ্ত হয় তা চেঙ্গিজ খান পরিকল্পিত পূর্ব ইউরোপ আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য গভীর রণকৌশলগত প্রাথমিক অভিযান বলে গণ্য করা যেতে পারে। চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুর বারো বছর পর ১২৩৭ সনে এই অভিযানে নামে তার পৌত্র বাতু খান; এক্ষেত্রে অভিযানের প্রধান সামরিক পরামর্শদাতা এবং নেতা ছিল উপরোক্ত প্রাথমিক অভিযানেরই নায়ক সুবুদাই বাহাদুর।

শীর্ষে তার রবে এক শিলা,
লিখিব তাহার পরে তব পূতে নাম।
কর্তব্য তখন শেষ, অশ্বদের গতি পূবমুখী —
এবারে ফেরার পথ,
শেষে যার আছে তব সোনালি ছাউনি।

গীত শেষ করে বার্তাবহ চোখ কুঁচকে এই প্রথম সাধারণ মোঙ্গলের কাছে দুর্লভদর্শন অধিপতির হিংস্র চোখ জোড়ার দিকে তাকাল। স্তম্ভিত হয়ে আবার সে দন্ডবৎ মাটিতে পড়ল। চেঙ্গিজ খান অর্ধনিমীলিত নয়নে অবিচল ও নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে ছিল, পায়ের নগ্ন গোড়ালি চুলকানোর সময় তার পাক ধরা কটা দাড়ি ঈষৎ আন্দোলিত হচ্ছিল মাত্র। সে তার সামনে দন্ডবৎ পড়ে থাকা বার্তাবহের দিকে ক্লান্তভাবে তাকিয়ে অনেকটা আচ্ছন্নের মতো বলে উঠল:

“বুনো হাঁসের মতো তোর গলা।... তোকে পুরস্কার দেওয়া উচিত।”... সিংহাসনের হাতলে ঝোলানো হলুদ রঙের রেশমী থলে হাতড়ে ধুলোবালিমাখা এক দলা গুড় বার করে সে বার্তাবহের থরথর মুখের মধ্যে গুঁজে দিল। তারপর মোঙ্গল খান বলল: “জেবে নোইয়ন ও সুবুদাই বাহাদুরকে এখনই প্রশংসা করার কিছু নেই। দেখা যাক ওদের এই যাত্রা কোথায় গিয়ে গড়ায়।... অন্য এক দূত দিয়ে আমার জবাব পাঠাব 'খন।”

মোঙ্গল খান আঙুলের ইশারায় বার্তাবহকে চলে যেতে বলল। সে হুকুম দিল বার্তাবহকে যেন পেট ভরে খেতে এবং ঘোল পান করতে দেওয়া আর সেই সঙ্গে তার সঙ্গী প্রহরীদেরও যেন যথাযোগ্য আপ্যায়ন করা হয়। পর দিন সে তাদের সকলকে ফেরত পাঠিয়ে দিল ইতিমধ্যে মোঙ্গলদের যে সেনাদল বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছে তাদের নাগাল ধরার জন্য।

বছর ঘুরে গেল, অথচ পশ্চিমগামী মোঙ্গলদের কোন খবরই পাওয়া গেল না। এক দিন চেঙ্গিজ খান তার সচিব উইগুর ইজমাইল খোজাকে গুটিকয়েক কথা বলল, হুকুম দিল যে কোন হরকরা যেন ঘুঙুর ঝুলিয়ে এবং জরুরী বার্তা বহনের চিহ্ন হিশেবে টুপিতে বাজপাখির পালক এঁটে মোহর করা চিঠি (যার বিষয়বস্তু কারও জানা নেই) বয়ে নিয়ে যায়। দশ হাজার অশ্বারোহীর একটি দল সমেত সেনাপতি তখুচারের ওপর হরকরাকে প্রহরা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার দেওয়া হল।

"জেবে নোইয়ন আর সুবুদাই বাহাদুরের খোঁজে দরকার হলে দুনিয়ার শেষ অবধি তোমাকে যেতে হবে। সেখানে তোমার চোখের সামনে হরকরা আমার এই চিঠি সুবুদাই বাহাদুরের হাতে তুলে দেবে। ওরা এখন এত দূর ভেতরে চলে গেছে যে তেত্রিশটা জাতি খেপে গিয়ে ওদের চার দিক থেকে চেপে ধরছে। ওদের বাঁচানো দরকার।"

তখুচার সেই দিনই তার সেনাদল নিয়ে দুনিয়ার প্রান্ত অভিমুখে ধাবমান মোঙ্গলদের সন্ধানে যাত্রা করল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'শেষ সাগরের' খোঁজে

দুর্মদ পায়ে বল, আগুয়ান ঘোড়াদল! আগে
আগে ছায়া হানে জনমনে ত্রাহি রব।

(মোঙ্গল গীত থেকে)

বিশাল দুই কালো রঙের সাপ যেমন সারা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটানোর পর জেগে উঠে প্রাচীন বট গাছের শেকড় থেকে বেরিয়ে আসে, বসন্তের সূর্যের কিরণে চাঙ্গা হয়ে উঠে কখনও পাশাপাশি সংলগ্ন থেকে কখনও বা বিচ্ছিন্ন হয়ে মেঠো পথে গুড়ি মেরে চলে, পলায়নরত পশু এবং মাথার ওপর চক্রাকারে উড়ন্ত কোলাহলরত পাখিদের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করে, তেমনিভাবে উৎসাহী জেবে নোইয়ন এবং হুঁশিয়ার ও সুচতুর সুবুদাই বাহাদুরের দুই তোমান মোঙ্গল সৈন্য কখনও দীর্ঘ প্রসারিত হয়ে কখনও বা রঙবেরঙের ঘোড়ার দল জড় করে মহা সোরগোল তুলে আতঙ্কগ্রস্ত শহরের চার পাশের প্রান্তর অশ্বখুরে পদদলিত করে, দগ্ধ ও গলিত শব এবং ধোঁয়াকালিমাখা ধ্বংসের স্তূপ পেছনে ফেলে পশ্চিমের দিকে চলতে থাকে।

চেঙ্গিজ খানের এই অগ্রণী সেনাদল খার, সিম্‌নান, কুম, জেন্‌জান এবং অন্যান্য শহর ধ্বংস করে উত্তর ইরান পার হয়ে চলল। মোঙ্গলরা কেবল সমৃদ্ধ শহর হামাদানকে রেয়াত করল — তার শাসক আগে থেকেই সম্ভ্রান্ত দূতবৃন্দের হাত দিয়ে মোঙ্গলদের কাছে এক পাল সাজানো ঘোড়া এবং পোশাক-পরিচ্ছদ বোঝাই দু'শ' উট উপঢৌকন পাঠায়। মোঙ্গলরা

কার্জাভিনে কঠিন বাধার মুখোমুখি হয় — শহরের ভেতরে অধিবাসীরা দীর্ঘ ছুরিকা নিয়ে মরিয়ার মতো লড়াই দেয়। কার্জাভিন পুড়িয়ে দেওয়া হল।

শীতকালের ঠাণ্ডা কয়েকটা মাস মোঙ্গলরা কাটিয়ে দিল রেই শহরের অভ্যন্তর ভাগে। চার দিক থেকে তাদের জন্য আসতে লাগল ভেড়ার পাল, ভালো ভালো ঘোড়া আর কাপড়-জামার গাঁট বোঝাই উটের সারি। সেখানে তারা বসন্তের প্রতীক্ষায় থাকল।

বসন্তের সূর্যালোকে ইরানের শৈলদেশ শ্যামল বর্ণ ধারণ করলে মোঙ্গলরা আজারবাইজানের ওপর দিয়ে চলল। বিপুল সমৃদ্ধ শহর তাব্রিজ থেকে তাদের কাছে দামী দামী ভেট এলো, মোঙ্গলরা তাদের সন্ধি প্রস্তাবে রাজি হয়ে শহরের কোন ক্ষতি না করে এগিয়ে চলল। তারা ককেশাসের দিকে পা বাড়িয়ে আর্‌রানের রাজধানী গাঞ্জার কাছাকাছি উপস্থিত হল। মোঙ্গলরা কিন্তু এই শহর আক্রমণ করবে না বলেই ঠিক করল, তারা রুপো ও পোশাক-পরিচ্ছদ দাবি করল এবং তা পাওয়ার পর জর্জিয়ার পথ ধরল।

জর্জিয়ার শক্তিশালী বাহিনী তাদের পথ অবরোধ করে দাঁড়াল। সুবুদাই মূল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চলল, আর জেবে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে আচম্‌কা আক্রমণের উদ্দেশ্যে ওত্‌ পেতে রইল। প্রথম সংঘাতে মোঙ্গলরা পালানোর ভান করল। জর্জীয় সেনাদল সতর্কতার কথা ভুলে গিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করল। জেবের তাতার বাহিনী আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া মাত্র সুবুদাইয়ের অশ্বারোহীরা মুখ ঘুরিয়ে সামনাসামনি হল। জর্জীয়রা চার দিক থেকে বেষ্টিত হয়ে প্রাণ হারাল। তেরো হাজার জর্জীয় এই যুদ্ধে প্রাণ হারায়।

মোঙ্গল বাহিনী কিন্তু গিরিখাতে আচ্ছন্ন এই দেশের ভেতরে ঢুকে দুর্ধর্ষ অধিবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নামতে ভরসা পেল না। তা ছাড়া লুটের মালও বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। মোঙ্গলরা তাই এ দেশ ছেড়ে চলে গেল। সৈন্যরা বলতে লাগল যে ককেশাসের গিরিখাতে তাদের ঠেসাঠেসি লাগছে। তারা তখন খোঁজ করছিল স্তেপভূমির, যেখানে ঘোড়াগুলোকে চরানো যেতে পারে। শেমাখা শহর ভেদ করে মোঙ্গলরা শির্ভানের দুর্ভেদ্য দুর্গের দিকে চলল। উত্তরের পথ আগলে এক দুর্গম পাহাড়ের ওপর এই

দুর্গটা দাঁড়িয়ে আছে। শির্ভানের শাহ রশীদ দুর্গে লুকিয়ে ছিল। জেবে নোইয়ন তার কাছে দূত পাঠিয়ে দাবি করল:

"তোমার খানদানী বেগদের আমার কাছে পাঠিয়ে দাও যাতে আমরা তাদের সঙ্গে আপস-মীমাংসা করতে পারি।"

শির্ভানের শাসক দশ জন সম্ভ্রান্ত প্রবীণকে পাঠিয়ে দিল। বেগদের মধ্যে একজনের আচরণে উদ্ধত ভাব প্রকাশ পেতে জেবে বাকি সকলের চোখের সামনে তার গর্দান নিয়ে বলল:

"এমন কিছু বিশ্বাসী লোকজন আমাদের দাও যারা আমাদের ফৌজকে পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়ার পথ দেখাতে পারে। তাহলেই তোমরা রেহাই পাবে। যদি দেখা যায় ঐ সব লোক ফন্দিবাজ তবে তোমাদের সকলের ভাগ্যে একই পরিণতি ঘটবে।"

শির্ভানের বেগেরা বলল যে তারা এই দাবি মেনে নিচ্ছে। তারা তখন দের্বেন্ত পাশে রেখে পার্বত্য পথে মোঙ্গল বাহিনীকে নিয়ে গিয়ে কিপচাক প্রান্তরের পথ দেখাল। মোঙ্গলরাও প্রবীণ বেগদের ছেড়ে দিয়ে আরও উত্তরের পথ ধরল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আলান ও কিপচাক জাতির দেশে

জেবে ও সুবুদাই উত্তর ককেশাসে আলানদের* দেশে এসে উপস্থিত হল। সেখানে আলানদের সাহায্যের জন্য উত্তর স্তেপের বিস্তীর্ণ প্রান্তর থেকে বহু লেজগিন, চের্কেসীয় ও কিপচাক সেনার সমাবেশ ঘটেছে।

মোঙ্গলরা সারা দিন সন্ধে অবধি তাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেল, কিন্তু বলে দু' পক্ষই সমান, কারও জিত হল না। তখন জেবে এক গুপ্তচরের হাত দিয়ে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত কিপচাক খান কোতিয়ানের কাছে এই মর্মে চিঠি লিখে পাঠাল:

"আমরা তাতাররা এবং তোমরা কিপচাকরা এক বংশের একই রক্ত সম্পর্কের সন্তান। অথচ তোমরা আপন ভাইদের বিরুদ্ধে অন্য গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে শামিল হয়েছ। আলানরা যেমন আমাদের, তেমনি

* আলান — বর্তমান ওসেতিন জাতির পূর্বপুরুষ।

তোমাদেরও পর। এসো আমরা অন্যের শান্তি ভঙ্গ করব না এই মর্মে এক পাকাপাকি চুক্তি করে ফেলি। এর জন্য তোমরা যত সোনাদানা ও দামী পোশাক-পরিচ্ছদ চাও আমরা দেব। আমরা নিজেরা যাতে আলানদের শায়েস্তা করতে পারি তোমরা এখান থেকে সরে গিয়ে তার সুযোগ করে দাও।"

মোঙ্গলরা দামী দামী উপঢৌকনে বোঝাই বহু ঘোড়া কিপচাকদের পাঠাল। এতে প্রলুব্ধ হয়ে কিপচাক খানের দল বেইমানী করে রাতে আলানদের পরিত্যাগ করল, নিজেদের বাহিনী উত্তরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

মোঙ্গলরা সদলবলে আলানদের ওপর হানা দিয়ে তাদের ধ্বংস করল, তাদের গ্রাম ও বসতি জুড়ে অগ্নিকাণ্ড, লুঠতরাজ ও হত্যার তাণ্ডব চলল। আলানেরা চেঙ্গিজ খানের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করল, তাদের একটা অংশ মোঙ্গল সেনাদলের সঙ্গে যোগ দিল।

তখন পশ্চাতে আলানদের তীক্ষ্ম তরবারির আর কোন আশঙ্কা না থাকায় জেবে ও সুবুদাই অকস্মাৎ তাদের ফৌজ উত্তরে স্তেপের অভিমুখে, কিপচাকদের বিচরণভূমির দিকে নিয়ে চলল। ঝঞ্ঝাট মিটে গেছে এবং আর কোন বিপদ নেই এই স্থির বিশ্বাসে কিপচাক খানেরা পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে যে যার শিবিরের দিকে যাত্রা করল। মোঙ্গলরা তাদের পিছু ধরে ফেলল, কিপচাকদের মূল আস্তানা ধ্বংস করে তাদের যাবতীয় সম্পদ হস্তগত করল। বেইমানীর পুরস্কার হিশেবে কিপচাকদের তারা যা দিয়েছিল এ সম্পদের পরিমাণ তার চেয়ে বহু গুণ বেশি।

কিপচাকদের মধ্যে যারা স্তেপের দূরাঞ্চলে বাস করত মোঙ্গলদের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তারা ধনসম্পদ উটে বোঝাই করে যে যে দিকে পারল পালাল: কেউ কেউ আত্মগোপন করল জলাভূমিতে, কেউ বা বনে জঙ্গলে*। অনেকে চলে গেল আরও দূরে রুশ ও হাঙ্গেরি দেশে।

মোঙ্গলরা দন নদীর তীর ধরে পলায়নরত কিপচাকদের পশ্চাদ্ধাবন

---

* কালমিউস ও সামার নদীর (নীপারের শাখানদী) গোড়ার দিকে স্মরণাতীতকাল থেকে গভীর অরণ্য, জলাভূমি ও নৌকো টেনে নিয়ে যাওয়ার পথ। এই দুই নদী ছিল প্রাচীনকালে আজভ সাগর সন্নিহিত অঞ্চল থেকে নীপারের দিকে বাণিজ্যের কর্মচঞ্চল জলপথ। (প্রফেসর ব্রুন)

করে শেষ পর্যন্ত তাদের নামাল খাজার সাগরের* নীল তরঙ্গে। সেখানে অনেকের সলিলসমাধি ঘটল। কিপচাকদের মধ্যে বাকি যারা বেঁচে রইল মোঙ্গলরা সব জায়গা থেকে দখল করা গোরু-ভেড়া ও ঘোড়ার পাল তদারক করার জন্য তাদের রাখাল ও সহিস করে নিল।

তার পর তারা এগিয়ে চলল খাজার উপদ্বীপের দিকে, সেখানে সমুদ্র তীরবর্তী সমৃদ্ধ কিপচাক শহর সুদাক আক্রমণ করল। অতীতে এখানে পোশাক-পরিচ্ছদ, বস্ত্র এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্য নিয়ে বহু বিদেশী জাহাজ ভিড়ত। কিপচাকরা ক্রীতদাস, দামী খেঁকশিয়াল ও কাঠবেড়ালির চামড়ার বদলে এবং কিপচাক ভূমির যার জন্য বিশেষ খ্যাতি ছিল সেই ষাঁড়ের চামড়ার বদলে এই সব জিনিস কিনত।

মোঙ্গলরা এগিয়ে আসছে জানতে পেরে সুদাকের অধিবাসীরা পলায়ন করল। অনেকে পাহাড়-পর্বতে আত্মগোপন করল, অনেকে জাহাজে চেপে সমুদ্র পার হয়ে ত্রেবিজোন্তে চলে গেল। জেবে ও সুবুদাই শহর লুণ্ঠন করে কিপচাকদের বিচরণ ভূমিতে বিশ্রাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে আবার উত্তরে সরে গেল। সেখানে তারা এক বছরেরও ওপর বিশ্রাম নিল।

এখানে পর্যাপ্ত তৃণাচ্ছাদিত চারণভূমি আর ক্রীতদাসদের চষা উর্বর জমির বিস্তার, চার দিকে তরমুজ ও লাউ-কুমড়োর খেত, আছে হৃষ্টপুষ্ট গোরু আর মিহি পশমওয়ালা ভেড়ার বিশাল দঙ্গল। মোঙ্গল সেনারা এই স্তেপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ; তাদের কথায় জন্মভূমিতে, ওনোন ও কেরুলেনের তীরে যেমন এখানেও তাদের ঘোড়ার পাল তেমনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। তবে জন্মস্থান মোঙ্গল স্তেপভূমি তাদের কাছে আরও আদরের এবং অন্য কোন স্তেপ দিয়ে তার বিনিময় হয় না। বিশ্ববিজয় সমাপ্ত করার পর সব মোঙ্গলেরই যেটা একমাত্র কাম্য তা হল নিজেদের সেই কেরুলেন নদীর তীরে প্রত্যাবর্তন।

জেবে ও সুবুদাই তাদের সেনাদল নিয়ে কিপচাকদের প্রধান শহর শারুকানে** বেশি দিন কাটাল না। এখানে ছিল ভূগর্ভে অর্ধপ্রোথিত

---

* ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান লেখকদের রচনায় কৃষ্ণ সাগর খাজার সাগর নামে এবং ক্রিমিয়া খাজারিয়া নামে উল্লিখিত হয়। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে কাস্পিয়ান সাগর নামে খাজার সাগরের উল্লেখ দেখা যায়।

** কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে কিপচাকদের শহর শারুকানের অবস্থান ছিল বর্তমান খারকভে।

পাথরে তৈরি দালান-কোঠা, বিদেশী পণ্যদ্রব্য মজুদ করা ভাঁড়ার ঘর, তবে বেশির ভাগই ছিল সামরিক ছাউনি, যেগুলোতে কিপচাক খান ছাড়া সাধারণ যাযাবররাও থাকত। বসন্তে তারা শহর থেকে আস্তানা গুটিয়ে স্তেপে চলে যায় আর শীতকালে আবার শহরে ফিরে আসে।

মোঙ্গলদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কায় সমুদ্রপারের বণিকেরা স্তেপের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়। লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ শারুকান শহর জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকে। মোঙ্গল বাহিনী লুকোমোরিয়ে* অভিমুখে যাত্রা করে।

এখানে বাতাসের হাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে মোঙ্গলরা টিলার সারির মাঝখানে নীচু জায়গায় তাদের আস্তানা বানাল। কিপচাকদের কাছ থেকে নিয়ে আসা কয়েক শ' ছাউনি মিলে বৃত্তাকারে এক-একটি আস্তানা। প্রতিটি আস্তানায় সৈন্যের সংখ্যা এক হাজার। এইরকম প্রতি বেষ্টনীর মাঝখানে হাজারী সেনাপতির বিশাল ছাউনি — তার মাথায় শিঙের মতো উঁচিয়ে আছে অশ্বপুচ্ছ শোভিত দণ্ড। ছাউনিগুলোর পাশে লোহার খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়ার দল সাজ পরানো অবস্থায় টানটান লাগাম মুখে দিয়ে অভিযানের জন্য সদা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাকি ঘোড়াগুলো কিপচাক সহিসদের তত্ত্বাবধানে দলে দলে স্তেপে চরে বেড়ায়।

মোঙ্গল বাহিনী 'চেঙ্গিজ খানের যাসা'র** কঠোর নিয়ম মেনে চলতে লাগল। শিবিরগুলো প্রহরীদের তিনটি সারি দিয়ে ঘেরা হল। বুলগার, উরুস ও উগ্রীয়দের*** দেশ অভিমুখী বড় বড় পথের আড়ালে চৌকি বসান হল। চৌকির পাহারাদারদের কাজ ছিল স্তেপে যে-ই যাচ্ছে তাকে ধরা ও জিজ্ঞেসবাদ করা, তার পর যারা প্রতিবেশী গোষ্ঠীদের খবরাখবর জানে তাদের জেবে নোইয়নের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া, বাদবাকিদের হত্যা করা।

বহু নোকরেরই সঙ্গে থাকত তাদের স্ত্রী — তারাও দূর জন্মভূমি থেকে অভিযানে সঙ্গ নিয়েছে, আর থাকত পথে ধৃত নারী ও শিশুদের দলবল। মোঙ্গল মেয়েদের বেশও নোকরদের মতো, তাই চট্ করে তাদের

---

* লুকোমোরিয়ে — আজভ সাগরের উপকূল।

** 'যাসা' চেঙ্গিজ খানের নির্দেশ ও বাণীর লিখিত সংগ্রহ, যা বহুদিন মোঙ্গলদের নীতিসংহিতা বলে বিবেচিত হত। বর্তমানে 'যাসা' সম্পূর্ণ বিস্মৃত, তার নগণ্য কিছু অংশ মাত্র রক্ষা পেয়েছে।

*** উগ্রীয় — হাঙ্গেরীয়।

তফাত করা যেত না। তারা সময় সময় লড়াইয়ে যোগ দিত, তবে মেয়েরা সচরাচর উট ও ভারবাহী ঘোড়ার এবং ভাগ-বাঁটোয়ারায় পাওয়া যে সব লুণ্ঠন সামগ্রী গাড়িতে জমা করে রাখা হত সেগুলোর দেখাশোনা করত। বন্দীদের উরুতে লোহা পুড়িয়ে মালিকের চিহ্ন এঁকে দেওয়া হত — মেয়েরা সেই চিহ্ন অনুযায়ী সনাক্ত করে তাদের ওপর নানা রকম কাজের ভার দিত। বন্দীদের সঙ্গে তারাও ঘোড়া, গোরু ও উট দুইত এবং বিরতির সময় তামার অথবা পাথরের কড়াইয়ে রান্না করত।

অভিযানের সময় যে সব শিশুর জন্ম হয়েছে অথবা পথে যে শিশুদের ধরা হয়েছে, স্থানান্তর যাত্রাকালে তাদের নিয়ে যাওয়া হত গাড়িতে করে কিংবা চামড়ার থলিতে, কোন কোন সময় দু'জন করে পুরে ভারবাহী ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে, এমনকি অশ্বপৃষ্ঠে মোঙ্গল রমণীদের পিঠে বেঁধে।

স্তেপে মোঙ্গল শিবির থেকে কিছুটা পৃথক হয়ে থাকত নানান জাতের সেই সব সৈনিকের তাঁবু যারা পথে মোঙ্গলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এখানে চোখে পড়ে তুর্কমেনদের রঙচঙে ছাউনি, তানগুতদের বাদামী রঙের তাঁবু, বেলুচদের কালো তাঁবু এবং আলানদের অথবা কোন অজ্ঞাত গোষ্ঠীর অশ্বারোহীদের সাদাসিধে কুঁড়ে ঘর। এই গোটা ছন্নছাড়া ভ্রাম্যমাণ দলটিকে মোঙ্গলরা খেদিয়ে প্রথম আক্রমণের মুখে এগিয়ে দেয়, আর সঙ্ঘর্ষের পর তাদের ভাগ্যে জোটে মোঙ্গলদের লুঠতরাজের ভুক্তাবশেষ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাল্কা সন্নিকটে তাতার শিবিরে

সুবুদাই বাহাদুর সমুদ্রতীরে উঁচু পাহাড়ের ওপর, মন্থরগতি ঘোলাটে নদীর মোহানার কাছে তার ছাউনি ফেলার হুকুম দিল।

নোকররা বিরতি ও বিশ্রামের আশায় সানন্দে বাহাদুরের হুকুম তামিল করল। বারোটি উটে করে ছাউনির কতকগুলো বিচ্ছিন্ন অংশ নিয়ে আসা হল। উটের পিঠে বসে ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত কিপচাক বন্দিনীর দল — তাদের মাথায় ছুঁচাল পশমী টুপি। মোঙ্গলদের হুকুমে জাফরি কাটা অর্ধবৃত্তাকার কাঠামো বসাতে বসাতে, সেগুলোর ওপর সাদা কম্বল টানটান করে ঢেকে দিয়ে তেরছাভাবে রঙচঙে কাপড়ের ফালির বাঁধন লাগানোর সময় তারা গান গেয়ে চলল।

সুবুদাই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল:

"তিনটে ছাউনি কেন?"

"একটাতে আপনি ভাবনা-চিন্তা করবেন, অন্যটাতে আপনার প্রিয় শিকারী তুষার চিতাগুলোকে রাখব, আর তৃতীয়টা ছাড়া চলবে না — তাতে নাচ গান করতে জানে এমন সেরা সেরা কিপচাক বন্দিনীকে আমরা আটকে রেখেছি।"

সুবুদাই নোকরদের বাধা দিয়ে বলল:

"উঁহু! দ্বিতীয় ছাউনিতে চিতাবাঘ গর্জন করুক, কিন্তু তৃতীয়টাতে বুড়ো সাক্‌লাব আমার খাবার রাঁধবে। কিপচাক বাঁদীরা যেন লড়াইয়ে যাওয়ার সময় আমাকে বিরক্ত না করে। একশ' সিপাহীর সর্দার যারা আছে তাদের মধ্যে ঐ সব মেয়েকে বিলিয়ে দাও।"

সাক্‌লাব হাঁড়িকুড়ি এবং কাঠের বড় বড় হাতা নিয়ে, কোমরে লম্বা লম্বা ধারালো ছুরি গুঁজে তৃতীয় ছাউনিতে জেঁকে বসল। আস্ত্রাখানের কাছাকাছি পথে এই ঢ্যাঙা, রোগা, হাড্ডিসার ঝাঁকড়া সাদা চুলওয়ালা ক্রীতদাসটি তাতারদের হাতে ধরা পড়ে। নোকররা তখন সুবুদাইকে বলে: "এই বুড়োটা জাতে উরুস। ও ছিল খোদ খরেজম শাহ মুহম্মদের মির্জার বাবুর্চি, নিজের দেশে পালিয়ে যাওয়ার তাল করছিল। ও সব ভাষায় কথা বলতে পারে, নানা রকম রান্না জানে। বুড়ো আপনাকে পোলাও তৈরি করে দেবে, আলুবোখরার চাটনি, ডালের ঘুগনি, ঘন দুধের দই বানিয়ে দেবে। ওর সঙ্গে আছে ওর পালিত ছেলে তুগান — ছোকরা কথাবার্তা কম বলে। আপনার খাবার রান্নার ব্যাপারে ছেলেটা সাক্‌লাবকে সাহায্য করবে।" এ কথায় সুবুদাই রেগে গিয়ে বলল:

"রান্না করার জন্য বুড়ো সাক্‌লাব একাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সঙ্গে ফাইফরমাশ খাটার কোন লোকের দরকার দেখি না। সকলেই রান্না ঘরে ঐ রকম কাজের ফিকিরে থাকে। ছোঁড়াটার হাতে তলোয়ার ধরিয়ে দিয়ে ঘোড়ার পাল থেকে তাকে রোঁয়া ওঠা ঘেয়ো গোছের কোন ঘোড়া দাও। সামনের একশ' সৈন্যের সারিতে তাকে দিয়ে দাও, সেখানে যুদ্ধ-টুদ্ধ শিখুক। যদি ভালো যোদ্ধা হতে পারে তাহলে ভালো ঘোড়া, জিন, বর্ম সবই পাবে। আর খারাপ হলে প্রথম লড়াইয়েই ফৌত হবে। তাতে তেমন কোন লোকসান নেই!.."

সুবুদাইয়ের ছাউনির চুড়ো সাদা, দরজা দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে মুখ

করা। ঢোকার মুখে জিনের গদির ওপর বসে সুবুদাই বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখে ধূসর সমুদ্র — এর জল আর হাওয়া, এখানকার মাছ এমনকি তরঙ্গমালার ওপর উড়ন্ত পাখির দল — সবই মোঙ্গল স্তেপের নীল সরোবর থেকে একেবারে অন্য রকম। দূরে থেকে একঘেয়ে তরঙ্গ উপকূলের দিকে গড়িয়ে আসছে, কুয়াশাচ্ছন্ন নীলিমার মধ্যে থেকে থেকে দেখা যায় ভিনদেশী জাহাজের সাদা পাল — তাতারদের অধিকৃত ভূমির কাছাকাছি হতে তারা ভরসা পাচ্ছিল না।

এখানে ছিল উদার স্তেপভূমি, সুদীর্ঘ তৃণশষ্প, ছোট ছোট সরোবর, সরোবরে নানা জাতের পাখির হুটোপুটি। সর্বত্র বিচরণ করছে কিপচাকদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া পশুর দল: ষাঁড়গুলো সাদা রঙের, সুডৌল তাদের পায়ের আকার. ভেড়ার দল হৃষ্টপুষ্ট, তাদের পশম কোঁকড়ানো, ধবধবে সাদা; কিপচাকদের কম্বল সাদা, ছাউনিও সাদা। সুবুদাইয়ের সৈন্যরা প্রতিদিন মাংস ভোজন করে, কোন কাজকর্ম করে না — কেবল পারস্যদেশীয় গালিচার ওপর গড়াগড়ি দেয়। মাঝে মাঝে মোঙ্গল হাজারী খানেরা বাজপাখি নিয়ে শিকারে যায় কিংবা ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে পরখ করে নিজেদের মোঙ্গল ঘোড়াদের এবং পথে তুর্কমেনীয়, পারস্যদেশীয়, ককেশীয় ও অন্যান্য যে সব ঘোড়া দখল করা হয়েছে তাদের শক্তি।

কাল্‌কা নদীর স্রোতের উজানের দিকে, স্তেপের মাঝখানে টিলার ওপর পড়েছে দ্বিতীয় সেনানায়ক জেবে নোইয়নের ছাউনি। চার দিকে সবুজ প্রান্তরের বিস্তার। এই প্রান্তর ভেদ করে উত্তরের দিকে চলে গেছে টিলার শ্রেণী — তাদের মাথায় সারি সারি চৌকি।

জেবে ও সুবুদাইকে চেঙ্গিজ খান একই সময়ে এবং একই কাজের দায়িত্ব দিয়ে পশ্চিমে পাঠিয়েছিল বটে, কিন্তু দুই সেনানায়কের মধ্যে সব সময় তেমন একটা বনিবনা দেখা যেত না, তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই ছিল, একে অন্যের খুঁত ধরার চেষ্টা করত। চেঙ্গিজ খান চালাকি করেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাঠায়। অন্যান্য নোকরদের বেলায়ও সে একাধিক বার এইভাবে একই কাজে দু' জনকে পাঠিয়েছে — যেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বীদের সব সময় চেষ্টা থাকে একে অন্যের ওপর টেক্কা মারার।

অভিযানের ব্যাপারে জেবে বেপরোয়ার মতো সব সময় এগিয়ে যায়। তার সেনাদলকে বহু বার রীতিমতো বেকায়দায় পড়তে হয়েছে। তবে

শত্রুর আক্রমণ থেকে সে কৌশলে বেরিয়ে আসতে পারত। যখন চার দিক থেকে বিনাশের আশঙ্কা দেখা দিত তখন সুবুদাই এসে তাদের উদ্ধার করত। ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ঘন সারিবদ্ধ মোঙ্গল অশ্বারোহী সেনাদল নিয়ে সে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। তার সেনাদলে যেমন অশ্বারোহী তেমনি অশ্বও চীনদেশীয় লৌহবর্মে সুরক্ষিত ছিল।

দীর্ঘদেহী ও ঋজু চেহারার জেবে সদা গম্ভীর, তার কাচের মতো চোখের দৃষ্টি অচঞ্চল। যুদ্ধের পর ধুলোবালি ও রক্তমাখা অবস্থায় সে সুবুদাইয়ের কাছে হাজির হত। আগুনের কাছে বসে সে সুবুদাইকে বোঝানোর চেষ্টা করত যে তার কোন ভুল হয় নি, আসলে শত্রুরা সংখ্যায় ভারী ছিল। সুবুদাই এই ভেবে খুশি হয়ে হাসত যে এবারেও সে জেবের উদ্ধারকর্তা হয়ে দেখা দিয়েছে এবং বলত জেবে যেন আর তার ভুল-ত্রুটির জবাবদিহি না করে খরেজম শাহী কায়দায় রসুন আর পেস্তা বাটা দিয়ে কচি ভেড়ার যে শিক কাবাব বানানো হয়েছে তা খানিকটা চেখে দেখে।

জেবে ছিল অহঙ্কারী, আত্মবিশ্বাসী ও কোপন স্বভাবের। তার ধারণা ছিল সে যদি ষাট পা দূর থেকে ছুটন্ত কাঠবেড়ালির মাথা লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়ে তাহলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। অভ্রান্ত লক্ষ্যভেদ ও ক্ষিপ্রতার জন্য তার নামই হয়ে গিয়েছিল 'জেবে' — তীর।* বাহিনীতে সকলে তাকে এই নামেই জানত, যদিও তার আসল নাম ছিল অন্য। লড়াইয়ের আগে সে উঁচু আকারের তেজী ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখভাগের বিপজ্জনক জায়গাগুলোর ওপর দিয়ে ছুটে ছুটে জায়গা খুঁটিয়ে দেখত। বেশ কয়েক বার তাকে জীবিত অবস্থায় বার করে নিয়ে আসতে দেহরক্ষীদের বেগ পেতে হয়েছে।

সুবুদাইয়ের চিবুকে কয়েক গুচ্ছ পলিত কেশ, তাকে দেখলে বৃদ্ধ বলেই মনে হয়; কিন্তু তার বয়স যে কত তা কারও জানা নেই। যৌবনে কোন এক সময় সে কাঁধে আঘাত পায়, মাংসপেশী কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায়,

---

* জেবে সাধারণ নোকর থেকে ওপরে ওঠে। "জেবে সাহসী বলে চেঙ্গিজ খান তাকে দশকী নেতার পদ দেয়; উত্তম প্রতিপন্ন হওয়ায় সে তাকে শতকী বেগের পদ দেয়; উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়ে সে হাজারী সেনাপতি পদে উন্নীত হয়। অতঃপর চেঙ্গিজ খান তাকে তুমেনের বেগ পদ দান করে এবং বহু কাল সে তার অনুচর পদে থাকে, বাহিনী নিয়ে অভিযানে যায়, কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।" (রশীদ উদ্-দিন)

তদবধি তার ডান হাত বাঁকা, একমাত্র বাঁ হাত তার সচল। তার মুখে বাঁ চোখের ভুরু বরাবর কাটার দাগ, ফলে বাঁ চোখ উড়ে গেছে, সে জায়গাটা সব সময়ই কোঁচকানো আর ডান চোখ বিস্ফারিত — মনে হয় ঘুরে ঘুরে সকলকে এ ফোঁড়-ও ফোঁড় করে বিঁধছে।

বাহিনীর সব নোকরই বলত যে সুবুদাই হল ঠ্যাঙে কামড় খাওয়া বুড়ো শেয়ালের মতো ধূর্ত ও হুঁশিয়ার; ফাঁদে পড়ার অভিজ্ঞতা যে চিতাবাঘের হয়েছে তারই মতো সে হিংস্র। সুবুদাইয়ের সঙ্গে থাকলে শত্রুর কোন পরোয়া করতে হয় না, ব্যর্থ হতে হয় না।

জেবে একরোখার মতো মতলব আঁটতে থাকে কোন পথে ধরণীবিধৌত 'শেষ সাগরের' উপকূলে পৌঁছানো যায়। গায়ক বার্তাবহকে দিয়ে চেঙ্গিজ খানের কাছে যে বার্তাটি পাঠানো হয় তা জেবেই রচনা করে, সুবুদাই কেবল মাথা নাড়িয়ে সায় দিয়ে যায়, হেসে বলে:

"অনেক দূর যাবে বুঝি? এমন জায়গায় গিয়ে পড়তে কত দেরি আছে শুনি, যেখান থেকে লেজ গুটিয়ে উল্‌টো দিকে দৌড় দেবে আর শেষ বারের মতো তোমার উদ্ধারে আমাকে যেতে হবে?"

যে সব গুপ্তচর স্তেপের ওপর নজর রাখছিল তারা পথিকদের ধরে ধরে জেবের কাছে নিয়ে আসত। পশ্চিম ও উত্তরের দিকে কোন গোষ্ঠীর বাস, সেখানে যাওয়ার পথ কী, পথে কোন কোন নদী ও ঘাট পড়ে, ঘোড়ার খাদ্য মেলে কিনা, কী কী সমৃদ্ধ নগরী ও শক্ত কেল্লা আছে, ফৌজ ও অস্ত্রের বল কেমন, সৈন্যেরা যুদ্ধে কত পটু, তাদের তীর কতটা লক্ষ্য ভেদ করে এবং শেষ সাগর — প্রান্তিক সাগর দূরে কিনা — জেবে স্বয়ং তাদের এই সব বিষয়ে জিজ্ঞেসবাদ করত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তাতারদের কবলে ভবঘুরে প্লোস্‌কিনিয়া

একবার গুপ্তচরের দল ইতিপূর্বে অজ্ঞাত কোন এক গোষ্ঠীর কিছু লোকজন জেবের কাছে এনে হাজির করল। এই লোকগুলো ভেলায় ও নৌকোয় করে পথযাত্রীদের খেয়া পারাপারের কাজ করত। তাদের আকৃতি দীর্ঘ, কাঁধ চওড়া, মুখে কটা রঙের বিস্তৃত দাড়ি, ঊর্ধ্বাঙ্গে ভেড়ার চামড়ার ছিন্নভিন্ন খাটো আংরাখা, নিম্নাঙ্গে চামড়ার বসন, পায়ে পটি জড়ানো

নরম চামড়ার উঁচু জুতো। বনবেড়ালের লোমের ছাইরঙা টুপি কায়দা করে কানের এক পাশে কাত করা।

"তোরা কারা? কোত্থেকে এসেছিস?" জেবে জিজ্ঞেস করল।

তাদের মধ্যে যে লোকটা একটু বেশি লম্বা চওড়া গোছের সে কিপচাক ভাষায় উত্তর দিল:

"লোকে আমাদের 'ভবঘুরে' বলে থাকে, কেন না আমরা স্তেপে ঘুরে বেড়াই। আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা স্বাধীনতার খোঁজে রাজাদের কাছ থেকে পালিয়ে এখানে স্তেপে চলে আসে।..."

"তোরা তোদের প্রভুদের মানিস না, তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিস — তার মানে তোরা ডাকাত, বাউণ্ডুলে?"

"আমরা ডাকাত নই, একেবারে বাউণ্ডুলেও নই।... আমরা স্বাধীন লোক, স্বাধীন শিকারী, জেলে।"

"তুই কে?" জেবে সকলের চেয়ে দীর্ঘাকৃতি ভবঘুরেকে জিজ্ঞেস করল।

"আমার নাম প্লোস্‌কিনিয়া! আমাদের ভবঘুরেরা আমাকে তাদের মোড়ল করেছে।"

"চলে এসো! দরকারী লোকজন ধরা পড়েছে।" — এই কথা জানানোর জন্য জেবে তৎক্ষণাৎ একদল নোকর সুবুদাই বাহাদুরের কাছে পাঠিয়ে দিল।

নোকররা ফিরে এসে বলল: "সুবুদাই বাহাদুর গালিচার ওপর বসে আছেন। তাঁর সামনে এক বস্তা শিম। তিনি বলে পাঠালেন, 'যেতে পারছি না, ব্যস্ত আছি'।"

ভবঘুরে প্লোস্‌কিনিয়া মন্তব্য করল:

"তার মানে 'গরজ যার, বালাই তার'।"

জেবে ধৃত লোকদের সকলকে পাহারাদারদের হাতে রেখে দিয়ে স্বয়ং নোকর পরিবৃত হয়ে প্লোস্‌কিনিয়াকে সঙ্গে করে সুবুদাইয়ের উদ্দেশে চলল।

নিভু নিভু রক্তিম আলো ছড়ানো আকাশের পটে সুবুদাইয়ের ছাউনি তিনটি ঘন মসীলিপ্ত হয়ে জেগে রয়েছে। তার ওপর ঈষৎ ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে, উঁচিয়ে আছে সামরিক মর্যাদার প্রতীক — অশ্বপুচ্ছ ও শিঙা বাঁধা

কতকগুলো দণ্ড। ছাউনির ভেতরে পারস্যদেশীয় রেশমী গালিচার ওপর সুবুদাই আসীন। অগ্নিকুণ্ডের কম্পমান শিখায় তার মূর্তি আলোকিত, রঙচঙে থলে থেকে সে বাঁ হাতে শিমের দানা তুলে নিয়ে সযত্নে সেগুলোকে অদ্ভুত লম্বা সুতোর আকারে সাজিয়ে রাখছিল।

"কে এ?" সুবুদাই জিজ্ঞেস করল। বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টিতে প্লোস্‌কিনিয়ার দিকে এক পলক তাকিয়েই সে আবার শিমের দানা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। "বসো, জেবে নোইয়ন।"

জেবে গালিচার ওপর সুবুদাইয়ের পাশে বসে পড়ল, সে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে আড়চোখে বাহাদুরের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। ঠ্যাঙে কামড় খাওয়া বুড়ো চিতা বাঘটা যে কখন কী করে বসে তা জেবে আগে থাকতে কখনই আন্দাজ করতে পারে না।

দীর্ঘদেহী, হৃষ্টপুষ্ট, আবক্ষলম্বিত কটা রঙের প্রশস্ত শ্মশ্রুধারী ভবঘুরে প্লোস্‌কিনিয়া চোখ ঘুরিয়ে ছাউনির চার পাশ দেখে শুনে মনে মনে কিছু একটা আঁচ করল। সে বিনীত ভঙ্গিতে প্রবেশ-পথের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকল। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দুই মোঙ্গল তার প্রহরায় ছিল।

সুবুদাই চট্‌পট্‌ শিমের দানা এদিক-ওদিক সরাচ্ছিল; জেবে তার হাতের দিকে তাকাতে তাকাতে বন্দীদের কাছে যা যা শুনেছে তা বলে গেল এবং ঠিকমতো রাস্তা খুঁজে বার করার ব্যাপারে প্লোস্‌কিনিয়ার সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দিল।

"কিপচাক খানেরা এখন কী করছে?" সুবুদাই কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস করল।

"তারা সকলে ভয়ে থরহরি," প্লোস্‌কিনিয়া উত্তর দিল। "আপনাদের তাতাররা যখন তাদের শারুকান শহরে ঢুকল তখন কিপচাক খানেরা এদিক-ওদিক পালিয়ে যায় — কেউ যায় রুশ দেশে, কেউ বা জলা জমিতে।''

"উরুসদের দেশে কারা পালাল?"

"অনেকেই — তাদের সবচেয়ে বড় ধনী কোতিয়ান, আরও অনেক অনেক সর্দার গোছের লোকজন।"

সুবুদাই শিমের দানা থেকে চোখ তুলে প্লোস্‌কিনিয়ার দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞেস করল:

"উরুসদের আসল ফৌজ এখন কোথায়?"

"ভগবান জানেন!"

স্ববদাইয়ের মধ্যে একটা শিহরণ দেখা দিল, তার মুখ বিকৃত হল এবং খোলা চোখ ক্রোধে ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলতে লাগল। সে তার নখহীন বাঁকা তর্জনী তুলে শাসাল।

"যা যা জানিস বল! কিছু লুকানো-চোরানোর চেষ্টা করিস না! তাহলে কিন্তু তোকে তক্তা চাপা দিয়ে তার ওপর বিশ জন নোকরকে বসাব। তখন তুই চিঁচিঁ করতে করতে মারা যাবি।..."

"চুপ করতে যাব কেন?"

"উরুস রাজারা এখন কোথায় বল। উরুসরা কি যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে?"

"আমাকে একটু ভাবতে দিন!" এই বলে প্লোস্‌কিনিয়া দীর্ঘ দুই ঠ্যাঙ ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকাল।

স্ববদাই বার দুয়েক ভবঘুরের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার গালিচার ওপর শিমের দানা নাড়াচাড়া করতে লাগল। অবশেষে হিসহিস করে বলল:

"ওরে স্তেপের বাউণ্ডুলে শোন! তুই যদি আমাকে সব ঠিক-ঠিক বলিস তাহলে তোরে বখশিস মিলবে। এখানে এই শিমের দানাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ — এই হল দন নদী।... আর এই যে লম্বা ফিতেটা দেখছিস এটা হল নীপার নদী।... কাছে এগিয়ে আয়, আমাকে দেখা উরুসদের শহর কিয়েভ কোথায় হবে।"

প্লোস্‌কিনিয়া এক পা এগিয়ে যেতেই মোঙ্গল প্রহরী দু' জন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার তলোয়ারসুদ্ধ কোমরবন্ধনী ছিঁড়ে নিল। ভবঘুরে তখন ধীরে ধীরে নতজানু হয়ে সেই অবস্থায়ই স্ববদাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

"হ্যাঁ, বুঝতে পারছি!" লোমের টুপিটা মাথার পেছন দিকে সরিয়ে দিয়ে কপাল কুঁচকে সে বলল। "এই হল আমাদের নীপার।... আর এই হল নীপারের মোহানা যেখানে আছে ওলেশিয়ে।... এখানে একটা ছোট্ট নদী — মানে কাল্‌কা, যেখানে আমরা এখন আছি।... কেবল শুনুন মহানুভব খান! নীপার কিন্তু এইভাবে সোজাসুজি উত্তর থেকে দক্ষিণে যাচ্ছে না, যাচ্ছে অনেকটা বাঁকানো হাতের মতো, এখানে একটা বাঁক আছে। এখানে এই কাঁধটাতে হল কিয়েভ শহর আর যেখানে মুঠো সে জায়গাটায় কৃষ্ণ সাগরের শুরু। কনুইটা যেখানে স্তেপের দিকে বেরিয়ে গেছে সেখানে আছে নীপার নদীর একটা দ্বীপ — খোর্তিৎসা, আর এখানে

খোর্তিৎসার কাছে, মানে কন্দুইয়ের লাগোয়া জায়গাটাতে রুশী ফৌজ জমায়েত হচ্ছে।” প্রোস্‌কিনিয়া শিমের দানাগুলোকে সরিয়ে এমনভাবে সাজাল যাতে নীপারের বাঁকটা তেকোনা দেখায়।

“এখান থেকে কিয়েভ কত দূর?” সুবুদাই জিজ্ঞেস করল। সে থলি থেকে শিমের দানার সঙ্গে সঙ্গে এক মুঠো সোনার মোহর বার করে হাতের তালুর ওপর ছড়িয়ে আবার নিজের পাশে রেখে দিল।

প্রোস্‌কিনিয়ার চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠল, সে জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল।

“কিয়েভ দিয়ে আপনার কী হবে? রুশীরা কিয়েভ থেকে আসবে না, কেন না এখান থেকে কিয়েভ অনেক দূর — ছয়শ' ভার্স্ট মতো হবে।...”

“ভার্স্ট আবার কী?” সুবুদাই রেগে জিজ্ঞেস করল। “ভার্স্ট-ফার্স্ট বুঝি না বাপু।... সোজা কথা বল, ঘোড়ায় কত দিনের পথ।”

“একটা ঘোড়ায় এখান থেকে সরাসরি কিয়েভ যেতে গেলে দিন বারো লাগবে। আর ঘোড়া বদল করে গেলে ছয় দিন।”

“এই ত বুদ্ধিমানের মতো কথা বলতে শুরু করেছিস!”

“তবে রুশীরা কিয়েভ থেকে সরাসরি পথে স্তেপে যায় না। তারা নৌকোয় চেপে নীপার নদী ধরে ‘কন্দুই’ পর্যন্ত, মানে এই কোনাটায় — খোর্তিৎসা দ্বীপ অবধি যায়। এখানে তারা নদী পার হয়ে অন্য তীরে চলে আসে আর সেখান থেকে অল্প সময়ের রাস্তা ‘জালোজ্‌নি শ্‌লিয়াখ’* ধরে তারা এখানে, লুকোমোরিয়েতে পেঁছায়। ভালো ঘোড়া হলে সবসুদ্ধ তিন-চার দিন লাগে, আর ঘোড়া বদলে চললে দু' দিন।”

“মোটে দু' দিন!” সুবুদাইয়ের অবাক হওয়ার পালা। “তার মানে উরুসরা দু' দিনে নীপার থেকে এখানে আসতে পারে?”

“এই দেখুন এখানে এই বাঁকটায় — খোর্তিৎসা থেকে আমাদের রুশীরা প্রায়ই পলভেৎস যাযাবরদের আস্তানা আক্রমণ করেছে। মালের বোঝাসুদ্ধ গাড়ি সঙ্গে না থাকলে দু-তিন দিনে যাওয়া যায়।”

মনে হল সুবুদাই তার পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে খুশিই হয়েছে। সে হাঁটুর ওপর চাপড় মেরে হাসল এবং ঘোলের সরবৎ আনার হুকুম

---

* জালোজ্‌নি শ্‌লিয়াখ — আজভ সাগর থেকে নীপার অভিমুখী সুপ্রাচীন বাণিজ্য পথ।

দিল। সে খ্ুটিয়ে খ্ুটিয়ে প্লোস্‌কিনিয়াকে জিজ্ঞেসবাদ করতে লাগল পথ-ঘাটের কথা, জানতে চাইল নদীর কোথায় কোথায় হাঁটু জল আছে, উর্‌সদের ফৌজ কেমন, তাদের ঘোড়া কেমন, যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র কেমন এবং যুদ্ধে তারা কতটা পটু।

"যুদ্ধ তারা দারুণ করে, বিশেষ করে খড়্গ নিয়ে, এমনকি সাদাসিধে কুড়ুল দিয়েও।"

"এই উর্‌সদের ফৌজ কত বড়?"

"আশেপাশের সব রাজা — মানে কিয়েভ, চের্নিগভ, স্মলেন্‌স্ক, গালিচ ও ভলিন্‌স্কের রাজা এবং আরও ছোটখাটো রাজারা এক জোট হয়ে যদি খোর্তিৎসায় তাদের ফৌজ জড় করে তাহলে পদাতিক, তীরন্দাজ ও ঘোড়সওয়ার মিলে হাজার পঞ্চাশেক সৈন্য স্তেপে নামবে।"

"তার মানে ওদের আছে পাঁচ তোমেন ফৌজ?" এই বলে নীপারের ওপর খোর্তিৎসার যে বাঁকটিতে স্তেপে অভিযান শুরু হবে তার কাছাকাছি জায়গায় সুবুদাই পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা রাখল। "আর কিপচাকদের ঘোড়সওয়ার কত হবে?"

"তাও হাজার পঞ্চাশেক হবে।* নীপারের এই পারটা ইতিমধ্যেই অসংখ্য কিপচাকে ছেয়ে গেছে।"

সুবুদাই আরও পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা রাখল।

"তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে আমাদের বিরুদ্ধে থাকবে উর্‌স আর কিপচাকদের মোট দশটা তোমেন?" এই বলে সুবুদাই নির্বিকার, নীরব জেবের দিকে তাকাল। "মনে আছে জেবে নোইয়ন, কী রকম ফৌজ নিয়ে আমরা কালো ইর্তিশ থেকে খরেজমে গিয়েছিলাম?.. এখন আমরা দেখাব 'জগৎ আলোড়নকারী' চেঙ্গিজ খানের আমরা যোগ্য সাকরেদ কিনা!"

প্লোস্‌কিনিয়া চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে একবার স্বর্ণমুদ্রাগুলোর দিকে, একবার চিন্তামগ্ন মোঙ্গল খানদের মুখের দিকে তাকায়। ধূর্ত ও দুষ্ট চিন্তার স্ফুলিঙ্গ তার চোখে-মুখে খেলে গেল। সে তোষামোদের স্বরে জিজ্ঞেস করল:

---

* মোঙ্গলদের মনে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে রুশী ও কিপচাক সৈন্যদের সংখ্যা প্লোস্‌কিনিয়া ইচ্ছে করে বাড়িয়ে বলেছিল। আসলে তাদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। প্রাচীন ঘটনাপঞ্জীতে সঠিক সংখ্যা বলা হয় নি।

"মহানুভব তাতার সেনাপতি, আপনার তাতার ফৌজ যেখানে আছে সেখানে আরও কয়েকটা সোনার মোহর রাখলেন না যে? আপনার ফৌজ কত বড় তা জাহির করুন না!"

সুবুদাই তার বাঁকা আঙুলগুলো মুঠো করে ঘুষি পাকিয়ে প্লোস্কিনিয়ার মুখে আঘাত করল।

"এই হল আমাদের তাতারে সৈন্যের সংখ্যা! আমার হাতে উরুস আর কিপচাকদেরও এই হাল হবে!" সুবুদাই যে দশটা মুদ্রা রেখেছিল ক্রুদ্ধ হয়ে সেগুলো জড় করে নিয়ে শিমের থলিতে পুরে ফেলল। "সবগুলোকে আমার এই থলেয় পুরে ছানার মতো গিলে খাব।"

প্লোস্কিনিয়া পিছিয়ে গেল।

"খানের জয় হোক! আমার কাজের জন্য দয়া করে কিছু অন্তত দেবেন ত?"

"উঁহু! টাকা আমি কাউকে দিই না, বরং লোকেই আমাকে দিয়ে থাকে, আর আমি সব কিছু পাঠিয়ে দিই আমার প্রভু অপরাজেয় চেঙ্গিজ খানের কাছে।... তুই অবশ্য বখশিস পেলেও পেতে পারিস। তোর ছেলেপুলে আছে কি?"

"ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমার চারটি ছেলে।"

"তারা কোথায়? দূরে?"

"দন নদীর হাঁটু জলের ওপরে নৌকোয় আছে।"

"ওদের আনার জন্য একশ' ঘোড়সওয়ার পাঠাচ্ছি। তারা মুহূর্তের মধ্যে ওদের এখানে নিয়ে আসবে। তুই ওদের বলবি ওরা যেন উরুসদের সঙ্গে ভিড়ে গুপ্তচরের কাজ করে, খোঁজ খবর নেয় উরুসদের সৈন্যরা কোথায়, তাদের সংখ্যা কত। ওদের জানতে বলবি উরুসদের সেনাপতিরা কী ভাবছে, তারপর শিগ্গির করে ফিরে এসে আমাকে যেন সব কিছু ঠিক ঠিক জানায়। তখন আমি তোকে আর তোর ছেলেদেরও ছেড়ে দেব, বখশিস হিশেবে এক পাল ঘোড়া দেব আর প্রত্যেককে দেব এক মুঠো করে সোনা। আর দেরি কেন? এদিক-ওদিক টলছিস কেন?"

প্লোস্কিনিয়া তার দীর্ঘ পা জোড়া ফাঁক করে শক্ত হয়ে দাঁড়াল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

"আমার গর্দান নিন মান্যবর খান, আমার ছেলেদের ছোঁবেন না!"

সুবুদাই হিসহিস আওয়াজ করে গালিচার ওপর ঘুষি মারল।

"কী, আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলিস? ওরে কোথায় কে আছিস? আমার এই মাননীয় অতিথিটিকে যে ছাউনিতে চিতা আছে সেখানে নিয়ে যা, তিন গুণ পাহারায় রেখে দে। আর সাক্‌লাব যেন ওকে পেট পুরে খানদানি খাবার-দাবার খেতে দেয়।..."

"এর পা কি বাঁধতে হবে?" নোকররা জিজ্ঞেস করল। "যেমন নেকড়ে দেখছি, পালিয়ে যেতে পারে!"

"হ্যাঁ, শক্ত লোহার শেকল দিয়ে ওকে সম্মান জানাতে ভুলিস না!.."

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কিয়েভে বিপদ্‌সঙ্কেত

রাজদ্রোহ করি কিনা আনিয়াছ ডাকি
দুরাচারে, রুশদেশে? কলহে-বিবাদে
অবারিত করি দিলে প্রবল তাণ্ডব
পলভেৎস ভূমি থেকে। ...
নগরের দ্বার আজি কর সুরক্ষণ
মর্মভেদী তীক্ষ্ম শরে, বাহুবল হোক
প্রকটিত মাতৃভূমি রুশদেশ স্মরি,
মহাবীর স্‌ভিয়াতস্লাভিচ্‌ ইগরের ক্ষত
আর শোণিতের তরে।

('ইগরের সেনাবাহিনীর কথা')

নীপারের বাম উপকূল স্তেপভূমি, তার বিপরীত দিকে কিয়েভ। এইখানে ভোরবেলা পলভেৎসরা অতর্কিতে হানা দিয়ে খেয়া পারাপারের ভেলা দখল করে ফেলল। তারা ভেলায় উঠে খেয়া মাঝিদের পালানোর রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে ভয় দেখাল। বহু লোকের ভারে জল উঠে ভেলা কাত হয়ে পড়ল। চিতাবাঘের মতো চকরাবকরা এক ঘোড়ায় চেপে সামনে এগিয়ে এলো মোটাসোটা গোছের পলভেৎস খান। তার সঙ্গে একশ' অশ্বারোহী। তাদের মধ্যে একজন দীর্ঘ দণ্ডে অশ্বপুচ্ছ ও তামার অলঙ্কারাদিতে সাজানো খানের মর্যাদা চিহ্ন ধ্বজা বহন করে মহাসমারোহে আগে আগে চলেছে। আর একজন খঞ্জনী বাজাচ্ছে। দু' জন বাঁশীতে কর্ণভেদী আওয়াজ তুলেছে। অশ্বারোহীদের একজন খানকে ঘাটের দিকে পথ করে

দেওয়ার জন্য এদিক-ওদিক সজোরে কশাঘাত করে চলছে, তার বুনো ঘোড়াটা ভয়ঙ্কর ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ফেলছে।

এক পাশে বেশ কিছু শ্রোতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। ভিড়ের সামনে এক ক্ষীণকায়, ধুলোবালিমাখা মুসাফির; তার কাঁধে ঝোলা। লোকটা বলছিল যে পলভেৎসরা সবাই এখন বুনো মাঠ* থেকে পালিয়ে যাচ্ছে আর তাদের পেছনে তাড়া করে চলছে অজানা, ভয়ঙ্কর চেহারার "তাতার গোষ্ঠীর লোকজন" — "তাদের মুখে দাড়িগোঁফ নেই, নাক খাঁদা, মাথায় ডাইনীর মতো রুক্ষ চুলের গোছা। পাষণ্ড তাতারদের দেখা মাত্রই লোকের প্রাণ উড়ে যায়।..."

"এরা কী রকম লোক? বল দেখি, ওহে ইমানদার মুসাফির, দেখেশুনে মনে হচ্ছে তুমি লোকটা বিদ্বান, লেখাপড়া জান বটে।''

মুসাফির তার দীর্ঘ যষ্টির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করল:

"পুব থেকে ভয়ঙ্কর এক জাতের লোকজন কাতারে কাতারে এগিয়ে আসছে। এরা হল 'তাতার'। আমাদের দেশের কেউ এর আগে তাদের কথা শোনে নি। তাদের লোকজনের মধ্যে সাতটা ভাষা চলতি আছে। পলভেৎসরা আশেপাশের জাতগুলোকে গোলাম করে রেখেছে, তাদের ধ্বংস করেছে। আজ সেই পলভেৎসদেরও দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাতাররা ওদের হারিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হবে না, ওদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে, ঝাড়েবংশে খতম করবে আর তাদের জমির ওপর নিজেরা মৌরসিপাট্টা হয়ে বসবে।..."

"এই জাতের আদি নিবাস কোথায়?"

"নানা পুরাণে এদের কথা আছে, পাদ্রী মেথোডি পাতারিস্কিও এদের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে ম্যাসিডোনিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার নাকি সেই আমলে দুরাচার গোগ আর মাগোগ জাতের লোকজনকে খেদিয়ে দুনিয়ার এক প্রান্তে, পুব ও উত্তরের মাঝখানে এক মরুভূমিতে নিয়ে যান। তিনি পাহাড় ঠেলে ওদের বন্ধ করে রেখে দিয়ে মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত ওখানে থাকার হুকুম দেন। পাদ্রী তাঁর বাণীতে এমনও বলেছেন যে ঐ সময় আসার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের বাধা সরে যাবে, তখন

---

* বুনো মাঠ — কৃষ্ণ সাগর তীরবর্তী স্তেপভূমি।

গোগ আর মাগোগরা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে পূব থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত এদিকে আবিসিনিয়া বাদে টাইগ্রিস থেকে পন্টাইন সাগর অবধি গোটা দুনিয়া দখল করে ফেলবে।..."

"গোটা দুনিয়া!" জনতা বিস্ময় প্রকাশ করল। "তার মানে আমাদের দেশও?.."

মুসাফির বলে চলল:

"চার দিকে কী কান্ড কারখানা হচ্ছে তা কি দেখতে পাচ্ছ না? মহাপ্রলয়ের লক্ষণের আর কী বাকিটা আছে! এক ভয়ঙ্কর তারা দেখা গেছে, তার কিরণ সরাসরি পূব দিকে চলে গেছে, এটা হল খ্রীস্টানদের ওপর নতুন করে ধ্বংসলীলা আর নতুন শত্রুর হামলার লক্ষণ।... তার মানে পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে দুরাচার গোগ আর মাগোগেরা আমাদের দিকে আসছে। দুনিয়ার শেষ হতে আর দেরি নেই!.."

দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ আর কান্নার রোল উঠল। মুসাফির তার কম্বলের টুপি খুলে সামনে পেতে ধরল, শ্রোতারা তাতে রুটির টুকরো এবং কালো রঙের খুচরো মুদ্রা ফেলতে লাগল।

দক্ষিণ তীর থেকে আলকাতরা মাখানো বড় বড় নৌকোয় চেপে কিয়েভের মহামান্য রাজার সৈন্যসামন্ত এসে হাজির হল। তারা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে খেয়াঘাটের পথ পরিষ্কার করল এবং প্রবীণ পলভেৎস খানকে ভেলায় উঠতে সাহায্য করল। খানের পরিধানে দামী পশুচর্মের পাড় লাগানো রক্ত বর্ণের রেশমী চাপকান, তার সাদা রঙের চোঙা টুপি থেকে ঝুলছে লাল লোমওয়ালা শেয়ালের চামড়া, হাঁটু অবধি ওঠানো রক্তিম জুতো জোড়া মুক্তাখচিত। সে চামড়ার দস্তানোবদ্ধ হাতে ভেলার বেষ্টনী ধরে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্য হাতে চেপে ধরে ছিল বাঁকা তরবারির হীরে ঝলমলে হাতল।

স্থূলকায় এবং রাশভারী খান আপাতদৃষ্টিতে শান্ত, কেবল তার চোখের উদ্বেগজনক কটাক্ষ দৃষ্টি নীপারের কালো জলের ওপর ছুটোছুটি করছিল। বাতাসের গতি তীব্র হতে নদীতে তরঙ্গ খেলে গেল, গড়ানো ঢেউয়ের ওপর সাদা ফেনা ভেঙ্গে পড়ল।

খান দরাজ হাতে দান করল। ভেলার মাঝিরা তার কাছ থেকে বেশ কয়েক মুঠো রৌপ্য মুদ্রা পেয়ে প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগল। সারা দিন ধরে তারা বিশাল কারাভান পার করে চলল: সে সবের মধ্যে ছিল কারুকাজ

করা মোটা কাপড়ে ঢাকা ঘোড়ার দল, আতঙ্কে গর্জনরত উট আর বিপুলকায় এমন সব মহিষ, যাদের শিঙ কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। সেই সঙ্গে পারেই পুঁতি আর ফিতের নানারকম সাজগোজ পরিয়ে ভিনদেশী বন্দিনীদের ভেলায় করে ওপারে পাঠানো হচ্ছিল। তাদের গায়ের রং তামাটে, ভুরু কালো। এ সবই হল রুশী রাজাদের উদ্দেশে ভেট।

জনতার ভেতর থেকে গুঞ্জন উঠল, ইনি হলেন সবচেয়ে বর্ষীয়ান পলভেৎস খান কোতিয়ান, কয়েক লক্ষ ঘোড়ার মালিক। মালিকের চিহ্ন — অর্ধাকৃতি খুর এবং তার নীচে দু'টি রেখা দেহে ধারণ করে এই ঘোড়ার দল 'বুনো মাঠের' অনন্ত প্রসারিত সমভূমিতে বিচরণ করে।

"কোতিয়ান — স্তেপের মালিক। তিনি একাই এক বিশাল ফৌজ খাড়া করতে পারেন। কিয়েভে তার যাত্রা অকারণে নয়। প্রয়োজনের তাড়নায়ই তিনি ছুটেছেন। অন্যান্য পলভেৎস খানও সার বেঁধে সপরিবারে রুশদেশের তীরের দিকে চলেছেন, তাঁরা এখন নীপারের যেখানে জল অগভীর সে সব জায়গা আর সাঁকোর ওপর দিয়ে নদী পার হচ্ছেন। পলভেৎস সেনাদল ঘোড়ার পিঠে চেপে ঢাল, বর্ম ও বর্শা নিয়ে জলে নামছে।... কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। ওদের মাথায় কোন কুমতলব নেই ত? পলভেৎসরা আর তাদের খোশমেজাজী গান গায় না, তারা যখন স্তেপ থেকে আমাদের দিকে আসতে থাকে তখন দূর থেকে কেবল উটের গোঙানির মতো একটানা গানের সুর শোনা যায়।..."

কিয়েভের মহামান্য রাজা ম্স্তিস্লাভ রমানোভিচের* প্রাসাদে দ্রুত হাতে সমাবেশের আয়োজন চলল: ছোট বড় সবরকম রাজারই আসার কথা। সকলের কাছে রুশদেশ রক্ষা করার জন্য আহ্বান জানিয়ে জাত ঘোড়ার পিঠে অশ্বারোহী দূতদের পাঠানো হয়েছে।

গণ্যমান্য অতিথিদের যোগ্য সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানানো কিয়েভের রাজার পক্ষে সহজ ব্যাপার ছিল না — প্রত্যেকের সঙ্গে তার নিজস্ব সৈন্যসামন্ত; যার পদমর্যাদা যত বেশি তত বেশি সংখ্যক অনুচর নিয়ে তার আগমন। রাজভৃত্যরা কিয়েভের যাবৎ রুটিওয়ালা ও মাংসের

---

* ম্স্তিস্লাভ রমানোভিচ (১২১৪—১২২৩) — মনোমাখ বংশের শেষ কিয়েভ রাজা।

কারবারীকে ভালো ময়দার রুটি ও মাংসের পুর দেওয়া পিঠে বানিয়ে রাজপ্রাসাদে সরবরাহ করার কাজে লাগিয়ে দিল। একশ' বছর আগে রাজা মনোমাখের আমলে কিয়েভ রাজবংশের যে প্রতাপ প্রতিপত্তি ছিল এখন আর তা নেই। সে আমলে বলতে গেলে গোটা রুশদেশ কিয়েভের মহামান্য রাজার হাতের মুঠোয় ছিল: কিয়েভ, পেরেয়াস্লাভ্ল, স্মলেন্স্ক, সুজ্দাল, রস্তোভ, এমনকি দূরবর্তী সমৃদ্ধ নভগরদও একান্তরূপে তার অধিকারভুক্ত ছিল। সে সময় সব রাজাই তাকে সমীহ করত, তাই পলভেৎসরা মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস করে নি। তাঁর নামে তখন রাজ্যের সীমানা জুড়ে রুশীদের নামডাক। কিন্তু কালে মনোমাখ বংশ ভেঙে টুকরো টুকরো হল। রাজারা তাদের পুত্র, পৌত্র এবং জ্ঞাতি গোত্রের মধ্যে নানা নগর ও এলাকা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতে দিতে এখন ম্স্তিস্লাভ রমানোভিচের শাসনাধিকারে এসে ঠেকেছে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল কিয়েভ। গত পঁচিশ বছরে রুশদেশের অন্যান্য নরপতির হামলায় কিয়েভ সর্বস্বান্ত হয়েছে, গালিচ, ভ্লাদিমির ও সুজ্দালের বাহিনী এবং অবিমৃষ্যকারী রাজাদের প্রশ্রয়প্রাপ্ত বর্বর পলভেৎসরা* প্রাচীন রাজধানীকে লুণ্ঠন করেছে, তাকে অগ্নিদগ্ধ করেছে।

এত ধ্বংসকাণ্ডের পর নিজেদের রাজধানী নতুন করে গড়ে তোলা কিয়েভবাসীদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না; বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়, দরজা-জানলা ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকে।...

এখন স্তেপ থেকে আর এক বিপদ এগিয়ে আসছে। এর ফলে গর্বিত ও উদ্ধত এবং শ্রেষ্ঠ সিংহাসন, আরও লাভজনক নগর ও জনপদের অধিকার লাভের জন্য সারা জীবন পরস্পরের প্রতি বৈরভাবাপন্ন রাজাদের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। এত কালের শত্রু পলভেৎসরা আজ নিজেরাই বিনীতভাবে কিয়েভে ছুটে এসে সাহায্য প্রার্থনা করছে। তাদের চোখে-মুখে হতাশার ছাপ, অবনত মুখে রাজপ্রাসাদের ফটকের সামনে তারা

---

* কিয়েভ শহর চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১১৬২, ১১৬৯, ১২০২, ১২০৪, ১২০৭ এবং ১২১০ সনে। ১২০৪ সনের আঘাত বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য — সে সময় শাসনক্ষমতা অধিকার করার জন্য যুদ্ধে নেমে রাজা রিউরিক রস্তিস্লাভিচ বর্বর পলভেৎসদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পলভেৎসরা নগর অগ্নিদগ্ধ করে, নিরীহ অধিবাসীদের হত্যা করে, ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে এবং কিয়েভের বহু নাগরিক ও শিশুকে ধরে নিয়ে যায়।

ভিড় করে আলগোছে বসে ছিল। একে একে রুশী নৃপতিরা আসতে থাকলে পলভেৎসরা তাদের কাছে ছুটে যায়, ঘোড়ার লাগামে চুমু খায়, হাত বাড়িয়ে দিয়ে বারবার বলতে থাকে:

"আপনাদের সব ফৌজ এক করুন! আমাদের স্তেপে আসুন! আমাদের রক্ষা করুন! এই ভয়ানক শত্রুদল তাড়ানোর ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করুন!"

প্রত্যেক নৃপতিই যার যার অনুচরবৃন্দ নিয়ে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে জড় হতে লাগল। তারা পৃথক পৃথক ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বাদানুবাদ শুরু করে দিল, কখনও কখনও কোথায় কে কী বলছে তা শোনার উদ্দেশ্যে জায়গা ছেড়ে আসতে লাগল। রাজপুরুষদের অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও তারা দরবার ঘরে উঠে আসতে রাজি হল না।

পলভেৎস খান কোতিয়ানও তার চিরাচরিত ঠাট নিয়ে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পাশে বুকের ওপর দু' হাত ভাঁজ করে গম্ভীর মুখে নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিল স্তেপের লোকজন — তার পরামর্শদাতার দল। তাদের মাথায় চোঙ্গা টুপি, স্তেপের রোদে ও উষ্ণ বাতাসে তাদের মুখের রঙ পোড়া। দোভাষী ছিল স্তেপের ভবঘুরে এক বুড়ো। সে খানকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল কোন রাজা ইতিমধ্যেই এসে গেছে, কার কী নাম এবং তাদের মধ্যে কে বিশেষ করে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। কাকে কাকে মর্যাদা দেখানো উচিত তা মনে মনে আঁচ করে কোতিয়ান হেলেদুলে তার তার সামনে হাজির হয়, নত হয়ে অতি কষ্টে হাত দিয়ে ভূমি স্পর্শ করে, তারপর আবার গম্ভীরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, নিজের কাঁচা-পাকা দীর্ঘ গোঁফে হাত বুলিয়ে বলে চলে একই কথা:

"ভাই হয়ে সাহায্য করুন! আমাদের সকলের ওপরই বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আমরা এক হয়ে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারলে বিপদ দূর করা যাবে। আমার সামান্য উপহারে অবজ্ঞা করবেন না। আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন! আমি কাউকে ভুলি নি, সকলকে সম্মান দেখাতে চাই — জামা-কাপড়, গোরু-ঘোড়া আর বাঁদী উপহার দিয়ে।"

সূর্য প্রায় মধ্য গগনে, অথচ নৃপতিরা তখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাসাদ প্রাঙ্গণের হৈ-হট্টগোলের মাঝখানে গলা ফাটিয়ে বাদ-প্রতিবাদে মত্ত। সকলেই অপেক্ষা করে কে প্রথম কিয়েভের রাজপ্রাসাদের দরবার ঘরে প্রবেশ করে। সকলে বলাবলি করতে লাগল যে রাজা মস্তিস্লাভ

রমানোভিচ আরও কার জন্য যেন অপেক্ষা করছে — হয়ত বা উত্তর থেকে শক্তিশালী ও দর্পিত সুজ্দাল নরপতি ইউরি ভ্সেভলোদভিচের দূতের! সুজ্দাল নরপতির ইচ্ছে সভাটা তার ওখানে সুজ্দালেই হোক। কিয়েভের মতো কাঙালের রাজত্বে যাওয়ার প্রবৃত্তি তার মোটেই নেই। তা ছাড়া গালিচ নরপতি ম্স্তিস্লাভ উদাত্নিকেও* দেখা যাচ্ছে না — সে বিশেষ করে সকলকে সভায় ডেকে পাঠিয়েছিল, তার দূতেরা সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে: সমূহ বিপদ দেখা দিয়েছে, অবিলম্বে আসুন!

অকস্মাৎ সমবেত নৃপতিদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, সকলে সমস্বরে বলে উঠল:

"ম্স্তিস্লাভ উদাত্নি এসে গেছেন!" তারা কৌতূহলবশে কনুইয়ের ধাক্কায় ঠেলাঠেলি করে উগ্রীয় ও পোলদের বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্য ও বিজয়ের জন্য বিখ্যাত এই নরপতিকে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করল।

ম্স্তিস্লাভ উদাত্নি বয়স যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে প্রবেশ করল। সে থমকে দাঁড়িয়ে মর্মভেদী কালো চোখের সজীব দৃষ্টি সমবেত নৃপতিদের ওপর বুলিয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগল, দীর্ঘ, ঝুলন্ত গোঁফে অনেকক্ষণ পাক দিল। তার পরিধানে সমরসাজ — সোনালি শিরস্ত্রাণে সূর্যকিরণে ঝক্ঝক্ করছে, হালকা জালিবর্মের ওপর সোনার অলঙ্করণ। তার দ্রুত পদসঞ্চারে রক্তিম আঙরাখা আন্দোলিত হচ্ছিল। প্রাসাদের এক কোণে খান কোতিয়ানকে দেখতে পেয়ে সে সোজা তার দিকে অগ্রসর হল। কোতিয়ানও হাত বাড়িয়ে দিয়ে দ্রুত পদে তাকে সম্ভাষণ জানাতে গেল। তারা কোলাকুলি করল, কোতিয়ান গালিচ নরপতির বুকে মাথা গুঁজল। কোতিয়ানের সাদা টুপি ধুলায় অবলুণ্ঠিত হল, সকলেই লক্ষ্য করল পলভেৎস খানের কাঁধ দুটো থরথর করে কাঁপছে।

"কাঁদছে! তা একটু কাঁদুক!" ভিড়ের মধ্য থেকে ফিস্ফিস্ শোনা গেল। "এই ইতরগুলো আমাদের কম লোকের হাতে-পায়ে বেড়ি দিয়ে অত্যাচার করে নি। অনাথের মর্মান্তিক চোখের জল কাকে বলে তা ওরা নিজেরাই এখন টের পাক! ম্স্তিস্লাভ খান কোতিয়ানের মেয়েকে বিয়ে করেছেন, তাই ধনী শ্বশুরের জন্য তাঁর মাথাব্যথা!"

---

* সমকালীনদের কাছে গালিচ নরপতি ম্স্তিস্লাভ ম্স্তিস্লাভোভিচ 'উদাত্নি' অর্থাৎ 'সফলকাম' নামে পরিচিত।

কিয়েভ নরপতির পাত্র-মিত্ররা এসে তাকে ম্স্তিস্লাভ উদাত্‌নির আগমন বার্তা জানাল। ম্স্তিস্লাভ রমানোভিচ কিন্তু তখনও গড়িমসি করতে লাগল, খুড়তুত ভাইকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দেউড়িতে বেরিয়ে আসার গরজ দেখা গেল না — পুরনো ক্ষত শুকোয় নি! এদিকে ম্স্তিস্লাভ কোতিয়ানকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে তার সঙ্গে প্রাসাদের এক কোণে সরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ নীচুগলায় কথাবার্তা বলতে লাগল।

আবার সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, সাড়া পড়ে গেল:

"সুজ্‌দালের রাজা দলবল নিয়ে এসেছেন! আমাদের ভরসা বাড়ল! ওদের ছাড়া কি আর আমাদের পা বাড়ানোর উপায় আছে! আরে না, সুজ্‌দালের রাজা ত নন, এ দেখছি রস্তোভের কুমার বাহাদুর ভাসিল্‌কো কনস্তান্‌তিনোভিচ।"

প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল এক তরুণ, সুগঠিত বীরপুরুষ। ক্ষীণ শ্মশ্রুরাজি তার চিবুক ঈষৎ আবৃত করেছে মাত্র। গালিচের ম্স্তিস্লাভের মতো তারও পরিধানে সামরিক সজ্জা — লোহার জালিবর্ম, ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ, আর কোমরবন্ধনীতে ঝুলছে দীর্ঘ ঋজু তরবারি। পোশাকে কোন আড়ম্বর নেই, রক্তিম আঙরাখার রং ফিকে হয়ে গেছে। সারা পোশাকে ধুলোবালি ও কাদামাখা — মনে হয় এই মাত্র ঘোড়া থেকে নেমে এসেছে। পাশে পাশে চলছে এক প্রৌঢ় — প্রৌঢ়ের কুঞ্চিত কেশদাম অর্ধপলিত, কাঁধ ঈষৎ ন্যুব্জ; তার কাঁধ বরাবর এক কাঁচা চামড়ার বন্ধনী — তাতে ঝুলছে বীণা।

"ইনি হলেন অন্ধ গায়ক! নামজাদা গাইয়ে গ্রেমিস্লাভ! আগে ছিলেন সেনাপতি, বহুবার পলভেৎসদের শায়েস্তা করেছেন, কিন্তু রিয়াজানের রাজা গ্লেবের রাগ ছিল তাঁর ওপর, তাই তিনি ওঁকে পাতাল ঘরে বন্দী করে রাখেন, ওঁকে অন্ধ করে দিয়ে তিন বছর সেখানে আটকে রাখেন। সেখানে বন্দীদশায় গ্রেমিস্লাভ গান বাঁধতে থাকেন, শেষে তিনি পাতাল ঘর থেকে উদ্ধার পান। তারপর থেকেই তিনি শহরে শহরে ঘুরে বেড়ান আর বহুকাল আগের সব ঘটনা নিয়ে গান গেয়ে শোনান।... তার মানে আজ গ্রেমিস্লাভের গান শোনা যাবে।"

কুমার বাহাদুর ভাসিল্‌কো অমায়িক হাসি নিয়ে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ নরপতিদের শ্রদ্ধা জানিয়ে সকলের পাশ দিয়েই একবার করে ঘুরে গেল। নৃপতিরা নিজেরাই তার সামনাসামনি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করতে থাকল:

"সুজ্‌দালের অতিথিরা কোথায়? তুমি ত ওঁদের প্রতিবেশী, বলতে

পার কি ও'দের পাত্তা নেই কেন? সুজ্‌দালের মহামান্য নরপতি ইউরি ভ্‌সেভলোদভিচ হলেন তোমার আপন খুড়ো, তুমি কি তাকে বুঝিয়ে বলেছ?"

"তিনি এখনও ভাবছেন! আর আসবেন কিনা তা ডাকিনী-যোগিনীরও বলার সাধ্য নেই।"

রাজপ্রাসাদের দেউড়িতে জোড়ায় জোড়ায় বেরিয়ে এলো দশ জন পাত্র-মিত্র। সকলেই বাছা বাছা বিশিষ্ট লোকজন। তাদের পরিধানে লোহার জালিবর্ম ও শিরস্ত্রাণ, হাতে খাটো বর্শা। তারা নেমে এসে সোপানের দু' ধারে সার বে'ধে দাঁড়িয়ে নৃপতি ম্‌স্তিস্লাভ রমানোভিচের আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। ম্‌স্তিস্লাভ রমানোভিচ হাতলে সোনার বাজপাখি আঁটা যষ্টিতে ভর দিয়ে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে এলো। তার সরল রেখাযুক্ত ভ্রূযুগলের নীচে কঠিন নয়নযুগলের দৃষ্টি অবসন্ন ও বিমর্ষ। ঈষৎ দ্বিধাবিন্যস্ত পলিত শ্মশ্রুরাজি, বক্ষদেশে ক্রুশ ও সোনার আইকন, পরিধানে কিংখাপের কামিজ, আগাগোড়া সাধুসন্ত গোছের চেহারা দেখে মনে হয় সামরিক ব্যাপারে মাথা ঘামানোর চেয়ে ধর্মচর্চা ও রাত্রিকালীন উপাসনার প্রতিই তার মনোযোগ বেশি। নৃপতি সামান্য খ‍ুঁড়িয়ে খ‍ুঁড়িয়ে সোপান ধরে নেমে শেষ ধাপের ওপর দাঁড়াল।

"মাননীয় অতিথিরা, আসতে আজ্ঞা হোক।" তার কণ্ঠস্বরে বিষণ্ণতা ও দুশ্চিন্তার আভাস।

প্রাঙ্গণে সমবেত নরপতিরা সকলে একে অন্যের চেয়ে গলা উ'চিয়ে সমস্বরে চে'চিয়ে উঠল:

"আমাদের ডাকা হয়েছে কেন? বর্বর পলভেৎসদের বাঁচানোর জন্য? ওদের কেউ পিষে ফেলে না কেন! আপদ-বালাইগুলো দূর হলে ভালোই হয়। ওরা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করুক গে, আমরা মজা দেখব!"

ভারী চেহারার খান কোতিয়ান ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে বাঁকা পায়ে হেলে দুলে দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সে ভূমিতে হাত ঠেকাল, নৃপতির স্বর্ণখচিত পোশাকের প্রান্ত স্পর্শ করে ঢোক গিলে বলল:

"মহানুভব মহারাজ! আমি যেমন আপনাকে সমাদর করেছি আপনার স্নেহ থেকেও তেমনি এত দিন বঞ্চিত হই নি। আপনি আমাদের পিতৃস্থানীয়! চেঙ্গিজ খানের খুনেদের হাত থেকে আমাদের বাঁচান! তাতার

নামে এই বদমাশগুলো নেকড়ের মতো আমাদের দেশ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। আজ আমাদের সমস্ত জমি কেড়ে নিয়েছে, কাল আপনাদের ওপর হানা দিয়ে আপনাদের রুশদেশও ছিনিয়ে নেবে। আমাদের রক্ষা করুন! আমাদের সাহায্য না করলে আমরা সকলে এখন মারা যাব আর আগামীকাল আপনাদের — রুশীদেরও ঐ একই গতি হবে! আমাদের সকলকে এক জোট হয়ে একটা ফৌজ নিয়ে নামা দরকার।"

"ঘ্যানঘ্যান করে আর কান ঝালাপালা করিস নে বাপু! কী আবোল-তাবোল বকে চলেছে!" অনেকে অসন্তুষ্ট হয়ে বলল। "চুপ, বলতে দাও। না বুঝে শুনেই চিৎকার-চেঁচামেচি কেন?"

অন্যেরা প্রতিবাদ করে বলল:

"পলভেৎসরা আমাদের শত্রু। এখন ওরা ক্ষমতা হারিয়ে দুর্বল হয়ে আমাদের দেশে এসেছে। ওদের সকলকে মেরে কেটে যা কিছু সম্পত্তি আছে কেড়ে নেওয়া যাক।"

নতুন নতুন কণ্ঠস্বর একে অপরকে ছাপিয়ে তুমুল হট্টগোলে পরিণত হল। কিয়েভ নরপতি অসহায়ের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে দু' হাত তুলল। গোলমাল আরও তীব্র হয়ে উঠল।

স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও করিতকর্মা নরপতি ম্স্তিস্লাভ উদাত্নি দেউড়ির সিঁড়িতে উঠে গেল। বলল:

"মহাযশস্বী নৃপতিবৃন্দ, সজ্জন সেনাপতিরা এবং তাবৎ রুশী বীরপুরুষ! আমরা সকলেই কি পবিত্র রুশভূমির সন্তান নই? আসুন, ভুলে যাই পলভেৎসদের সঙ্গে আমাদের পুরনো ঝগড়া-বিবাদ! আমরা তাদের আঘাত করেছি, বন্দী করেছি, ওরাও আমাদের দেশের ওপর অগ্নি ও তাণ্ডবের বন্যা বইয়ে দিয়েছে।... আজ পলভেৎসদের এবং আমাদেরও দুর্দিন দেখা দিয়েছে। যখন নতুন এক অজানা শত্রু আমাদের ওপর আক্রমণ করতে আসছে তখন পলভেৎসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে তাদের সঙ্গে মৈত্রী শ্রেয়। চেঙ্গিজ খানের পাষণ্ড তাতারদের বিরুদ্ধে আমরা যদি ওদের এখন সাহায্য না করি তাহলে পলভেৎসরা ওদের দলে ভিড়ে যেতে পারে, তখন শত্রুর শক্তি আরও বেশি হবে।''

"কিন্তু তাতাররা কেমন জাত? এমনও ত হতে পারে যে তারা পলভেৎসদের চেয়ে উঁচুদরের কিছু নয়? ওরা সংখ্যায় কত?"

"খান কোতিয়ান আলানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চেঙ্গিজ খানের তাতারদের

বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তার কথায়, ওরা একযোগে ঘনবদ্ধ হয়ে আক্রমণ চালায়, লড়াইয়ে জানের কোন পরোয়া করে না। ওবেজদের* দেশ ও লৌহ ফটক পার হয়ে বহুদূর থেকে তারা এসেছে। পলভেৎসদের একার সাধ্য ছিল না তাতারদের গতি রোধ করে। তাতাররা পলভেৎসদের তাঁবু লুটপাট করেছে, স্ত্রী, ঘোড়া ও গোরু-ভেড়ার পাল, কোতিয়ান এবং অন্যান্য পলভেৎস সেনাপতির সব ধনসম্পদ অধিকার করেছে।... তাতাররা এখন লুটের মালে এমন ফুলে ফেঁপে উঠেছে যে দিশে করতে পারছে না সেগুলোকে নিয়ে কী করবে, ভাগাড়ের শবদেহ অতিরিক্ত ভোজনে হৃষ্টপুষ্ট কুকুরের মতো এখন তাদের অবস্থা। নিজেদের বিপুল ধনসম্পদ তারা জমা করে রেখে দিয়েছে লুকোমোরিয়ের কাছে, খাজার সাগরের তীরে।... তাতাররা নিজেরা এখন মাল টানা গাড়ির বোঝা ছাড়া হাল্‌কা হয়ে রুশদেশের দিকে এগিয়ে আসছে। কেউ যদি এমন মনে করেন যে আমি পবিত্র রুশভূমির জন্য এসব কথা বলছি না, বলছি আমার শ্বশুর, বর্তমানে সর্বস্বান্ত খান কোতিয়ানের দিকে তাকিয়ে তাহলে সেটা হবে ডাহা মিথ্যে কথা!.."

জনতা রুদ্ধশ্বাসে মহাকীর্তিমান নরপতি ম্‌স্তিস্লাভের কথা শুনল। কেউ কেউ রব তুলল:

"খাজার সাগরের তীর অনেক দূরে — যেতে যেতে দিন বিশেক লেগে যাবে।"

"অবাঞ্ছিত অতিথিদের সঙ্গে প্রথম মোলাকাতটা আমাদের হচ্ছে না! কিয়েভ নৃপতিকে তাদের ধাক্কা সামলাতে হবে, সুতরাং তিনিই এ নিয়ে হা-হুতাশ করুন না!''

ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। এটা ত জানা কথাই যে রাজাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও ঐক্যবোধের কোন বালাই নেই, তাদের মধ্যে আছে কেবল দীর্ঘকালের ঈর্ষা ও পুরনো ক্ষতের জ্বালা।

প্রার্থনা সঙ্গীতের সুর কানে এলো। উত্তেজিত নরপতিদের ঝগড়া-বিবাদ স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ঠিক সময়মতো কিংখাবের কাজ করা আঙরাখা পরিধানে ধর্মীয় শোভাযাত্রাকারীদের আবির্ভাব ঘটল। ধুনুচি দোলাতে দোলাতে চার জন উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকের আগমন ঘটে — প্রশস্ত তাদের বক্ষোদেশ, সঙ্গে জন কয়েক বালক — তাদের হাতে মোটা মোটা জ্বলন্ত

* ওবেজ — উত্তর ককেশাসে বসবাসকারী গোষ্ঠী।

মোমবাতি, তারপর আসে ধাতুর ক্রুশ হাতে বর্ষীয়ান পাদ্রীদের দল এবং সর্বশেষে দু'টি বালকের কাঁধে ভর দিয়ে বিশাল স্বর্ণমুকুট মস্তকে আর্চবিশপ — কৃষ্ণ বর্ণের শ্মশ্রুমণ্ডিত রোদে পোড়া এক গ্রীক, সকলে একটানা মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে দেউড়ির দিকে এগিয়ে এলো, তারা থেমে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে নীরবতা নেমে এলো।

কিয়েভ নরপতি আর্চবিশপের সামনে এসে মাথা নত করল, হাত জোড় করে আশীর্বাদের জন্য উদ্যত বৃদ্ধের কর চুম্বন করল, মৃদুস্বরে বলল:

"হে পুণ্যাত্মা, আমাদের কিছু ধর্মোপদেশ দিন! নরপতিদের বুঝিয়ে বলুন তাঁরা যেন পুরনো ঝগড়া-বিবাদ ও অপমান ভুলে গিয়ে সৌহার্দ ও প্রেমের বন্ধনে এক হয়ে দাঁড়ান!"

আর্চবিশপ সিঁড়ি বয়ে উঠে দেউড়ির সামনে দাঁড়াল, এদিক-ওদিক হাত তুলে সকলকে আশীর্বাদ করে বিদ্ঘুটে উচ্চারণে রুশ ভাষায় তার তৈরি বুলি আওড়াতে শুরু করল।

"আমার প্রিয় ভ্রাতা ও সন্তানবর্গ! খ্রীস্টীয় সুসমাচার অনুযায়ী কর্মে নিষ্ঠাবান হও! প্রভুর নামে সৎকর্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হও! জিহ্বা সংযত কর, তোমাদিগের চিন্তা বিনীত হউক, দেহ তাঁহাতে সমর্পণ কর, ক্রোধ সংবরণ কর!.."

কিয়েভ নরপতি মস্তক ঈষৎ আনত করে দাঁড়িয়ে রইল। গালিচের ম্স্তিস্লাভ উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সকলের হাঁ করা মুখ এবং চোখে-মুখে অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করল। এদিকে আর্চবিশপ বলে চলেছে:

"তুমি যদি কোন কিছু হইতে বঞ্চিত হও তাহা হইলে মন শান্ত কর, প্রতিহিংসা পরিত্যাগ কর! ঘৃণা এবং আঘাত আসিলে ধৈর্যচ্যুত হইও না! তোমার উপর কেহ মন্দবাক্য বর্ষণ করিলে তাহার প্রতি মিনতি কর! প্রভু আমাদিগকে অনুতাপ, অশ্রুপাত এবং দয়া — এই ত্রিবিধ শুভ কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা শত্রু জয়ের নির্দেশ দিয়াছেন।..."

ম্স্তিস্লাভ সন্তর্পণে ধর্মযাজক চার জনের সামনে এগিয়ে এসে তাদের কানে কানে বলল:

"গ্রীকের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে! সব কিছু গুলিয়ে ফেলেছেন উনি! এসব অশ্রু ও অনুতাপের কথা কাদের কাছে বলছেন? চাষাভুষোদের

কাছে না রাজাদের কাছে! তাড়াতাড়ি কোন ধর্মসঙ্গীত জাতীয় কিছু শুরু হোক — প্রত্যেককে একটা করে ভেড়া দেব!"

আর্চবিশপ বিড়বিড় করে কী সব বলে চলল, কিন্তু ধর্মযাজক চার জন অকস্মাৎ ভজন শুরু করে দিল, তাদের সঙ্গে অন্যান্য পাদ্রী ও বালকের দল নানা স্বরগ্রামে গলা মেলাল। রাজপুরুষেরা বিস্মিত আর্চবিশপকে ঘিরে ফেলে তাকে রাজদরবারে প্রবেশ করতে সাহায্য করল।

রস্তোভের কুমার বাহাদুর ভাসিল্‌কো সিঁড়ির মাথায় উঠে গেল।

"আমি এখানে এসেছি দূর উত্তরের বিশাল রস্তোভ রাজ্য থেকে। রুশভূমির স্বার্থে এবং আমাদের খ্রীস্টীয় বিশ্বাসের স্বার্থে আপনাদের যা বলছি শুনুন। কিয়েভ নরপতি ম্‌স্তিস্লাভ রমানোভিচের কাছ থেকে রুশভূমি রক্ষার জন্য আমাদের সব বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করার জরুরী আবেদন নিয়ে বার্তাবহরা ছুটে এসেছে। আমার নিজের সামান্য সৈন্যসামন্ত আমি নিয়ে এসেছি, এদিকে আমাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে শক্তিশালী সেই সুজ্‌দাল নরপতি ইউরি ভ্‌সেভলোদভিচ এখনও মনে মনে জল্পনা-কল্পনা করছেন তাতাররা কি তার সুজ্‌দাল রাজ্যে আসবে, না পাশ কাটিয়ে চলে যাবে? এখানেও সেই একই রকম কথাবার্তা শুনছি: 'আপন আপন মাথা বাঁচাও!' এদিকে আমাদের পুণ্যাত্মা আর্চবিশপ বলছেন অনুতাপ ও অশ্রুর কথা — এসব কথা যোদ্ধাদের সামনে না বলে জরাগ্রস্ত মৃত্যুশয্যাশায়ীর কাছেই বলা শোভা পায়।... বিনয় ও নম্রতা দিয়ে শত্রুকে থামানো যাবে না, রুশভূমিকেও রক্ষা করা যাবে না।..."

"ঠিক কথা, ঠিকই বলেছে ভাসিল্‌কো!" ভিড়ের মধ্য থেকে চিৎকার উঠল।

"অপরিচিত খল প্রকৃতির জাতি দ্রুত এগিয়ে আসছে।... এই অবাঞ্ছিত অতিথিদের সামনে নিজেদের সম্মান নিয়ে দাঁড়াতে হবে। ওদের তাড়িয়ে দিতে হবে, চিরদিনের জন্য শায়েস্তা করতে হবে। তাতারদের ডানা নেই, নীপারের ওপর দিয়ে উড়ে আসবে না, আর উড়ে যদি আসেও, নামতে তাদের হবেই, ভগবানের কৃপায় তখন দেখা যাবে।..."

"তলোয়ার ও খড়্গ নিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানাব!"

ভাসিল্‌কো বলে চলল:

"আমাদের নানা রাজ্যের নৃপতিবর্গ তাহলে নৃপতি ম্‌স্তিস্লাভ রমানোভিচের দরবারে প্রবেশ করুন, প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ঘনিষ্ঠভাবে

গোল হয়ে একাসনে বসে স্থির করুন অশ্রু ও অনুতাপ নিয়ে না আমাদের পিতৃপিতামহের বহু পরীক্ষিত তীক্ষ্ম তরবারি ও খড়্গ নিয়ে এই কালসর্পরূপী শত্রুদের মুখোমুখি হবেন।"

"কুমার বাহাদুর ভাসিল্‌কোর কথা ঠিকই।"

"তা-ই হোক!" চার দিক থেকে ধ্বনি উঠল।

"প্রধান কে হবে? কে বাহিনী পরিচালনা করবে? ম্‌স্তিস্লাভ রমানোভিচের অধীনে আমি যাচ্ছি না!" এক দিক থেকে রব উঠল। তার খেই ধরে আর এক দিক থেকে কেউ কেউ বলল:

"গালিচ নরপতি ম্‌স্তিস্লাভ ম্‌স্তিস্লাভিচ আমাদের বাহিনী পরিচালনা করুন। অমনি অমনি তাঁকে 'সফলকাম' নামে ডাকা হয় না, তিনি সাফল্য বয়ে আনবেন!.."

কিংকর্তব্য স্থির করার উদ্দেশ্যে তেইশ জন রাজন্য কিয়েভের রাজদরবারে প্রবেশ করল। বহুক্ষণ ভাবনা-চিন্তা করল, কিন্তু কিছুতেই আপসে আসতে পারল না। ম্‌স্তিস্লাভ উদাত্‌নির কথা হল লুকোমোরিয়ের তাতার শিবিরে হানা দেওয়া দরকার। "তাদের ধনসম্পদের ভান্ডার দখল করতে পারলে সকলেই ধনী হবে, তখন কেবল রাজন্যবর্গ ত বটেই, সাধারণ সৈন্যরাও লুটের মালের ভালোমতো বখরা পাবে।"

লুকোমোরিয়ে পর্যন্ত অভিযানের এই চিন্তাটা অনেকেরই মনে ধরল, কিন্তু সকলের বাহিনীর জন্য একজন সেনাপতি কেউই কোনমতে ঠিক করতে পারছিল না।

ইতিমধ্যে স্তেপ থেকে এক ভবঘুরের আবির্ভাব ঘটল। সে জানাল যে অপরিচিত তাতাররা ঘনবদ্ধ হয়ে নীপারের দিকে এগিয়ে চলেছে। ফলে তাড়াতাড়ি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে নীপারের খোর্তিৎসা দ্বীপ সন্নিহিত অগভীর জলভাগ দিয়ে ওপারে উঠে তাতারদের আক্রমণ করতে হবে।

নৃপতিবর্গ একটা ব্যাপারে একমত হল: প্রত্যেক নরপতি নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাবে, কেউ কারও পথ আটকাবে না। প্রথম লুকোমোরিয়েতে উপস্থিত হয়ে তাতার শিবির দখল করার সৌভাগ্য যার হবে সে সততার সঙ্গে সকলকে লুটের সামগ্রীর সমান ভাগ দেবে।

সকলে ক্রুশ চুম্বন করে প্রতিজ্ঞা করল যে এই শপথ কেউ ভাঙবে না আর কোন নৃপতি যদি অন্য নৃপতির সঙ্গে কলহ বাধায় তাহলে সকলে একযোগে তার বিরুদ্ধে যাবে। তারপর তারা পরস্পরকে চুম্বন করল।

কিয়েভের ম্‌স্তিস্লাভ এবং ম্‌স্তিস্লাভ উদাত্‌নি মাথা নুইয়ে নিজেদের মধ্যে অভিবাদন জানাল।

নৃপতিরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এই সময় কুমার বাহাদুর ভাসিল্‌কোর মুখ ভাবনা-চিন্তায় থমথমে দেখাচ্ছিল। সে ভুরু কুঁচকে দেউড়ির বাইরে এলো। বুড়ো গায়ক গ্রেমিস্লাভ তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

"আমাদের পরিণাম শুভ নয়," ভাসিল্‌কো বলল। "এভাবে যুদ্ধ করা উচিত নয়। তাতারেদের ধনসম্পদের সন্ধান না করে শত্রুদের এমন আঘাত দেওয়া দরকার যাতে তারা আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। আর একে অন্যের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে আলাদা আলাদা যাওয়ার অর্থ হল ইচ্ছে করে নিজের বিপদ ডেকে আনা।"

ঈষদুষ্ণ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। নৃপতিবর্গের তাঁবুগুলোর ওপর উজ্জ্বল তারকারাজি দীপ্তি বিস্তার করল। প্রাঙ্গণে ভোজের জন্য ওক কাঠের দীর্ঘ টেবিল পাতা হয়েছে। ওক কাঠের তক্তপোশের ওপর বসে অতিথিরা সকলে নীরবে রাজকীয় পিষ্টক ও শূলপক্ব রাজহাঁসের মাংস আস্বাদনে ব্যস্ত, বালক ভৃত্যের দল টেবিলের চতুর্দিকে জ্বলন্ত মশাল হাতে দণ্ডায়মান, রক্তবর্ণের কম্পিত শিখার আলোকে সকলে স্পষ্ট দেখতে পেল রাজপ্রাসাদের দেউড়ির সবচেয়ে ওপরের সিঁড়িতে বসে আছে বৃদ্ধ গায়ক গ্রেমিস্লাভ। তার অঙ্গুলিস্পর্শে বীণায় মৃদু সুর ধ্বনিত হচ্ছে, বৃদ্ধ গায়ক তার চক্ষুহীন রক্তাক্ত কোটর আকাশের দিকে তুলে ঈষৎ ভাঙা গলায় তার প্রিয় প্রাচীন গাথা গাইতে শুরু করল।

গ্রেমিস্লাভের গানের বিষয়বস্তু ছিল পলভেৎসদের বিরুদ্ধে ইগর স্‌ভিয়াতস্লাভিচের দুঃসাহসী অভিযান, রাজন্যবর্গের কলহ-বিবাদ, সেই কারণে সাহসী রুশী যোদ্ধাদের অযথা প্রাণহানি এবং কলহের ফলে 'শত্রুদের সামনে রুশভূমির ফটক উন্মুক্ত করার' কাহিনী।...

শ্রোতাদের অনেকেই গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল রাজন্যবর্গের মধ্যে আজ এই যে মনের অমিল আর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ দেখা যাচ্ছে তা কি সেই একই রকম বিপদের সূচনা করছে না এবং এই কলহ ও শত্রুতা কি রুশ জাতির মহান কর্মে — মাতৃভূমির রক্ষাসাধনে অন্তরায় হয়ে দেখা দেবে না?..

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুবুদাই বাহাদুরের পরিকল্পনা

সুবুদাই তার হাজারী সেনাপতিদের দশ জনকে ডেকে পাঠাল। জেবেও তার দলবল নিয়ে হাজির হল। প্রবীণ-নবীন সকলেই ছাউনিতে গোল হয়ে বসল। জেবের বক্তব্য তারা শুনল। জেবে কথা বলতে বলতে সকলের মাথার ওপর দিয়ে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন দূরে কিছু দেখা যাচ্ছে।

"কিয়েভ শহরটা ধনী," জেবে বলল। "প্রার্থনার দালান-কোঠাগুলোর ছাদ উঁচু উঁচু, গোল আর সেগুলো খাঁটি সোনায় মোড়া। আমরা এই সোনার ছাদগুলো খসিয়ে এনে চেঙ্গিজ খানের সাদা ঘোড়া সেতেরের মতোই বিরাট, খাঁটি সোনায় ঢালাই করা এক ঘোড়া তাঁর তাঁবুর কাছে এনে রাখব।"

"চেঙ্গিজ খানের কাছে সোনার ঘোড়া নিয়ে যাব!" মোঙ্গলরা সহর্ষে চেঁচিয়ে উঠল।

"উরুসদের অনেক খান; তারা ওদের রাজা বলে। এই খানদের মধ্যে কুকুরদের মতো খাওয়াখাওয়ি লেগেই আছে। তাই তাদের ধ্বংস করতে অসুবিধা হবে না। কেউই এই রাজাদের এক সঙ্গে জড় করতে পারে নি, ওদের নিজেদের চেঙ্গিজ খানও নেই।"

"আমাদের মহামান্য চেঙ্গিজ খানের মতো নেতা সারা দুনিয়ায় কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না!"

"আমি আপনাদের বলি: উরুস দেশের ওপর আমাদের চট্‌পট্‌ হানা দিতে হবে, তাকে আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে হবে, আমাদের অদ্বিতীয় ও মহামান্য খানের কাছে আমরা যে বার্তা পাঠিয়েছি তার উত্তর আসার আগেই..." বলে জেবে থামল।

"আসার আগেই কী?" হাজারী সেনাপতিরা জিজ্ঞেস করল।

"আসার আগেই কিয়েভ দখল করতে হবে।"

"চেঙ্গিজ খান তাঁর আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে বলবেন! চেঙ্গিজ খান নিজে কিয়েভে ঢুকতে চান!" মোঙ্গলরা বলল। "আমরা ইতিমধ্যে বুখারা, সমরখন্দ, গুরগঞ্জের মতো বড় বড় শহর নিয়েছি, কিয়েভ নেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন নয়। আমাদের চট্‌পট্‌ কিয়েভ দখল করতে হবে!"

সকলে সুবুদাইয়ের দিকে আড়চোখে তাকায়, অপেক্ষা করতে থাকে এই ধূর্ত ও হুঁশিয়ার 'ঠ্যাঙে কামড় খাওয়া চিতাবাঘটি' কী বলে। সুবুদাই ঘাড় কাত করে বসে ছিল, তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে এক এক করে প্রত্যেকের দিকে তাকাচ্ছিল।

"জেবে নোইয়ন যেরকম ভাবছেন উরুসদের ধ্বংস করা মোটেই তেমন সহজ হবে না," হাজারী সেনাপতি গেমিয়াবেক বলল।

"উরুস আর কিপচাকরা সংখ্যায় অনেক — এক লাখ, আমরা সংখ্যায় কম — আমাদের আছে বিশ হাজার সৈন্য, তায় আবার একটা তোমেন পাঁচমিশালী ভবঘুরেদের নিয়ে; আমরা পিছু হটতে থাকলে ওরা চড়াইয়ের ঝাঁকের মতো এদিক-ওদিক উড়ে পালাবে। উরুসদের দেশে ঢোকার বিপদ আছে — সেখানে বহু দুর্দান্ত ফৌজ আছে। কিয়েভে যাওয়া আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না।... এখান থেকে আমাদের ফিরে যেতে হবে চেঙ্গিজ খানের নিরাপদ আশ্রয়ে।..."

জেবে বলল:

"ওহে বাহাদুর গেমিয়াবেক, তোমার বোধ হয় মনে নেই যে তোমার সঙ্গে, অন্যান্য বাহাদুরকে নিয়ে আমরা যখন চীনের মহাপ্রাচীর ভেদ করে চীনাদের চষা মাঠে ঢুকলাম তখন ওরা উরুসদের চেয়েও সংখ্যায় বেশি ছিল?"

সুবুদাই নড়ে চড়ে উঠে হাত নাড়ল। সকলে চুপ করে গিয়ে তার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

"কাজে হাত দিতে গেলে মনে করে দেখা দরকার এর আগে আমাদের 'একচ্ছত্র নেতা' কীভাবে কাজ করেছেন। তারপর ভাবতে হবে আমাদের জায়গায় তিনি কী করতেন," সুবুদাই ধীরে ধীরে বলল। "প্রথমত শত্রুর ওপর চালাকি খাটাতে হবে, শত্রুর গায়ে মাথায় হাত বুলাতে হবে যাতে তার চোখ আরামে বুজে আসে এবং সে দিব্যি পা ছড়িয়ে দিয়ে চিত হয়ে গড়াগড়ি যায়।... তখন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি টিপে ধর।"

সকলে সোজা হয়ে এ-ওর দিকে তাকাল। কী করতে হবে এখন তা পরিষ্কার হয়ে দাঁড়াল। শক্তিমান খানের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। সুবুদাই বলে চলল:

"উরুসরা সংখ্যায় অনেক! তারা এত শক্তিশালী যে পথের ওপর ঘুমন্ত পোকামাকড় যেমন উটের পায়ের চাপে থেঁতলে মারা যায় তেমনি

আমাদেরও তারা পিষে মেরে ফেলতে পারে। তবে তাদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নেই! তাদের রাজাদের মধ্যে খাওয়া খাওয়ি লেগেই আছে। তাদের ফৌজের অবস্থা হল স্তেপের চার দিকে চরে বেড়ানো বলবান ষাঁড়ের দলের মতো।... তবে জেবের মতো বীর উরুসদের আছে বটে! তার নাম 'বাহাদুর মাস্তিস্লিয়াব'।... লোকে বলে যে এই মাস্তিস্লিয়াব নাকি বহু যুদ্ধ করেছে অথচ আজ পর্যন্ত পরাজয়ের মুখ দেখে নি। কিন্তু মাস্তিস্লিয়াব এগিয়ে এসে বিপদের মুখে পড়ে গেলে তাকে যে সাহায্য করবে এবং উদ্ধার করে আনবে এমন কোন সুবুদাই বাহাদুর ওদের নেই!..''

"আমরা এই মাস্তিস্লিয়াবকে ধরে চেঙ্গিজ খানের কাছে নিয়ে যাব!" মোঙ্গলরা চেঁচিয়ে বলল।

সুবুদাই যোগ করল:

"আমি কথা দিচ্ছি, যে মাস্তিস্লিয়াবকে ধরে তার সোনার মুকুট মাথা থেকে নামিয়ে ফেলতে পারবে সে নিজেই তাকে চেঙ্গিজ খানের কাছে নিয়ে যাবে।"

সভা অনেকক্ষণ চলল। মোঙ্গল সেনানায়কদের সিদ্ধান্ত যাতে প্রহরী নোকরদের কানে না যায় সেই উদ্দেশ্যে সকলেই নীচু স্বরে কথাবার্তা বলতে লাগল।

পর দিনই জেবে তার অশ্বারোহী তোমান নিয়ে পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হল আর ঘোড়াগুলোকে ভালোমতো খাইয়ে-দাইয়ে চূড়ান্ত আঘাতের জন্য তৈরি হওয়ার উদ্দেশ্যে অশ্বারোহীদের অন্য একটি দল নিয়ে সুবুদাই কাল্‌কা নদীর তীরে থেকে গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

নীপার তীরে মোঙ্গল বাহিনী

বসন্তকালটা অস্বাভাবিক গরম ছিল। বহু দিন ধরে শুকনো গরম হাওয়া বইতে থাকে। ঘাস দিব্যি বেড়ে উঠেছিল, কিন্তু এখন নিস্তেজ হয়ে শুকিয়ে যেতে লাগল। সকলের মনে আতঙ্ক সঞ্চারকারী সুবুদাইয়ের রক্তচক্ষুর মতো আকাশে জ্বলন্ত সূর্যের তেজ নির্মম জ্বালা ধরিয়ে দিল।

জেবে নোইয়ন তার বাহিনীকে পাঁচ ভাগে ভাগ করল। দু' হাজার অশ্বসমেত একটা দল নিয়ে সে আগে নীপারের দিকে চলল, আর বাদবাকি অশ্বারোহীদের চারটি দলকে সে স্তেপভূমিতে বহুকালের পদদলিত আঁকাবাঁকা পথের ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখল।

তাতার শত সিপাহীর কয়েকটি দল দু'পাশের স্তেপ প্রান্তরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল এবং যেখানেই পশুপালসমেত কিপচাক যাযাবরদের আস্তানা দেখতে পায় সেখান থেকে তাদের পায়ে-চলা-পথের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

ধূলিধূসরিত একশ' নোকরের দল নিয়ে জেবে সূর্যকরোজ্জ্বল প্রশস্ত নীপারের দিকে এগিয়ে যায়। নীলিম নদীবক্ষে আলকাতরা মাখানো নৌকার সারি চলাফেরা করছে।

"দেখুন, ঐ যে রুশী সৈন্যের দল!" দোভাষী বলল।

তীরের কাছাকাছি একটা টিলার ওপর রুশী যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ, হাতে খাটো বর্শা। রোদ থেকে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে তারা স্তেপের দূর প্রান্ত নিরীক্ষণ করছিল। যারা এগিয়ে আসছে তারা কিপচাক নয়, অন্য কোন গোষ্ঠীর অশ্বারোহী — এটা দেখতে পেয়ে রুশীরা দৌড়ে নৌকোয় উঠে তীর থেকে দূরে সরে গেল।

জেবের মাথায় লোহার তীক্ষ্ণাগ্র শিরস্ত্রাণ, তার রৌদ্রদগ্ধ তামাটে মুখাবয়বে গাম্ভীর্য। খাড়া পারের ওপর ঘোড়ার লাগাম টেনে অনেকক্ষণ ধরে সে অপলক দৃষ্টিতে অপর তীরের টিলায় সমাচ্ছন্ন প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে দেখল। সেখানে জনবহুল শিবিরের কালো কালো সারি, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মাল টানা গাড়ি — তাদের সামনের জোয়ালগুলো উঁচিয়ে আছে। নানা বর্ণের ঘোড়ার দল চরে বেড়াচ্ছে। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের দল প্রান্তরের ওপর ইতস্তত বিচরণ করছে, তাদের অস্ত্রশস্ত্রের ধাতব অংশগুলোর গা থেকে উজ্জ্বল সূর্যকিরণ স্ফুলিঙ্গের মতো ঠিকরে পড়ছে।

তীরের কাছাকাছি কয়েকটি নৌকো পাক খাচ্ছিল। মাঝিরা প্রাণপণে দাঁড় ফেলে জলভারাক্রান্ত নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে যুঝছিল। একটা নৌকো থেকে হাঁক শোনা গেল:

"ওহে উট্‌কো অতিথির দল! আমাদের এখানে কী মনে করে? কোন অলক্ষুণে হাওয়া তোদের এখানে নিয়ে এসেছে?"

জেবের সঙ্গী দুই ভবঘুরে নৌকো থেকে ভেসে আসা কথাগুলো অনুবাদ করে শোনাল।

"আমরা তোমাদের খোঁজে যাচ্ছি না, যাচ্ছি কিপচাকদের খোঁজে!" দোভাষীদের একজন গলা চড়িয়ে বলল। "কিপচাকরা হল আমাদের গোলাম আর সহিসের জাত। ওদের মার, গাড়ির মাল আর গোরু-ভেড়ার দল নাও। কিপচাকরা আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে, তোমাদের ওপরও বহুকাল যাবৎ অনিষ্ট করে চলছে। আমরা তোমাদের সঙ্গে শান্তি চাই। তোমাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ নয়।"

নৌকোর লোকেরা চেঁচিয়ে বলল:

"তোমাদের দূতদের পাঠিয়ে দাও, আমরা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখব!"

"কার সঙ্গে কথা হবে? তোমাদের এখানে বড়গোছের নেতা কেউ আছে কি?"

"এখানে রাজাদের কমতি নেই। তাঁরা তোমাদের সঙ্গে আপসের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন।"

জেবে চার জন নোকর এবং দোভাষী হিশেবে একজন ভবঘুরেকে বেছে নিয়ে তাদের ওপারে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিল। বলা হল তারা যেন কিয়েভের প্রধান নরপতির সঙ্গে দেখা করে জানায় উরুসরা কিপচাকদের গোরু-ভেড়া ও ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে তাদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দিক, আর এখানে, স্তেপে তাতাররা ওদের খতম করবে।

বাছাই করা নোকরের দল চঞ্চল হয়ে উঠল, তারা বেতের আগা দিয়ে পিঠ চুলকে বলল:

"উরুসদের সঙ্গে আবার কথা বলার কী আছে? বরং তাদের সঙ্গে মারপিট বাধিয়ে দেওয়া যাক।"

জেবে বলল:

"তাহলে দোভাষী নিয়ে আমাকেই একা যেতে হচ্ছে।"

নোকররা চিৎকার করে উঠল:

"না, না, আপনার গিয়ে কাজ নেই। আপনাকে ছাড়া আমাদের ফৌজের দশা কী হবে? নেকড়ে মা ছাড়া নেকড়ের বাচ্চারা বিপদে পড়ে যাবে। ওখানে আপনাকে ওরা আস্ত রাখবে না। আপনি এখানেই থাকুন! আমরা যাচ্ছি।"

চার জন নোকর ও ভবঘুরে নদীর কাছাকাছি নেমে গেল এবং তীর ঘেঁসে যে সব রুশী নৌকোয় করে যাচ্ছিল তাদের ডাক দিল। একটা নৌকো তীরে ভিড়ে মোঙ্গল দূতদের তুলে নিল।

জেবে অনেকক্ষণ খাড়া পারে দাঁড়িয়ে থেকে অপর তীরের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। সেখানে দূরে কুয়াসার আড়ালে ছড়িয়ে আছে তৃণভূমি, উপবন ও নীল জলরাশি; পথের সর্বত্র বায়ুপ্রবাহে চলমান সেনাদলের মাথার ওপর ধূলিজাল উড়ছে।

রাতে জেবে ভেড়ার লোমের আঙরাখা গায়ে জড়িয়ে টিলার ওপর আগুনের ধারে শুয়ে রইল। রুশীদের কাছে যে নোকরদের পাঠানো হয়েছিল জেবে তাদের অপেক্ষা করতে থাকল। তারা আর ফিরল না। কিপচাকদের হাতে তারা প্রাণ হারাল।

স্তেপের চার দিকে দূরে দূরে অগ্নিশিখা মিটমিট করতে থাকে। প্রান্তরের সর্বত্র রহস্যপূর্ণ জীবনের চাঞ্চল্য। সন্ত্রস্ত অশ্বারোহীর দল স্তেপের ভেতর দিয়ে গিরিখাত অতিক্রম করে চলেছে, রাতে দূরে দূরে শিবিরের বাইরে আগুন দপ দপ করে জ্বলছে।...

সারা রাত জেবের ঘুম হল না। গভীর দুশ্চিন্তা, টুকরো টুকরো কথাবার্তা, পরিচিত মুখ তার সামনে একের পর এক ভেসে ভেসে ওঠে, কখনও সে ক্রোধে জ্বলতে থাকে, কখনও ঝিমোয়।... তার সামনে হাজির হয় কখনও কখনও কৃষ্ণবর্ণের শৃগালপুচ্ছ শোভিত লোহশিরস্ত্রাণ, বিকটদর্শন বৃদ্ধ চেঙ্গিজ খানের মুখাবয়ব, তার ঈষৎ সবুজবর্ণের মার্জারচক্ষুর অপলক দৃষ্টি, কখনও সুবুদাইয়ের খোলা কটমটে একটি চোখ, কখনও বা ঝকঝকে তরবারির আন্দোলন।...

এখন সামনে আছে উরুসদের সঙ্গে, শক্তিশালী সেনাদের সঙ্গে লড়াই। ওরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছে না, নিজেরাই যুদ্ধং দেহি হয়ে এগিয়ে আসছে। ওদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা খুব একটা সহজ ব্যাপার হবে না!.. এখন এমন দিন আসছে যখন জেবের চীন বিজয়ে অর্জিত সমস্ত খ্যাতি ভূলুণ্ঠিত হয়ে যেতে পারে।

জেবে হয় এই স্তেপভূমিতে তার মাথা রেখে যাবে নয়ত মাস্তিস্লিয়াবের মাথা থেকে সোনার মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে সে হবে উরুস ও কিপচাকদের ওপর মহাবিজয়ী, মোঙ্গল খানের সোনালি ছাউনিতে তার নামে আবার জয়-জয়কার পড়ে যাবে।

সকালে নোকররা জেবের ঘুম ভাঙাল।

"দেখুন ওপারে কী কাণ্ড হচ্ছে।... উরুসরা ও ধার থেকে এত নৌকো জড় করেছে যে সেগুলো দিয়ে নদীর ওপর সাঁকো বাঁধা হয়ে গেছে। ওদের গাড়িগুলো একেবারে জলের ধারে নেমে পড়েছে। সেখানে বহু ঘোড়সওয়ার ও পদাতিকের দল জুটেছে।* শিগ্‌গিরই ওরা এ পারে আসতে শুরু করবে। কী করা যায়?"

"উরুসদের বাধা দিও না!" জেবে হুকুম দিল। "স্তেপে ফিরে গিয়ে দূর থেকে লক্ষ্য কর!"

দশম পরিচ্ছেদ

স্তেপের বুকে উরুস ও কিপচাকদের যাত্রা

> ...উরুস ও কিপচাকরা তাতারদের ধ্বংস করার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেল: তারা ভাবল ওরা ভয়ে এবং দুর্বলতার দরুন রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করছে, তাই তারা উৎসাহভরে তাতারদের পিছু নিল। তাতাররা ক্রমাগত পিছু হটতে লাগল, আর তারা ১২ দিন তাদের অনুসরণ করে চলল।
>
> (ইবন আল-আসির)

জেবে নোইয়নের শুকনো, কটা রঙের ঘোড়াটা অবলীলাক্রমে নিঃসঙ্গ টিলার ওপর উঠে গেল, স্তেপের মহাবীরের উঁচু প্রস্তরমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। মহাবীরের প্রশস্ত ও ঈষৎ আনত দু'টি কাঁধ, তার চেটাল মুখাবয়ব, উরুদেশে ঝোলানো নাতিদীর্ঘ তরবারি, মাথার ছুঁচালো টুপি এমনকি হাতের পানপাত্রটি সুদূর অতীতে হাতুড়ির ঘায়ে অখণ্ড শিলা কেটে কোন এক যাযাবর শিল্পীর নিপুণ হাতে খোদাই করা।... তারপর

* দক্ষিণ রাশিয়ার নৃপতিবর্গ কিয়েভের পরামর্শসভায় স্থির করেন নিজেদের রাজ্যসীমা পার হয়ে তাতারদের মুখোমুখি হবেন। এপ্রিলে তাঁরা অভিযান শুরু করলেন। নীপারের তীরে একত্রে সমাবেশ ঘটল কিয়েভ, চেনির্গভ, স্মলেন্‌স্ক, কুর্স্ক, ত্রুব্‌চেভ্‌স্ক, পুতিভল এবং ভলিন্‌স্ক ও গালিচের সেনাদলের। শেষোক্তরা নৌকোয় চেপে আসে।

কত যুগ কেটে গেল, জনবহুল দেশ নির্জন স্তেপভূমিতে পরিণত হল, কিন্তু মাটির গভীর অভ্যন্তরে বদ্ধমূল মহাবীর মূর্তিটি আগের মতোই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল টিলার চূড়ায়; স্ফীত ও অন্ধ চোখ মেলে সে তাকিয়ে থাকে এক দিকে, যেখানে একদা সে অভিযান চালিয়েছিল।

সেই মূর্তির মতোই অনড় হয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আসীন জেবে তার নিরুত্তাপ চোখ দুটি কুঁচকে অপর তীরভূমি নিরীক্ষণ করতে লাগল। সেখান থেকে সবুজ স্তেপভূমির ওপর জমাট কুয়াসার মধ্য দিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে সারি সারি কালো বিন্দু।... ঘর্মাক্ত ঘোড়াটার শরীর ইতিমধ্যে জুড়িয়ে এসেছে, সে স্বচ্ছন্দে মুখের লাগাম টান-টান করে কালো ঠোঁট দিয়ে শুকনো ঘাসপাতার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল; ঘোড়াটা ইতিমধ্যেই নোনা জমির ওপর পা ঠুকতে শুরু করে দিয়েছে, অথচ জেবে অগ্রসরমান রুশ সৈন্যদের ঘন সারিগুলো থেকে কিছুতেই দৃষ্টি সরাতে পারছে না।

সামনে অশ্বারোহীর দল।... কেউ কেউ চলেছে পথ ধরে, অন্যেরা স্তেপের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।... তাদের ওপর ধুলোর কালো মেঘ উঠছে।... তাদের হাতে নাতিদীর্ঘ বর্শা।... ধূলিজালের আড়ালে টানা গাড়িগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ে। উরুসরা দামী শিকার পাওয়ার আশায় আছে, গাড়িতে করে তারা টেনে নিয়ে চলেছে অস্ত্রশস্ত্র, কড়াই আর শস্য বোঝাই বস্তা।

জেবে লাগাম ধরে টান দিল। এখন সরে পড়তে হয়।... উরুসরা ইতিমধ্যে টিলার ওপর নিঃসঙ্গ অশ্বারোহীকে দেখতে পেয়েছে।... কয়েক জন উরুস ও কিপচাক তাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এলো। তারা দ্রুত তার দিকে রওনা দিল। অশ্বারোহীদের অন্য একটি দল তার পথ আটকানোর উদ্দেশ্যে রাস্তার ওপর দিয়ে আগে আগে ছুটল। কিন্তু জেবের এই কটা রঙের তেজী ঘোড়াটা হল তার ফৌজের সেরা দৌড়বাজ ঘোড়াগুলোর একটি। সে কি আর অমনি-অমনি ওটাকে ভালোবাসে!

জেবে ধূলিধূসরিত, নোনা মাটি আচ্ছন্ন টিলার ঢাল বয়ে নীচে নামতে থাকে। এক পাশে জমি খোঁড়া, অল্পপরিসর অন্ধকার গহ্বর চোখে পড়ে — সম্ভবত এখন এটা স্তেপের নেকড়েদের আস্তানা। তবে এক কালে কেউ যে মহাবীরের কবর খুঁড়ে তার গুপ্ত স্বর্ণভান্ডার হস্তগত করার মতলবে ছিল এটা বোঝা যায়।...

জেবে অশ্বের গতিবেগ বৃদ্ধি করে দেয়। খাত পর্যন্ত যাওয়া দরকার। সেখানে গেমিয়াবেকের কয়েক শ' সেনার দল ওত পেতে আছে। তাতারে গুপ্তচররা ঘাসের আড়ালে উপুড় হয়ে পড়ে থেকে উরুসদের এগিয়ে আসা, তাদের কাছ থেকে জেবের পলায়ন — সবই পরিষ্কার দেখতে পায়।

কিন্তু উরুস অশ্বারোহীরা ক্রমেই আরও কাছাকাছি চলে আসছে।... ওদের ঘোড়াগুলো ভালো, সামনে সেরা অশ্বারোহীদের দেওয়া হয়েছে। পথ আটকানোর জন্য যারা ছুটেছে তারাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। সেখান থেকে পাশে ফেরার উপায় নেই — বাঁয়ে উত্তুঙ্গ উপকূল ভূমি, তার নীচে গভীর খাত, ডান দিকে উরুসদের দল।

তারা নয় জন।... পেছনের তিন জন পিছিয়ে পড়তে লাগল। সামনের ছয় জনও ছাড়া ছাড়া হয়ে পড়ল। ওরা জেবেকে ঘিরে ফেলতে চায়।

ঘোড়ার পায়ের নীচ থেকে এক ঝাঁক ধূসর তিতির পাখি উড়ে এক পাশে সরে গেল, আবার ঘাসের ওপর গিয়ে পড়ল। ঘন ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে একটা খরগোস কান খাড়া করে সোজা ছুটে যায়। ঘোড়া কিন্তু সাবলীল গতিতে তার বাদামী রঙের পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে লম্বা লম্বা আগাছার ঝোপ ভেদ করে দ্রুত ছুটে চলে, জেবে ঘোড়ার কেশরের সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে বসে থাকে।

শত্রুরা আর বেশি দূরে নেই।... লোহার শিরস্ত্রাণের নীচে তাদের রোদে পোড়া মুখ জেবের নজরে পড়ে।... দু'জন উরুস লাল ঢালের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে চলেছে: একজন নেহাৎই অল্পবয়সী, তার মুখে রক্তিম আভা, চোখ কালো, অন্য জনের মুখে পাকা ঝোলা গোঁফ। তৃতীয় যে অশ্বারোহীটি সকলের চেয়ে এগিয়ে আছে সে হল এক জন কিপচাক। তার গায়ে লাল টকটকে চাপকান, তার ঘোড়া মিশ কালো।... সে হাতে ফাঁসদড়ি জড়াচ্ছে।...

জেবের দৃষ্টি প্রতারণা করে না, তার লক্ষ্য অভ্রান্ত। জেবে তার আঁটসাট ভয়ঙ্কর ধনুকের ছিলা ধরে টানার সঙ্গে সঙ্গে কিপচাক দু' হাত শূন্যে তুলে জিন থেকে গড়িয়ে পড়ে যায়। মিশ কালো ঘোড়াটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মাথা তুলে আরোহী ছাড়াই ছুটতে থাকে, বাতাসে তার দীর্ঘ কেশর আন্দোলিত হতে থাকে।

অল্পবয়সী রুশ সৈন্যটা কাছাকাছি চলে এসেছে।... আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দুই ঘোড়ায় সঙ্ঘর্ষ লেগে যাবে। যুবক তার নাতিদীর্ঘ

বর্শা সজোরে ছুঁড়ে মারল, কিন্তু তা তাতারের লৌহ বর্মের কাঁধে লেগে পিছলে পড়ে গেল মাত্র।... দ্বিতীয় দীর্ঘ তীরটি জেবে নিক্ষেপ করল যুবকের উজ্জ্বল দুই কালো চোখের মাঝ বরাবর। বিদায় যশাকাঙ্ক্ষা! বিদায় সূর্যের আলো! বিদায় দেশের মাটি!

জেবে আর ফিরে তাকায় না।... তার দু' চোখ খুঁজে বেড়ায় কোথায় গেল গেমিয়াবেকের নোকরের দল? ঐ ত ওরা! ওদের গোটা দলটা ইতিমধ্যে খাত থেকে উঠে এসেছে এবং কর্কশ স্বরে হিংস্র হুহু ধ্বনি তুলে আক্রমণরত রুশ সেনাদলের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে।

রুশ অশ্বারোহীরা দ্রুত নিজেদের গোছগাছ করে নেয়, ঘন সারিবদ্ধ হতে থাকে। তাদের হাতে লাল রঙের সারি সারি ঢাল — সেগুলোর ওপরের অংশ গোলাকার, নীচের ভাগ ছুঁচাল। শ্রেণীবদ্ধ ঢালের এই নিবিড় বিন্যাস সামনে ভয়ঙ্কর শৃঙ্খলের বাধার মতো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রুশ সৈন্যরা সদ্যশাণিত ঝক্‌ঝকে তরবারি হাতে ক্ষিপ্রবেগে তাতারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কিন্তু জেবের হুকুম গেমিয়াবেক ও তার নোকরদের ভালোমতোই মনে আছে: তীরের লক্ষ্যসীমানার কাছাকাছি হওয়া মাত্র তারা অকস্মাৎ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে হতচকিত উরুসদের পাশ কাটিয়ে তীরবেগে ছুটতে থাকে, ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণঘাতী তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রবল গতিতে আবার স্তেপের দিকে ফিরে যায়।

উরুসরা সোরগোল তুলে ওদের পিছু ধাওয়া করে। তাদের সৈন্যদের সাজানো সারিগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। সকলেই পলায়নরত তাতারদের নাগাল ধরার উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটতে থাকে। কিছু উরুসের ঘোড়া রীতিমতো ভালো জাতের ছিল বলে তারা পিছিয়ে পড়া জনা দশেক তাতারের নাগাল ধরে ফেলে। উরুসরা তাদের অস্ত্রাঘাতে ধরাশায়ী করে, তাতারদের অস্ত্র ও জুতো খুলে নিয়ে নিজেদের ঘোড়া বদলে তাদের ঘোড়ায় চেপে বসে।

দেহরক্ষী পরিবৃত জেবে উরুসদের সঙ্গে তাতারদের প্রথম সংঘাত খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে। সে খাতে নেমে ঘোড়াকে ঝরনার জল খাওয়ালো, তারপর গোটা তাতার সেনাদলকে আরও দূরে সরার হুকুম দিল।

গেমিয়াবেকের অশ্বারোহীরা ফিরে এসে জানাল যে তাদের নেতা বর্শারে

আঘাতে আহত হয় ঘোড়াসুদ্ধ পড়ে যায়, উরুস অশ্বারোহীরা তাকে ঘিরে ধরে কিন্তু সে সামলে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে স্তেপের দিকে ছুটতে থাকে। বহু কিপচাক তার পিছু নিয়েছে।

রাতে ভবঘুরেদের সাহায্যে জেবে স্বয়ং যুদ্ধবন্দী রুশীকে জিজ্ঞেসবাদ করতে লাগল। বন্দী বলল যে এটা হল গালিচের সাহসী নরপতি মস্তিস্লাভ উদাত্নির অগ্রবাহিনী। তার সঙ্গে আছে গালিচ এবং ভলিন্স্ক শহরের সৈন্যরা। তারা নৌকোয় করে দ্নেস্ত্র দিয়ে সাগরে পৌঁছায়, নীপারের মোহানায় বাঁক নিয়ে খোর্তিৎসা দ্বীপে গিয়ে ওঠে — তাতারদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য সমস্ত রুশী সৈন্যের সেখানেই জমায়েত হওয়ার কথা।

"রাজাদের নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব নেই," বন্দী বলল, "সকলে যে যার দল নিয়ে আলাদা আলাদা চলছে; প্রতিটি সেনাদলে আছে নিজস্ব সেনাপতি, কিন্তু গোটা ফৌজের ওপর কোন সেনানায়ক নেই। সৈন্যরা সকলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে মস্তিস্লাভ উদাত্নিকে প্রধান সেনাপতি করা উচিত যেহেতু তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে খুবই অভিজ্ঞ ও দুর্ধর্ষ! কিন্তু কিয়েভের রাজা মস্তিস্লাভ রমানোভিচ তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি নিজেকে সকলের চেয়ে বড় ও প্রবল রাজা বলে মনে করেন, তাই কারও অধীনতা তিনি কিছুতেই মানতে রাজি নন। রাজাদের এই শত্রুতা সাধারণ সৈন্যদের দুঃখদুর্দশার কারণ ছাড়া আর কিছুই নয়; কেন না তাতাররা যদি জেতে তাহলে রাজারা সকলে তাঁদের তুরন্ত ঘোড়ার পিঠে চেপে পালাবেন আর সাধারণ সৈন্যদের হাড়গোড় যাবে। সৈন্যেরা অভিযানের জন্য এগিয়ে এসেছে তাদের চাষের ঘোড়ায় চড়ে আর সেগুলোর দৌড় বেশি দূর নয়। তাতাররা ছট্‌ফটে সাপের মতো তাদের হাত থেকে পিছলে যায়।"

জেবে জিজ্ঞেস করল কিপচাকরা সংখ্যায় অনেক কিনা। বন্দী উত্তরে বলল যে শোনা যায় তারা বেশ ভারী। তাদের সেনাদল খোর্তিৎসায় রুশীদের সঙ্গে সামিল হওয়ার জন্য নীপারের বাঁ দিকের পার ধরে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে। আর এখন মস্তিস্লাভ উদাত্নির সঙ্গে আগে আগে চলেছে কিপচাকদের দল, তার নেতা হল সেনাপতি ইয়ারুন।

"তাতার সৈন্যদের সম্পর্কে উরুসরা কী বলে?" জেবে জিজ্ঞেস করল।

"আগে বলত যে তাতাররা সাধারণ যোদ্ধা, তাদের শক্তি কম, তারা

কিপচাকদের থেকেও খারাপ। এই কারণে রাজারা কোন রকম সতর্কতা ছাড়াই তাতারদের শিবির আর তাদের লুটের মাল দখল করার জন্য তাড়াহুড়ো করছেন। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে তাতাররাও উঁচুদরের যোদ্ধা, তাদের তীর ভালোমতো লক্ষ্য ভেদ করে।"

জেবে তাতারদের হুকুম দিল তারা যেন স্তেপের আরও ভেতরে সরে যায়, রাতে কোন আগুন না জ্বালায়, আর বন্দী রুশীটাকে যেন মেরে ফেলা হয়।

রাতে স্তেপের ভবঘুরে ও তাতার গুপ্তচরদের দলবল চুপিসারে রুশীদের অগ্রবাহিনীর শিবিরের কাছাকাছি এসে তাদের কথাবার্তা শুনল। রুশ সৈন্যরা চার দিকে গাড়িগুলো স্তূপাকার করে রেখে তার মাঝখানে রাত কাটাল। কিপচাকদের শিবির আলাদা, তারা আগুনের পাশে নাচ গান করে চলছে। তাতাররা অদের যেখান থেকে বিতাড়না করে দিয়েছে সেই পরিত্যক্ত বিচরণভূমিতে তারা ফিরে চলেছে ভেবে তাদের খুশি আর ধরে না।

গুপ্তচররা সংবাদ আনল যে উরুসরা তাতারদের হাজারী নেতা গেমিয়াবেককে ধরে ফেলেছে। ওদের হাত থেকে পালিয়ে সে টিলায় নেকড়েদের খোঁড়লের ভেতর আত্মগোপন করে ছিল। উরুসরা তাকে সেখান থেকে টেনে বার করে এনে কিপচাকদের হাতে তুলে দেয়। তারা গেমিয়াবেকের হাত পা বেঁধে চারটি ঘোড়ার সঙ্গে যুতে দেয়, ঘোড়াগুলো চার দিকে চালিয়ে দেওয়ায় তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।... কান ফুঁড়িয়ে দড়ি লাগিয়ে গেমিয়াবেকের মাথাটাকে ঘোড়ার লাগামে ঝুলিয়ে নিয়ে চলে গেছে পলাভেৎস সৈন্যদের সেনানায়ক ইয়ারুন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তাতারদের ফাঁদ

দ্রুত অগ্রসরমান রুশীদের অগ্রবর্তী বাহিনীর ওপর নজর রাখতে রাখতে জেবে তার তাতার দলবল নিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে লাগল। মাঝে মাঝে সামনে এগিয়ে আসা কিপচাক অশ্বারোহীদের সঙ্গে তাতারদের সঙ্ঘর্ষ বেধে যায়, তবে বড় রকমের কোন যুদ্ধ হয় না

দ্রুত গতিতে পথ পাড়ি দিতে দিতে রুশীরা দিনের বেলায় প্রায়ই যাত্রা স্থগিত রাখে, বসন্তের তৃণভূমিতে কিপচাকদের যে সব ষাঁড় ইতস্তত বিচরণ করে সেগুলোকে ধরে আনে। জেবের হুকুমে এই পশুগুলোকে সেখানে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রুশ ও কিপচাক সৈন্যরা এগিয়ে আসার আগে পর্যন্ত তাতার রাখালরা এদের দেখাশোনা করত; অবশেষে রাখালরা পলায়ন করে, তাতার সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দেয়।

রুশীদের শক্তিতে যাতে শৈথিল্য আসে, তাদের সতর্কতা যাতে ঢিলে হয়ে পড়ে এবং বিরতিস্থলে তারা যাতে ষাঁড়ের মাংসভোজে পরিতৃপ্ত হয়ে বিপদমুক্ত বলে নিজেদের মনে করে জেবে তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে রেখেছে। রুশ সৈন্যদের সারিগুলো পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের থেকে ক্রমেই আরও দূরে দূরে সরে গিয়ে ধূলিময় বিস্তীর্ণ পথ জুড়ে চলতে থাকে। রাতে ঘুমানোর সময়ও তারা আর বেড়া কিংবা গাড়ির সারি দিয়ে চার দিক ঘিরে রাখে না।

নতুন করে যে সব রুশী তাতারদের হাতে বন্দী হয় তারা বলে যে সৈন্যরা এই অভিযানে এবং প্রচুর পরিমাণে গোরু-ভেড়া হস্তগত করতে পারায় খুশি: "এখন ভেড়ার চামড়ার পোশাক পরা যাবে, ষাঁড়ের চামড়ায় জুতো সেলাই করা যাবে।..." সৈন্যেরা বলছে: "তাতারদের সেই অত বড় লোকবল কোথায় গেল? কিপচাকদের ষাঁড়ের সংখ্যাই ত দেখা যাচ্ছে তাতারদের চেয়ে বেশি। ওদের পেছন পেছন এভাবে ছুটতে ছুটতে আমরা লুকোমোরিয়ে পর্যন্ত চলে যাব কিন্তু তাতারদের শিবিরের আর পাত্তা মিলবে না।"

রুশীদের একটা দল অন্যগুলোর তুলনায় ভালো সার বেঁধে চলছিল, সেটাতে সামরিক শৃঙ্খলা ছিল, সৈন্যরা সারা স্তেপ জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে না চলে এক সঙ্গে চলছিল। রাতে এই দলটি সব সময় নিজেদের চার দিকে সার বাঁধা গাড়ির বেষ্টনী রাখত, এদিক-ওদিক গুপ্তচর পাঠাত। এটি হল কিয়েভের মহামান্য নরপতি মৃস্তিস্লাভ রমানোভিচের বাহিনী। কিয়েভ ফৌজ অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে চলত; এখানে অর্ধেক ছিল পদাতিক, বাকি অর্ধেক সৈন্য ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী। স্তেপের ওপর কিপচাকদের গোরু-ভেড়ার পালকে বসন্তের কচি ঘাসপাতা খেতে দেখে তারাও সেগুলোকে ধরার জন্য অশ্বারোহীদের পাঠাতে থাকে।

তারপর তারা তামার কড়াইয়ে মাংসের সুরুয়া রাঁধে। ভোজনের পর সৈন্যদল সকাল অবধি দিব্যি নিদ্রা দেয়।

তাতাররা বলাবলি করতে থাকে যে উরুসদের ঘোড়াগুলো তাতারদের ঘোড়ার মতো চট্‌পটে ও সহিষ্ণু নয়, উরুসদের তীরও তেমন একটা দূরে যায় না, তবে দীর্ঘ হাতলওয়ালা কুঠার নিয়ে হাতাহাতি যুদ্ধে যখন তারা নামে তখন তাদের সঙ্গে এ'টে ওঠা ভার, উরুসরা অটল ও দুর্ধর্ষ।

রুশীদের সঙ্গে প্রতিটি ছোটখাটো সম্ঘর্ষের পর তাতাররা স্তেপের অনেক ভেতরে পালিয়ে যায়, টিলার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে কিংবা খাতের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দিনের বেলায় গুমোট গরম। সূর্যের নিদারুণ লেলিহান শিখাকে ঢাকার মতো বিন্দুমাত্র মেঘখণ্ড আকাশে ভাসছে না। সেনাদল চলার সময় যে কালো ধুলোর মেঘ উড়তে থাকে তাতে ঘোড়াদের এবং লোকজনের নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম। কোন কোন সেনাদল রাস্তা থেকে স্তেপের মধ্যে নেমে এসে ঘাস মাড়িয়ে চলে কিন্তু সেখানেও চৌচির মাটি পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে যায়, বাহিনীর মাথার ওপর কালো ধুলোর মেঘ উড়তে থাকে।

এই গরমে নদীর জলপ্রবাহ শুকিয়ে যেতে লাগল, সৈন্যরা অসন্তুষ্ট হয়ে বলাবলি করতে লাগল: "তাতারদের খোঁজে আমাদের স্তেপে নিয়ে আসা হল কেন? কিপচাকদের যে গোরু-ভেড়া আমাদের হাতে এসেছে সেগুলো নিয়ে কি এখন ঘরে ফেরা উচিত নয়?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সুবুদাই বাহাদুরের যুদ্ধ-প্রস্তুতি

প্রবীণ সেনানায়ক দু' দিন এদিক-ওদিক ঘুরে জায়গাটা ভালো করে দেখেশুনে নিল, লড়াইয়ের জন্য মোঙ্গলদের সুবিধামতো মাঠ নির্বাচন করল।

ঘর্মাক্ত ঘোড়ায় চড়ে তিন বার বার্তাবহরা এসে জানাল:

"জেবে নোইয়ন পিছু হটছেন।... সামনে চলেছে লম্বা দাড়িওয়ালাদের সৈন্য দল।... দলের নেতা 'বাহাদুর মাস্তিস্লিয়াব'।... তার সঙ্গে চলেছে

খান ইয়ারুনের কিপচাক দল।... তার ঘোড়ার জিন থেকে ঝুলছে আমাদের হাজারী নেতা গেমিয়াবেকের মাথা।..."

যুদ্ধের আগের দিন সন্ধ্যায় সুবুদাই টিলার ওপর তার ছাউনিতে ফিরে এলো। সেখানে শৃঙ্গমণ্ডিত পশুপুচ্ছধারী ধ্বজার পাশাপাশি মাটিতে প্রোথিত ছিল সমগ্র সেনাদলের হাজারী নেতাদের ধ্বজা লাগানো দশটি উঁচু উঁচু বর্শা। এখন গোটা বাহিনী একত্রিত হয়েছে, প্রান্তরের ওপর ছাউনিতে গুঞ্জন উঠেছে।

সুবুদাই কম্বলের ওপর শুয়ে ছিল। তার হাড় ব্যথায় টন্‌টন্‌ করছিল। সে এপাশ-ওপাশ করছিল। ছাউনির ভেতর নিভু নিভু আগুন থেকে ধোঁয়া উঠছিল। ঝুলকালি মাখা আচ্ছাদনের নীচে ধোঁয়া জমছে, ধীরে ধীরে ছাদের ছিদ্রপথ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। চার পাশের কম্বলের পর্দাগুলো ছাদের ওপর গুটিয়ে রাখা হয়েছে বটে কিন্তু কাঠের বাঁধানো গরাদ ভেদ করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কালকার খট্‌খটে প্রান্তরের ওপর গরম বাতাসে কোন চাঞ্চল্য খেলে না।

প্রবীণ মোঙ্গল সেনানায়কের ঘুম আসে না, সে শান্ত হয়ে আসা শিবিরের ভাসা ভাসা অস্পষ্ট কোলাহল কান পেতে শোনে। ছাউনির গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখতে পায় এখানে ওখানে জ্বালানো আগুনের চার দিকে গোল হয়ে বসে আছে সৈন্যরা। রক্তবর্ণের শিখায় তাদের চোখমুখ আলোকিত। টুকরো টুকরো কথাবার্তা ভেসে আসছে, কানে আসে পাথরের গায়ে লোহার ফলা শানানোর একঘেয়ে আওয়াজ। কে একজন গেয়ে উঠল:

জন্মভূমি কেরুলেন, শ্যামলিমা তার,
হে সৈনিক, কভু তুমি দেখিবে কি আর?
এ যাত্রার অবসান সেথা জেন তুমি,
যেথা অস্থিপঞ্জরের উপত্যকা ভূমি।...

ক্রুদ্ধ কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল:

"চুপ রও! বিপদ ডেকে আনার সাধ হয়েছে দেখছি!"

গান থেমে গেল। কোথায় যেন কে হেঁকে উঠল: "থাম! কে যায়?" সুবুদাই অতিকষ্টে উঠে বসল। লোকজনের কোলাহল এবং ঘোড়ার খুরের স্পন্দন এগিয়ে আসতে লাগল।... একজন রক্ষী প্রবেশ করল।

"তখুচার নোইয়ন এসেছেন। সঙ্গে আছে তাঁর গোটা দল — দশ হাজার ঘোড়সওয়ার।"

“ওদের দিয়ে আমার কী হবে?”

“নোইয়ন টিলার ওপর উঠে আসছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।”

সুবুদাই কঁকিয়ে, কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়াল, ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলো। আধো অন্ধকারে তার সামনে এক দীর্ঘকায় সৈনিক এসে দাঁড়াল। সৈনিকের মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ।

“অমরলোকের আশীর্বাদ আপনার ওপর ঝরে পড়ুক। আপনার ধ্বজার পাশে আমার ধ্বজা রাখার জন্য আমি সোজা সোনালি ছাউনি থেকে এসেছি।”

“আমার পথে যে দাঁড়িয়েছে আজ পর্যন্ত তোমাকে ছাড়াই তাকে শায়েস্তা করেছি।...”

“এটা মোঙ্গলদের কারও অজানা নেই। এখন আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।”

সেনাপতিদের দু'জনেই ছাউনিতে প্রবেশ করল। তথ্যচার নোইয়ন সুবুদাইয়ের পাশে কম্বলের আসনের ওপর বসে পড়ে তার কানে কানে বলল, মোঙ্গলদের যে বাহিনী আগে আগে চলে গেছে তার সন্ধানে পশ্চিমে যাওয়ার হুকুম হয়েছে। সে একথাও বলল যে মহামান্য মোঙ্গল খানের চিঠি নিয়ে বিশেষ দূত আসছে।

সুবুদাই অনেকক্ষণ কাশল, মাথা ঝাঁকাল। তথ্যচারের দিকে ঝুঁকে পড়ে সেও তার কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলল:

“খান-ই-খানানের চিঠিতে কী আছে আমি জানি না।... তাকে অমান্য করার উপায় নেই। হয়ত বা আমাদের একচ্ছত্র অধিপতি আমাদের সাফল্য কামনা করছেন, আবার এমনও হতে পারে যে তিনি পিছু হটার হুকুম দেবেন? তাহলে আমার সৈন্যরা আর যুদ্ধে নামতে চাইবে না।... অথচ কালই এখানে উরুসরা এসে যাচ্ছে। যুদ্ধের ঠিক আগে আগেই যদি আমি এখান থেকে চলে যাই তাহলে তারা ভাববে কী?.. তারা বলবে যে চেঙ্গিজ খানের ফৌজ কিনা উরুসদের দাড়ি দেখেই লেজ গুটিয়ে চম্পট দিল।...”

সুবুদাই চুপ করে গিয়ে আবার অনেকক্ষণ কাশল।

“আমি চিঠি দেখি নি।... তার কথা কিছুই শুনি নি।... এখন আমি শুতে যাব, সকালে মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে উরুসদের মুখোমুখি হওয়ার

জন্য এগিয়ে যাব।... রণদেবতা সুলদে, অগ্নিদেব গালাই এবং আমাদের অন্যান্য দেবতা যদি আমাকে তীর ও তরবারির হাত থেকে রক্ষা করেন তাহলে যুদ্ধের পর তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তখন সমস্ত ফৌজের সামনে খান-ই-খানানের চিঠি আমার হাতে দিও।... আপাতত বিদায়!"

সুবুদাই রাতে দু'বার উঠে আঁচে ফুঁ দিল, আগুনে কিছু শুকনো ডালপালা গুঁজে দিল। সে ছাউনির গরাদের সঙ্গে রুপোর শেকলে পা বাঁধা সোনালি মোরগটার দিকে তাকাল। মোরগটা গায়ের পালক ফুলিয়ে বসে ছিল। সে মালিকের দিকে কোন মনোযোগ দিল না। গোল জ্বলজ্বলে চোখ বিস্ফারিত করে মোরগটা আবার চোখের সাদা পাতা টেনে দিল।

সকালের দিকে সুবুদাইয়ের তন্দ্রা এলো। মোরগ অকস্মাৎ জোরে চিৎকার করে উঠে ডানা ঝাপটা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছাউনিতে বৃদ্ধ ক্রীতদাস সাক্লাব প্রবেশ করল। সে আগুন জ্বালাতে লাগল। পাশের চাউনিতে মোরগের গানের সুরের অনুকরণে দুই শামান চেঁচিয়ে উঠল:

"কোঁকর-ও-কোঁ-ও!"

সুবুদাই আড়চোখে সাক্লাবের দিকে তাকাল — ব্যাপারটা কী? বৃদ্ধ রুশ ক্রীতদাস কম্বলের ওপর রেশমী দস্তরখান বিছিয়ে দিল। তার চেহারায় বিশেষ গাম্ভীর্য প্রকাশ পাচ্ছে: সাদা চুল দু' দিকে পাট করে আঁচড়ানো এবং বন্ধনী দিয়ে বাঁধা, রোদে পোড়া বলিরেখাময় কণ্ঠদেশে ভালুকের দাঁতের কণ্ঠী।... সাক্লাব বেরিয়ে গিয়ে পাত্রে করে ভাত ও ভেড়ার মাংসের পোলাও নিয়ে এলো। সুবুদাইয়ের সামনে রেশমী রুমালের ওপর সে পাত্র নামিয়ে রাখল, পাশে রাখল চার ভাঁজ করা কয়েকটি পাতলা পরোটা।

"এটা হল লাল লঙ্কা দিয়ে তৈরি গুরগঞ্জী পোলাও।..."

"ভালুকের দাঁতের কণ্ঠী পরেছিস কেন? তোর উরুস জাত ভাইদের দেখতে পাবি বলে আনন্দ হচ্ছে বুঝি?.." সুবুদাই খাবারের খুব কাছাকাছি ঝুঁকে পড়ে সন্দিগ্ধভাবে তার ঘ্রাণ নিল।

"বিষ! এই দিয়ে তোর মড়া বাপের পিণ্ডি দে!" সুবুদাই হিস্‌হিস্‌ আওয়াজ তুলে খাবার ঠেলে সরিয়ে দিল।

"আমি গোলাম, আমি কুকুরের চেয়েও হীন," সাক্লাব বিনীতভাবে

বলল, "কিন্তু আমার এই এত কালের জীবনে আমি কখনও কারও কোন অনিষ্ট করি নি।"

সুবুদাই ভ্রুকুটি করল।

"খাবার উঠিয়ে নিয়ে আমার পেছন পেছন চলে আয়! সুবুদাই বাহাদুর প্রার্থনা করতে চায়।"

খোঁড়াতে খোঁড়াতে এবং ফুঁসতে ফুঁসতে প্রবীণ সেনানায়ক বেরিয়ে ছাউনির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আগের দিন সন্ধ্যায়ই সে তার বাহিনীকে হুকুম দিয়ে রেখেছে: "ভোরে মোরগের প্রথম ডাক শোনার পরই টিলার পেছনের প্রান্তরে সার বেঁধে দাঁড়াতে হবে।"

চার দিক থেকে অশ্বারোহীর দল আসতে লাগল, শিঙা ও ঢাকের আওয়াজ উঠল, অশ্ব তাড়নার জন্য সৈনিকদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত।

ছাউনির সামনে অগ্নিকুণ্ডের পাশেই বসে ছিল দুই প্রবীণ শামান। তাদের মাথায় উঁচু টুপি, গায়ে ঝাঁকড়া পশমের আঙরাখা, তার ওপর ঝুলছে নানারকম ঝুমঝুমি। সেনানায়ককে দেখতে পেয়ে শামান দু'জন হুঙ্কার তুলল, খঞ্জনীতে ঘা মারল এবং অগ্নিকুণ্ডের চার ধারে গোল হয়ে নাচতে লাগল।

সুবুদাই শেষ নির্দেশ দিল:

"ছাউনি, গালিচা, কম্বল এখানেই পড়ে থাকবে! আর তুই চুবুগান* মাল টানা ঘোড়াগুলোর সঙ্গে সঙ্গে যাবি। আমার চিতাবাঘ তিনটে, মোরগ আর বুড়ো সাকলাবকে সঙ্গে নিবি, আর হ্যাঁ, বুড়োটাকে চোখে চোখে রাখবি কিন্তু। দেখিস ওটা আবার আজ ওর উরুস জাত ভাইদের কাছে পালিয়ে যাওয়ার ফিকির না করে।... ঘোড়া নিয়ে এসো!"

রক্ষীরা ঘোড়া নিয়ে এলো: সেগুলোর মধ্যে পথে বদল করার জন্য জিন চাপানো দুটো ঘোড়া ছিল আর ছিল ছয়টি মালবাহী ঘোড়া। মালবাহী ঘোড়াদের পিঠে ছিল চামড়ার ভারী ভারী থলে। জনরব এই যে সুবুদাই নাকি এই থলেগুলোতে তার স্বর্ণভাণ্ডার নিয়ে চলেছে।

সুবুদাই ঈষৎ বাদামী রঙের একটা বাচ্চা মালবাহী ঘোড়ার সামনে এগিয়ে এসে রক্ষীদের একজনকে ইশারা করল। রক্ষীরা দু'জনে মিলে ঘোড়াটার লাগাম ধরে তার গায়ে হাত বুলাতে লাগল, তারপর সেটাকে

* চুবুগান — চট্‌পটে।

অগ্নিকুণ্ডের সামনে নিয়ে এলো। সাক্‌লাব সেখানে ভাতের থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সুবুদাই তার অক্ষত বাঁ হাতের থাবা দিয়ে এক মুঠো ভাত তুলে নিয়ে আগুনে ছুঁড়ে দিয়ে টেনে টেনে প্রার্থনা আওড়ে চলল:

শোন মোর প্রভু, লোহিত অনল,
হে গালাই খান, তুমিই শরণ!
জনক তোমার ক্ষুদ্র অরণি,
সাফ ইস্পাত তোমার জননী।
করি নিবেদন হে আমার ত্রাতা
পীতবর্ণের ঘৃত এক হাতা,
দিই ঘন কালো সুরার পেয়ালা
আর মুঠো ভরি চর্বির ডেলা।
আন মঙ্গল,
দাও বাহুবল,
অশ্বের খুরে
শকতি!

দু' জন শামানই সুবুদাইয়ের এই মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে ধীরে ধীরে খঞ্জনীতে ঘা মারতে লাগল। সেনানায়ক তার আবৃত্তি শেষ করলে শামানরা সাক্‌লাবের হাত থেকে ভাতের থালা ছিনিয়ে নিয়ে আলগোছে মাটিতে বসে চবর চবর শব্দে গোগ্রাসে ভাত খেতে শুরু করল।

সুবুদাই একটা সরু ছুরি টেনে বার করে বাদামী ঘোড়ার কাঁধে বসিয়ে দিল। ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল, তার রেশমের মতো মসৃণ পশমে ঢাকা গা বয়ে গাঢ় রক্ত গড়িয়ে পড়ল। আর সুবুদাই ঘোড়ার দুই কাঁধের মাঝখানটা শক্ত করে হাতে আঁকড়ে ধরে ক্ষতস্থানে ঠোঁট লাগিয়ে রক্ত চুষতে লাগল।

রক্ষীরা অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে লক্ষ্য করতে লাগল কীভাবে তাদের সেনানায়ক বড়রকমের যুদ্ধযাত্রার আগে উষ্ণ রুধিরে নিজের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করে।

টিলার ওপর উঠে এলো এক সৈনিক। তার মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ, দেহে বর্ম আঁটা। লোকটার আপাদমস্তক ধুলোয় ঢাকা। তাকে দেখে চেনার উপায় নেই। সুবুদাই বাদামী ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল। সে রক্তমাখা মুখ তুলে তাকাল, তার ভাঁটার মতো চোখের দৃষ্টি অনুসন্ধিৎসায় ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল।

"কে তুমি বাহাদুর?"

সৈনিক তার হাতের তালু ঘোড়ার টাটকা ক্ষতের ওপর চেপে ধরল এবং রক্তে ভেজা হাত সুবুদাইয়ের পোশাকে বুলাল।*

"আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করি! আমি জেবে নোইয়ন!"

"উরুসরা কোথায়?"

"কাছে, একেবারে কাছে! এই এলো বলে।... আমার দলবল তাদের সঙ্গে লড়াই করছে, পিছু হটতে হটতে এই দিকে ওদের টেনে আনছে।... আমি একশ' সিপাহীর তিনটি দল নিয়ে মাস্তিস্লিয়াবের পিছু নিয়েছি।... সে তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে আগে আগে চলেছে।... আমি ওকে জ্যান্ত ধরতে চাই!"

"দেখো, নিজেই ওর কবলে গিয়ে না পড়!"

সুবুদাই ধূসর বর্ণের ঘোড়ায় উঠে বসল। তার আগে আগে সারি বেঁধে চলল তিন জন মোঙ্গল। মাঝের জনের হাতে পাঁচটি অশ্বপুচ্ছ শোভিত শিঙ উঁচানো ধ্বজা। সুবুদাই টিলা থেকে ধীরে ধীরে সমভূমিতে অবতরণ করল। সেখানে একশ' দেহরক্ষীর দল তার জন্য অপেক্ষা করছিল। আরও কিছু দূরে রৌদ্রদগ্ধ স্তেপভূমির ওপর চার দিক থেকে কাতারে কাতারে অশ্বারোহীর দল এসে জমায়েত হচ্ছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধারম্ভ

> ...উরুসরা যুদ্ধের জন্য জমায়েত হতে না হতে বিপুল সংখ্যক তাতার তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যুদ্ধে দু' পক্ষই অশ্রুতপূর্ব শৌর্যের পরিচয় দিল।
>
> (ইবন আল-আসির, ত্রয়োদশ শতক)

কাল্‌কার খাড়া পাড়ের ওপর প্রথম যাদের দেখা গেল তারা হল ম্‌স্তিস্লাভ ম্‌স্তিস্লাভিচ উদাত্‌নির গালিচ অশ্বারোহী দল। তার পেছন পেছন এলো সেনাপতি ইয়ারুনের পলভেৎস অশ্বারোহী দল। ম্‌স্তিস্লাভ

---

* মোঙ্গল রীতি — স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা।

তাতারদের পরিত্যক্ত ঝুলকালি মাখা ছাউনির বিস্তারিত মণ্ডলী দেখতে পেল। অনেকগুলো ছাউনিতে গালিচা ও কম্বল এবং শস্যের বস্তা পড়ে ছিল, অগ্নিকুণ্ডগুলোতে আগুন তখনও ধিকিধিকি জ্বলছে।

"তাতাররা ভীতু খরগোসের মতো এখান থেকে পালিয়েছে," সৈন্যরা বলাবলি করল। "আমরা কোথায় ওদের নাগাল পাব? এই গরমের মধ্যে আর কত দূরে মরণের পিছু পিছু যাব?"

নৃপতি মুস্তিস্লাভ উদাত্নির ভালো রকম সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল — সারা জীবন সে যুদ্ধ বিগ্রহ করে কাটিয়েছে, তা সে যুদ্ধ যার পক্ষ নিয়েই হোক না কেন, তা থেকে লাভ ওঠানো গেলেই হল। তাতাররা যে শিবির পরিত্যাগ করে চলে গেছে তাতে কিন্তু সে উল্লসিত হল না — আসলে কব্জা করা দরকার ছিল শিবির নয়, তাতারদের। মুস্তিস্লাভ বিরতির নির্দেশ দিলেও সেনাদলকে লোহার জালিবর্ম পরে শিগ্গিরই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলল। নৃপতি তার অল্প বয়সী জামাতা দানিল রমানোভিচকে ভলিন্স্ক সেনাদল সঙ্গে দিয়ে গোপন অনুসন্ধানের কাজে পাঠাল। অসহিষ্ণু সেনাপতি ইয়ারুনও তাড়াহুড়ো করে তার পলভেৎস সেনাদল নিয়ে তাতারদের ধরার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল, কেন না সকলেরই ধারণা হয়েছিল যে তাতাররা অবসন্ন হয়ে পড়েছে এবং তাদের শক্তিও নিঃশেষিত।

অনতিবিলম্বে রাজা দানিলের কাছ থেকে বার্তাবহ ছুটে এলো:

"তাতাররা একেবারেই কাছে! ওরা এখানে! টিলার ওপর ওদের গুপ্তচরদের দেখা গেছে।... আমাদের দেখতে পেয়ে ওরা লুকিয়ে পড়ছে।... কী করা যায়?"

নৃপতি নতুন ঘোড়া এনে দিতে বলল। রাজপুরুষরা জিন চাপানো তিনটি ঘোড়া নিয়ে এলো। তাদের মধ্যে দু'টি ছিল উগ্রীয় জাতের — বাদামী রঙের, কেশর কালো, বুকের ছাতি চওড়া, শক্তসমর্থ গোছের। এখন ধুলোর আবরণে ঢাকা পড়ে তাদের অবস্থা শোচনীয়। তৃতীয় ঘোড়াটি তার শ্বশুর পলভেৎস খান কোতিয়ানের দেওয়া উপহার। এটি ছিল উঁচু তেজীয়ান এক তুর্কমেন ঘোড়া। তার ধূসর রঙের দেহের ওপর বাদামী বুটি। বদমেজাজের এই ঘোড়াটার ডাকনাম ছিল 'আত্কাজ'।* দুই

* আত্কাজ — কিপচাকদের ভাষায় 'পক্ষিরাজ ঘোড়া'।

পলভেৎস সহিস লাগাম ধরে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে কোনরকমে তাকে টেনে নিয়ে এলো।

ম্‌স্তিস্লাভ লাফিয়ে আত্‌কাজের পিঠে উঠে বসল এবং ঘোড়ার সঞ্চিত শক্তি সংযত করে রেখে নদীর দিকে নামল। অশ্বারোহীদের সে হুকুম দিল তারা যেন ঘোড়াগুলোকে খানিকটা জল খাইয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ে। নৃপতি তাতারদের চালাকি ধরতে পারে নি: তার ধারণা ছিল তাতাররা তাদের দুর্বলতার জন্য যুদ্ধ এড়িয়ে যাচ্ছে, তাই সে ঠিক করল কোন বিরতি না দিয়ে এই মুহূর্তে তাতারদের নাগাল ধরে তাদের শেষ করে দেওয়া দরকার।

সোনার কারুকাজে খচিত ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ, উচ্চকায় তুর্কমেন ঘোড়া, সে ঘোড়ার রাজহাঁসের মতো বাঁকানো গ্রীবাদেশ, অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন কঠিন পেশীবহুল নৃপতির দৃপ্ত ভঙ্গি — এসবই তার সৈন্যসামন্তের মনে এমন ধারণাই ত এনে দেয় যে সে সত্যিকারের বীরপুরুষ, যুদ্ধের আগুন ও বিপদকে সে ভালোবাসে, সে শত্রুকে সন্ধান করে বেড়ায়, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বহু সংঘর্ষ ও অভিযানে পোড় খাওয়া এই ম্‌স্তিস্লাভকে বৃথাই 'সফলকাম' আখ্যা দেওয়া হয় নি।...

নদীর অপর তীরে উঠে ম্‌স্তিস্লাভ ঘোড়াগুলোর জলপান শেষ হওয়া পর্যন্ত অশ্বারোহীদের অপেক্ষা করে।

"ঈশ্বর আমাদের সহায়!" ম্‌স্তিস্লাভ চেঁচিয়ে উঠল। "নাস্তিক তাতারগুলোকে খতম করব! এই হিংস্র জাতটাকে কোন রকম মায়া-মমতা দেখাবে না! আগে চল!"

গোটা দলটা টগ্‌বগিয়ে ছুটে চলল। এখনই তুমুল লড়াই বেধে যেতে পারে ভেবে সৈন্যরা অস্ত্র ঠিকঠাক করতে থাকে।

ম্‌স্তিস্লাভ সামনের প্রান্তরের দিকে চেয়ে দেখল সেখানে কালো ধুলোর মেঘ উড়িয়ে তাতার ও রুশ অশ্বারোহীরা ছুটছে। এই অশ্বারোহীরা ছিল ভলিন্‌স্ক সেনাদলের আর তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল ম্‌স্তিস্লাভের আঠারো বছর বয়স্ক জামাতা রাজা দানিলা রমানোভিচ। এই ত ঝলক দিল সোনালি নক্সা দেওয়া তার নীল পতাকা। সৈন্যসামন্তরা চার দিকে ভিড় করে তাকে আগলে আগলে চলছে, ওদিকে তাতাররা চার পাশে পাক খাচ্ছে,

তারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ছে, আঘাত খেয়ে পড়ে যাচ্ছে কিন্তু দীর্ঘ বাঁকা ফলা হাতে যুদ্ধে কোন ক্ষান্তি দিচ্ছে না।

পলভেৎসরা ছিল আরও দূরে। মস্তিস্লাভ দেখল যে সেনাপতি ইয়ারুনের পুচ্ছশোভিত ধ্বজা নড়ছে আর পলভেৎস সেনাদল ধুলোর ঝড় তুলে টিলার দিকে সরে যাচ্ছে।

মস্তিস্লাভ ঠিক করল বাঁ দিকটা দখল করবে, টিলা পেরিয়ে যাবে, আর টিলার ওপারে যদি যুদ্ধ চলে তাহলে সেনাপতি ইয়ারুনের পলভেৎস সৈন্যদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এক পাশ থেকে তাতারদের ওপর আঘাত হানবে। সে তার সেনাদল নিয়ে পাশ কাটিয়ে আরও একটা উঁচু টিলার ওপর উঠে যা দেখতে পেল তাতে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াল।...

ঘনঘন সারিতে প্রান্তর ছেয়ে নতুন তাতার বাহিনী তৈরি হয়ে আছে। অশ্বারোহীরা ভয়ঙ্কর নীরবতা অবলম্বন করে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোহার শিরস্ত্রাণ, ঝক্‌ঝকে বর্ম এবং হাতের বাঁকা তালোয়ারের ফলা স্পষ্ট চোখে পড়ছিল। দলের পর দল দীর্ঘ সারি বেঁধে তাতাররা প্রান্তর ছেয়ে ফেলেছে।... ওরা সংখ্যায় কত? দশ হাজার? নাকি আরও বেশি — পনেরো? না বিশ হাজার?

তাহলে এখানেই শেষ ভয়ঙ্কর দিন পর্যন্ত তাতারদের সেনাদল লুকিয়ে ছিল! আর নীপার থেকে শুরু করে রাস্তায় যে ছোটখাটো দল হানা দেয় ও পালিয়ে যায় তা ছিল টোপ, ধূর্ত তাতারদের ছলনা মাত্র!

এরকম একটা ভুল করে, এমনভাবে কিনা বাঁকা তরবারি হাতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তাতারদের ফাঁদে সে তার বিশ্বস্ত সৈন্যসামন্তকে এনে ফেলল! উপায় কী? পরিত্রাণ কোথায়? এদিকে দীর্ঘ পথের ওপর রুশ সেনাদলগুলো পরম নিশ্চিন্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে — সংবাদ পাঠিয়ে তাদের সকলকে জড় করার মতো সময়ই বা কোথায়? "আমাদের রুশী ফৌজও বিরাট — তাতারদের চেয়ে কম হবে না! কিন্তু কেনই বা তারা এমন ভয়ঙ্কর অপরাজেয় শক্তি নিয়ে একসঙ্গে মিলতে পারল না? কেন প্রত্যেক নৃপতি যাঁর যাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে আলাদা আলাদা হয়ে চলছেন? আর মাত্র এক দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই বিচ্ছিন্ন রুশ সেনাদলগুলোকে এক করা যায়! তখন তাতারদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় নামা যেতে পারে।"

সময় হাতছাড়া হয়ে গেছে! তাতাররা এখন সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তিরিশ হাজার নতুন ঘোড়ার পিঠে চেপে প্রবল আক্রমণে

পথের ওপর থেকে সব কিছু ঝেঁটিয়ে সাফ করবে।... "মৃত্যুতেই কলঙ্কের অবসান!" বিড়বিড় করে মুস্তিস্লাভ ঘোড়ায় কশাঘাত করল। স্তেপের ঘোড়া পেছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে উঠে উন্মাদের মতো লাফ দিল। ঘোড়া টিলা থেকে নীচে প্রান্তরের দিকে ছুটে গেল। এদিকে পলভেৎস অশ্বারোহীরা ভিড় করে ঝাঁকে ঝাঁকে টিলার আড়াল থেকে দ্রুত তার সামনাসামনি এগিয়ে এলো। আতঙ্কে এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চিৎকার করতে করতে তারা ঘোড়ায় কশাঘাত করল, মুস্তিস্লাভের গালিচ সৈন্যসামন্তের সারি ভেঙ্গেচুরে একাকার করে দিয়ে বিশৃঙ্খল জনতার মতো সামনের সকলকে ছিটকে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া বয়ে নিয়ে চলল বুকে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত তরুণ দানিলা রমানোভিচকে। সে ঘোড়ার কেশর আঁকড়ে ধরে কোন রকমে জিনের ওপর ঝুলছিল।

সামনে ঘন সারি বেঁধে প্রান্তরের ওপর তাতাররা বেরিয়ে এলো। তারা অদ্ভুতরকম নীরব, তাদের ডান হাতের আস্তিন কাঁধ পর্যন্ত গোটানো, সে হাতে উদ্যত বাঁকা তরবারি। টুঁ শব্দটি না করে মাঝারি কদমে তারা যখন কাল্কার উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে লাগল তখন মনে হচ্ছিল ঘন সারিবদ্ধ অশ্বারোহীদের এই নীরবতার মধ্যে আরও অশুভ কী যেন একটা আছে।

কেবল ঘোড়াদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ, তাদের খুরের ফাঁপা শব্দ, অস্ত্রের ক্বচিৎ ঝন্‌ঝনা একই লক্ষ্যে এবং একই সঙ্কল্পে শৃঙ্খলিত ভয়ঙ্কর মোঙ্গল বাহিনীর নীরবতা ভঙ্গ করে।

তাতাররা নদী পার হয়ে অন্য তীরে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে তূরীর কর্ণভেদী সঙ্কেত ধ্বনিত হল। তাতার সৈন্যরা বন্য গর্জন তুলে রুশ শিবিরগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যেই বিমূঢ় পলভেৎস সেনাদলের দ্রুত পলায়ন লক্ষ্য করে সেখানে সৈন্যরা তাড়াতাড়ি চার দিকে ভারী ভারী গাড়ি সাজিয়ে বেষ্টনী তুলে ফেলে।

রুশ সেনাদের প্রথম দলটির কাছে না থেমে তাতাররা আরও দূরে এগিয়ে গিয়ে সামনের দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ শকটের ওপর আক্রমণ চালায়।

জালোজান পথ বরাবর বিস্তৃত রুশ সৈন্যদের সবগুলো দলই দেখতে পেল পলভেৎস অশ্বারোহীদের ঘোড়াগুলো তাড়া খেয়ে ছুটছে, তাদের মধ্যে নৃপতি মুস্তিস্লাভের ঘোড়াও আছে। মুস্তিস্লাভ উদাত্‌নি বিষণ্ণ

বদনে ধূসর তেজী ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে, বাতাসে তার পরনের লাল বসন উড়ছে।

বহু রুশী তাদের শকটশ্রেণী ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে দ্রুত নীপারের দিকে পশ্চাদপসরণ করল। অন্যেরা শকটের বেষ্টনী রচনা করে কুঠার হাতে তাতার সেনাদলের মোকাবিলা করতে লাগল।

তাতার বাহিনীর একটি অংশ কিয়েভ নরপতি মস্তিস্লাভ রমানোভিচের শিবির অবরোধ করল। মস্তিস্লাভ রমানোভিচ দশ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনার দল নিয়ে চলছিল। অন্যান্য সেনাদলের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল না, মস্তিস্লাভ উদাত্নি যে কী ব্যবস্থা নেবে তাও তার জানা ছিল না। সে এই বলে বড়াই করেছিল যে অপরের সাহায্য ছাড়া একাই 'অশুভ বায়ুতাড়িত চেঙ্গিজ খানের তাতারদের' উচ্ছেদ করবে।

এই কলঙ্কিত দিনের মধ্যাহ্নে কিয়েভ বাহিনীর সৈনিকরা কাল্কার উঁচু তীরে তাদের শিবির ফেলে। তারা সচরাচর যেমন করে থাকে তেমনি ভাবে চার দিকে শকটের শ্রেণী দিয়ে বেষ্টনী তৈরি করে, এমন সময় বিভ্রান্ত পলভেৎস অশ্বারোহীদের বন্যাস্রোত ঝটিতি তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

কিয়েভ বাহিনীর এগারো জন নরপতি বলে উঠল:

"আমরা মরতে বসেছি! শক্ত হয়ে দাঁড়ানো দরকার!"

তারা পরস্পরকে চুম্বন করে অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত সংগ্রাম করতে বদ্ধপরিকর হল।

কিয়েভের সৈনিকরা সারি সারি গাড়ি এক সঙ্গে জড় করে লাল ঢালে গা ঢাকা দিয়ে চাকার আড়ালে আশ্রয় নিল। তারা আক্রমণরত তাতারদের তীরবিদ্ধ করে, তরবারি ও কুঠারের আঘাতে আঘাতে তাদের প্রতিহত করতে থাকে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মরণপণ সংগ্রাম

তাপদগ্ধ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ওপর ধুলোর মেঘ জমেছে। যেখানে ধুলো বিশেষ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে সেখানে চলেছে মানুষে মানুষে নৃশংস সংঘর্ষ, ছুটছে সওয়ারহীন ঘোড়া; শত শত আহতের আর্তনাদে ও

সৈনিকের ক্রুদ্ধ চিৎকারে, তুরী ও ভেরির বিকট, কর্ণভেদী আওয়াজে সে স্থান পরিপূরিত।

একশ' বাছাই করা রক্ষী নিয়ে সুবুদাই বাহাদুর টিলার ওপর অবস্থান করছে। বাহাদুররা কেমন লড়ছে, উরুসদের নতুন কোন ফৌজ দেখা গেছে কিনা, কোন দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা আছে কি না — এই সব সংবাদ জানার জন্য সে থেকে থেকে অশ্বারোহীদের পাঠায়। বার্তাবহরা ফিরে এসে জানায় যে মোঙ্গলরা সর্বত্রই বিজয় লাভ করছে, উরুসরা নীপারের দিকে পশ্চাদপসরণ করছে, তবে লড়ছে, পড়ে যাচ্ছে, আহত হয়েও লড়াইয়ে ক্ষান্তি দিচ্ছে না ; কেউ কিন্তু ক্ষমা ভিক্ষা করছে না, আত্মসমর্পণও করছে না।

"নেকড়ের জাত!" সুবুদাই বলল। "নেকড়ের মতোই মরবে!"

কিয়েভ বাহিনী তার চার ধারে শকটশ্রেণীর বেষ্টনী দিয়ে পাল্‌টা আক্রমণ চালাচ্ছে জানতে পেরে সুবুদাই ঐ শিবিরে একের পর এক সেনাদল পাঠিয়ে সেই সঙ্গে হুকুম দিল: "গাড়িগুলো উল্‌টে দিয়ে বেষ্টনী ভেদ কর! চার পাশ থেকে স্তেপে আগুন লাগাও!''

রুশীদের আশ্রয়স্থলের ওপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মোঙ্গলরা ঐ স্থান লক্ষ্য করে বর্শা ছোঁড়ে, বিশাল বিশাল ধনুকের ছিলা টেনে আগুনে তাতানো ফলাওয়ালা তীর ছোঁড়ে, শুকনো নলখাগড়ার জ্বলন্ত আঁটি গড়িয়ে দেয়, কিন্তু রুশীরা আগের মতোই দৃঢ় প্রতিরোধ দিতে থাকে — আক্রমণরত অশ্বারোহীদের হাতের কাছে পেলেই তীর ও পাথরের আঘাতে তাদের প্রতিহত করে। তাতাররা রুশীদের মনোবল ভাঙতে পারল না।

সুবুদাইয়ের আদেশে মোঙ্গলদের সঙ্গী বিভিন্ন গোষ্ঠীর কিছু আজেবাজে লোককে ঘোড়া থেকে নামিয়ে রুশ শিবির আক্রমণের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। বল্লম ও বাঁকা তরবারি আন্দোলন করতে করতে বন্য হুহুঙ্কারে একে অপরকে উৎসাহিত করে তারা শকটশ্রেণীর ওপর উঠতে লাগল। রুশীরা দীর্ঘ হাতলযুক্ত কুঠার, তরবারি ও মুগুরের আঘাতে তাদের প্রতিহত করল — আক্রমণকারীদের মাথা ফেটে চৌচির হল, তারা ধরাশায়ী হল।

তৃতীয় দিনে সুবুদাই ভবঘুরেদের সর্দার প্লোস্‌কিনিয়াকে ডেকে পাঠাল। লোকটা অনাহারে শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। দীর্ঘকায়, শক্তিশালী প্লোস্‌কিনিয়া এখন কোন রকমে পা ফেলছে। প্লোস্‌কিনিয়া

যাতে আগে বাড়ে সেই উদ্দেশ্যে পেছন পেছন দুই মোঙ্গল তার গায়ে ছুরির খোঁচা মারতে মারতে চলে। সুবুদাই বলল:

"তোর জাতভাই উরুসদের কাছে গিয়ে বুঝিয়ে বল ওরা যেন তলোয়ার আর কুড়ুল নামিয়ে রেখে ঘরে ফিরে যায়।... আমরা ওদের গায়ে হাত দেব না। এ কথা বললে আমরা তোকে ছেড়ে দেব।"

প্লোস্‌কিনিয়া পায়ের বেড়ির শিকল হাতে ধরে রুশ শিবিরের দিকে চলল। দুই মোঙ্গল প্লোস্‌কিনিয়ার কাঁধে বাঁধা কাঁচা চামড়ার বন্ধনীর প্রান্ত ধরে তার পিছু পিছু চলল। প্লোস্‌কিনিয়া রুশীদের শকটশ্রেণী থেকে কয়েক পা আগেই থমকে দাঁড়াল। রুশীরা শকটশ্রেণীর ওপর উঠে অবাক হয়ে কাঁধে ভারী বেড়ি লাগানো এই অদ্ভুত কৃশকায় লোকটিকে দেখতে লাগল। কেউ কেউ তাকে চিনতে পেরে বলল: "এ ত দেখছি সহিস প্লোস্‌কিনিয়া! ও পলভেৎসদের ঘোড়ার পাল কিয়েভে নিয়ে যেত। এ ছিল পলভেৎস খানদের দোভাষী!"

প্লোস্‌কিনিয়া রুশীদের উদ্দেশে চেঁচাতে লাগল:

"তাতারদের খান মহাবীর সুবুদাই আমাকে এই বলতে আদেশ করছেন যে তোমরা মিছিমিছি যুদ্ধ করো না। তোমরা যদি ওদের দয়ার ওপর নিজেদের ছেড়ে দাও তাহলে ওরা যেখানে খুশি তোমাদের চলে যেতে দেবে।... কেবল তোমাদের সব সম্পত্তি — ভেড়ার চামড়ার আলখাল্লা, গাড়ি আর কুড়ুল ফেলে যেতে হবে। এগুলো তাতারদের কাজে লাগবে, কেন না পথ চলে চলে ওদের এসব আর কিছু অবশিষ্ট নেই।"

"হুঃ, ফাঁকা বুলিতে ওস্তাদ তোকে বিশ্বাস করলেই হল! জানা আছে কীভাবে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে হাটে তুই আমাদের এই সব বেতো ঘোড়া গছিয়েছিস!"

"ওর কথায় কান দিও না!" বর্ষীয়ান যোদ্ধারা বলল। "বরং আমরা তলোয়ার হাতে করে এখান থেকে বেরিয়ে নীপারের দিকে যাব। তাতে অন্তত আমাদের অর্ধেক লোকেজনও ঘরে ফিরতে পারবে, কুড়ুল ও তলোয়ার হাতছাড়া করলে আমাদের সকলকেই স্তেপে প্রাণ খোয়াতে হবে!"

প্লোস্‌কিনিয়া কিন্তু দিব্যি কেটে বলল যে সে সত্যি কথা বলছে। সে নিজের গলা থেকে ক্রুশ খুলে নিয়ে চুম্বন করে কাঁদতে কাঁদতে বলল:

"তাতাররা পেছন থেকে আমাকে ছুরির খোঁচা দিচ্ছে, অন্যরকম আমি আর কী বলতে পারি!"

তাতাররাও মাথা ঝাঁকাল এবং তর্জনী তুলে সমর্থন করল যে তাদের দোভাষী ঠিক কথাই বলছে।

বর্ষীয়ান যোদ্ধাদের আপত্তি সত্ত্বেও কিয়েভের মহারাজ মস্তিস্লাভ রমানোভিচ তাতারদের কাছে অস্ত্র সমর্পণের আদেশ দিল। ফলে কিয়েভের সৈন্যরা কুর্নিশ ঠুকে পরস্পরের প্রতি বিদায় সম্ভাষণ জানাতে লাগল এবং স্তূপাকারে অস্ত্র ফেলে একে একে বেরিয়ে এলো। সৈন্যদের প্রথম চেষ্টা হল নদীর দিকে ছোটা — তিন দিন তারা জল পান করে নি। সৈন্যদের শেষ দলটি শিবির থেকে বেরিয়ে আসতে রাস্তার ওপর যখন ধূলিজাল উঠল এবং সৈন্যরা যখন হাঁফ ছেড়ে পিঠ খানিকটা টান করে নিয়ে দেশের মুখ দেখতে পাবে ভেবে খুশি হয়ে উঠেছে ঠিক তখনই তাতাররা পিছু ধাওয়া করে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করতে লাগল।

এখন এই সীমাহীন শূন্য প্রান্তরে নিরস্ত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আর কারও কোন গত্যন্তর রইল না। রুশদেশ অনেক দূরে এবং কোন খান থেকে কোন সাহায্য পাওয়ার উপায় নেই!

মোঙ্গলরা কিয়েভ নরপতির সঙ্গী এগারো জন নরপতিকে বেছে নিল। তারা খান সুবুদাই বাহাদুরের ভোজসভায় ওদের আমন্ত্রণ জানাল। অশ্বারোহীরা ঘন বেষ্টনীতে তাদের পাহারা দিয়ে তাতার শিবিরে নিয়ে এলো।

সুবুদাই বাহাদুর তার একশ' দেহরক্ষীর দলটি নিয়ে কিয়েভ শিবির থেকে কিছুটা তফাতে গিয়ে হত্যাকাণ্ড লক্ষ্য করতে লাগল। নিরস্ত্র উরুসরা তাদের সাধ্যমতো পাথর ও মাটির ঢেলা ছুঁড়ে লড়াই করে চলেছে। আহতরা তাতারদের আঁকড়ে ধরে ঘোড়ার জিন থেকে নামিয়ে ফেলছে, তাদের বাঁকা তরবারি কেড়ে নিয়ে আবার লড়াই করছে। এক দীর্ঘদেহী উরুস শিবির থেকে গাড়ির জোয়াল টেনে এনে সেটাকেই মুগুরের মতো ঘুরিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, সামনে এক অশ্বারোহীকে আসতে দেখে তাকে আঘাত করতে গেল, কিন্তু চোটটা গিয়ে পড়ল ঘোড়ার মাথার ওপর। ঘোড়াটা পেছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল, আরোহীসমেত ধরাশায়ী হল। উরুস ধরাশায়ী মোঙ্গলের দিকে ছুটে গিয়ে তার তরবারি ছিনিয়ে নিল, তাকে হত্যা করে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠল, তরবারি হাতে যুদ্ধ করে চলল।... ধুলোর মেঘে সব কিছু ঢেকে গেল।...

কিন্তু শক্তি অসমান, মোঙ্গলদেরই জয় হল।

সুবুদাই বাহাদুর টিলার ওপর উঠল এবং সেখান থেকে পথের ওপর অশ্বারোহীদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। প্রথম তারই নজরে পড়ল যে উত্তর থেকে তিনটি ধূলিঝড় এগিয়ে আসছে।

"এটা কী ব্যাপার?" সুবুদাই উত্তরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করল।

"তখুচারের মোঙ্গলদল ফিরছে!" রক্ষীরা বলল। "কিপচাকরা ষাঁড়ের দলের পেছন পেছন ছুটছে!"

"না, নতুন করে শত্রু সৈন্য আসছে!" সুবুদাই বলল। "সকলকে জমায়েত হওয়ার জন্য শিঙা বাজাও! শিগ্‌গির সব সৈন্যকে ডেকে আন! মড়া উরুসগুলোর পা থেকে জুতো ছিনিয়ে আর কাজ নেই! ফের যুদ্ধ হবে!"

কর্ণভেদী সুরে শিঙা বেজে উঠল। যেখানে যেখানে হাতাহাতি সংঘর্ষ চলছিল সেরকম কিছু কিছু জায়গায় অন্যান্য মোঙ্গল শিঙাবাদকরা সংকেত করে সাড়া দিল। রুশীরা পথের ওপর তখনও আক্রমণ প্রতিহত করে যাচ্ছিল। কিছু কিছু মোঙ্গল অশ্বারোহী তাদের ছেড়ে দিয়ে টিলার দিকে উঠে গেল। সেখানে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল সুবুদাইয়ের পশুপুচ্ছশোভিত ধ্বজা এবং অশ্বপৃষ্ঠে প্রস্তরমূর্তির মতো নিথর সেনানায়ককে।

এদিকে স্তেপের উত্তর দিক থেকে তিনটি ধূলিজাল ক্রমেই এগিয়ে আসে। তারপর ধুলোর মেঘ থেকে আলাদা হয়ে শূন্যে ভাসতে থাকে, ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। সুবুদাই নীরবে সে দিকে চেয়ে থাকে। তার রক্ষীরা মৃদুস্বরে বলতে থাকে:

"তিনটে দল আসছে। ওরা কারা? কিপচাকরা যদি না হয় তাহলে উরুস ঘোড়সওয়ারের দল হবে। সামনে নলখাগড়ার বন। ওরা এখন জলা জমির ওপর দিয়ে চলেছে, তাই ধুলোও আর উঠছে না।... দেখ, ঐ ত ওরা!"

নলখাগড়ার বন যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে মাঠের ওপর সাদা ও বাদামী ঘোড়ার পিঠে অশ্বারোহীদের প্রথম দলটির আবির্ভাব ঘটল। চার দিক থেকে দলে দলে অশ্বারোহী ঠিক যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে ভিড় করে দাঁড়াতে লাগল, দেখতে দেখতে প্রান্তর ছেয়ে ফেলল।

অশ্বারোহীরা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে যথাস্থানে দাঁড়িয়ে রইল — মনে হল তারা যেন সারিগুলো ঠিকমতো বিন্যাস করছে। অশ্বারোহীরা অর্ধবৃত্ত রচনা করল। তিনটি ত্রিকোণ ধ্বজা দেখা গেল — মাঝেরটা কালোর ওপর সোনার কাজ করা আর দু' পাশে দু'টি লাল রঙের।

নিরস্ত্র কিয়েভ সেনাদের হত্যায় লিপ্ত তাতাররা চার দিক থেকে ঘন ধুলোর জালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত নতুন ফৌজের আগমন টেরই পেল না। হাতাহাতি সংঘর্ষ চালাতে চালাতে তারা ধীরে ধীরে পশ্চিমে, নীপারের দিকে এগিয়ে চলল।...

অকস্মাৎ নবাগত বাহিনীর মধ্যভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে কান ফাটানো আওয়াজ তুলে বিপুল গতিতে এগিয়ে এলো, সংঘর্ষ যেখানে সবচেয়ে প্রবল সেই স্থান লক্ষ্য করে ছুটল।

ডান পাশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আরও দূরে, পশ্চিমের দিকে চলল সংঘর্ষরত তাতারদের বেড় দেওয়ার উদ্দেশ্যে। আর বাঁ পাশের অংশটি ধীরে ধীরে গতিবেগ বৃদ্ধি করে এগিয়ে চলল সেই টিলার দিকে যেখানে সুবুদাই বাহাদুর অবস্থান করছিল।

বর্ষীয়ান সেনানায়ক মাত্র কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর হাঁক দিল: "আমার পেছন পেছন চলে এসো!" ক্ষিপ্রগামী অশ্বের পিঠে কশাঘাত হেনে সে টিলা থেকে নেমে ছুটে গেল সেই দিকে যেখানে তখুচারের বাহিনীর দাঁড়িয়ে থাকার কথা। অথচ সেখানে কেউ নেই — তখুচার লড়াইয়ের ভিড়ে গিয়ে জুটেছে, অতএব সুবুদাইকে এগিয়ে যেতে হল।

রুশীরা কিন্তু তার পিছু নিল না। তারা অর্ধমণ্ডলাকারে সারি বেঁধে ধুলোর ঝড় তুলে নীপারের দিকে অপসারণরত কিয়েভ সৈন্যদের উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে গেল।

সুবুদাই থামল। পথের ওপর ছড়িয়ে থাকা মোঙ্গল বাহিনীকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে সে চার দিকে বার্তাবহ নোকরদের পাঠাল, হুকুম দিল সব বাহিনী যেন অবিলম্বে কাল্‌কা নদীর তীরে ফিরে আসে।

"এখন অবধি বিজয় আমাদের দিকেই আছে," বর্ষীয়ান সেনানায়ক বলল। "তবে উরুসরা বড় একরোখা, মরদের জাত। স্তেপ থেকে উরুসদের আরও ফৌজ এসে আমাদের দেশে ফেরার পথ বন্ধ করে দিতে পারে।.. সময় থাকতে ঘোড়ার মুখ ফেরানো দরকার!"

তিনশ' অশ্বারোহীর নেতৃত্ব দিয়ে জেবে নোইয়ন ঘোড়ার পর ঘোড়া বদল করে ঊর্ধ্বশ্বাসে নীপার অবধি ছুটল। দোভাষী হিশেবে তার সঙ্গী ভবঘুরে প্লোস্‌কিনিয়া আহত রুশীদের জিজ্ঞেসবাদ করে:

"মস্তিস্লাভ উদাত্‌নি কোথায়?"

কেউ কেউ উত্তরে বলে যে তারা তাকে তার ছাইরঙা শয়তান ঘোড়ার পিঠে ঝড়ের মতো উড়ে যেতে দেখেছে।

নীপারের তীরে এসে জেবে একটা কালো নৌকোকে তীরভূমি ছেড়ে যেতে দেখল। নৌকোর ভেতরে মস্তিস্লাভের রক্তবর্ণের আঙরাখা। নৃপতি পশ্চাদ্ভাগে উপবিষ্ট, তার হাতে ধরা আছে ঘোড়ার লাগাম, আর ঘোড়াটা নৌকোর পেছন পেছন সাঁতরে চলছে। গোধূলির সূর্যকিরণে মস্তিস্লাভের সোনালি শিরস্ত্রাণ ঝলমল করছে। সে কিন্তু আর এই ফেলে আসা 'সর্বনাশা তীরভূমির' দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না।

জেবে সেরা তীর বসিয়ে শক্ত ধনুকের ছিলায় টান দিল। তীর নৌকো অবধি না গিয়ে ছলাং করে জলে আছড়ে পড়ল। জেবে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং দু' হাতে মাথা চেপে ধরে ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হুলদেটে শুকনো ঘাস চিবুতে লাগল।...

সে উঠে দাঁড়িয়ে আরও একবার রক্তবর্ণের আঙরাখাসমেত অপসৃয়মাণ নৌকোটার দিকে তাকাল। রাগটা কার ওপর করবে তা ঠিক করতে না পেরে সে বাঁকা তরবারি তুলে নিয়ে তার কাছে এখন নেহাৎই অপ্রয়োজনীয় শৃঙ্খলিত ভবঘুরে প্লোস্‌কিনিয়াকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলল।

জেবে তার বাদামী ঘোড়ায় উঠে বসল এবং স্তেপের দিকে ঘুরিয়ে দিল; রাস্তার ওপর যেখানে ধুলোর কালো মেঘের আড়ালে শেষ সঙ্ঘর্ষ চলছে এবং হাজার হাজার লোকে আনাগোনা করছে সেখান থেকে দূরে সরে যেতে লাগল।

কাল্‌কায় এবং দীর্ঘ জালোজ্‌নি সড়কের ওপর যে যুদ্ধ হয় তাতে বহু খ্যাতিমান রুশ মহাবীর ও অখ্যাত বীরপুরুষ মৃত্যু বরণ করে। আত্মসমর্পণকারী উরুসদের কোনরকম ক্ষতি করা হবে না এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তাতাররা যখন নিরস্ত্র কিয়েভ সেনাদের নির্বিচারে হত্যা

করতে থাকে তখন তাদের উদ্ধার করতে গিয়ে এই সব বীরের মৃত্যু ঘটে। রুশ জনগণ ভুলবে না এই সংগ্রামে আত্মদানকারী রস্তোভের মহাবীর আলিওশা পপোভিচ ও তার বিশ্বস্ত ঢালবরদার তোরপকে, রিয়াজানের মহাবীর সুবর্ণবন্ধনীধারী দব্রিনিয়াকে, আলিওশার তরুণ পার্শ্বচর যশস্বী একিম ইভানোভিচকে, সুজ্‌দাল, মুরম, রিয়াজান ও প্রোনের অন্য সব বীরদের এবং উত্তরের অন্যান্য বীরপুরুষকে।*

সাহসের সঙ্গে শত্রুব্যূহ ভেদ করে, অস্ত্র পরিত্যাগ না করে রুশীদের এই সেনাদলগুলো নীপার অবধি পৌঁছায়। সেখানে প্রতীক্ষারত নৌকোয় চেপে তারা অপর তীরে গিয়ে ওঠে। আর যারা তাতারদের কথায় বিশ্বাস করে তরবারি ও কুঠার পরিত্যাগ করেছিল তাদের প্রায় কেউই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারল না। অবস্থাটা হল সেইরকম যেমন বলা হয়েছে একটি প্রাচীন গীতে:

নেকড়ের ভোজে মৃতদেহ যাবে,
বায়সের দল ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে...

---

* ১২২৩ সনের শীতকালে সুজ্‌দালের সুবিখ্যাত রমণীয় নগরী রস্তোভে বিভিন্ন নৃপতির রাজপুরুষ ও যোদ্ধৃবর্গের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকলেই বলে যে রুশদেশে 'মহা বিশৃংখলা', নৃপতিদের নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব নেই, অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে রাজন্যবর্গ তাদের সৈন্যসামন্ত ও কৃষকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডে নামিয়ে পলভেৎস, পোল এবং অন্যান্য বিদেশীর হর্ষ উদ্রেক করছেন।

উক্ত সম্মেলনে রাজপুরুষেরা এই চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে তাঁরা সকলেই রুশ নগররাজির সুপ্রাচীনা জননী কিয়েভে গিয়ে একমাত্র কিয়েভের পরাক্রান্ত নরপতির সেবা করবেন। সম্মেলনের পর রাজপুরুষের দল সুজ্‌দাল থেকে দক্ষিণে কিয়েভের দিকে যাত্রা করেন।

কিয়েভ নরপতিসমেত দক্ষিণের সমস্ত নরপতি তাতার খান চেঙ্গিজের বিরুদ্ধে নীল সাগরের (আজভ সাগরের) দিকে অভিযানে বেরিয়েছেন, পথেই একথা শুনতে পেয়ে গোটা মিত্র বাহিনী মূল পথ থেকে ঘুরে গিয়ে দক্ষিণ স্তেপের দিকে চলল এবং অগ্রগামী রুশ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত পথ ধরল।

কালমিউস সড়ক ধরে উত্তরের সেনাদল জালোজ্‌নি সড়কে এসে উপস্থিত হল ঠিক সেই দিন যে দিন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিয়েভ সেনাদের নিরস্ত্র করে তাতাররা তাদের হত্যায় লিপ্ত হয়।

উত্তরের মহাবীররা তাতারদের সঙ্গে সংঘর্ষকালে মৃত্যু বরণ করেন, কিন্তু সড়ক বরাবর বিস্তৃত রুশ সেনাদলের মধ্যে শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং তাতারদের আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে নীপার পর্যন্ত যেতে তাঁরা সমর্থ হন।

রাজন্যবর্গ ছিল অদূরদর্শী, ঈর্ষাপরায়ণ এবং পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন; নিজেদের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক সুগ্রথিত রুশ বাহিনী গড়ে তোলার ইচ্ছে তাদের ছিল না। তাদের এই দোষে জালোজ্‌নি সড়ক মহা বিজয়ের সরণি না হয়ে 'অশ্রুর সরণিতে' পরিণত হল — নির্ভীক রুশ সৈনিকের দল সেখানে নিজেদের শুভ্র অস্থিপঞ্জর ছড়িয়েছে, সিঞ্চন করেছে তাদের বুকের লাল রক্ত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হাড়ের ওপর ভোজের পিঁড়ি

> …নৃপতিবর্গ ধৃত হইলে তাহাদিগকে পিষ্ট করা হইল, তাহাদিগের পৃষ্ঠের উপর কাষ্ঠাসন চাপাইয়া তাতারগণ স্বয়ং তাহাতে উপবেশন করিল এবং ভোজনোৎসবে মাতিল। তাহাতে নৃপতিবর্গ ইহলীলা সংবরণ করিলেন।
>
> (প্রাচীন ঘটনাপঞ্জী)

কাল্‌কা নদীর উপকূলবর্তী এক উঁচু টিলায় রণদেবতা সুলদের উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক প্রার্থনায় যোগ দেওয়ার জন্য সুবুদাই বাহাদুর তার হাজারী সেনাপতি ও শত সিপাহীর সর্দারদের সকলকে ডেকে পাঠাল। এটা ছিল বিকটদর্শন লোমশ শামান বেকির ইচ্ছা। বুড়ো গুনিনটির মাথায় চোঙ্গা টুপি, তার কাঁধে ভালুকের চামড়া, সর্বাঙ্গে ঝুলছে নানারকম ছুরি, পুতুল আর ঝুমঝুমি। কিয়েভের মহারাজ ম্‌স্তিস্লাভ রমানোভিচ এবং তাতারদের কথায় বিশ্বাসপ্রবণ আরও এগারো জন রুশ নরপতিকে হাত-পা বেঁধে মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছে। একটা বিশাল ঢাক বাজাতে বাজাতে শামান তাদের চার ধারে গোল হয়ে নাচতে লাগল।

মাথা নাড়িয়ে, পরিতৃপ্তিভরে চুক্‌চুক্‌ আওয়াজ তুলে তাতাররা বন্দীদের নিরীক্ষণ করে, আক্ষেপ করে এই জন্য যে ধৃতদের মধ্যে রাজা ম্স্তিস্লিয়াব নেই — সুবিখ্যাত 'উরুস জেবেটিকে' তাদের বড়ই দেখার সাধ ছিল।…

শামান বেকি চেঁচিয়ে মন্ত্র আওড়াতে লাগল। কখনও সে তার লোমশ মুখের ওপর খঞ্জনী চেপে ধরে, কখনও দোয়েলের মতো শিস মারে, কখনও পেঁচার মতো আওয়াজ করে, কখনও ভালুকের মতো কখনও বা নেকড়ের

মতো গর্জন করে — এই ভাবে সে মোঙ্গলদের নতুন বিজয়মাল্যদাতা শক্তিমান রণদেবতা সুলদের সঙ্গে 'কথাবার্তা' বলে।

"শুনতে পাচ্ছ, দেবতা সুলদে কেমন রেগে গেছেন?" শামান গর্জন করে উঠল। "সুলদের খিদে এখনও মেটে নি, তিনি নরবলি চান!.."

হাজার হাজার তাতার সৈন্য টিলার চার পাশে প্রান্তরের ওপর জুটেছিল। তারা আগুন জ্বালাল, বাচ্চা ঘোড়া কাটল।

তাতাররা রুশীদের শকটগুলো ভেঙ্গে কাঠের দণ্ড ও তক্তা নিয়ে এসে হাত-পা বাঁধা নৃপতিদের ওপর স্তূপাকার করল। তিনশ' তাতার সেনাপতি সেই সব তক্তায় চেপে বসল। ঘোলের বাটি তুলে তারা মোঙ্গলদের রক্ষাকর্তা ভয়ঙ্কর রণদেবতা সুলদের স্তুতিগানে এবং 'জগৎ আলোড়নকারী' অপরাজেয় বীর লোহিত শ্মশ্রুধারী চেঙ্গিজ খানের প্রশস্তিতে রত হল। এই সম্ভ্রান্ত রুশ নরপতিদের মুক্তিপণ হিশেবে তাতাররা প্রচুর অর্থ পেতে পারত, কিন্তু তা না করে 'স্বর্গীয় দূত' চেঙ্গিজ খানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী এই উদ্ধত বন্দীদের তারা দেবতা সুলদের উদ্দেশে উৎসর্গ করল। তক্তার নীচ থেকে পিষ্ট নরপতিদের আর্তনাদ ও অভিসম্পাত ভেসে আসতে বাহাদুররা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। আর্তনাদ ও চিৎকার ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো এবং মোঙ্গল সৈন্যদের উল্লসিত গানের সুরে তা চাপা পড়ে গেল। তারা গান ধরল:

মোঙ্গল স্তেপভূমি,
    স্মরণীয় ভূমি তুমি,
যেথা নীল কেরুলেন,
    স্বর্ণাভ ওন্‌ওন্‌।
মোঙ্গল সেনাদল
    করে দিল উৎখাত
তিরিশের তিন গুণ
    প্রবল স্পর্ধিত জাত।

মৃত্যুর বিভীষিকা,
    বজ্র, বহ্নিশিখা
চেঙ্গিজ খান, আর
    সন্তান যত তার।
দুই কুড়ি মরুভূমি

পড়ে থাকে পশ্চাৎ —
শূন্যে শূন্যে একাকার
রক্তিম বালি যার।

ভোজের সময় সেনানায়ক তখুচার নোইয়ন উঠে দাঁড়িয়ে শিকারের সময় জঙ্গল ঝাড়াইয়ের জন্য যেরকম সঙ্কেত করে তীরন্দাজদের ডাকা হয় সেই ভঙ্গিতে শিস দিল। পরিচিত আহ্বান শুনে সকলে চুপ করে গেল। তখুচার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলতে লাগল:

"তাতার খান-ই-খানান চেঙ্গিজ খান — সকলের চেয়ে জ্ঞানী! তিনি একশ' দিন আগে থেকে, হাজার বছর আগে থেকে সব কিছু দেখতে পান।... তিনি সাহসী এক দল সৈন্য দিয়ে আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন অপরাজেয় দুই ব্যাঘ্র জেবে নোইয়ন ও সুবুদাই বাহাদুরের খোঁজে। মোঙ্গল খান আমাকে বলেছেন যে তোমাদের কাছে তাঁর সেরা উপহার হল লড়াইয়ের দিনে সামরিক সাহায্য।..."

"ঠিক কথা, ঠিক কথা!" মোঙ্গলরা চেঁচিয়ে উঠল।

"কোথাও না থেমে নানা দেশ পার হয়ে আমরা এসেছি। সর্বত্রই আমরা দেখেছি মোঙ্গলদের অক্ষয় তরবারির ফলা। আমরা জিজ্ঞেস করেছি: 'বিখ্যাত বাহাদুরেরা জেবে ও সুবুদাই কোথায়?' ভীত লোকজন হাঁটু নুইয়ে পড়ে পশ্চিমের দিকে হাত নেড়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আমরা যুদ্ধের আগে আগে এখানে এসে পৌঁছেছি, আমার দশ হাজার ঘোড়সওয়ারও ওই লড়াইয়ে শরিক হয়েছে!.. তোমাদের সঙ্গে মিলে আমরা দেখতে দেখতে লম্বা দাড়িওয়ালা উরুসদের ধ্বংস করে ফেলেছি!..''

"তখুচারের জয় হোক! আপনি ঠিক সময়ে এসেছেন!"

তখুচার বলে চলল:

"মহিপাল চেঙ্গিজ খান তোমাদের কথা ভেবে আমার মারফত তাঁর বার্তা পাঠিয়েছেন।... এক বিশেষ দূত তাঁর এই পবিত্র খত্ বয়ে নিয়ে এসেছে। আমার দশ হাজার ঘোড়সওয়ার তাকে মহামূল্যবান হীরার মতো আগলে অক্ষত অবস্থায় এখানে নিয়ে এসেছে। এই বার দেখ তাকে!"

বাঁকা ঠ্যাংওয়ালা এক বুড়ো মোঙ্গল সুবুদাই বাহাদুরের কাছে এগিয়ে এলো। তার সর্বাঙ্গে ঘুঙুর ঝোলানো, টুপিতে বাজপাখির পালক গোঁজা। লোকটা তার পোশাকের ভেতর থেকে চামড়ার একটা চোঙা বার করল। তার ভেতর ছাপ মারা কাগজ পাক দিয়ে সযত্নে রাখা ছিল। বাঁকা আঙুলে

সুবুদাই মোমের মোহর ভাঙল। মুসলমানী কায়দায় পাগড়ি বাঁধা শুভ্রশমশ্রুধারী মির্জা পাক খুলে মনে মনে খত্ পড়ে নিয়ে সুবুদাইয়ের কানে ফিস্ ফিস্ করে কী যেন বলল। সুবুদাই উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল:

"খান-ই-খানাই-এর হুকুম। শ্রদ্ধার সঙ্গে শোন!"

সেনাপতিরা সকলে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য তাতারও চটপট উঠে পড়ল। সেনাপতিরা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল। মাথা তুলে তারা চেঁচিয়ে বলল:

"খান-ই-খানান-এর হুকুম! আমরা মেনে নিচ্ছি!"

সুবুদাই বাহাদুর বলে চলল:

"একেশ্বর ও অপরাজেয় মোঙ্গল খান এই কথাগুলো লিখেছেন: 'পত্রপাঠ ঘোড়ার মুখ ফিরাও। দুনিয়া জয়ের ব্যাপারে কুরুলতাইয়ে পরামর্শ আছে।

"স্বর্গে বিধাতা, খান — মর্তলোকে বিধাতার শক্তি। গ্রহ-তারার অধিপতি সকল মানুষের প্রভুর মোহর'।"

মোঙ্গলরা আভূমি নত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সুবুদাই তাদের পিঠের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে হাত তুলল।

"এখন আমি বলি!.. আমার কথা শোন!"

সকলে পিঠ সোজা করল, নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রুদ্ধ নিশ্বাসে 'ঠ্যাঙে কামড় খাওয়া তুষার চিতার' দিকে তাকাল।

"আজও আমরা খানিকটা আমোদ-প্রমোদ করব, আর কাল সূর্যোদয়ের পর আমরা আমাদের অধিপতির সোনালি ছাউনির দিকে মুখ ফেরাব। যে গড়িমসি করবে তার আর রক্ষা নেই!"

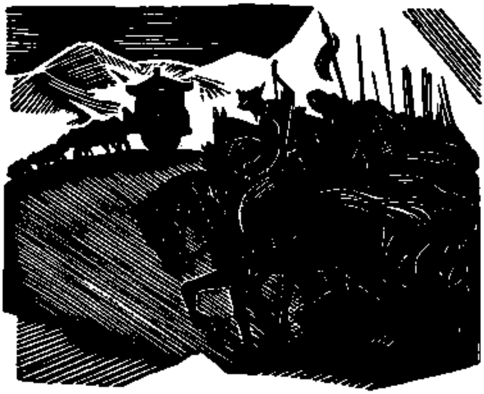
সৈন্যরা সকলে আনন্দে বন্য গর্জন করে উঠল এবং আবার যে যার আসন নিয়ে সোরগোলে ও গানে ভোজের উৎসব মাতিয়ে তুলল।

পর দিন সকালে সূর্যের উদ্দেশে প্রার্থনা সেরে, ঘোল নিবেদন করার পর মোঙ্গলরা ঘোড়ায় চেপে বসল। তারা আগে আগে গোরু-ভেড়ার পাল এবং বিধ্বস্ত ও অবসন্ন বন্দীদের দল তাড়িয়ে নিয়ে যায়। লুটের মাল এবং গুরুতর আহত মোঙ্গলদের বোঝাই করা ষাঁড়ে টানা গাড়িগুলো চলতে চলতে সারা স্তেপ জুড়ে অসহ্য ক্যাঁচ্ক্যাঁচ্ আওয়াজ তোলে, ধূলিমেঘের

আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। মোঙ্গল বাহিনীর অগ্রভাগে চলে সুবুদাই বাহাদুর। জিনের সঙ্গে বাঁধা একটা থলিতে সে বয়ে নিয়ে যায় কিয়েভ নরপতি ম্স্তিস্লাভ রমানোভিচের ছিন্ন শির এবং সেই সঙ্গে তার সোনালি রঙ করা ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ আর সোনার ক্রুশ ঝোলানো কণ্ঠহার। নিজের এই মহামূল্যবান থলিটি জগৎ আলোড়নকারী অপরাজেয় চেঙ্গিজ খানের স্বর্ণসিংহাসনের সামনে নিবেদন করবে এই চিন্তায় সুবুদাইয়ের ক্ষতবিক্ষত কাদামাখা মুখ হাসির ধরনে বিকৃতি ধারণ করল।

বাহিনীর পশ্চাতে একশ' গুপ্তচরের দল নিয়ে বিষণ্ণ বদনে চলেছে জেবে নোইয়ন। সে কোন শিকার বহন করে আনতে পারে নি। বাতাসের হুহু ধ্বনির মতো একটানা বিলাপের সুরে সে নীলরঙা কেরুলেন ও সোনালি ওনোন আর অবারিত মোঙ্গল স্তেপভূমি সম্পর্কে গান ভাঁজতে ভাঁজতে চলছিল।...

মোঙ্গলরা উত্তর-পূর্ব দিকে, ইতিল নদীর অভিমুখে চলল, তার পর যাত্রা করল উরালের গিরিশাখা ভেদ করে খরেজমের সমভূমির দিকে। কিপচাক স্তেপভূমি মোঙ্গল ও তাতারদের ভয়ংকর বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হল। যেমন অতর্কিতে ও রহস্যজনকভাবে তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল তেমনিভাবেই তারা উধাও হল। তারা চলে যাওয়ার পর কিছু কিছু কিপচাক গোষ্ঠী নিজেদের বিধ্বস্ত আস্তানায় ফিরে এলো, অন্যেরা আস্তানা সরিয়ে নিয়ে গেল উগ্রীয় স্তেপে এবং দানিউবের নিম্ন অববাহিকার দিকে। তখন কিন্তু কিপচাক সর্দারদের এবং রুশ নরপতিদেরও ধারণা হল যে তাতাররা আর কখনই ফিরে আসবে না। এই ভেবে তারা নতুন করে যুদ্ধের জন্য কোন প্রস্তুতি না নিয়ে আগেকার মতোই ঝগড়া-বিবাদ করে দিন কাটাতে লাগল। তাতাররা যে পশ্চিমে নতুন করে আরও ভয়ংকর আক্রমণের মতলব আঁটছে এমন সন্দেহ তাদের হয় নি।...



চতুর্থ অধ্যায়

চেঙ্গিজ খানের অবসান

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহ অভিমুখে

সুলতান জালাল উদ-দিনের দুঃসাহসী পলায়নের পর চেঙ্গিজ খান অভিজ্ঞ সেনানায়ক বালা নোইয়ন ও দুরবাই বাহাদুরকে সুলতানের খোঁজে হিন্দুস্তানে প্রেরণ করল। তারা নানা পথে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়েও তার কোন চিহ্ন পেল না। পথে হত্যার তান্ডব চালিয়ে মোঙ্গলরা জালাল উদ-দিনের সহযোগী আগ্রাক এবং আজম মালিকের খানদের অধীনস্থ নগরগুলো পুড়িয়ে দিল।

মোঙ্গলরা বহু ভেলা তৈরি করে সেগুলোকে অস্ত্রনিক্ষেপ যন্ত্র এবং ক্ষেপণের উপযোগী গোলাকার পাথরে বোঝাই করল। অতঃপর তারা ভেলায় চেপে সিন্ধুনদের উজান বেয়ে মুলতান শহরে উপস্থিত হল। সেখানে তারা পাথর ছোঁড়া যন্ত্রের সাহায্যে এই সমৃদ্ধ শহরের ওপর বর্ষণ শুরু করল। দুর্ভেদ্য প্রাকার, নতুন নতুন হিন্দুস্তানী সেনাবাহিনীর অবিরাম আগমন

এবং অসহ্য উত্তাপের ফলে মেষচর্মাবৃত মোঙ্গলরা অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে পাহাড়-পর্বতের মধ্যে চেঙ্গিজ খানের কাছে ফিরে যেতে বাধ্য হল।

মোঙ্গল খান-ই-খানান উঁচু পর্বতশ্রেণীর আড়ালে, মেঘে ঘেরা পল্লীতে আশ্রয় নিয়ে উত্তাপের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাল। এখানে যেন সে যুদ্ধবিগ্রহের কথা বিস্মৃত হল। সান্ধ্য ভোজে চেঙ্গিজ খান কথকদের মুখ থেকে কাহিনী এবং গায়কদের কণ্ঠনিঃসৃত পারসিক ও চৈনিক গান শুনল। চীনের রাজধানী থেকে দু' বছরের পথ অতিক্রম করে সদ্য যে সব নর্তকীর আগমন ঘটেছে তারা সোনালি রেশমের জমকালো পোশাক অঙ্গে ধারণ করে গাঢ় বেগুনী রঙের আফগানী গালিচার ওপর নৃত্য পরিবেশন করল। বিশাল ডানা মেলা উড়ন্ত পাখিদের অনুকরণে পোশাকের দীর্ঘ আস্তিন আন্দোলন করে, কখনও বা সাপের মতো কুণ্ডলী প্যাকিয়ে তারা নৃত্য কৌশল দেখাল, দেহহিল্লোল তুলে সমবেত হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল।

চেঙ্গিজ খানের কনিষ্ঠ পুত্র কুলকান এবং শিশুর জননী কুলান খাতুন এখানে অসুস্থ হয়ে পড়ল। দু'জনেই রেশমী গদির ওপর পশুলোমের চাদর গায়ে ঢেকে শুয়ে থাকে, কখনও গায়ে কাঁপুনি ধরে, কখনও বা জ্বরে গা পুড়ে যায়। চেঙ্গিজ খান প্রতিদিন তাদের দেখতে আসে, মুখে গুড়ের ডেলা গুঁজে দেয়, পাশে বসে জিজ্ঞেস করে আজ ব্যথাটা কোথায়।

কুলান খাতুন কাঁদতে কাঁদতে বলে যে তার সর্বাঙ্গ ব্যথায় জরজর করছে।

"এ হল এখানকার পাহাড়ের ভূত-প্রেতের কাণ্ড, এই অভিশপ্ত জায়গায় যে থাকবে ওনারা তাকেই কষ্ট দেবেন," সে বলল। "খাতের তলা থেকে কেমন কুয়াশা ওঠে দেখেছ? তোমার ফৌজের হাতে যে সব কচি বাচ্চার প্রাণ গেছে এ হল তাদেরই আত্মা। আমি আর আমার ছোট্ট কুলকান এখানেই মারা যাব। একমাত্র নীল কেরুলেনের জলই আমাদের সারিয়ে তুলতে পারে। নিজের দেশ মোঙ্গল স্তেপে আমাদের ফিরে যেতে দাও।"

চেঙ্গিজ খান রেগে ওঠে:

"আমাকে ছাড়া একা তুমি কোথাও যেতে পারবে না। আর আমাকে আগে দুনিয়ার বাকি অর্ধেকটা জয় করতে হবে।"

কুলান খাতুনের কান্নার বেগ আরও বেড়ে যায়। চেঙ্গিজ খান তার প্রধান অমাত্য চীনদেশীয় ইয়েলিউ চু-ত্সাইকে ডেকে পাঠায়। সে সঙ্গে

সঙ্গে হাতে এক বিশাল পুথি নিয়ে হাজির। তাকে দেখা মাত্রই কুলান খাতুন লাফিয়ে উঠে বই ছিনিয়ে নিয়ে গালিচার ওপর ছুড়ে ফেলে দিল, নিজে সেটার ওপর শুয়ে পড়ল।

"বেগ কী বলে তা এখন শোনা যাক!" চেঙ্গিজ খান বলল।

"আমার কী দশা হবে তা জানার গরজ আমার নেই," কুলান বলল। "আমি চাই আমার ইচ্ছে পূর্ণ হোক। আমি চাই কেরুলেনের ধারে ফিরে যেতে আর আমাদের ফৌজের সকলেরও তা-ই ইচ্ছে।..."

চেঙ্গিজ খানের ভুরু ওঠা-নামা করল, হিসহিস আওয়াজ তুলে শেষকালে সে বলল:

"আজ অবধি এমন কোন শত্রুর দেখা পাই নি যাকে আমি জয় করি নি। এখন আমি মৃত্যুকে জয় করতে চাই। কুলান খাতুন, তুমি হলে নির্বোধ, অবাধ্য। তুমি যদি আমার পাশে পাশে থাক তবে মৃত্যু তোমাকে স্পর্শ করবে না। আর যদি আমাকে ছেড়ে যাও তবে খাবারের সঙ্গে মেশানো গোপন বিষে বা অন্ধকার থেকে ছোঁড়া কোন তীরে তোমার প্রাণ যাবে।..." অতঃপর পরম বিজ্ঞ অমাত্য ইয়েলিউ চু-ত্‌সাইয়ের দিকে ফিরে চেঙ্গিজ খান জিজ্ঞেস করল: "তুমি না কথা দিয়েছিলে যে এমন সব শামান, ওঝা, বৈদ্য আর ফকির যোগাড় করে আনবে যারা অমর করে দেওয়ার ওষুধ বানাতে পারে? এখনও তাদের পাত্তা নেই কেন?"

"তাদের সন্ধানে বিশ্বাসী লোকজন লাগানো হয়েছে। তাদের সকলের শিগ্‌গিরই এখানে আসার কথা। তবে আপনি ফৌজ নিয়ে এত তাড়াতাড়ি আর এমন দূরে দূরে চলে যান যে এই সব ওয়াকিবহাল লোক আপনার নাগালই ধরতে পারে না।..."

চেঙ্গিজ খান দেখতে পায় যে কুলান খাতুনের অসুস্থতা আরও তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে, তার সেই তরতাজা সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। শিশুপুত্র কুলকানও আগের মতোই মার পাশে পড়ে থাকে, ক্রমে আরও রুগ্ন ও বিবর্ণ হয়ে পড়ে। তখন মোঙ্গল খান উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, কোন কিছুতেই সান্ত্বনা পায় না। সে প্রায়ই মৃত্যুর কথা বলে এবং বৈদ্যদের কাছে আয়ুবৃদ্ধির দাওয়াই জিজ্ঞেস করে। অনেকেই নানা রকম অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পানীয়ের বিধান দেয়। চেঙ্গিজ খান ঐ সব বৈদ্যকে যার যার নিজের নিজের দাওয়াই পান করার হুকুম দেয়, তারপর তাদের শিরচ্ছেদ করে লক্ষ্য করতে থাকে তারা জীবিত থাকে কিনা।

বাল্‌তান দুর্গের লড়াইয়ে শত্রুশিবির থেকে নিক্ষেপ যন্ত্র নিক্ষিপ্ত বর্শার আকারের এক বিশাল তীর জাগাতাইয়ের পুত্র, মোঙ্গল খানের বড় আদরের পৌত্র মুতুগানের বুকে এসে বেঁধে। কথা ছিল যে মুতুগানেই হবে সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার খান-ই-খানান, কিন্তু আকস্মিক তীরের আঘাতে সে জীবনলীলা সংবরণ করে। এই ঘটনার পর থেকেই চেঙ্গিজ খানকে বিশেষ করে বিষণ্ন দেখা যেতে থাকে।

চেঙ্গিজ খানের তখন এই প্রত্যয় হল যে মৃত্যু আঘাত হানে, অন্ধ উটের মতো পদাঘাত করে: যার ওপর আঘাত এসে পড়ে সে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে, যার পাশ কাটিয়ে চলে যায় সে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবন ধারণ করে।

পৌত্রের মৃত্যুতে চেঙ্গিজ খান এত ক্রুদ্ধ হয় যে সে অবিলম্বে বাল্‌তান দখল করার হুকুম দেয়। সেনাবাহিনী প্রাকার ভেঙে নগরে প্রবেশ করে, তরবারির আঘাত থেকে কোন কিছু রেহাই পায় না। চেঙ্গিজ খানের আদেশ হল সৈন্যরা যেন কাউকে বন্দী না করে। সমগ্র এলাকাটিকে সে জনপ্রাণীশূন্য মরুভূমিতে পরিণত করে। জায়গাটির নাম দেওয়া হয় 'বিষাদের টিলা'। এর পর থেকে আর কেউই সেখানে বসতি স্থাপন করে না, জমি পতিত অবস্থায় থেকে যায়।

খাড়া পাড়ের ওপর পাহাড়ের চূড়ায় চেঙ্গিজ খানের হলুদরঙা ছাউনি পড়েছে। চেঙ্গিজ খান সারা দিন ছাউনির পাশে বসে থাকে। পদতলে অন্ধকার, অতল গিরিখাত। তার চোখে পড়ে কুয়াশাচ্ছন্ন দূর প্রান্তে বিলীয়মান বিষণ্ন গিরিশ্রেণী ও তুষারাচ্ছন্ন পর্বতশীর্ষ। কখনও কখনও সে অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকদের ডেকে পাঠায়, হিন্দুস্তান ও তিব্বতের ভেতর দিয়ে মোঙ্গল স্তেপে যাওয়ার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ জানতে চায়।

শিবিরে মূল্যবান লুণ্ঠনদ্রব্যে ভারাক্রান্ত সৈন্যরা কেবল তাদের জন্মস্থানে ফিরে যাওয়ার কথা বলে। কিন্তু ভয়ঙ্কর খানের কাছে এ কথা প্রকাশ করার মতো সাহস কারও হল না। তার প্রকৃত অভিপ্রায় কারও জানা ছিল না. কেউই আগে থাকতে বলতে পারে না আগামী কাল তার কী হুকুম হবে — সেনাবাহিনীর মুখ ফিরতি পথে ঘোরাবে, না কি আবার অভিযানে যাত্রা করবে এবং অগ্নিকাণ্ডের ধোঁয়ার আড়ালে লোকজনের ওপর ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করে পথে পথে আরও বহু বছর কেটে যাবে।

আফগানিস্তানের গিরিসঙ্কটে ঘোড়ার খাদ্যের বেশ অভাব। অথচ

সেখানে এসে যাত্রায় দীর্ঘ ছেদ পড়ল। এতে বাহিনীর মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল। আর দেরি না করে এখন যে ঘরে ফেরা উচিত মোঙ্গল খানকে এ কথাটা ভালোমতো বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কুলান খাতুন প্রধান অমাত্য চীনদেশীয় ইয়েলিউ চু-ত্‌সাইয়ের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে এক গল্প ফাঁদল। ইয়েলিউ চু-ত্‌সাই দুই সাহসী নোকরকে শিখিয়ে দিল তারা যেন গল্পটা চেঙ্গিজ খানকে শুনিয়ে আসে। ঐ দুই মোঙ্গল সদর দপ্তরে হাজির হয়ে চেঙ্গিজ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা প্রকাশ করল, তারা বলল যে অতি প্রয়োজনীয় অদ্ভুত একটা ব্যাপার চেঙ্গিজ খানকে জানানোর আছে।

ইয়েলিউ চু-ত্‌সাই তাদের চেঙ্গিজ খানের কাছে নিয়ে যেতে তারা বলল:

"পাহাড়ে পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমরা এক অদ্ভুত জন্তুর দেখা পাই। জন্তুটা হরিণের মতো দেখতে, গায়ের রঙ সবুজ, লেজ ঘোড়ার মতো, তার মাথায় একটা শিঙ। সে মোঙ্গল ভাষায় চিৎকার করে আমাদের বলল: 'তোমাদের খানের উচিত সময় থাকতে দেশে ফিরে যাওয়া।' "

চেঙ্গিজ খান গল্পটি চুপচাপ শুনল, কিন্তু সে এক পাশের ভুরু তুলে তার সামনে নতজানু বাহাদুরদের ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

"ঐ আজব জন্তু যেদিন তোমরা দেখ সেদিন কতটা ঘোলের সরবত পেটে পড়েছিল?"

বাহাদুররা দিব্যি করে বলল যে পান করতে পারলে ত তারা খুশিই হত, কিন্তু এই ন্যাড়া পাহাড়ী জায়গায় ঘোড়ার দুধ ত দূরের কথা ছাগলের দুধই পাওয়া ভার। তারা যে সত্যি কথা বলছে তা বোঝানোর উদ্দেশ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলি তুলল।

চেঙ্গিজ খান ইয়েলিউ চু-ত্‌সাইয়ের দিকে ফিরে বলল:

"জ্ঞানে বোঝাই যে সব পুঁথিতে পৃথিবী, সাগর আর আকাশের রহস্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে তা ত তোমার জানা আছে। এমন কোন জন্তুর কথা কি তুমি পড়েছ?"

ইয়েলিউ চু-ত্‌সাই দুনিয়ার নানা জাতের জন্তু, মাছ ও পাখির নক্সা ও ছবি আঁকা এক বিশাল পুঁথি এনে হাজির করল। পুঁথির পৃষ্ঠা উল্‌টিয়ে সে বলল:

"এই দুর্লভ জন্তুটির নাম হল 'মহাজ্ঞানী গো দুয়ান', সে সব জাতের লোকের ভাষা জানে। আমাদের এই দুই বাহাদুরের কাছে সে যা

বলেছিল তার অর্থ এই যে দুনিয়ায় খুব বেশি রকম রক্তপাত ঘটছে। আজ চার বছর হল আপনার বিশাল সেনাদল পশ্চিমের দেশগুলো জয় করছে। এই কারণে অবিরাম হত্যাকাণ্ডে বিতৃষ্ণ হয়ে অমরলোক তার নিজের মনোভাব জানানোর উদ্দেশ্যে 'গো দুয়ান'কে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। অমরলোকের আদেশ মেনে নিয়ে এই সব দেশের লোকজনকে ক্ষমা করুন। এতে আপনার পরম সুখ হবে, আর তা না হলে অমরলোকের ক্রোধ আপনার ওপর নেমে আসবে, আপনার শিরে বজ্রাঘাত হবে। চীনের মহাজ্ঞানীদের এই প্রাচীন পুথি তা-ই বলছে।"

পুরোহিতের মন্ত্র পড়ার ভঙ্গিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এবং ভারিক্কি চালে ইয়েলিউ চু-ত্সাই এই কথাগুলো উচ্চারণ করল। এদিকে চেঙ্গিজ খান এক চোখ কুঁচকে তার অমাত্যের দিকে তাকাল। তারপর সে বাহাদুরদের ওপর চোখ বুলাল। তারা বাধ্যের মতো নতজানু হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চেঙ্গিজ খান প্রথমে একজনকে তার কাছে এগিয়ে আসতে বলল, তারপর দ্বিতীয় জনকেও ডাকল। সে ঝুঁকে পড়ে তাদের কানে কানে কী যেন বলল, প্রত্যেকে কানে কানেই তার জবাব দিল।

মোঙ্গল খান তখন বেশ খুশি হয়ে বাহাদুরদের চলে যেতে বলল, হুকুম দিল ওদের যেন প্রাণ ভরে ঘোলের সরবত খেতে দেওয়া হয়।

"এই বাহাদুরেরা বেশ চালাক-চতুর," খান তার অমাত্যকে বলল, "ওদের তারিফ করতে হয়। আমি আলাদা আলাদা ডেকে ওদের জিজ্ঞেস করলাম গো দুয়ান নামে এই জন্তুটা কোন কদমে চলছিল। তাতে একজন বলল টগবগিয়ে ছুটছিল, অন্য জন বলল — মাঝারি কদমে। বেহুদ্দ মাতাল হয়েও কোন মোঙ্গল ছুটন্ত জানোয়ার দেখে ভুল করতে পারে না। তবে আজ আমি বুঝতে পারলাম যে সৈন্যরা যুদ্ধ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, দেশের স্তেপের জন্য তাদের প্রাণ ক্রমেই আকুলি-বিকুলি করছে। তাই ঘোষণা করছি অমরলোক তার দূত এই অলৌকিক জানোয়ার গো দুয়ানকে আমার কাছে পাঠিয়ে তার মাধ্যমে যে ইচ্ছা জানিয়েছে তা মেনে নিয়ে আমি ফিরতি পথ ধরছি, ফৌজ নিয়ে আমার সাবেক উলুসে* ফিরে যাচ্ছি।"

---

* সাবেক উলুস — চেঙ্গিজ খানের সাম্রাজ্যের প্রধান বিভাগ। সাম্রাজ্যের এই অংশে একমাত্র খাঁটি মোঙ্গলদের বসতি ছিল।

পর দিন চেঙ্গিজ খানের সিদ্ধান্ত জানতে পেরে মোঙ্গল সৈন্যরা সকলেই খুশি হল, তারা গান ধরল, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

গোড়ায় চেঙ্গিজ খানের মতলব ছিল হিন্দুস্তান ও তিব্বতের ভেতর দিয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যে সে দিল্লীতে হিন্দুস্তানের বাদশাহ ইলতুত্‌মিসের কাছে দূত পাঠায়। কিন্তু গিরিপথ তখনও বরফে বোঝাই হয়ে ছিল, বাদশাহও উত্তর দিতে গড়িমসি করতে লাগল এবং এই ফাঁকে ফৌজ জোরদার করতে লেগে গেল। বাহিনীর ভার দেওয়া হল জালাল উদ-দিনের হাতে।

ইতিমধ্যে মঙ্গোলিয়া থেকে সদা অসন্তুষ্ট তানগুতদের নতুন করে বিদ্রোহের সংবাদ এলো। চেঙ্গিজ খানের অমাত্য ইয়েলিউ চু-ত্‌সাই গ্রহের অবস্থান হিসাব করে এবং শামানেরা গণনা করে চেঙ্গিজ খানকে হিন্দুস্তানের ভেতর দিয়ে না যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

চেঙ্গিজ খান তখন যে দীর্ঘ পথ ধরে এসেছিল সেই পথেই প্রত্যাবর্তনে মনস্থ করল। তার হুকুমে স্থানীয় অধিবাসীরা তুষারাচ্ছন্ন গিরিখাত সাফ করার কাজে লেগে গেল এবং বসন্তের শুরুতে মোঙ্গল বাহিনী পথ ধরল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জনৈক ভিক্ষুর সঙ্গে চেঙ্গিজ খানের পত্রালাপ

কালো ইরতিশের গোড়ার দিকে বিরাম নেওয়ার সময়ই চেঙ্গিজ খান নিজের স্বাস্থ্য এবং আয়ু সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে অভিজ্ঞ ভিষক্‌দের সন্ধান করতে থাকে। তাকে বলা হয় চান্‌ চুন্‌ নামে এক পরম জ্ঞানী নাকি ধরণী ও আকাশের সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, অমরত্ব লাভের উপায় পর্যন্ত তাঁর জানা আছে। চেঙ্গিজ খানের প্রধান অমাত্য ও জ্যোতিষী ইয়েলিউ চু-ত্‌সাই তার সম্পর্কে বলল:

"চান্‌ চুন্‌ লোকটি অশেষ গুণী। এই মহাস্থবির বহুকাল হলো বলাকাকে বাহন করে মেঘলোকে বিচরণে পারঙ্গম, তিনি নিজেকে অন্যান্য জীবে রূপান্তরের ক্ষমতা রাখেন। পার্থিব যাবতীয় সম্পদ উপেক্ষা করে আর সব শ্রমণের সঙ্গে তিনি মানুষের দীর্ঘজীবন ও অমরত্ব লাভের পরশপাথর 'তান্‌'-এর সন্ধান করছেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি কখনও

শবের মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকেন, কখনও বা সারা দিন গাছের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, কখনও তাঁর কণ্ঠে ফেটে পড়ে বজ্র নির্ঘোষ, কখনও বা তিনি বাতাসের মতো স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে বিচরণ করেন। তিনি অনেক কিছু দেখেছেন, শুনেছেন, এমন কোন পুঁথি নেই যা তিনি পড়েন নি।"

এই অসাধারণ মহাস্থবিরের সন্ধানে চেঙ্গিজ খান অবিলম্বে তার অভিজ্ঞ চৈনিক পারিষদ লিউ চুন লুকে পাঠানোর হুকুম দিল। সে তাকে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্র লাঞ্ছিত সোনার মোহর দিল। মোহরের ওপর খোদাই করে লেখা আছে: 'আমাদিগের ভ্রমণকালে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে এই ব্যক্তিও তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী।'

মহামূল্যবান সামগ্রীর মতো লিউ চুন লুর হাতে তুলে দেওয়া হল ভিক্ষু চান্ চুনের উদ্দেশে চেঙ্গিজ খানের ব্যক্তিগত পত্র। নিরক্ষর মোঙ্গল খান-ই-খানানের জবানীতে পত্রটি রচনা করে তার অমাত্য ইয়েলিউ চু-ত্সাই। পত্রে বলা হয়েছে:

'অতিরিক্ত বিলাসব্যসন ও অহঙ্কারের জন্য অমরলোক চীনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। উত্তর স্তেপভূমির অধিবাসী আমার কিন্তু লাম্পট্যের কোন প্রবণতা নাই। আমি অনাড়ম্বর ও শুদ্ধ জীবনচর্যার পক্ষপাতী, বিলাসব্যসন পরিহার করিয়া চলি, সংযম অনুসরণ করি। আমার গাত্রাবরণ একটি মাত্র মোটা বস্ত্র, খাদ্য বৈচিত্র্যহীন। আমার বস্ত্র সহিসের গাত্রাবরণের ন্যায় ছিন্নভিন্ন, আমি গাভীর মতো সাধারণ খাদ্য ভক্ষণ করি।

'সাত বৎসরে আমি বিশাল বিশাল কর্ম সম্পাদন করিয়াছি এবং দুনিয়ার সকল দেশে আমার রাজত্ব কায়েম করিয়াছি। সুপ্রাচীন কালে আমাদিগের পূর্বপুরুষ যাযাবর গোষ্ঠী হুনেরা* যখন বিশ্ব জয় করে তাহার পর হইতে এই রূপ রাজত্ব আর দেখা যায় নাই।

'আমার প্রতিপত্তি বিপুল, কর্তব্যও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমার আশঙ্কা যে আমার শাসনে কোন একটি বস্তুর অভাব রহিয়া গিয়াছে। তরী নির্মাণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দাঁড়ের আয়োজন করিয়া থাকে যাহাতে তাহার সাহায্যে নদী পারাপার করা যায়। অনুরূপভাবে বিশ্বভুবন

---

* হুন — মধ্য এশিয়ায় বসবাসকারী রণলিপ্সু এই জাতি অতঃপর পশ্চিমের দিকে যাত্রা করে এবং পঞ্চম শতাব্দীতে আত্তিলার নেতৃত্বে ইউরোপ আক্রমণ করে।

অধিকারে আনয়নপূর্বক তাহাকে শাসন করিবার জন্য জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানাইয়া সহযোগী নির্বাচন করা আবশ্যক।

'হে গুরু, আমি অবগত রহিয়াছি যে আপনি সত্যসন্ধ এবং সর্বদাই উচ্চ নীতির অনুসরণকারী। হে জ্ঞানসাগর, হে প্রাজ্ঞ, আপনি গভীরভাবে নীতিসকল অধ্যয়ন করিয়াছেন। বহু কাল যাবৎ আপনি জগতের অগোচরে শৈলমালার গহ্বরে লুক্কায়িত রহিয়াছেন।

'আমার কী করা কর্তব্য? বিস্তীর্ণ পর্বত ও উপত্যকা আমাদিগের মধ্যে ব্যবধান রচনা করায় আমি আপনার সহিত সাক্ষাতে অপারগ। এই কারণে আমার অন্তরঙ্গ পারিষদ লিউ চুন লুকে আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম, তাহার সহিত দ্রুতগামী অশ্বারোহী ও ডাকগাড়িও দিলাম। হে গুরু, আপনার প্রতি আমার নিবেদন এই যে সহস্র লির* জন্য ভীত না হইয়া আমার নিকট আগমন করুন।

'বালুকাপূর্ণ স্তেপের আয়তন এবং দূরত্বের কথা চিন্তা না করিয়া আমার প্রজাবর্গের প্রতি করুণা করুন। অথবা আমার প্রতি করুণা পরবশ হইয়া আয়ুবৃদ্ধির উপায় জ্ঞাপন করুন।

'আশা করি পরম সত্য 'তাও'এর মর্ম অবগত আপনি কল্যাণকর যাবতীয় বিষয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হইবেন এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। আমাদিগের প্রকৃত আজ্ঞা ইহাতে আপনার নিকট নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইয়াছে।'

এই পত্র হাতে নিয়ে লিউ চুন লু স্তেপ ও পাহাড়-পর্বত ভেদ করে দূর পথে যাত্রা করল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মোঙ্গল খানের ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে সে চৌকিতে চৌকিতে** দ্রুত অশ্ব পরিবর্তন করে পথ চলতে লাগল। অবশেষে চীনে উপস্থিত হয়ে উঁচু উঁচু পাহাড়পর্বত খুঁজতে খুঁজতে এক নির্জন গুম্ফায় জনৈক প্রবৃদ্ধ জ্ঞানীর সাক্ষাৎ পেল। এই ব্যক্তিই বিখ্যাত চান্ চুন্। তাঁর পরিধানের শতচ্ছিন্ন বসন লজ্জা নিবারণের অনুপযোগীই বলা চলে। চেঙ্গিজ খানের পত্র পাঠ করে তিনি প্রথমে তার কাছে যেতে স্পষ্টই অস্বীকার করলেন।

---

* লি — চীনা ভাষায় দূরত্বের পরিমাপ; এক লি প্রায় ½ কিলোমিটারের সমান।

** চেঙ্গিজ খানের সাম্রাজ্যের সমস্ত সদর রাস্তার ওপর অবস্থিত চৌকিতে অশ্বের সংস্থান থাকত।

তার পর তিনি উত্তর লিখলেন। লিউ চুন ল্ জরুরী বার্তাবহের হাত দিয়ে সেই পত্র খানের কাছে প্রেরণ করল আর নিজে গুম্ফার কাছাকাছি থেকে গেল। তার আশঙ্কা ছিল যে মোঙ্গল খান ক্রুদ্ধ হবে, তা ছাড়া চান্ চুন্‌কে বলে-কয়ে রাজি করানো যাবে বলে তখনও সে আশা করছিল। চৈনিক মহাস্থবিরের কাছ থেকে উত্তর গেল:

''তাও' সাধক, বিনম্র পর্বতবাসী চান্ চুন্ দূর দেশ হইতে রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা স্বীকার্য যে সমুদ্রতীরে বসবাসকারী অপদার্থ চৈনিক জনসমাজের সকলেই তাহাদিগের অহংকার হেতু বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে। নিজ পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলিতে হয় যে সাংসারিক ব্যাপারে আমি নিতান্তই অজ্ঞ, আর 'তাও' সাধনায়ও বিন্দুমাত্র সাফল্য লাভ করিতে পারি নাই, যদিও চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখি নাই। এখন আমার জীবনমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, আমি জরাগ্রস্ত। আমার খ্যাতি বহু রাষ্ট্রব্যাপী বিস্তৃত হইয়াছে বটে, তথাপি পবিত্রতার বিচারে আমি যে সাধারণের তুলনায় কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহি ইহা মনে মনে আন্দোলন করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণই হইয়া পড়ি। মনুষ্যের গোপন চিন্তা কাহারই বা অধিগত?

'প্রথমে এই অসাধারণ পত্র প্রাপ্ত হইয়া ভাবিলাম পর্বতে আত্মগোপন করিব অথবা সমুদ্রের দিকে পলায়ন করিব; অবশেষে মনস্থ করিলাম আপনার আজ্ঞার অন্যথা করিব না এবং স্বর্গলোকের আশীর্বাদে শৌর্যে ও জ্ঞানে যিনি সমুদয় প্রাচীন নৃপতিকে এত দূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন যে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত চৈনিক জাতি ও বন্য বর্বরগণ সকলেই তাঁহার বশীভূত, তুষারসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া সেই নৃপতির উদ্দেশে যাত্রা করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলাম।

'যাত্রাপথে অবিরাম বাত্যা ও ধূলিঝড় দেখা দিবে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইবে। আমি জরাতুর ও দুর্বল, অধিক ক্লেশ সহ্য করিবার মতো ক্ষমতা আমার নাই, তাই আশঙ্কা হয় এই দীর্ঘ পথ আমি অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব না।

'হে জনগণের অধীশ্বর, আমি যদি আপনার নিকট পহুঁছিতে সক্ষমও হই তথাপি সামরিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মের সমাধান কি আমার পক্ষে সম্ভব? এই কারণে অনুগ্রহপূর্বক বলুন আমার গমন করা উচিত কি না। আমার দেহ অস্থিচর্মসার ও বিশীর্ণ।

আপনার উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

ড্রাগন বর্ষ, তৃতীয় চন্দ্র দিবস।'

এই চিঠি পাওয়ার পর চেঙ্গিজ খান রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সে দরাজ হাতে পত্রবাহককে পুরস্কার দিল। উত্তরে নতুন একটা চিঠি লিখল:

'আমার সন্নিকটে যে আসে সে আমার পক্ষে। আমার নিকট হইতে যে দূরে প্রস্থান করে সে আমার বিরুদ্ধাচারী। আমার যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্য হইল এই যাহাতে বিপুল শ্রমের পর সময়ে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি অর্জন করা যায়। আমি ক্ষান্ত হইব তখনই যখন বিশ্বের সকল হৃদয় আমার বশীভূত হইবে। এতদুদ্দেশ্যে আমি সর্বদা অপরাজেয় সৈন্যসামন্ত পরিবৃত অবস্থায় অভিযান পরিচালনা করিয়া রুদ্র মহিমার পরিচয় দিয়া থাকি। আমি জ্ঞাত আছি যে আপনি স্বচ্ছন্দে পথ যাত্রা করিতে পারেন এবং সারসপক্ষীর সাহায্যে উড্ডয়নপূর্বক আমার নিকট আগমন করিতে পারেন। পথের প্রান্তর যদিও সীমাহীন, তথাপি আপনার ভ্রমণযষ্টির দর্শন লাভের জন্য আমাকে অধিক অপেক্ষা করিতে হইবে না। আমার ভাবনা যাহাতে আপনার গোচরীভূত হয় এই উদ্দেশ্যে আপনার বার্তার উত্তর প্রদান করিলাম। অলমতিবিস্তরেন।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমাকে অমর কর!

খান-ই-খানানের কাছ থেকে দ্বিতীয় পত্র পেয়ে চৈনিক মহাস্থবির দূর পথ যাত্রায় সম্মত হলেন। একই সঙ্গে চীন থেকে চেঙ্গিজ খানের জন্য যে সব অপরূপ দরবারী গায়িকা ও নর্তকীদের দলবল পাঠানো হচ্ছিল তাদের সঙ্গে এক কারাভানে ভ্রমণে তিনি ঘোরতর আপত্তি জানালেন। এই কারণে তাঁকে সহস্র পদাতিক ও তিনশ' অশ্বারোহীর এক বিশেষ রক্ষিদল দেওয়া হয়। চান্ চুনের সঙ্গী হল তাঁর বিশ জন শিষ্য। তাদেরই একজন এক বিশদ কড়চা রচনা করে এবং তাতে গুরুর বাণী ও তাঁর রচিত শ্লোক লিপিবদ্ধ করে রাখে।*

* 'পশ্চিম দেশ পর্যটন' নামে অভিহিত চান্ চুনের যাত্রার এই কড়চা আজও সংরক্ষিত আছে।

চান্ চুন্ ধীরে সুস্থে পথ চলতে লাগলেন, পথে প্রতিটি শহরেই বিরাম নিলেন। মোঙ্গল নগরাধিপতি দারোগারা তাঁকে মহা সমারোহে অভ্যর্থনা জানাল এবং তাঁর জন্য ভূরিভোজনের আয়োজন করল। ভিক্ষু সে সবই প্রত্যাখ্যান করলেন — কেবল পরমান্ন ও ফলমূল আহার করে জীবন ধারণ করতে লাগলেন।

পথে চান্ চুন্ অবিরাম শ্লোক রচনা করে যান। মোঙ্গল স্তেপ অতিক্রম করার সময় তিনি তাঁর ভাবনা ব্যক্ত করেন এই পংক্তিগুলোতে:

দৃষ্টি মোর রহিছে আবরি
অবিরাম পর্বতের শ্রেণী,...
বাত্যা বহে দিকচক্র জুড়ি,
গিরিগাত্রে বহে নির্ঝরিণী।

মন মোর উচাটন, বলে:
ধরণীর কোন গর্ভ হতে
যাযাবর জাতি দলে দলে
এলো হেথা কল্লোলিনী স্রোতে?

তৃপ্ত তারা আদিম আহারে —
বাধা নাহি গোমাংস ভোজনে।*
ভিন্ন তারা আচারে-বিচারে,
অপরূপ বসনে-ভূষণে!

জ্ঞানহীন শিশুতুল্য তারা —
লিখনের জ্ঞান নাহি ধরে।...
দিন কাটে বাধাবন্ধ হারা,
সমর্পিত নিয়তির ক্রোড়ে!

এই সময় লেখা তাঁর আরও একটি পদ:

মরুপ্রান্তর ভেদি পথ চলি,
পদে পদে কত শত বাধা ঠেলি।
ঝলকে সরসী অচ্ছোদ নীল,
রোদে নোনাজমি করে ঝিলমিল।

---

* চীনারা গোরুকে পবিত্র প্রাণী বলে গণ্য করত — তারা গোমাংস ভক্ষণ করত না, গোদুগ্ধ পান করত না। মোঙ্গলদের আহার তাই তাদের কাছে বিচিত্র মনে হত।

হেথা প্রান্তরে শুধু বালিয়াড়ি,
পান্থবিহীন পথ দিবানিশি।...
দ্রুত ছায়া সম পথ দেয় পাড়ি
কদাচিৎ ঘোড়া হাঁকিয়ে বিদেশী।

নাহি গিরিমালা, নাহি তরুবর,
হেথা হোথা টিলা সাদা কাশফুলে:
প্রান্তর মাঝে দিয়াছে টোপর,
নিদাঘে তুষার বুঝি পথ ভুলে?

এখানে ধানের হয় না ফলন,
দুগ্ধের আছে বহু প্রচলন;
অধিবাসী সবে জাতে যাযাবর —
যে যাহার সনে বহে নিজ ঘর।...

যাত্রার দু'বছর বাদে চান্ চুন্ জাইহুন নদীর তীরে পৌঁছালেন এবং তের্মেজের কাছাকাছি এক জায়গায় এসে নদী পার হলেন। সেখানে চেঙ্গিজ খানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। জ্ঞানী ভিক্ষু দীর্ঘ যাত্রার সমাপ্তি উপলক্ষে যে পদ রচনা করেন তা চিকিৎসককে উপহার দিয়ে বললেন:

"আমি ছন্নছাড়া পর্বতবাসী, খান-ই-খানানের যুদ্ধশিবিরে আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল তাঁকে কিছু দরকারী কথা বলব। সে সব কথা তিনি যদি গ্রহণ করেন তাহলে জগতের মঙ্গল হবে।"

চান্ চুনের কবিতাটি ছিল এই:

অষ্টম চন্দ্রের মাস*
সনাতন উৎসবের কাল!
মৃদু বহে সমীরণ,
অন্তর্হিত হল মেঘজাল।
রজনী আলোকে ভাসে,
রজতের রেখা আকাশে আকাশে,
নক্ষত্র কিরণে বুঝি
অগ্নিস্রাবী ড্রাগনের দল
দক্ষিণে উঠিল জাগি —

* অষ্টম চন্দ্রের মাস — চৈনিক দিনপঞ্জী অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাস; এই সময় দেশে খেতের কাজ শেষ হওয়া উপলক্ষে উৎসব আয়োজিত হয়।

ভয়ানক হল উতরোল।
মন্দিরের চূড়া হতে
উৎসবের ঘণ্টাধ্বনি বাজে —
এসো আজি জুটি সবে
উৎসবের সাজে।
অতঃপর সুরাস্রোত,
গায়কের কণ্ঠে আলাপন।...
ও হেন উৎসব কালে
চলিয়াছি স্থবির শ্রমণ
পরাক্রান্ত খানের উদ্দেশে —
রক্তপায়ী দানবেরে
করিতে নিবার
এবং কিঞ্চিৎ স্বস্তি দিতে মানবেরে!

চান্ চুন বিধ্বস্ত বাল্খ শহর অতিক্রম করলেন। শহরের সমস্ত অধিবাসী পলায়ন করেছে, সেখানে তাই শোনা যায় কেবল ক্ষুধার্ত কুকুরদের আর্তনাদ। পাহাড়-পর্বতের ওপর দিয়ে চার দিন পথ যাত্রার পর তিনি এসে উপস্থিত হলেন খাড়া পাড়ের ওপর চেঙ্গিজ খানের হলুদরঙা তাঁবুর সামনে।

মোঙ্গল ভাষা ও চীনা ভাষায় পারদর্শী সমরখন্দের ক্ষত্রপ আখাইয়া তাইশির সঙ্গে চান্ চুন্ ভয়ঙ্কর অধিপতির সামনে উপস্থিত হলেন। 'তাও'পন্থী শ্রমণরা চীন সম্রাটের সামনে কখনও নতজানু হতেন না, আভূমি নতও হতেন না। চান্ চুন্‌ও মোঙ্গল খানের ছাউনিতে প্রবেশ করে কেবল হাত জোড় করলেন এবং ঈষৎ আনত হয়ে সম্মান জানালেন।

খান-ই-খানানের সামনে দণ্ডায়মান এই শীর্ণকায় বৃদ্ধ তপস্বীর গায়ের রং তামাটে, রোদে ও গরম হাওয়ায় ঝলসানো; তাঁর ললাটদেশ উদ্গত, মাথার পশ্চাৎভাগে শুভ্র চূর্ণকুন্তল। নগ্নপদের ওপর দড়িপাকানো চটি জোড়ায় এবং অঙ্গের শতচ্ছিন্ন বসনে মূর্তিমান ভিখারী এই শ্রমণ কিন্তু অবিচলিত ভঙ্গিতে 'বিশ্ব সম্রাটের' দিকে তাকালেন, তারপর গালিচার ওপর আসন গ্রহণ করলেন।

চেঙ্গিজ খান স্বর্ণসিংহাসনের ওপর পা গুটিয়ে বসে ছিল। তার কৃষ্ণকায় মুখমণ্ডলে তাম্রশ্মশ্রু — তাতে পাক ধরেছে, মাথার গোলাকার কালো মুকুটের ওপর বিশাল পান্না বসানো, মুকুট থেকে কাঁধের ওপর

ঝুলছে শৃগালের তিনটি পুচ্ছ। মার্জারের মতো ঈষৎ সবুজ বর্ণের চোখের অপলক দৃষ্টিতে সে জরাতুর ও দীনদরিদ্র এই মহাস্থবিরকে লক্ষ্য করতে লাগল — চেঙ্গিজ খান এখন তাঁর কাছ থেকে মুক্তি লাভের প্রত্যাশী। এই অতিথির মতো চেঙ্গিজ খানের পরনেও একদা ছিল এই রকমই সাধারণ চটের কালো পোশাক, তারও চুলদাড়িতে বার্ধক্যের তুষারশুভ্র প্রলেপ পড়েছিল, তবে তাদের এক এক জনের পথ এক এক রকম। চীনদেশীয় এই জ্ঞানতপস্বী জনসমাজ পরিত্যাগ করে নির্জন স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন, তিনি জ্ঞানের সন্ধানে, জরা, ব্যাধি, শোক ও মৃত্যুর হাত থেকে মানুষের মুক্তির গোপন রহস্যের অনুধ্যানে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং তাঁর কাছে যারা প্রার্থনা নিয়ে আসেন তাদের সকলকে তিনি করুণা প্রদর্শন করেন; আর চেঙ্গিজ খান সর্বদাই বিশাল বাহিনীর অধিনায়ক, সে অন্যান্য জাতিকে বিনাশ ও ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সৈন্যদের পাঠায়, তার সমস্ত বিজয় অর্জিত হয় লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের মূল্যে। এখন জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হতে এই ক্লিষ্ট তপস্বীটির ওপর নির্ভর করছে চেঙ্গিজ খানের যৌবন ও শক্তি আবার ফিরে পাওয়া এবং যে মৃত্যু খানকে অনুসরণ করে চলেছে, যে মৃত্যু পৃথিবীর পরম শক্তিমানকে ধূলিকণায় ও অনস্তিত্বে পরিণত করার চেষ্টা করছে তার বজ্রমুষ্টি থেকে চিরকালের জন্য পরিত্রাণ লাভ।

দুই প্রবীণই বহুক্ষণ নীরব। অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে চেঙ্গিজ খান জিজ্ঞেস করল:

"পথে আপনার কোন অসুবিধা হয় নি ত? যে যে শহরে আপনি থেকেছেন সেখানে সব কিছু ঠিক ঠিক পেয়েছেন ত?"

"গোড়ার দিকে খাবার-দাবার প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি," চান্ চুন্ বললেন। "তবে শেষ দিকে, যে সব দেশ আপনার ফৌজের কবলে পড়েছে সেগুলোর ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় সর্বত্রই ধ্বংস আর অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন দেখতে পেলাম। সেখানে খাবার পাওয়া দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়।''

''এখন আপনি আপনার খুশিমতো সব কিছু পাবেন। আমার খাওয়ার সময় রোজ আপনার নেমন্তন্ন রইল।"

"না, এমন অনুগ্রহের প্রয়োজন আমার নেই! বুনো পর্বতবাসী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে, নির্জনতা পছন্দ করে।"

ভৃত্যরা ঘোলের সরবত নিয়ে এলে ভিক্ষু তা প্রত্যাখ্যান করলেন। খান বললেন:

"আপনার যেমন খুশি তেমনি ভাবেই আমার এখানে থাকুন। একটা বিশেষ আলোচনার জন্য আপনাকে পরে ডেকে পাঠাব। এখন আপনি যেতে পারেন।"

চান্ চুন্ উঠে পড়লেন, হাত জোড় করে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

অচিরেই মোঙ্গল বাহিনী মাভেরান্নগরের ওপর দিয়ে উত্তর দিকে ফিরতি পথ ধরল। পথে চেঙ্গিজ খান বহুবার এই জ্ঞানতপস্বীকে দ্রাক্ষাসব, খরমুজা ও বিবিধ খাদ্যদ্রব্য পাঠায়।

নৌকোর ওপর ভাসমান সেতু বেঁধে বাহিনী দ্রুত জাইহুন নদী পার হয়ে সমরখন্দের পথ ধরল।

একবার বিরতির সময় চেঙ্গিজ খান চান্ চুনের কাছে সংবাদ পাঠাল যে গভীর রাতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য সে তাঁর প্রতীক্ষা করছে।

শিবিরের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে আসতে আসতে ভেকের কলধ্বনিতে চার দিক মুখরিত হয়ে উঠল, তখন আখাইয়া তাইশি নিশ্চল প্রহরীদের সারির পাশ দিয়ে জ্ঞানতপস্বী চান্ চুন্‌কে খান-ই-খানানের হলুদরঙা তাঁবুতে নিয়ে গেল।

স্বর্ণসিংহাসনের দু' পাশে রুপোর উঁচু উঁচু বাতিদানে জ্বলছে মোটা মোটা মোমবাতি। সাদা পশমী গদির ওপর খানের আসন, দু'টি পা সে গুটিয়ে রেখেছে। মণ্ডলাকার মসৃণ মুকুট এবং মুকুট সংলগ্ন মসি বর্ণের শৃগালপুচ্ছ তার মুখের ওপর ছায়া ফেলেছে, কেবল দু' চোখ বাঘের মতো জ্বলজ্বল করছে। পাশে গালিচার ওপর বসে ছিল মোঙ্গল ও চীনা ভাষায় দক্ষ তার দুই সচিব।

চান্ চুন্ সিংহাসনের সামনে আসন গ্রহণ করে বললেন:

"আমি বুনো পর্বতবাসী, বহু বছর হল পরম সত্য ও পরমাত্মা 'তাও'এর ধ্যানে রত আছি। আমি ভালোবাসি কেবল খুবই নিরিবিলি ও শান্ত জায়গা, মরুভূমিতে ভ্রমণ করতে কিংবা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে আমার ভালো লাগে। অথচ এখানে রাজকীয় তাঁবুর পাশে বহু সৈন্যের, তাদের ঘোড়া ও গাড়ির অবিরাম কোলাহল। এতে

আমার আত্মা অস্বস্তি বোধ করছে। আপনি কি আমাকে আপনার এই মিছিল থেকে ইচ্ছেমতো একটু আগে বা পেছনে সরার অনুমতি দেবেন? তাহলে এই বুনো পর্বতবাসীটি অশেষ অনুগৃহীত বোধ করবে।"

"আপনার যা অভিরুচি," খান উত্তর দিল। তারপর সে জিজ্ঞেস করল: "আমাকে বুঝিয়ে বলুন দেখি বজ্র জিনিসটা কী। ওঝারা আর শামানদের সর্দার বেকি আমাকে বলে, মেঘলোকের ওপারে স্বর্গে যে দেবতারা থাকেন তাঁরা যখন মানুষের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে গর্জন করেন তখনই নাকি বজ্রপাত হয় — এটা কি সত্যি? আর তাঁরা তখনই অসন্তুষ্ট হন যখন লোকে নিয়মমাফিক কালো রঙের প্রাণীর বদলে অন্য কোন রঙের প্রাণী তাঁর সামনে কুরবানি দেয়। এটা কি ঠিক?"

"অমরলোক যে মানুষের ওপর অসন্তুষ্ট হয় তার কারণ অজস্র বা নগণ্য কুরবানি নয়," চান্ চুন্ উত্তর দিলেন। "তার কারণ এ-ও নয় যে কালোর বদলে কটা, চকরা-বকরা কিংবা সাদা রঙের ভেড়া অথবা ঘোড়া অমরলোকের উদ্দেশে নিবেদন করা হল। আমি আপনার শামানদের এমন ভ্রান্ত ধারণাও শুনেছি যে গরমকালে স্নান করা বা নদীতে কাপড় জামা ধোয়া উচিত নয়, কম্বল বোনা কিংবা ব্যাঙের ছাতা তোলা উচিত নয় — এসব নিয়মের অন্যথা করলে নাকি দেবলোক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে বজ্র ও বিদ্যুতের সন্ত্রাস সৃষ্টি করে।... এতে মোটেই দেবলোকের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না, মানুষ যে বহু অপরাধ করে থাকে তাতেই অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়।... আমি বুনো পর্বতবাসী, প্রাচীন পুথিপত্রে পড়েছি যে মানুষের বিভিন্ন রকম তিন হাজার অপরাধের মধ্যে ঘৃণ্যতম অপরাধ হল পিতা-মাতার প্রতি অশ্রদ্ধা।... পথে আমি অনেক বার লক্ষ্য করেছি যে আপনার প্রজারা তাদের পিতা-মাতাকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করে না: নিজেরা ভোজসভায় মাতামাতি করে, এদিকে বৃদ্ধ পিতা-মাতা, পিতামহ-পিতামহীকে শুকিয়ে মারে। নির্দয় পুত্র-কন্যারা পিতা-মাতাকে এইভাবে অপমান করে বলেই ন্যায়পরায়ণ দেবলোক বজ্র-বিদ্যুতের আঘাত হেনে তাদের সাজা দেয়। হে সম্রাট, আপনি আপনার প্রজাবর্গের চৈতন্য উদ্রেকে, তাদের সংশোধনে যত্নবান হন।"

"এই শাস্ত্রজ্ঞানী খাঁটি কথা বলছেন!" চেঙ্গিজ খান মন্তব্য করল। সে তার কলমচীদের আদেশ দিল তারা যেন চান্ চুনের বাণী একাধারে

মঙ্গোলীয়, চীনা ও তুর্কী ভাষায় লিপিবদ্ধ করে, যাতে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা সম্পর্কে বিশেষ আইন জারি করা যায়।

স্বর্ণপাত্রে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য পরিবেশিত হলে চান্‌ চুন্‌ মাত্র এক মুঠো ভাত ও কিছুটা শুকনো আঙুর তুলে নিলেন। খান অতঃপর জিজ্ঞেস করল:

"পুণ্যবান শাস্ত্রজ্ঞানী! বহুদিন হল আমার জানতে ইচ্ছে করছে আপনার কাছে এমন কোন ওষুধ আছে কি যাতে বৃদ্ধ যুবক হতে পারে, দুর্বল নতুন শক্তি লাভ করতে পারে? বিশাল নদীর জলধারা যেমন অবিরাম বয়ে চলে আমার জীবনের ধারাও যাতে অবাধে অবিরাম, চিরকাল বয়ে চলে তার কোন উপায় আপনি বার করতে পারেন কি? মানুষকে অমর করার কোন দাওয়াই কি আপনার কাছে নেই?"

চান্‌ চুন্‌ দৃষ্টি অবনত করলেন এবং নীরবে দু' হাতের আঙ্গুলের ডগা একত্রিত করলেন।

চেঙ্গিজ খান বলে চলল:

"এই মুহূর্তে সেরকম কোন দাওয়াই যদি আপনার কাছে নাও থাকে, আপনার হয়ত জানা আছে কীভাবে তা তৈরি করতে হয়? কিংবা আপনি এমন কোন জ্ঞানী পুরুষ বা যাদুকরের নাম করুন যিনি মানুষকে অমর করার গোপন রহস্য জানেন। আপনি যদি আমাকে এমন কোন দাওয়াই তৈরি করে দেন যাতে আমি অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারি তাহলে আমি আপনাকে অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য রকম ধনসম্পদ উপহার দেব: আমি আপনাকে নোইয়নের পদ দেব, বিশাল জেলার শাসক করে দেব।... আমি আপনাকে থলে বোঝাই করে সোনার মুদ্রা দেব। আপনি নানা দেশের একশ' সেরা সুন্দরী উপহার পাবেন!"

চান্‌ চুন্‌ কোন উত্তর না দিয়ে দৃষ্টি নামিয়ে রেখে কাঁপতে লাগলেন — যেন তাঁর প্রচণ্ড শীত করছে। এদিকে খান তাঁকে প্রলোভন দেখিয়ে চলল:

"আমি আপনার পাহাড়ে এমন এক অপরূপ রাজপুরী বানিয়ে দেব যা একমাত্র চীনের সম্রাটেরই উপযুক্ত, আর সেই অপূর্ব পুরীতে বসে আপনি পরমাত্মার ধ্যান করবেন।... এমনকি যৌবনও আমার দরকার নেই। আমি এখন যে রকম বুড়ো সে রকমই না হয় থেকে গেলাম, আমার মাথার চুল সাদা থেকে যায় তাও সই, কিন্তু আমি চাই অনেক অনেক বছর,

অনন্ত কাল, আমি চাই আমি নিজের হাতে যে বিশাল মোঙ্গল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছি তার দায়িত্ব কাঁধে নিতে।..."

খান নীরব হল, তারপর জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টিতে অবসন্ন মহাস্থবিরকে বিদ্ধ করল। মহাস্থবির সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন, ভয়ঙ্কর খানের দিকে আড়চোখে চেয়ে তিনি মৃদুস্বরে বললেন:

"আমি পাহাড়-পর্বত নীরবতা ও ধ্যান পছন্দ করি — সোনাদানা দিয়ে আমার কী হবে? আমি নিজেকেই শাসন করতে পারি না, সেক্ষেত্রে একটা গোটা জেলা শাসন করব কী করে? সুন্দরী বন্দিনীদের সচ্চরিত্রের যুবক দেখে বিয়ে দিয়ে দিন। প্রাসাদের কোন প্রয়োজন আমার নেই — আমি একটা শিলার ওপর দাঁড়িয়েই ধ্যান করতে পারি।... নামজাদা চীনা পণ্ডিতদের লেখা জ্ঞানবিজ্ঞানের যাবতীয় পুথি আমি পাঠ করেছি, আমার কাছে রহস্য বলে কিছু নেই। আমি আপনাকে নির্ভেজাল সত্যি বলতে পারি: মানুষের শক্তি বৃদ্ধির, তাকে আরোগ্য করে তোলার এবং তার জীবন রক্ষা করার বহু উপায় আছে, কিন্তু তাকে অমর করার কোন দাওয়াই কস্মিনকালে ছিল না এবং আজও নেই।..."

চেঙ্গিজ খান ভাবনায় ডুবে গেল, মাথা নীচু করে অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইল। যে কলমচীরা এই কথাবার্তা পুথিতে লিখছিল তাদের খাগের কলমের খস্‌খস্‌ আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। কেবল মোমবাতি থেকে গলা মোমের চড়্‌চড়্‌ শব্দ শোনা যেতে লাগল। অবশেষে খান বলল:

"আমাদের সেকেলে মোঙ্গলদের মধ্যে একটা কথা চলে আসছে: 'সত্যবাদীর মরণ রোগশয্যায় হয় না,' ঈর্ষায় সত্যবাদীকে কেউ না কেউ সময়ের আগেই তার পরমায়ু শেষ করবে।... আর এই কারণেই ত সব মানুষের চেষ্টা থাকে মিথ্যের পাহাড় গড়ে তোলা।... অথচ হে মহাস্থবির, দশ হাজার লি পার হয়ে আমাকে দেখার জন্য এসে একমাত্র আপনিই এই সত্যি কথাটা বলতে ভয় পান নি যে অমর হওয়ার কোন উপায় নেই। আপনি সৎ, স্পষ্টবক্তা। আপনার যদি কোন অনুরোধ থাকে ত বলুন। আমি কথা দিচ্ছি তা পালন করব।"

চান্‌ চুন্‌ দু' হাত জোড় করে খানের সামনে আনত হলেন।

"আমার একটিমাত্র অনুরোধই আছে; তুষার, পর্বত আর মরুভূমি পার হয়ে আমি আপনাকে সেটাই বলতে এসেছি — আপনার এই নিষ্ঠুর যুদ্ধ বন্ধ করুন, সর্বত্র লোকজনের মধ্যে সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন!.."

চেঙ্গিজ খানের ভ্রূভঙ্গ হল, তারপর দুই ভ্রূ মিলিত হল। মুখে বিকৃতি দেখা দিল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে এমন চেঁচাতে লাগল যে কাগজের ওপর কলমচীদের খাগের কলম কেঁপে উঠল।

"সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে যুদ্ধের দরকার!.. আমাদের স্তেপের সেকেলে লোকজন অমনি অমনিই শেখান নি: 'চরম শত্রুকে যখন হত্যা করতে পারবে একমাত্র তখনই দূরে হোক কাছে হোক সর্বত্রই শান্তির ভাব দেখা দেবে।' আমি এখনও আমার পুরনো শত্রু তানগুত সম্রাট বুর্খানকে খতম করতে পারি নি! তা ছাড়া দুনিয়ার বাকি অর্ধেক এখনও আমার পদানত হয় নি।... এটা কি আমার পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব? আপনি জ্ঞানী ঠিকই, কিন্তু আপনার অনুরোধ কাজের নয়! এমন অনুরোধ করে আর যন্ত্রণা দেবেন না!"

চেঙ্গিজ খান উঠে দাঁড়াল, সিংহাসনের হাতল আঁকড়ে ধরে ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে হিস্‌হিস্‌ আওয়াজ তুলে বলল:

"আপনি যেতে পারেন!"

সে বছর শীতকালটা চেঙ্গিজ খান কাটিয়ে দিল সমরখন্দের কাছাকাছি। শহরের বদ্ধ ভাব তার ভালো লাগত না বলে সে মোঙ্গল শিবিরেই বাস করত।

গোড়ায় এত বৃষ্টি নামল যে গোটা জায়গাটা জলকাদায় একাকার হয়ে গেল এবং অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ল। তারপর ঘন ঘন বরফ পড়তে লাগল এবং এমন ঠাণ্ডা শুরু হল যে বহু ঘোড়া ও বলদ জমে গিয়ে পথে মুখ থুবড়ে পড়ল।

জ্ঞানতপস্বী চান্‌ চুন্‌ প্রাক্তন খরেজম শাহের উদ্যান বেষ্টিত পল্লীপ্রাসাদ 'কোক্‌ সরাইয়ে' বাস করতে লাগলেন। এখানে মহাস্থবির কবিতা রচনা করেন। মোঙ্গল সৈন্যরা যাদের কাছ থেকে সমস্ত সম্পত্তি, পশুপাল, স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা হরণ করেছে সেই সব ক্ষুধার্ত কৃষক দলে দলে ভিড় করে তার কাছে আসত। চেঙ্গিজ খান তাঁকে যে খাদ্য উপঢৌকন পাঠাত তা ত তিনি দান করতেনই, তা ছাড়া দর্শনপ্রার্থীদের জন্য তিনি নিজে খুদের জাউ রান্না করতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোঙ্গলদের নিজ ভূমে প্রত্যাবর্তন

চেঙ্গিজ খান শিবিরের অবস্থান পরিবর্তনের বাসনা জানিয়ে যখন সমরখন্দ থেকে সাইহুন নদীর দিকে অগ্রসর হওয়ার হুকুম দিল তখন তার আজ্ঞায় শাহ মুহম্মদের জননী, খরেজমের এককালীন সুলতানা প্রৌঢ়া তুর্কান খাতুনকে, শাহের এক কালের হারেমের সকলকে এবং সম্ভ্রান্ত বংশের অন্যান্য বন্দিনীকে মোঙ্গলদের যাত্রাপথ বরাবর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়; সৈন্যের সারি যতক্ষণ তাদের পাশ দিয়ে চলে ততক্ষণ তারা খরেজম সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্য বিলাপ করে উঁচু গলায় গান গায়।

মেষবর্ষের সূচনায় (১২২৩) চেঙ্গিজ খানের শিবির স্থাপিত হল সাইহুন নদীর দক্ষিণ তীরে। এখানে চেঙ্গিজ খানের আহ্বানে জ্যেষ্ঠ পুত্র, দাম্ভিক ও অবাধ্য জুচি বাদে চেঙ্গিজ খানের আর সব পুত্র — জাগাতাই, উগেদেই ও তুলি কুরুলতাইয়ে যোগদানের জন্য উপস্থিত হল। পুত্রবর্গ, খান এবং প্রধান প্রধান সামরিক নেতার সঙ্গে মিলিত হয়ে চেঙ্গিজ খান পরবর্তী তেরো বছরের মধ্যে প্রান্তিক সাগর অবধি সমস্ত পশ্চিমী দেশ জয় করার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করল।

চেঙ্গিজ খানের শিবির স্থাপিত হয়েছিল নিরুদ্দিষ্ট অধিবাসীদের পরিত্যক্ত উদ্যানের মাঝখানে। আশেপাশের পাহাড়-পর্বত থেকে অসংখ্য বন্য বরাহ এখানে নেমে আসত। ঘোড়ায় চড়ে বর্শা ও তীর বিদ্ধ করে এই সব বরাহ শিকারে চেঙ্গিজ খানের উৎসাহ ছিল।

একবার বন্য বরাহ শিকার করতে গিয়ে তার ঘোড়া হোঁচট খায়। খান মাটিতে পড়ে যায়, ঘোড়াও ছুটে পালায়। বিশাল বন্য জন্তুটি থমকে দাঁড়িয়ে শায়িত চেঙ্গিজ খানের নিশ্চল দেহটি নিরীক্ষণ করল। তারপর সে ধীরে ধীরে নলখাগড়ার বনের ভেতর চলে গেল। সঙ্গী শিকারীরা ছুটে এসে ঘোড়াটাকে ধরে নিয়ে এলো। খান শিকার বন্ধ করে দিয়ে শিবিরে ফিরেই চীনদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞানী চান্ চুন্‌কে ডেকে আনার হুকুম দিল। তার প্রশ্ন হল বন্য বরাহের সামনে চেঙ্গিজ খানের এই পতনে অমরলোকের কোন হাত আছে কিনা। চান্ চুন্ বললেন:

"আমাদের সকলেরই প্রাণের প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত। মহামান্য খানের বয়স এখন অনেক হয়েছে, তাঁর শিকারের নেশা একটু কমানো দরকার।

নোংরা বুনো শুয়োর যে জলা জমিতে পড়ে থাকতে দেখেও 'জগৎ আলোড়নকারীকে' স্পর্শ করতে সাহস পায় নি এটা হল স্বর্গ যে তাঁকে রক্ষা করছে তারই ইঙ্গিত।"

"আমাকে শিকার ছাড়তে হবে? না, এ পরামর্শ আমি নিতে পারছি না!" চেঙ্গিজ খান উত্তর দিল। "আমরা মোঙ্গলরা একেবারে ছেলেবেলা থেকে শিকারে আর ঘোড়া থেকে তীর ছুঁড়ে অভ্যস্ত, এমনকি বুড়োরাও এই অভ্যাস ছাড়তে পারে না। তবে আপনার কথাটা আমার মনে থাকবে।"

চান্ চুন্‌কে পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে চেঙ্গিজ খান এক পাল দুধাল গোরু ও বাছা বাছা ঘোড়া আনার হুকুম দিল। কিন্তু জ্ঞানসাধক সে উপঢৌকন গ্রহণ করলেন না, তিনি বললেন যে সাধারণ ডাকগাড়িতেই তিনি তাঁর স্বস্থানে — চীনের পার্বত্য অঞ্চলে ফিরে যেতে পারেন। অতঃপর মোঙ্গল খানের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিয়ে জ্ঞানসাধক তাঁর বিশ জন শিষ্যের সঙ্গে সেনাদলের প্রহরায় ফিরতি পথ ধরলেন। চেঙ্গিজ খানের অন্তরঙ্গদের অনেকেই কলসভর্তি সুরা এবং ঝুড়ি ঝুড়ি দামী ফলমূল উপঢৌকন নিয়ে এই বর্ষীয়ান 'তাও'সাধককে বিদায় জানাতে গেল। বিদায়কালে অনেকেই চোখের জল মুছল।

মর্কটবর্ষে (১২২৪) চেঙ্গিজ খান তার বাহিনীকে মোঙ্গল স্তেপে ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

প্রচুর শিকারলব্ধ প্রাণী ভোজনে স্ফীতোদর বৃদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন তার আভূমি ঝুলন্ত উদর টেনে টেনে শ্লথগতিতে ঘন নলখাগড়ার বনে নিজের ডেরায় প্রত্যাবর্তন করে চেঙ্গিজ খানের বাহিনীও তেমনি বিপুল লুণ্ঠন-সামগ্রীর ভারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। প্রতিটি সৈন্যের সঙ্গে আছে কয়েকটি করে মাল বোঝাই ঘোড়া, উট আর ষাঁড়। সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে চলে ভেড়ার পাল এবং মুসলমানদের কাছ থেকে লুট করা পোশাক-পরিচ্ছদ, গালিচা, অস্ত্রশস্ত্র, তামার তৈজসপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর ভারে আর্তনাদরত দ্বিচক্রযান। সেই সঙ্গে ঘোড়ার, উটের পিঠে ও শকটে চেপে চলে মোঙ্গল এবং অন্যান্য বহু গোষ্ঠীর নারী ও শিশু; দীর্ঘ সারি বেঁধে চলে শীর্ণকায়, শতচ্ছিন্ন বসন পরিহিত, নগ্নপদ অসংখ্য বন্দীর দল।

গোটা মিছিল মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে, পশুচারণের উপযোগী জায়গায় যাত্রার বিরতি দেয়। এই ভাবে বাহিনী পথে পথে গ্রীষ্ম ও শীত

কাটিয়ে দিল। তাদের দীর্ঘ যাত্রাপথের পশ্চাতে পড়ে থাকে মধ্য এশিয়ার জলশূন্য ও কঙ্করময় প্রান্তরের ভেতর দিয়ে পথ অতিক্রমের কষ্ট যারা সহ্য করতে পারে নি সেই সব ঘোড়া ও ষাঁড়ের কঙ্কাল এবং বন্দীর মৃতদেহ।

বসন্তকালে চেঙ্গিজ খান কেরুলেন নদীর তীরবর্তী সাবেক বিচরণভূমিতে এসে উপস্থিত হয়ে বুকি সুচেগুতে বিরতি ঘোষণা করল এবং সেখানেই তার হলুদবর্ণের রাজকীয় তাঁবু খাটানোর আদেশ দিল। এখানে সে অভিজাত খান ও কৃতি সেনানায়কদের এক পরামর্শসভা আহ্বান করল এবং এমন এক জমকালো ভোজসভার আয়োজন করল যা স্তেপে কেউ কখনও দেখে নি। এই ভোজসভার তিন দিন বাদে চেঙ্গিজ খানের তরুণী পত্নী কুলান খাতুনের মৃত্যু হল। সকলে কানাকানি করতে লাগল যে এই মৃত্যুর জন্য দায়ী চেঙ্গিজ খানের ভ্রাতারা।... তবে সত্যি-মিথ্যে জানার উপায় নেই।

পরের বছর, কুক্কুটবর্ষে (১২২৫) চেঙ্গিজ খান তার সাবেক বাসভূমিতেই রয়ে গেল এবং মোঙ্গল জাতিকে 'বিচক্ষণতা ও সমৃদ্ধির পথ' নির্দেশ করে 'যাসা' অর্থাৎ আইন জারী করল। চেঙ্গিজ খানের এই 'যাসা' 'বিচক্ষণতা ও সমৃদ্ধির পথ' নামেই পরিচিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অভিযানরত অবস্থায় মৃত্যুবরণে চেঙ্গিজ খানের সংকল্প

অবাধ্য তানগুতদের রাজ্য আবার তার বিরুদ্ধে মাথা তুলেছে জানতে পেরে চেঙ্গিজ খান শান্ত হতে পারল না। তানগুত সম্রাট বুর্খানকে শাস্তি দেওয়ার সংকল্প খান-ই-খানান বিস্মৃত হয় নি। সে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল এবং স্বয়ং বাহিনী পরিচালনা করবে এই সংবাদ জানিয়ে পুত্রদের ডেকে পাঠাল।

এবারেও জ্যেষ্ঠ অবাধ্য জুচি বাদে তার তিন পুত্র এসে হাজির হল।

খানের দ্বিতীয় পুত্র, মাভেরান্নাগরের শাসক জাগাতাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জুচির প্রতি সব সময়ই বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। পারিবারিক পরামর্শসভায় সে বলল:

"জুচি আমাদের আদিভূমির চেয়ে কিপচাকদের দেশকে বেশি ভালোবাসে। খরেজমে সে কোন কিপচাকের গায়ে পর্যন্ত হাত দিতে দেয় না। জুচি নির্লজ্জের মতো সরাসরি বলে বেড়ায়: 'বুড়ো চেঙ্গিজ খানের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, সে দেশের পর দেশ ধ্বংস করছে, কোন রকম মায়া-মমতা না দেখিয়ে জাতির পর জাতি উচ্ছেদ করছে।' জুচির মতলব শিকারের সময় আমাদের বাবাকে হত্যা করবে, সে চায় মোঙ্গলদের আদিভূমি থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে জোট বাঁধতে।"

চেঙ্গিজ খান তখন ক্রোধে জ্বলে উঠল। চেঙ্গিজ খান তার ভ্রাতা উৎচিগিন এবং বিশ্বস্ত লোকজন মারফত খরেজমে এই হুকুম পাঠাল যে জুচি যেন অবিলম্বে পিতার কাছে হাজির হয়। চেঙ্গিজ খান উৎচিগিনের কানে কানে বলল: "জুচি যদি আসতে রাজি না হয়ে খরেজমেই থেকে যায় তা হলে ওকে গোপনে ঘা মারবে, কোন আক্ষেপ না করে খতম করে দেবে!"

জুচি পিতাকে বলে পাঠাল যে অসুস্থতার দরুন আসতে পারছে না। সে কিপচাকদের সঙ্গে স্তেপেই রয়ে গেল। বিশ্বস্ত লোকজন চেঙ্গিজ খানকে লিখে পাঠাল যে খান জুচি বহাল তবিয়তেই আছেন, তিনি প্রায়ই বন তোলপাড় করে শিকার করছেন; আর এই কারণেই তারা খান-ই-খানানের গোপন হুকুম তালিম করার উদ্দেশ্যে জুচির কাছাকাছি থেকে গেল।

জাগাতাই তার নিজের রাজ্য সমরখন্দে ফিরে গেল। এদিকে চেঙ্গিজ খান তার দুই প্রিয় পুত্র উগেদেই ও তুলিকে সঙ্গে নিয়ে সারমেয়বর্ষের গোড়ায় (১২২৬) তানগুতদের বিরুদ্ধে বাহিনী পরিচালনা করে ওন্‌গোন-তালান-খুদুনে উপস্থিত হল। এখানে এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখার পর থেকে সে আসন্ন মৃত্যুর কথা বলতে থাকে। পুত্ররা তখন অন্য সেনাদলের সঙ্গে ছিল। চেঙ্গিজ খান তাদের ডেকে পাঠাল।

পর দিন প্রত্যুষে উগেদেই ও তুলির আগমন ঘটল। উত্তম ভোজনে তারা পরিতৃপ্ত হওয়ার পর চেঙ্গিজ খান ছাউনিতে উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে বলল:

"ছেলেদের সঙ্গে আমার গোপন পরামর্শ আছে। আমি একেবারে একান্তে আমাদের নিজস্ব কতকগুলো ব্যাপার আলোচনা করতে চাই। তোমরা সকলে এখান থেকে সরে যাও।"

সব খান এবং অন্যান্য লোকজন সরে যেতে চেঙ্গিজ খান তার দুই

প্ত্রকেই নিজের কাছে বসাল। প্রথমে সে তাদের জীবনযাত্রা ও রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে উপদেশ দিল, তার পর বলল:

"সব কিছু ভালো করে মনে রেখো বাছারা! বুঝতেই পারছ আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার শেষ অভিযানের সময় এসে গেছে। মোঙ্গলদের রক্ষক, রণদেবতা সুলদের সাহায্যে আমি তোমাদের জন্য এমন অসাধারণ বিশাল রাজ্য নিজের বশে এনেছি যার কেন্দ্র থেকে এক এক কিনারায় যেতে এক বছর সময় লাগে। এখন আমার শেষ নির্দেশ বলি: 'সব সময় শত্রুদের ধ্বংস কর, নিজের বন্ধুজনের কদর দিও।' আর এর জন্য তোমাদের যেটা দরকার তা হল সব সময় একমত হওয়া, সকলে মিলেমিশে কাজ করা। তা হলে তোমাদের জীবন সহজ ও আনন্দের হবে, তোমরা তোমাদের সাম্রাজ্য ভোগ করতে পারবে। আমি আগেই বলেছি যে আমার ওয়ারিশ হবে উগেদেই। আমার পর সে-ই খান-ই-খানান হয়ে সম্মানের শ্বেতাসনে বসবে। কঠিন হয়ে শক্ত হাতে গোটা রাষ্ট্র আর মোঙ্গল জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাও, আমার মৃত্যুর পর আমার 'যাসা' বিকৃত করার বা তা অমান্য করার ধৃষ্টতা যেন তোমাদের না হয়। দুঃখের বিষয় আমার দুই ছেলে জুচি আর জাগাতাই আজ এখানে নেই। বড়ই দুঃখের কথা! এমন যেন না ঘটে যে আমার অবর্তমানে ওরা আমার কাজ পন্ড করে দেয়, নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে রাজ্যে সর্বনাশা বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে! সকলেই ঘরে মরতে চায় কিন্তু আমি চাই যোদ্ধার মতো মরতে, তাই জীবনের শেষ যুদ্ধে যাত্রা করছি। তোমরা যেতে পার!"

এর পর চেঙ্গিজ খান তার বাহিনী নিয়ে আরও দূরে যাত্রা করল। পথে বহু জাতিগোষ্ঠী ও শহরের শাসকবর্গ একের পর এক এসে অধীনতা স্বীকার করে। জনৈক খান একটি থালায় বড় বড় আকারের মুক্তা নিয়ে এসে বলে: "আমরা বশ্যতা স্বীকার করছি!" খান-ই-খানান নিজের অবসান আসন্ন জেনে মুক্তার প্রতি মনোযোগ দিল না, সে সেগুলোকে তার বাহিনীর সামনে স্তেপের মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়ার হুকুম দিল। সৈন্যরা সকলে মুক্তাখন্ড কুড়াতে লেগে গেল, কিন্তু অনেক মুক্তাই ধুলোর নীচে হারিয়ে গেল। লোকে পরেও সেগুলোর সন্ধান করে খুঁজে পায়।

"আমার কাছে এখন প্রতিটি দিন থালাভর্তি মুক্তার চেয়েও দামী," চেঙ্গিজ খান বলল। তাকে চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখা যেত।

তানগুত সম্রাট তখন চেঙ্গিজ খানের কাছে দূতদের পাঠাল। চেঙ্গিজ

খান তাদের গ্রহণ করল না। তানগুত দূতবৃন্দ তখন খানের প্রধান অমাত্য ইয়েলিউ চু-ত্সাইকে জানাল:

"আমাদের সম্রাট খান-ই-খানানের বিরুদ্ধে কয়েক বার বিদ্রোহ করেছেন, আর তার পর প্রতিবারই মোঙ্গলরা আমাদের দেশের ওপর হানা দিয়ে লোকজন হত্যা করেছে, শহর লুট করেছে। বিরুদ্ধাচরণ করে কোন লাভ নেই। আমরা চেঙ্গিজ খানকে সেবা করার জন্য এসেছি, আমরা শান্তি চাই, আপস-মীমাংসা আর দু' তরফের শপথ চাই।"

ইয়েলিউ চু-ত্সাই দূতদের বলল:

"মহামান্য খান অসুস্থ। চেঙ্গিজ খান যত দিন সুস্থ হয়ে না ওঠেন, তানগুত সম্রাট ততদিন অপেক্ষা করুন।"

চেঙ্গিজ খানের অসুস্থতা দিনের পর দিন তীব্র আকার ধারণ করতে লাগল। সে স্পষ্টই শিয়রে মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেয়ে হুকুম দিল:

"আমি মারা গেলে আমার মৃত্যুসংবাদ যেন কোনভাবে প্রকাশ না পায়, কান্নাকাটি ও বিলাপের রোল তুলো না; শত্রুরা জানতে পারলে আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করবে। তানগুতের রাজা আর রাজ্যের লোকজন যখন ভেট নিয়ে দুর্গের তোরণ থেকে বের হবে তক্ষুনি তাদের ওপর আক্রমণ করবে, তাদের ধ্বংস করবে!"

খান-ই-খানান নয় ভাঁজ করা শ্বেত কম্বলের শয্যায় শায়িত। মাথার নীচে কৃষ্ণসার চর্মের নরম বালিশ, পায়ের ওপর কালো রঙের কম্বল।

দীর্ঘ ও বিশীর্ণ দেহটিকে অসম্ভব ভারী বলে মনে হচ্ছিল এবং তার মতো জগৎ আলোড়নকারীর পক্ষেও নড়াচড়া করা কিংবা ভারে ছিঁড়ে পড়া মাথা তোলা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছিল।

সে কাত হয়ে শুয়ে ছিল, তার কানে আসছিল কী ভাবে প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরের কিঁচ কিঁচ আওয়াজের মত একটা মিহি শব্দ উঠছিল। অনেকক্ষণ সে বুঝে উঠতে পারল না ইঁদুরটা কোথায় বসে আছে। শেষকালে তার বোধগম্য হল যে ইঁদুর তার বুকের ভেতর চিঁচিঁ করছে, যখন সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ইঁদুরও তখন চুপ করে যায়, তার মানে এই ইঁদুরই হল তার রোগ।

যখন সে ফিরে চিত হয়ে শোয় তখন ওপরে, ছাউনির ছাদে গাড়ির চাকার মতো গোলাকার রন্ধ্রপথ দেখতে পায়। সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে মেঘমালা ভেসে চলেছে। একবার সে লক্ষ্য করল আকাশে অনেক উঁচুতে

বলাকের শ্রেণী উড়ছে — তাদের প্রায় চোখেই পড়ে না। তাদের দূরাগত কাকলি তাকে যেন দূরের কোন অদেখা দেশের আমন্ত্রণ জানায়।

খানের মনে পড়ল 'শেষ সাগর' অবধি অভিযান চালানোর কী সাধই না তার ছিল! কিন্তু হিন্দুস্তানের সীমান্তে আসতে না আসতেই গরমে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল, তার সর্বাঙ্গ লাল লাল খোস-পাঁচড়ায় ছেয়ে গেল। তখন সে বাহিনীকে মোঙ্গলদের শীতল স্তেপে ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

এখন দুর্বল ও অসহায় সে তানগুতের বেগনী পাহাড়ের উপত্যকায় মৃত্যুশয্যাশায়ী। এখানে সকালে পেয়ালার জল জমে বরফ হয়ে যায়। প্রতিটি মুহূর্তে তার শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, এদিকে বৈদ্যরা তার সঙ্গে শঠতা করে যাচ্ছে। নাকি তারা সেই দাওয়াই খুঁজে পাচ্ছে না যা তাকে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে বসার এবং স্তেপে দীর্ঘশৃঙ্গী হরিণের অথবা হলুদরঙা অবাধ্য কুলানে ছাগের পিছু ধাওয়া করার শক্তি যোগাতে পারে।... কুলান? কোথায় গেল সেই সুন্দরী, অবাধ্য কুলান খাতুন?... সে আর নেই!.. চীনদেশের সেই জ্ঞানী তাহলে ঠিক কথাই বলেছিলেন যে অমর হওয়ার কোন উপায় নেই!..

খান কোন রকমে শুকনো ঠোঁট নেড়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল:

"নীল মোঙ্গল স্তেপের অসংখ্য মানুষকে যখন আমি আমার হাতের মুঠোয় জড় করতে যাই তখনও এত কষ্ট পাই নি।... তখন বেগ পেতে হয়েছিল বটে, এত বেগ পেতে হয়েছিল যে আমার ঘোড়ার জিন বাঁধার বন্ধনী টানটান হয়ে পড়ে, লোহার রেকাব ভেঙে যায়।... কিন্তু এ কষ্টের কোন সীমা-পরিসীমা নেই।... আমাদের সাবেকী লোকেরা ঠিক কথাই বলেন: 'পাথর চর্মহীন, মানুষ নয় চিরজীবী!'..."*

চেঙ্গিজ খান অস্বস্তিকর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল, এদিকে ইঁদুরের সেই কিঁচ কিঁচ আওয়াজ আরও তীব্র হয়ে উঠল, পাঁজরে হুল ফোটানোর মতো ব্যথা, নিশ্বাস থেমে থেমে পড়তে লাগল।

সংবিৎ ফিরে পেতে খান দেখতে পেল শয্যার প্রান্তদেশে নতজানু হয়ে বসে আছে ইয়েলিউ চু-ত্‌সাই। চেঙ্গিজ খানের মতোই দীর্ঘদেহী ও শীর্ণকায় এই প্রাজ্ঞ অমাত্যটি রোগীকে চোখের আড়াল করত না। খান বলল:

* প্রাচীন মোঙ্গল ঘটনাপঞ্জী থেকে।

“কী ভালো... আর কী-ই বা মন্দ...”

“বুখারা থেকে আপনার দোভাষী মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্‌ এসেছে। সে জানাচ্ছে যে সেখানে...”

খান বিরক্তির সঙ্গে হাত নাড়াতে অমাত্য কথা বন্ধ করল।

চেঙ্গিজ খান ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল:

“আমি জিজ্ঞেস করছি কী ভালো... আর কী-ই বা মন্দ... এই জীবনে... আমি করেছি?”

ইয়েলিউ চু-ত্‌সাই ভাবনায় পড়ে গেল। যে লোক জীবন থেকে বিদায় নিতে চলেছে তাকে কী জবাব দেওয়া যায়? অকস্মাৎ তার সামনে একের পর এক ছবি ভেসে উঠল।... সে দেখতে পেল রুধির ও অশ্রুর ধারায় আবিল নদ-নদীতে খণ্ডবিখণ্ড এশিয়ার নীল প্রান্তর ও পাহাড়-পর্বত।... তার মনে পড়ল শহরের পর শহরের ধ্বংসস্তূপ আর ঝুলকালি পড়া দেয়ালের গায়ে গায়ে বৃদ্ধ ও শিশুর, উদ্ভিন্ন যুবকের ছিন্নভিন্ন ও স্ফীত মৃতদেহের পাহাড়। দূর থেকে ভেসে আসে মোঙ্গলদের আক্রমণে দালান-কোঠা ভেঙ্গে পড়ার কর্ণভেদী আওয়াজ এবং ক্রন্দনরত অধিবাসীদের উদ্দেশে মোঙ্গলদের মনে রাখার মতো তর্জন-গর্জন: “যাসার আদেশ! চেঙ্গিজ খানের আদেশ!..”

মৃতদেহ পচতে শুরু করেছে। অধিবাসীদের যে কয় জন শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচেছিল ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধে টিকতে না পেরে তারা ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে এসে জলাভূমিতে ও কুটিরে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আশ্রয় নেয় — প্রতি মুহূর্তে তাদের আশঙ্কা এই বুঝি মোঙ্গলরা ফিরে আসে এবং ফাঁসদড়ি দিয়ে দুর্বিষহ দাসত্বের নাগপাশে তাদের বেঁধে ফেলে।... একটি ছবি চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য নিয়ে জ্বলে উঠল। বিধ্বস্ত সমরখন্দের প্রাচীরের কাছে শুকনো লম্বা লম্বা চারটি ঠ্যাং বিশৃঙ্খলভাবে শূন্যে তুলে চিত হয়ে পড়ে ছিল এক বিশাল শীর্ণকায় উট; তার আতঙ্কগ্রস্ত চোখে তখনও জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল। দুর্ভিক্ষের কালিমালিপ্ত কিছু লোক কবজি অবধি রক্ত মাখা হাতে একে অন্যকে ধাক্কা মেরে উটের পেট চিরে ফেলে নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতহস্তে তা উদরসাৎ করে চলছে।... শয্যাশায়ী নির্বাক ‘জগৎ আলোড়নকারীর’ কঙ্কালসার দুই পা ও বিশীর্ণ দু’টি হাত সেই উটের কথা মনে করিয়ে দেয়। তার আধবোজা চোখেও সেই একই রকম মৃত্যুর আতঙ্ক ঝলক

দিচ্ছে।... তারও দেহের পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে লোকজন — তার উত্তরাধিকারীরা। তারা একে অন্যকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে, তাদের চেষ্টা হল এই রক্ত মাখা বিপুল সম্পত্তি থেকে টুকরো ছিঁড়ে নেওয়া।...

"কিছুই... কি... মনে... পড়ছে না?.. বল!"

ইয়েলিউ চু-ত্সাই ফিস্‌ফিস্ করে বলল:

"জীবনে আপনি বড় বড়, আলোড়নকারী এবং ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অনেক কাজ করেছেন। এগুলো ঠিকমতো গণনা করতে পারবেন একমাত্র তিনি যিনি আপনার অভিযান, কর্ম ও বাণী নিয়ে গ্রন্থ রচনা করবেন।..."

"আমার হুকুম... জ্ঞানী লোকজনকে... ডেকে আন।... তারা আমার যুদ্ধযাত্রা... কাজ... আর আমার... মুখের কথা নিয়ে... কাহিনী লিখুক।..."

"আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।"*

ছাউনিতে কোন সাড়াশব্দ নেই। থেকে থেকে আগুনের চড়বড় আওয়াজ নীরবতা ভঙ্গ করে, ছাউনির চাল ভেদ করে দমকা হাওয়া এসে শুকনো ডালপালা দিয়ে জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডের ওপর নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করে। আবার মৃদু কণ্ঠে বলতে শোনা যায়:

"আমি... যা কিছু করেছি... তার মধ্যে... সবচেয়ে ভালো... কী?"

মৃত্যু পথযাত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইয়েলিউ চু-ত্সাই বলল:

"আপনার সবচেয়ে ভালো কাজ হল আপনার আইন 'যাসা'। 'যাসা'র ওপর শ্রদ্ধা থাকলে আপনার বংশধররা দশ হাজার বছর দুনিয়া শাসন করতে পারবে।"**

"ঠিক কথা। তখন... শান্তি... আসবে... কবরের শান্তি।... স্তেপের মরুভূমি... সরস হবে... ঘাস জন্মাবে।... আর কবরের মতো... ঢিবিগুলোর মাঝে মাঝে... চরে বেড়াবে... শুধুই ঘোড়া... মোঙ্গলদের ঘোড়া।..."

---

* চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুর পর প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণের ভিত্তিতে তার জীবন ও অভিযান সম্পর্কে মঙ্গোলীয়, চীনা ও ফারসী ভাষায় সরকারী ঘটনাপঞ্জী লিখিত হয়। সবগুলি ঘটনাপঞ্জীতেই ঘটনার প্রকৃত চিত্র বিকৃত করে চেঙ্গিজ খানের এবং মোঙ্গলদের সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের তারিফ করা হয়েছে। যথার্থ তথ্য পরিবেশন করেছেন কেবল আধুনিক ইরানীয় দরবারের জনৈক ঘটনাপঞ্জীকার রশীদ উদ্-দিন, আরবদেশীয় ঘটনাপঞ্জীকার ইবন আল-আসির এবং আরও স্বল্প কয়েক জন।

** চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুর (১২২৭) ১৪১ বছর পর, ১৩৬৮ সনে মোঙ্গলরা তাদের অধিকৃত চীন থেকে বিতাড়িত হয় এবং ১৫৩ বছর পর, ১৩৮০ সনে কুলিকোভো প্রান্তরের যুদ্ধে পরাজিত হয়।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে খান যোগ করল:

"আর ঘুরে বেড়াবে... কুলান ঘোড়ার দল।..."

চেঙ্গিজ খান অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। তার কপালের দু'টি পাশ কোটরগত, নাক উঁচিয়ে আছে।

মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্, চৈনিক বৈদ্য ও শামান সর্দার নিঃশব্দে প্রবেশ করল। তারা খানের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে পড়ে, আড়ষ্ট হয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকে কখন খান সংবিৎ ফিরে পেয়ে কথা বলতে শুরু করে। খান চোখ খুলল, তার দৃষ্টি মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচের ওপর বিদ্ধ হল।

"আমার ছেলে... জাগাতাই... পশ্চিমের রাজ্য... কেমন চালাচ্ছে?"

সুদর্শন মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচের পোশাকেও বেশ জাঁকজমক — পরিধানে রক্তবর্ণের আংরাখা ও তুষারশুভ্র উষ্ণীষ। সে তার স্থূল উদরদেশের ওপর দু' হাত ভাঁজ করে আভূমি নত হল।

"আপনার কৃতিসন্তান জাগাতাই খান, সমস্ত মোঙ্গল বাহাদুর, সেই সঙ্গে সাইহুন আর জারাফশান নদীর ধারে তাঁর রাজ্যের প্রজারা সকলেই আপনার আরোগ্য কামনা করে আল্লাহের কাছে প্রার্থনা করছে, কামনা করছে আপনি যেন আরও বহু বছর রাজত্ব করেন!"

"উত্তরের জাতিগুলোর শাসনকর্তা... আমার বড় ছেলে... জুচি খান... কেমন রাজত্ব চালাচ্ছে?"

মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ দু' হাতে মুখ ঢাকল। মোঙ্গল প্রথা অনুযায়ী 'পূত প্রেতযোনিপ্রাপ্ত' মৃত আপনজনের প্রসঙ্গ উঠলে তাকে সাধারণ নামে উল্লেখ করা শিষ্টাচার সম্মত নয়, এক্ষেত্রে তার নামের বদলে অন্য কোন সম্মানসূচক দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহার করতে হয়। তাই মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচ্ প্রসঙ্গটা বেশ দূর থেকে শুরু করল:

"আপনার কাছ থেকে উত্তরের জাতিগুলোর শাসনভার পেয়ে বেগদের জানালেন যে একটা বড় যুদ্ধযাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছেন।..."

"আমার বিরুদ্ধে?"

"না হুজুর! পশ্চিমে, বুলগার, কিপচাক, সাক্‌সিন আর উরুসদের বিরুদ্ধে ধারালো বর্শা চালানো উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না, সৈন্যরা যার যার আস্তানায় ফিরে গেল। বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো সকলের ওপর বিপর্যয় নেমে এলো!"

"কী ব্যাপার, পরিষ্কার করে বল!"

"খান পরিবারের জন্য স্তেপে বড় রকমের শিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জন্তু-জানোয়ার তাড়িয়ে আনার জন্য পাঁচ হাজার নোকর সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ে। বুনো শুয়োর, নেকড়ে আর গোটা কয়েক বাঘকেও তারা নলখাগড়ার বন থেকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে। আর বাকি পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার স্তেপ ঝাড়া দিয়ে দূর থেকে বুনো ছাগল, বুনো ঘোড়া — এই রকম আরও সব জন্তু-জানোয়ারে তাড়াতে তাড়াতে এনে হাজির করে। শিকারের পর সন্ধেবেলায় মাঠের এখানে ওখানে আগুন জ্বালানো হল, ভোজ শুরু হওয়ার কথা, কিন্তু ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ভেতর থেকেও যিনি অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতেন সেই বীরকে আর নোকররা খুঁজে পেল না! বহুক্ষণ তাঁর জন্য খোঁজাখুঁজি চলল। শেষকালে তাঁর দেখা মিলল বটে, কিন্তু তখন তাঁর যা অবস্থা! তিনি সঙ্গীহীন অবস্থায় স্তেপে পড়ে আছেন, তখনও দেহে প্রাণ আছে। দেহের কোথাও রক্তের ছিটে নেই, কিন্তু তিনি একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না। কেবল তিনি যে দৃষ্টি মেলে তাকালেন তাতে পুরো জ্ঞানের লক্ষণ আর প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ পাচ্ছে।..."

"ও কি তাহলে... মারাই গেল?.."

"হ্যাঁ, আপনার আপনজন সেই বাহাদুর আর নেই, বিজয়ের গৌরব নিয়ে তিনি এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন —অজানা শত্রুতে তাঁর শিরদাঁড়া মটকে দিয়েছে।"

চেঙ্গিজ খানের মুখ বিকৃত হল। সে তার গায়ের কম্বল আঁকড়ে ধরল, ধরা গলায় বলল:

"... উৎচিগিন একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে।... সেই মহাবীর, অভিজ্ঞ সেনাপতি আর নেই··· কে-ই বা তার জায়গা নিতে পাবে? খরেজমের শাসনকর্তা··· এখন কে?"

"আপনার নাবালক নাতি খান বাতু, অভিভাবকত্ব করছেন তাঁর বুদ্ধিমতী জননী। বাতু খানের জননী নোকরদের ডেকে জড় করে পুত্রের সঙ্গে টিলায় উঠলেন। বাতু খান তাঁর পিতার বাদামী রঙের যুদ্ধ ঘোড়ায় চেপে বসলেন। বালক কিন্তু তেজী এই খান বংশের সন্তানটি চেঁচিয়ে তাঁর নোকরদের বললেন: 'শোন বাহাদুরের দল, দিগ্বিজয়ী বীরেরা! তোমাদের তলোয়ারে মরচে ধরে গেছে! ওগুলোকে পাথরে শানিয়ে নাও! আমি তোমাদের নিয়ে যাব পশ্চিমে, মহানদী ইতিলের ওপারে। আমরা

কাপুরুষ জাতিগুলোর দেশের ওপর তান্ডব সৃষ্টি করব, আমি আমার পিতামহ চেঙ্গিজ খানের রাজত্বের সীমা দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার করব।... আমি এই শপথও নিচ্ছি যে আমার পিতাকে যারা হত্যা করেছে সেই দুর্বৃত্তদের খুঁজে বার করে কড়াইয়ে তাদের জীবন্ত সিদ্ধ করব!"

অসুস্থতার কালিমালিপ্ত বিকটদর্শন চেঙ্গিজ খান ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করে কনুইয়ে ভর দিয়ে খানিকটা উঠল, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে চেপে চেপে বলল:

"তরুণ হওয়ায় মজা আছে... এমনকি কাঁধে বেড়ি নিয়ে হলেও।... তখন সামনে বিজয়ের আলো ঝলকায়।... তবে বাতু এখনও নাবালক।... ওর ভুল-ভ্রান্তি হবে।... ওরও প্রাণ যেতে পারে! আমার আদেশ... বাতুর পাশে পাশে সব সময় যেন পরামর্শদাতো... হয়ে থাকে... আমার সবচেয়ে বিশ্বাসী লোক... ঠ্যাঙে কামড় খাওয়া চিতাবাঘ... হুঁশিয়ার সুবুদাই বাহাদুর।... সে ওকে রক্ষা করবে, যুদ্ধ করতে শেখাবে।... বাতু আমার বিজয়কে এগিয়ে নিয়ে যাবে।... দুনিয়া... মোঙ্গলদের নাগালে আসবে।..."

চেঙ্গিজ খান এক পাশে ঢলে পড়ল। তার বাঁ চোখ কুঁচকে গেল, ডান চোখের জ্বলন্ত ও সর্বনাশা দৃষ্টি উপবিষ্টদের নিরীক্ষণ করতে লাগল।

দৃষ্টি নামিয়ে সকলে দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন করল। তাদের মনে পড়ল কবির উক্তি*:

> চিকিৎসক, পুরোহিত, দরবেশ, গণৎকার
> ভুবনজয়ীর পাশে চারিজন এক ঠায়
> বসি রহে মানি হার, নিতান্তই নিরুপায়।
> সাধ্য নাহি হেন তার করে রোগ প্রতিকার
> মহৌষধ, মন্ত্রবল, কবচ, কোষ্ঠীর ফল —
> তাহাদের ভান্ডারের পুঁজি আর যত বল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে তাঁবুর পাশে হ্রেষাধ্বনি উঠল। সকলে চমকে উঠে খানের ওপর দৃষ্টি ফেলল — তার ডান চোখ দীপ্তি হারিয়ে ঘোলাটে হয়ে গেছে।

চেঙ্গিজ খান বহু দিন আগে থেকেই এক খন্ড ভারী কাঠ কুঁদে

---

* খসরেওয়ানি (দশম শতক)।

তৈরি এবং ভেতরে সোনার পাত মোড়া একটা শবাধার সঙ্গে করে নিয়ে যেত। রাতে পুত্ররা গোপনে শবাধারটিকে হলুদরঙা তাঁবুর মাঝখানে এনে রাখল। সামরিক জালিবর্মে সাজিয়ে চেঙ্গিজ খানকে শবাধারে রাখা হল। বুকের ওপর ভাঁজ করা তার দুই হাতে মুঠো করে ধরিয়ে দেওয়া হল শাণিত তরবারির হাতল। চকচকে ইস্পাতের নীলাভ কালো শিরস্ত্রাণ তার মুদিত চোখের পাতা এবং রুক্ষ ও বিবর্ণ মুখাবয়বের ওপর ছায়া ফেলছে। শবাধারে তার দু' পাশে রাখা হল তীর-ধনুক, ছুরি, আগুন জ্বালানোর চকমকি এবং পান করার জন্য সোনার বাটি।

চেঙ্গিজ খানের আদেশমতো সেনানায়করা তার মৃত্যু সংবাদ গোপন রেখে তানগুতদের প্রধান শহর অবরোধ চালিয়ে গেল। তানগুতরা যখন নজরানা নিয়ে শহরের ফটক থেকে বেরিয়ে এসে সন্ধি প্রার্থনা করল তখন মোঙ্গলরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, সকলকে হত্যা করল, তার পর শহরে প্রবেশ করে তাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল।

চেঙ্গিজ খানের শবাধার কম্বলে জড়িয়ে বারোটি ষাঁড়ে টানা দু' চাকার গাড়িতে চাপিয়ে মোঙ্গলরা ফিরতি পথ ধরল। আগে থাকতে যাতে কেউ লোকাধিপতির মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে না দেয় সেই উদ্দেশ্যে আদিভূমিতে প্রত্যাবর্তনের পথে বাহাদুররা কী মানুষ কী জন্তু-জানোয়ার — যে কোন প্রাণীকেই সাক্ষাৎ মাত্রে হত্যা করে চলে আর সেই সঙ্গে বলতে থাকে:

"পরপারে গতি হোক! সেখানে গিয়ে আমাদের প্রভুকে মন প্রাণ দিয়ে সেবা কর!"

মহাযশস্বী বাহাদুর চেঙ্গিজ খানের জন্য জাতীয় শোক প্রকাশের সময় মেরকিত, চীনা, কিপচাক, ইরানীয়, জর্জীয়, আলান ও উরুসদের পরাভবকারী সেনানায়ক জেবে নোইয়ন ঘোষণা করল:

"এক সময় 'আমাদের সাম্রাজ্য যিনি গড়েছেন' তিনি বুরখান খালদুনের পাহাড়ে শিকার করতে গিয়েছিলেন। পাহাড়ের ঢালুতে নির্জন জায়গায় এক পুরনো গাছের নীচে তিনি বিশ্রাম নিলেন। 'যিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই' এই বুনো জায়গাটা আর আকাশছোঁয়া উঁচু সুঠাম দেবদারু গাছটা তাঁর পছন্দ হল। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম: 'এই জায়গাটা বুনো হরিণ চরার উপযোগী আর আমার শেষ শান্তির আশ্রয় হিশেবে চমৎকার। এই গাছটা মনে করে রেখো'।"

খানের সেনানায়করা এই হুকুম মেনে নিয়ে পাহাড়ের ওপর খুঁজে খুঁজে ঐ জায়গাটা বার করল, যেখানে অসাধারণ উঁচু এক দেবদারু গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে মাটির নীচে চেঙ্গিজ খানের শবাধার রাখা হল।

ধীরে ধীরে কবরের চার দিক এমন ঘন ও গভীর জঙ্গলে ছেয়ে গেল যে তা ভেদ করে গিয়ে কবরস্থান খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এমনকি ঐ নিষিদ্ধ স্থানের প্রাচীন রক্ষকরাও শেষ পর্যন্ত পথের হদিস দিতে পারে না।



উপসংহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে পথ দিয়ে গিয়েছিল তারা

তুষার কিরীটি তুমি, হে নীরব গিরি।
দেখিলে বিধর্মী মোরে লহে দাস করি।
চলিয়াছি, শৃঙ্খলিত হায় দুটি হাত,
দুহাত মস্তকে তুলি রুখি কশাঘাত।
অশ্রু মোর কাহারেও স্পর্শ নাহি করে।
একমাত্র গিরিমালা বুঝি বা শিহরে।

(জনৈক বন্দীর গীত থেকে)

মহানদী জাইহুন থেকে পুবের দিকে যে বিস্তৃত সড়ক চলে গেছে তার ওপর দিয়ে বহু শতক ধরে সমৃদ্ধ কারাভান চলাচল করত। মোঙ্গলদের তাণ্ডবলীলার পর পরই সে সড়কে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। পথপার্শ্বের দোকানপাট ও পান্থশালাগুলো পরিত্যক্ত ও ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হয়। সেগুলোর

ফটক ও কপাটের কিছুই অবশিষ্ট নেই — সৈন্যরা ভেঙ্গেচুরে জ্বালানির কাজে লাগিয়েছে। জলের অভাবে বাগিচা শুকিয়ে যেতে লাগল — সেচের খাল পরিষ্কার করে জলের প্রবাহ অব্যাহত রাখার মতো কেউ ছিল না।

ধূলিধূসরিত পথের সর্বত্র শৃগালের দল মানুষের হাড় ছড়িয়ে রেখেছে। এই পথের ওপর এক বিষণ্ণ অশ্বারোহী যুবার নিঃসঙ্গ যাত্রা এবং তার পরিধানের ভিন্‌দেশী আলখাল্লা অনভ্রান্ত দৃশ্যের সূচনা করছিল। কালো মিশমিশে অস্থিসার আরবী ঘোড়াটি মাটিতে সমান তালে খুরের আঘাত করে চলছিল আর অশ্বারোহী ক্বচিৎ শিস দিয়ে তাকে চাঙ্গা করে তুলছিল।

"মরা মরুভূমি আর কাকে বলে! না আছে কোন মানুষ, না উট, না কুকুর!" মুসাফির দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "সারা দিনে কেবল দুটো নেকড়েকে ধীরে সুস্থে রাস্তা পার হতে দেখা গেল — কবরের মতো নিস্তব্ধ এই সীমাহীন প্রান্তরের যেন তারাই মালিক।... আমার ঘোড়াটা সহজে কাহিল হয় না, কিন্তু এমন আরও কিছু দূর চললে মোঙ্গলদের ভয়াবহ তলোয়ারের চিহ্ন ধারণ করে এই যে সাদা খুলিগুলো পড়ে আছে তাদেরই পাশে তাকেও শিগ্‌গির তার প্রভুর সঙ্গে চিরকালের জন্য হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তে হবে।"

সামনে একটা কালো রঙের পিণ্ড নড়েচড়ে উঠতে কেমন যেন খটকা লাগল। ঘোড়া সতর্ক হয়ে কান খাড়া করল, নাক ঝাড়া দিল। অশ্বারোহী আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। চোখ ধাঁধানো সূর্যালোকে, ধূলিধূসরিত পথের মাঝখানে শিকারের ওপর ঠেলাঠেলি করছে কয়েকটি বিকটদর্শন বিশাল ঈগল।

অশ্বারোহী শিস দিল। অতি কষ্টে বিশাল ডানাগুলো নাড়া দিয়ে ঈগলের ঝাঁক উড়ে গিয়ে কাছাকাছি একটা ঢিবির ওপর এসে বসল। রাস্তার চার পাশে সদ্য ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন, তারই মাঝখানে বীভৎস ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে তুর্কমেনদের একটি ছোট মেয়ে, তার অঙ্গের পোশাক শতচ্ছিন্ন। ঈগলের আঁচড়ে-কামড়ে তার মুখ ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু লাবণ্য তখনও নষ্ট হয় নি।

"মোঙ্গলদের আরও একটা কাজ! ওরা বাচ্চাদেরও রেহাই দেয় না, ধরে রাখে, কোন রকম যত্ন নেয় না, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মজা করে।..."

অশ্বারোহী চাবুক হাঁকাতে হাঁকাতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। পথের বাঁকে

সে এক দল মোঙ্গলের নাগাল ধরল। লুটের মালে চুড়োচুড়ি বোঝাই দু'টি গাড়ি মন্থর গতিতে এগিয়ে চলছে, গাড়ির উঁচু উঁচু চাকায় ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ উঠছে। গাড়ি দুটোর প্রত্যেকটিতে জিনিসপত্রের গাদার ওপর বসে আছে একটি করে মোঙ্গল নারী। তাদের পরিধানে পুরুষের মতো পোশাক — শেয়ালের লোমের টুপি আর ভেড়ার চামড়ার আংরাখা। গাড়িতে যোতা ষাঁড়গুলোর উদ্দেশে তারা এক নাগাড়ে হাঁকডাক করে চলে, ষাঁড়গুলো উদাসীন ভঙ্গিতে ধুলোর মেঘের মধ্যে পা বাড়ায়।

গাড়ির পেছন পেছন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে অবসন্ন, অর্ধনগ্ন তিন বন্দী — তাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা; সেই সঙ্গে আছে একটি স্ত্রীলোক — দুর্বলতার দরুন তার পা টলছে। আরও পেছনে জিভ বার করে শ্লথ পদক্ষেপে চলেছে বিশাল এক লোমশ কুকুর। কানের দু' পাশে দুই বেণী ঝুলিয়ে বছর সাতেকের একটি ছোট ছেলে রাখালের ভঙ্গিতে মন্থরগামী গোরু-ভেড়ার মতো বন্দীদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

"হট্, হট্, বজ্জাত!" হাঁকডাক করতে করতে ছেলেটা এক এক করে প্রত্যেককেই ছড়ির আঘাত করে চলেছে। তার গায়ে ছিল কোন বয়স্ক লোকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া তুলোর জোব্বা, সেটার কোমর গোটানো, পায়ে বড়সড় গোছের জুতো, আর জুতো জোড়া যাতে খসে না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে মোঙ্গল ছোঁড়াটা হাঁটুর নীচে বন্ধনী দিয়ে শক্ত করে সেগুলোকে বেঁধেছে। তার ওপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে সেটার গুরুত্ব সম্পর্কে সে সচেতন। একমাত্র গাড়ির সঙ্গে দড়িতে বাঁধা থাকার দরুন স্ত্রীলোকটি কোনে রকমে টেনে হিঁচড়ে চলছিল। বালক তাকেই বিশেষ তাড়া দিচ্ছিল। বন্দিনীর ছিন্নভিন্ন হলুদ বসন ভেদ করে চোখে পড়ে তার হাড্ডিসার পিঠ আর রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন। সে বিলাপ করতে করতে বলছিল:

"আমাকে ছেড়ে দাও! আমি আবার ফিরে আসব! আমার মেয়ে খ্যাবিচে পথে পড়ে রইল গো!.. আমি নিজে ওকে বইব!.."

"মেয়ে দিয়ে তোর হবেটা কী?" ছাইরঙা ঘোড়ার পিঠে চেপে এক বুড়ো মোঙ্গল ধুলোর মেঘ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে তার কথার মাঝখানে বলল। "নিজে ত দড়ির সঙ্গে বাঁধা হয়ে কোন রকমে টেনে হিঁচড়ে চলছিস, আবার বড়াই করছিস কিনা আরেকটা অথর্বকে টানবি!.."

বুড়ো বন্দিনীর গায়ে চাবুক কষিয়ে দিল। সে দৌড়ে এগিয়ে যেতে পড়ে গেল, যে দড়ির সঙ্গে বন্দিনী বাঁধা ছিল সেটাতে টান পড়তে টাল সামলাতে পারল না। গাড়ির ওপর থেকে মোঙ্গল স্ত্রীলোকটি বলে উঠল:

"অ্যাই বুড়ো কুকুর, অত লোভ কেন রে? খোঁড়া ভেড়া হলে না হয় কথা ছিল, আমি ওটাকে নিজের কোলে তুলে নিতাম — ভেড়ার অন্তত মাংস আর চামড়া আছে। এটা থেকে আমাদের কী ফায়দা শুনি? ওর মেয়েটা ত টেঁসে গেছে, এখন এটাও মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ওঃ, এদিকে আমাদের ঘর কেরুলেনের পারে এখনও বহু দূরের পথ।... ওটাকে ফেলে দে।"

"টাঁসবে না! জান কড়া আছে!" বুড়ো রাগে চিৎকার করে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল। "এই ইতর মাগীটা, এই তিন গাট্টাগোট্টা জোয়ান — সব কটাকেই আমাদের ছাউনিতে নিয়ে ওঠাব। আমাদের আর সব পড়শী বিশ জন অবধি গোলাম ঘরে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা কিনা চারটেও নিতে পারব না? এই গোরু-ভেড়ার দল, আগে, আগে! হট্, হট্!"

মোঙ্গল বন্দিনীর গায়ে কশাঘাত করল, গাড়ির সঙ্গে বাঁধা দড়ি ছিঁড়ে যেতে বাঁদী পথেই পড়ে রইল। গাড়ি এগিয়ে গেল। বুড়ো ছাইরঙা ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল, তারপর জিভে চুক্‌চুক্ আওয়াজ তুলে সামনে তরুণ অশ্বারোহীকে আসতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করল:

"বাঁচবে, না মরে যাবে? এটাকে আমার কাছ থেকে কিনে নেও না! শস্তায় বেচে দিচ্ছি — মোট দুটো সোনার দিনার।..."

"রাত অবধিও বাঁচবে না! বল ত দুটো তামার দিরহাম দিতে পারি।"

"তা-ই দাও! সত্যি সত্যিই শেষ অবধি বাঁচলে হয়! পরে আর এটাও মিলবে না।..." অশ্বারোহীর কাছ থেকে দুটো তামার মুদ্রা পেয়ে মোঙ্গল তার জুতোর ভেতর সেগুলোকে পুরে ফেলল, গাড়ির পিছু ধরার জন্য জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

অশ্বারোহী এক পাশে মোড় নিল এবং এদিক-ওদিক না তাকিয়ে খট্‌খটে শুকনো মাঠ ধরে এগিয়ে গেল।

সামনে জেগে উঠল শ্বেতবর্ণের ভগ্নাবশেষ, ধ্বংসস্তূপের এক অদ্ভুত দৃশ্য, ফাটল ধরা সেকেলে প্রাচীর আর বিশাল বিশাল গুটি কয়েক খিলান। সেগুলোর ওপর বহু বর্ণে উৎকীর্ণ আরবী লিপি এখনও বজায় আছে। এই সব সুগঠিত ইমারত তৈরি করার পেছনে স্থপতিদের প্রভূত

শিল্পজ্ঞানের ও ভাবনা-চিন্তার পরিচয় মেলে। তাদের চেয়েও বেশি শ্রম ব্যয় করেছে অজ্ঞাত শ্রমিকের দল, যারা বড় বড় চৌকো ইট দিয়ে গড়ে তুলেছে সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, জমকালো মাদ্রাসা আর ছিমছাম মিনার। মোঙ্গলরা এই সব কিছুকে ঝুলকালিমাখা ভগ্নস্তূপে পরিণত করেছে।

"কিছু শুকনো ঘাসপাতা আর গোটা কয়েক চাপাটি যদি পাওয়া যেত," অশ্বারোহী আপন মনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "তাহলে আরও এক দিনের পথ পার হয়ে আমরা সবুজ পাহাড়ের এলাকায় পেঁছাতে পারব — সেখানে লোকজন পাওয়া যাবে, আগুনের পাশে বসে দিল খুলে কথাবার্তা বলা যাবে।"

অদূরেই পাথরের ভগ্নস্তূপ। বিশাল খিলানের নীচে ভারী ভারী ফটক সম্পূর্ণ খোলা। দরজাগুলোর ওপর বড় বড় লোহার গজাল লাগানো, সেগুলোর এক-একটি মাথা পিরিচের সমান।

"চেনা ফটক! কোন এক সময় দরবেশ হাজি রহিম, চাষী কুরবান কিজিক ও বালক তুগান এর ভেতর দিয়ে গিয়েছিল। তুগান এখন বড় হয়েছে, সে হয়েছে দক্ষ সৈনিক, কিন্তু নিরাশ্রয় মুসাফিরের মতো এককালের সমৃদ্ধ ও জনবহুল এই বুখারা শরিফে তার না মিলছে এক টুকরো রুটি, না মাথা গোঁজার একটুকু ঠাঁই।"

হতশ্রী ফটকের নীচে অশ্বখুরের ফাঁপা ফাঁপা আওয়াজ উঠল। সামনে বাদামী রঙের একটা শেয়াল ছুটে গিয়ে আবর্জনাস্তূপের ওপর অবলীলাক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আড়ালে গা ঢাকা দিল।

মৃত ও নির্বাক নগরীর ভগ্নস্তূপের মাঝখান দিয়ে ঘোড়া সন্তর্পণে পা ফেলে চলছিল। এই হল সদর চক।... লোকজনের জমায়েতে কোলাহলমুখর এই জায়গাটাকে ঘিরে আগে ছিল বিরাট বিরাট ইমারত। এখন চত্বরটি আবর্জনায় ভর্তি, মাঝখানে পড়ে আছে ঘোড়ার সাদা কঙ্কাল। ফিরোজা রঙের আকাশে নিথর ডানা মেলে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে ধূসর-বাদামী বর্ণের চিল।

মসজিদের পাথরের সোপানশ্রেণীর সামনে এসে ঘোড়া থমকে দাঁড়াল, নাকে ফরফর আওয়াজ তুলে পিছু হটে গেল, কান খাড়া করল। সামনে পাথরের কিতাবদানের ওপর খোলা পড়ে আছে কোরানের প্রকাণ্ড পুঁথি, তার পাতাগুলো বৃষ্টিতে ভিজে ফুলে গেছে, এখন বাতাসে কাঁপছে।

"এই পাথরের সিঁড়িগুলোর ওপর দিয়ে বাদামী রঙের তেজী ঘোড়ায় চেপে মসজিদে প্রবেশ করেছিল মোঙ্গলদের ভয়ঙ্করদর্শন অধিপতি কটা দাড়িওয়ালো চেঙ্গিজ খান। এখানে বুখারার বর্ষীয়ানদের সে হুকুম দেয় তার চ্যাপ্‌টা মুখো সৈন্যদের পেট পুরে খাওয়ানোর। তখন তারই হুকুমে চত্বরে উনুন জ্বালিয়ে ভেড়ার মাংস রান্না করা হয়। চত্বরের পাথুরে ফলকগুলোর ওপর এখনও আগুন জ্বালানোর চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।..."

তুগান ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। গায়ের আলখাল্লা মাটিতে বিছিয়ে সে শুকনো রুটি গুঁড়ো গুঁড়ো করল, ঘোড়ার ধরাচুড়া খুলে লাগাম হাতে ধরে সিঁড়ির ওপর বসল।

পাথরের স্তূপের আড়ালে কী যেন নড়েচড়ে উঠল। ইঁটের ভগ্নস্তূপের ওপার থেকে এক কঙ্কালসার নারীমূর্তি উঠে দাঁড়াল। তার অঙ্গে ছিন্নভিন্ন বস্ত্রখন্ড জড়ান। তুগানের সামনে এগিয়ে আসতে আসতে সে হাত পাতল, তার দু' চোখের লোলুপ জ্বলন্ত দৃষ্টি রুটির টুকরোগুলো থেকে সে আর ফিরিয়ে নিতে পারল না।

তুগান তাকে একমুঠো গুঁড়ো রুটি দিল। মহামূল্যবান সামগ্রীর মতো সে সন্তর্পণে এই দান গ্রহণ করল এবং একটু দূরে সরে গিয়ে নতজানু হয়ে বসল। একটা গ্রাস ফোলা টস্‌টসে ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গেই নামিয়ে ফেলল। পাথর বাঁধানোর জায়গাটার ওপর সে গুঁড়োগুলোকে সমান ভাগ ভাগ করে রাখতে লাগল। হাতে লেগে থাকা অবশিষ্ট গুঁড়ো ভালো করে চেটেপুটে নিয়ে ডাক দিল:

"এই ছানাপোনার দল, আমার কাছে আয়! ভয়ের কিছু নেই! এ আমাদের লোক, ভালো লোক!"

ভাঙা চোরা পাথরের অন্ধকার গহ্বর থেকে একটি দু'টি করে শিশুর উস্কখুস্ক মাথা উঁকি দিতে লাগল। একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে ভগ্নস্তূপ ডিঙিয়ে বাচ্চারা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। উলঙ্গ, রৌদ্রদগ্ধ এই মূর্তিগুলো কঙ্কালসার, কেবল তাদের উদরদেশ অতিরিক্ত স্ফীত। অন্ধকার গহ্বর থেকে আরও দু'টি শিশু বেরিয়ে এলো। তাদের দাঁড়ানোরও ক্ষমতা নেই। তারা চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগিয়ে এলো। স্ফীত উদর দু' হাতে আঁকড়ে ধরে বসে পড়ল।

রুটির গুঁড়োগুলোর দিকে যারা হাত বাড়াল স্ত্রীলোকটি তাদের হাতে বাড়ি মারল, নিজে এক এক করে ওদের মুখে গ্রাস পুরে দিতে লাগল। সে বলল :

"ভেড়ার চামড়া গায়ে ভয়ঙ্কর লোকগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকে পড়ল।... ছোট ছোট ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা সব জায়গা ছেঁকে ফেলল, যা পেল তা-ই হাতাতে লাগল।... আমার খসম পরিবারকে বাঁচাতে গিয়ে ওদের হাতে মারা গেল।... ওরা আমার সবগুলো ছেলেমেয়েকে ধরে নিয়ে গেল — আমার বাছারা বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না।... ঘোড়সওয়াররা আমাকে ফাঁসদড়িতে বেঁধে নিয়ে চলল, আমি বাঁদী হয়ে ওদের সকলের মন যোগাতে লাগলাম। এক দিন রাতে পালানোর সুযোগ হল, আমি এখানে এসে এই ভাঙা চোরা স্তূপের মধ্যে ঠাঁই নিলাম।... এখানে আমি আর আমার বাসা খুঁজে পেলাম না। পড়ে আছে কেবল আবর্জনার স্তূপ। দিনের বেলায় গিরগিটির দল ছোটাছুটি করে, আর রাতে দলে দলে শেয়াল হানা দেয়, হাঁকডাক করে।... শহরের কাছে আমি এই বাচ্চাদের দেখতে পাই — মোঙ্গলরা ওদের পথে ফেলে যায়। আমরা এক সঙ্গে খাবার-দাবার খুঁজি, বুনো পেঁয়াজ খুঁড়ে বার করি।... এখন এই বাচ্চারা আমার বাচ্চা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমরা এক সঙ্গেই মারা যাব, হয়ত বাঁচতেও পারি।..."

শুকনো রুটির শেষ টুকরোগুলো তাকে দিয়ে লাগাম ধরে ঘোড়া টানতে টানতে তুগান শহর থেকে বেরিয়ে এলো।

তুগান ক্রমেই সমরখন্দের দিকে এগিয়ে চলল। পথে কোন কারাভান চোখে পড়ল না। কোথাও কোথাও মাঠে এক আধজন চাষীকে দেখা যায়। বার দুয়েক মোঙ্গল অশ্বারোহীদের ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখা গেল। মাঠে কর্মরত চাষীরা তাদের দেখা মাত্রই এমনভাবে পড়ে যায় যেন তাদের হাঁটু জোড়া আল্‌গা হয়ে গেছে, তারা গড়িয়ে খানাখন্দে লুকিয়ে পড়ে। মোঙ্গলদের উত্থিত ধূলিঝড় টিলার ওপারে উড়ে যেতে ভীতসন্ত্রস্ত চাষীরা আবার মাথা তুলে উঠে দাঁড়িয়ে খেতের মাটি কোপাতে থাকে।

কোথা সেই কোলাহলমুখর সমরখন্দ?

কিছু দিন বাদে তুগান সর্বত্র কবরের ঢিবিতে আচ্ছন্ন এক নির্জন মালভূমিতে এসে থামল। তার সামনে নদীর শ্যামল উপত্যকায় একদা বিখ্যাত সমরখন্দ নগরের ভগ্নাবশেষ। সমতল ছাদে ছাওয়া ছোট ছোট ঘরবাড়ি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মাভেরান্‌নগরের প্রাক্তন এই রাজধানীতে, যেখানে একদা হাজার হুন্নুরী কাজ করত, সেখানে আজ কোন চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে না।

ভাঙাচোরা এবং বৃষ্টির জলে ধোয়ামোছা প্রাচীর শহরের মাঝের অংশ ঘিরে রেখেছে। ওখানে টিকে আছে খরেজমের শেষ শাহ মুহম্মদের তৈরি উঁচু মসজিদের ঝুলকালিমাখা অংশ আর দু'টি গোলাকার মিনার।

এক খোঁড়া ভিখারী এগিয়ে এসে ছিন্ন বসনের আড়াল থেকে অস্থিচর্মসার হাত তুগানের দিকে বাড়িয়ে দিল।

"গরীবকে দয়া কর বাহাদুর বেগ! আল্লাহ লড়াইয়ে তোমার সহায় হবেন! বীরপুরুষের কলিজাকে তিনি দুশমনের তীরের আঘাত থেকে রক্ষা করবেন!"

"শহর কোথায় গেল? কোথায় সুলতান আর শাহদের সেই জমকালো রাজধানী? কোথায় বড় বড় বণিক, ঝলমলে বাজার, কোথায় কামারশালার হাতুড়ির সরগরম?" তুগান ভিখারীকে জিজ্ঞেস করল — তার কথাগুলো অবশ্য অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই শোনাল।

"সে সবের কিছুই আর নেই!" ভিখারী বলল। "মোঙ্গলরা এখান দিয়ে যাওয়ার সময় সব ছারখার করে চলে গেছে! ওরা কি আর কিছু অবশিস্ট রাখবে? জিজ্ঞেস করছ শহর কোথায় গেল। লোকজনের একটা অংশকে নিষ্ঠুর ঘোড়সওয়ারের দল মেরে কেটে সাফ করে দিয়েছে, কাউকে কাউকে তারা ধরে নিয়ে গেছে তাদের দেশে — দূর স্তেপে, বাদবাকিরা পালিয়ে গেছে পাহাড়ে-পর্বতে — অনেকেই সেখানে মারা পড়েছে।..."

"যারা পালিয়ে গেছে তারা আর কত কাল ঘুরে বেড়াবে?"

"ওখানে, শহরের ওপাশে, নদীর একটু ওপরের দিকে লোকজন জড় হচ্ছে, তারা কুটোকাটা আর কাদামাটি দিয়ে নিজেদের কুঁড়েঘর বানাচ্ছে। কিন্তু সব সময়ই তারা ভয়ে ভয়ে থাকে: মোঙ্গলরা যে কোন দিন ফিরে

এসে যাকে খুশি তাকে ফাঁসদড়িতে বেঁধে ধরে নিয়ে যেতে পারে।... তোমার এই দয়ার জন্য আল্লাহ তোমাকে সে বিপদ থেকে রক্ষা করুন।"

"শহরের মাঝখানে এই মিনারটাই বা কিসের?"

"এই সব মিনার থেকে ঘোড়ার মুখ দূরে সরিয়ে রাখ! ওখানে জিন্দান! মোঙ্গল খানেরা এই মরা শহরে নিজেদের কয়েদ বানিয়ে ফেলেছে। মোঙ্গল জল্লাদরা এর দেখাশোনা করে, তারা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে কয়েদীদের মাথা ফাটায়। ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলছি।..."

তুগান তার কথায় কান না দিয়ে ঢাল বয়ে নীচে নেমে গেল। মৃত নগরের ধ্বংসস্তূপের মাঝখান দিয়ে তুগান এগিয়ে গেল দুর্গের দিকে, যেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল দুটি ভয়ঙ্কর ও নীরব মিনার। দেয়াল বরাবর মাটির ওপর বসে ছিল বন্দীদের মনমরা আত্মীয়স্বজন। ফটকের সামনে বর্শা হাতে প্রহরারত প্রহরীর দল। পিঠে জিন বাঁধা ঘোড়াগুলো খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় ঝিমুচ্ছিল।

"কোথায় চল্লি? সরে যা!" প্রহরী হাঁক দিল।

"কয়েদের কর্তার সঙ্গে আমার কাজ আছে," তুগান বলল।

"সাধ করে এখানে মরতে এসেছিস?"

"কী আর করা যাবে, আমার ভাই যদি এখানে আটক থাকে।"

"আমাদের এই কয়েদে ডাকাত কম নেই। তবে বেশি দিন তাদের রাখা হয় না: গর্তের সামনে চত্বরটাতে ওদের নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর লোহার মুগুর দিয়ে মাথার পেছনে ঘা মেরে খতম করা হয়। গর্তের মধ্যে খুঁজে দ্যাখ, ওখানে তোর ভাইয়ের লাশ পেলেও পেতে পারিস। ভাইয়ের নামটা কী শুনি?"

"ও হল দরবেশ, কিতাব লেখে। হাজি রহিম বাগদাদি।"

"লম্বা চুলওয়ালা পাগলা দরবেশ? ওটা এখনও বেঁচে আছে বটে! আমরা ওকে 'দিওয়ানা' বলে ডাকি। বহু কালের মেয়াদ দেওয়া হয়েছে।..."

"আজীবন ও আমরণ?"

"তোকে দেখছি আমি অনেক কথা বলে ফেলেছি!.. ঘোড়া বেঁধে রেখে চত্বরে ঢুকে পড়। কয়েদের কর্তাকেই না হয় জিজ্ঞেস করিস। ওখানেই তার বাড়ি। দরজার পাশে আংটার সঙ্গে একটা কলসী ঝোলানো আছে। অন্তত ছয়টা দিরহাম ঐ কলসীতে ফেলতে ভুলবি না। তাহলেই কর্তা তোর কথা শুনবেন।..."

তুগান ঘোড়া বেঁধে রেখে ফটকের মধ্যে প্রবেশ করল। কারাপাল বাড়ির দাওয়ায় বসে ছিল, তার পরিধানে ছিল লাল রঙের জোব্বা, খালি পায়ে সবুজ রঙের চটি। দুই পায়ে বাঁধা লোহার শৃঙ্খলের আওয়াজ তুলে অর্ধনগ্ন শীর্ণকায় এক পাচক কাবাবের জন্য ভেড়ার মাংস টুকরো টুকরো করে পাত্রে রাখছিল। কারাপালের সাদা দাড়ির ডগা, নখ আর হাতের তালু ছিল হেনার লাল রঙে ছোপান। পাচকের পিঠে বেত্রাঘাত করতে করতে সে বলে চলেছে:

"আরও লঙ্কা দে! গড়িমসি করিস না! হ্যাঁ, হ্যাঁ! ডালিমের রস ঢাল!"

দরজার গোড়ায় মাটির কলসী ঝুলতে দেখে তুগান তাতে দশটি তামার দিরহাম ফেলল। কারাপাল কটমট করে তুগানের দিকে তাকিয়ে দেখল।

"আমি সুবুদাই বাহাদুরের দলের মুসলমান যোদ্ধা। তাঁর অনুমতি নিয়ে আত্মীয়স্বজনের খোঁজে বেরিয়েছি। এই হল সুবুদাই বাহাদুরের ছাপ দেওয়া মোহর!"

তুগান তার গলা থেকে সুতোর সঙ্গে ঝোলানো কাঠের ফলক বার করে দেখাল। ফলকের ওপর খোদাই করা ছিল কিছু লেখা আর একটা পাখির মূর্তি।

কারাপাল ফলকটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তুগানকে ফিরিয়ে দিল। "এই বজ্জাতগুলোর আস্তানায় তোর কী কাজ?"

"আমি আমার ভাই দরবেশ হাজি রহিম অল বাগদাদির খোঁজ করছি। এই নামে কেউ আছে কি?"

"আল্লাহের অভিসম্পাত তার ওপর পড়ুক, আমাকে আর তোকে — আমাদের দু'জনকেই আল্লাহ সন্দেহের হাত থেকে, তার সংশ্রব থেকে রক্ষা করুন!"

"ওকে কী কারণে সাজা দেওয়া হয়েছে? আমি ত তাকে সৎ বলেই জানতাম।"

"কী আমার সৎ রে! মাজহারি শরিফকে তাচ্ছিল্য করায়, বেআদবের মতো যা খুশি তাই মতামত বলে বেড়ানোর জন্য, কথাবার্তায় ভুলেও সর্বশক্তিমান আল্লাহের নাম উচ্চারণ না করায় পরম ধর্মপ্রাণ শেখ-উল-ইসলাম আর সুযোগ্য ইমানদের দাবিতে ওকে সাজা দেওয়া হয়েছে। ওর

কপালে মরণ আছে!.. জাহান্নামের আগ্নুনে পুড়ে ও মরবে!.. এ ছাড়া আর কোন গতি নেই!"

তুগান একটু ভেবে বলল:

"ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে সাংঘাতিক তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর নসিব যাতে অন্তত কিছুটা হাল্‌কা করা যায় আপনার অনুমতি নিয়ে তার জন্য আমি কিছু করতে পারি কি?"

"মিছিমিছি অমন চেষ্টা করিস না! ওকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে একমাত্র আমাদের দেশের মহামান্য অধিপতি খান জাগাতাইয়ের খাস উজির মাহ্‌মুদ ইয়ালভাচের অনুরোধে। 'জগৎ আলোড়নকারী' চেঙ্গিজ খানের জীবন আর তাঁর যুদ্ধযাত্রা নিয়ে বই লেখা যতক্ষণ শেষ না করছে ততক্ষণ ওকে ছাড়া হবে না।"

"তাহলে হাজি রহিম যখন লেখা শেষ করবে তখন ত ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে?"

"কী আব্‌দার আমার! ও যদি ওর গুনাহ কবুল করে তাহলেও ত কয়েদ থেকে ওকে ছাড়া হবে কেবল লোকজনের সামনে চত্বরের ওপর ওর জিভ আর হাত দুটো কেটে ফেলার জন্য। আর এই কারণেই 'দিওয়ানা' দু' বছর হল কিতাব লিখছে ত লিখছেই। দুর্দশা এড়ানোর মতলবে আরও বছর তিরিশেক সে লিখেই যাবে।"

তুগান বলল:

"হাজি রহিম আমার উপকার করেছেন, তিনি আমাকে আরবী লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন, আমি যখন খিদেয় মরে যাচ্ছিলাম তখন আমাকে অন্ন দিয়েছেন; তাই আপনাকে খুশি করার জন্য আমি আমার একমাত্র সোনার দিনারটি দিতে রাজি আছি।..." তুগান স্বর্ণমুদ্রাটি দেখাল। "হতভাগ্য লোকটিকে দয়া করুন হুজুর, আমাকে একবার হাজি রহিমের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিন।"

"সোনার দিনারটা আমাকে দিয়ে পরের উঠানে চলে যা। ওখানে গিয়ে প্রাণভরে তোর 'দিওয়ানার' চাঁদমুখ দেখ গে যা।"

তুগান কারাপালের হেনা রাঙানো তালুর ওপর স্বর্ণমুদ্রা ফেলে দিয়ে পাথর বাঁধানো ফটক পার হয়ে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লৌহপিঞ্জরে

সংকীর্ণ আঙিনার দূর প্রান্তে দেয়ালের গায়ে লোহার গরাদ দেয়া অন্ধকার চৌকো গহ্বর উঁকি মারছে। সেখানে ছেঁড়া জামাকাপড়ের বোঝার আড়ালে কালোমতো কী একটা নড়েচড়ে উঠল।

গরাদের সামনে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এক মূর্তি। যাযাবর গোষ্ঠীর মেয়েদের গায়ে সচরাচর যেমন শাল দেখা যায় সেরকম আভূমি লুণ্ঠিত এক কালো শাল তার সর্বাঙ্গে জড়ান।

তুগান সন্তর্পণে এগিয়ে গেল। নারীমূর্তি তার দিকে মুখ ফিরাল। পরিচিত মুখ দেখে তুগান বিস্মিত হল: সেই রোদে পোড়া সোনালি মুখ, সেই পাটকিলে রঙের কৌতূহলী চোখ জোড়া, তবে আগের মতো নিশ্চিন্ত ভাব আর নেই। এক পলক দেখেই মেয়েটি চোখ ফিরিয়ে নিল।... সন্দেহ নেই — এ হল বেস্ত জানকিজা!

তুগান আরও সামনে এগিয়ে এসে ভেতরে উঁকি মারল। সেখানে বন্দীর পক্ষে অতি কষ্টে নীচু হয়ে বসে থাকা সম্ভব। অন্ধকার থেকে চোখে পড়ে কোঁকড়ান কালো চুলের রাশি এবং মর্মভেদী জ্বলন্ত দৃষ্টি। শীর্ণ মুখাবয়বে ভয়াবহ পরিবর্তন সত্ত্বেও হাজি রহিমকে তুগান ঠিকই চিনতে পারল। দরবেশ হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগিয়ে এসে কেশাচ্ছন্ন মুখ গরাদে চেপে ধরল।

"তুই ঠিক সময়ে এসেছিস ভাই!" হাজি রহিম ভাঙা ভাঙা গলায় বলল। "কাছে আয় তুগান, আমার শেষ ইচ্ছে মন দিয়ে শোন। হিংস্র ইমামদের ইচ্ছে আমি এই খাঁচার ভেতর পচে মরি, কিংবা লোকজনকে ভয় দেখানোর জন্য সকলের সামনে জিভ কেটে তারপর আমাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলে।... কিন্তু আমার স্বাধীন চিন্তাকে কি তারা হত্যা করতে পারে? আমার মনের মধ্যে যে ঘৃণার আগুন জ্বলছে তাকে কি ওরা নেভাতে পারে? ওরা যা যা চেয়েছিল সে সব আমি এখন লিখে ফেলেছি, তবে আমার লেখা পড়ার পর পাণ্ডুলিপি পোড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাকেও পুড়িয়ে মারবে। ...আমি ত আর ওদের মতো করে লাল দাড়িওয়ালা চেঙ্গিজের তারিফ করি নি, খরেজমকে যারা গোলাম বানিয়েছে, নারী ও শিশুর নৃশংস হত্যাকারী সেই তাতারদের নিয়ে মিঠে স্তুতিগান রচনা করি নি।...

আমি নিজের চোখে যা দেখেছি সাহস করে সেই সত্যই লিখেছি।... আমি আমার সাধ্যমতো সব কিছু করেছি। এখন আমার বিদায়ের শেষক্ষণ ঘনিয়ে এলো। আমাকে সালার নদীর তীরে পুরনো বট গাছের ছায়ায় কবর দিও।... আমার গুরু আবু আলি ইবন সিনা ছিলেন পরম জ্ঞানী, কিন্তু আকাট মূর্খ দুষ্টবুদ্ধি ইমামদের হাতে তিনি নিগৃহীত হন, কয়েদে পচা খড়ের গাদায় তিনি দেহত্যাগ করেন। ... দুনিয়ার যাবতীয় রহস্য তাঁর জানা ছিল, কেবল যে জিনিসটা জানতেন না তা হল কী করে মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়!..''

তুগান শান্তস্বরে বলল:

"মরুভূমিতে যখন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আমাদের মাথার ওপর ভয়ঙ্কর 'কালো ঘোড়ার সওয়ার' কারা কন্চারের তলোয়ার ঝুলছিল তখন তুমি আমাকে কী বলেছিলে তা মনে আছে কি? তুমিই না তখন বলেছিলে:'এখনই হতাশ হওয়ার কিছু নেই, রাত দীর্ঘ, এখনও শেষ হয় নি!' এখন আমি তোমাকে সেই একই কথা বলছি: 'হতাশ হওয়ার কিছু নেই, রাত এখনও শুরুই হয় নি!' ''

হাজি রহিম যেন শক্তি ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে উঠে বসল। তুগান অর্ধস্ফুট স্বরে ধীরে ধীরে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল:

"শোন, আমি যা বলি কর। আমি তোমাকে তিনটে কালো বড়ি দেব, সেগুলো তুমি গিলে ফেলবে। তখন তোমার শরীর মড়ার মতো অসাড় হয়ে যাবে, কোনরকম যন্ত্রণাবোধ তোমার থাকবে না, তুমি স্বপ্ন দেখবে যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে পাহাড়-পর্বত পার হয়ে এমন এক উপত্যকায় এসে পেঁছেছ যেখানে বয়ে চলেছে শীতল জলধারা, ফুটে আছে রাশি রাশি সুগন্ধী ফুল।... সেখানে বরফের মতো সাদা ঘোড়ার দল চরে বেড়াচ্ছে, সোনালি পাখিরা গান গাইছে।... সেখানেই স্বপ্নে তুমি আবার দেখতে পাবে তাকে, যাকে তুমি ষোল বছর বয়সে ভালোবেসেছিলে।..."

"তারপর জেগে উঠে আবার এই লোহার গরাদ কামড়াতে থাকব? এমন স্বপ্নে আমার কাজ নেই!"

"দাঁড়াও, সম্পূর্ণটা শোনই না। যতক্ষণ পাহাড়ী উপত্যকার স্বপ্নে বিভোর হয়ে তুমি শোক দুঃখের অতীত এক বিস্মৃতিতে পরম সুখ উপভোগ করতে থাকবে ততক্ষণে আমি তোমার কারারক্ষীদের কাছে গিয়ে বলব তুমি মারা গেছ, তোমার দেহ গোর দেওয়া দরকার। ওরা তখন খাঁচা

খুলবে, আংটার সঙ্গে তোমার লাশ বেঁধে বধ্যভূমির গর্তে ফেলে দেবে।... যতই ব্যথা লাগুক না কেন সহ্য করতে হবে, কোন রকম টুঁ শব্দ বা কান্নাকাটি করবে না! তাহলে ওরা লোহার ডান্ডা মেরে তোমার মাথা ফাটিয়ে দেবে।... যখন তুমি লাশগুলোর মাঝখানে গর্তের মধ্যে পড়ে থাকবে আর মাঝরাতে শেয়ালের দল তোমার ঠ্যাং চিবুনোর জন্য গুঁড়ি মেরে আসবে তখন আমি তিন জন সৈন্য নিয়ে এখানে অপেক্ষা করব। আমরা তোমাকে আলখাল্লায় জড়িয়ে নিয়ে চট্‌পট্‌ শহরের বাইরে নির্জন কোন জায়গায় বয়ে নিয়ে যাব।... সেখানে তোমার সংবিৎ ফিরে আসবে, আমি তোমাকে ঘোড়ায় উঠিয়ে দেব, তুমি পশ্চিমে কিংবা পুবে চলে গিয়ে সেখানে নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু করবে।..."

"হ্যাঁ, তুই ঠিকই বলেছিস: রাত এখনও শেষ হয় নি।... সাদা ঘোড়ার দেশে যাওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত!... ওষুধের বড়িগুলো শিগ্‌গির আমাকে দে!" এই বলে হাজি রহিম বাজপাখির কালো ও শক্ত থাবার মতো হাত বাড়িয়ে দিল।

তুগান রঙচঙে থলে থেকে তিনটি কালো কালো বড়ি বার করে হাজি রহিমকে দিল। হাজি রহিমও কোন রকম ইতস্তত না করে সেগুলো গলাধঃকরণ করে ফেলল। সে ফিস্‌ফিস্‌ করে কী যেন বলতে লাগল। তার কথাগুলো ক্রমেই আরও দুর্বোধ্য ও ক্ষীণ হয়ে এলো। অবশেষে সে একটা ঝাঁকুনি তুলে কাত হয়ে পড়ে গেল।...

বর্শা হাতে এক রক্ষী গরাদের দিকে এগিয়ে এলো।

"আমার কর্তা বলছেন বজ্জাতটার কাছে আর থাকার হুকুম নেই!"

"তোমার অমন কড়া কর্তার দয়ায় কয়েদীর আর কাজ নেই — সে মারা গেছে!"

পাহারাদার সন্দিগ্ধ হয়ে খাঁচার ভেতর বর্শা ঢুকিয়ে শায়িত দরবেশের গায়ে খোঁচা দিল।

"সাড়াশব্দ নেই? দেখা যাচ্ছে সত্যি সত্যিই মারা গেছে!... এখন 'দিওয়ানার' লাশ গর্তে ফেলা হবে।... তোমরা যদি ওকে গোর দিতে চাও ত আজ রাতের মধ্যেই চট্‌পট্‌ দিয়ে ফেল। সকাল হতে না হতে শেয়াল-কুকুরে ওকে এমন ছিঁড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলবে যে হাড়গোড়ও যোগাড় করতে পারবে না।... বখশিসের জন্য ধন্যবাদ! আমাদের সকলকেই এক দিন না এক দিন মরতে হবে!.."

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শেষ অঙ্ক

অধ্যবসায় ও ধৈর্য কর্মকে সাফল্যমণ্ডিত করে।

(হাজি রহিম)

তুগান ও বেস্ত জানকিজা বিধ্বস্ত নগরের নীরব, জনশূন্য রাস্তা ধরে পাশাপাশি চলল। তুগান লাগাম ধরে ঘোড়া টেনে নিয়ে চলছে। পরিত্যক্ত ঘরবাড়ির দেয়ালে ঘা খেয়ে অশ্বখুরের আওয়াজ ফাঁকা ফাঁকা প্রতিধ্বনি তুলছে। দু' জনেরই মনে পড়তে লাগল কোলাহলমুখর গুরুগঞ্জে মির্জা ইউসুফের গৃহে অতিবাহিত তাদের যৌবনের সুদূর দিনগুলোর কথা। নদীর বন্যায় প্রবীণ মির্জা ইউসুফের সলিল সমাধি ঘটে।

"দীর্ঘ ভবঘুরে জীবনের সব সময় তোমার কথা ভেবেছি বেস্ত জানকিজা!"

"এই ত তোমার সামনে আবার তোমার ছেলেবেলার বান্ধবী।... আমাকেও দেখতে হল বিদ্যুতের চমক, শুনতে হল সেই বজ্রের আওয়াজ যা আমাদের গোটা দেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।... কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ে যেখানে বড় বড় বট আর অশ্বত্থ পড়ে যায়, সেখানে ছোট্ট ইঁদুরটি কখনও কখনও অক্ষত থেকে যেতে পারে — আমিও তেমনি বেঁচে গেলাম!"

"ভয়ঙ্কর এই কয়েক বছরে তোমার কী হয়েছিল বল।"

"আমার কী হয়েছিল শোন। মোঙ্গলরা যখন বুখারায় আমাকে ধরল আর ওদের বর্বর প্রভুর সামনে আমাকে খরেজমের ধ্বংস কাহিনী নিয়ে করুণ গান গেয়ে শোনাতে হল তখন সে আমার তারিফ করে হুকুম দিল আমাকে যেন তার অভিযানের সঙ্গী চীনা গায়িকাদের দলে রাখা হয়। এই নরঘাতক যে যে জায়গায় গেছে আমি সর্বত্রই তার সঙ্গে গেছি। একবার চেঙ্গিজ খানের চোখের ব্যামো হল, সে বলল যে একটা চাঁদের জায়গায় দুটো চাঁদ দেখছে, একটা হরিণের জায়গায় স্তেপে তার চোখের সামনে এক বারে ভেসে বেড়াচ্ছে তিন-তিনটে হরিণ। ওর ধারণা হল যেন অপদেবতারা তার সঙ্গে মস্করা করছে। মোঙ্গল শামানরা অপদেবতার পুজো দিল, চেঙ্গিজ খানের সামনে নাচল, কিন্তু অপদেবতাদের তাড়াতে

পারল না। তাকে ছুঁয়ে তার ঐ ভয়ঙ্কর চোখ জোড়া উঁকি মেরে দেখে এমন সাহস হেকিমদের হল না। শেষ পর্যন্ত জিন জাবান নামে এক বুড়ো আরবী চোখের হেকিম চেঙ্গিজ খানের শিবিরে এলো। সে কিন্তু সাহস করে 'জগৎ আলোড়নকারীর' চিকিৎসার ভার নিল। সে সত্যি সত্যিই চেঙ্গিজ খানকে চট্‌পট্‌ সারিয়ে তুলল। বর্বর অধিপতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল সে কী পুরস্কার চায়। বুড়ো হেকিম কোন ধনসম্পদ চাইল না, সে কেবল আঙ্গুল দিয়ে গায়িকাদের দলের একজনকে দেখিয়ে দিল, দেখা গেল সেই গায়িকাটি হলাম আমি! চেঙ্গিজ খান আমাকে হেকিমের হাতে তুলে দেওয়ার হুকুম দিল। বুড়ো আমাকে তার অন্দরে আটকে রেখে দিল। সেখানে আমি যুবকের কালো চুল আর গালের তিল নিয়ে গান গাইলাম। এই গান শুনতে পেয়ে হেকিম তার কোমরের চামড়ার কষি খুলে তাই দিয়ে আমাকে মারল। আমি এক নিরানন্দ সৈনিককে নিয়ে গান ধরলাম। বুড়ো এবারেও কাঁচা চামড়ার কোমর বাঁধুনি দিয়ে আমাকে শিক্ষা দিতে লাগল। আমি তখন তার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে আমরা যাদের অবজ্ঞা করে থাকি আগুনের পূজারী সেই বেদে জাতের মেয়েদের ছই ঢাকা গাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। আমি ওদের মতোই কালো ঘোমটা ঢাকা দিয়ে চলতাম। কেউ আমাকে ধরিয়ে দেয় নি।... কিন্তু বুড়ো হেকিম মনের দুঃখ চাপতে না পেরে ভয়ঙ্কর চেঙ্গিজ খানের কাছে গিয়ে আমার নামে নালিশ করল, বিনীত অনুরোধ জানাল তার সৈন্যরা যেন আমাকে খুঁজে বার করে।... মোঙ্গল অধিপতি এমন রেগে উঠল যে আশেপাশের সকলে মুখে হাত ঢেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।... 'আমার দেওয়া উপহার তুই হাতছাড়া করলি কী বলে?' চেঙ্গিজ খান চেঁচিয়ে উঠল। 'নিজের বিবিকে বাগে আনার মুরদ নেই তোর! বৌ যার কথা শোনে না আমার রাজত্বে তেমন পুরুষের বেঁচে থাকার অধিকার নেই! ধর ওকে!' বেচারি বুড়ো হেকিমকে পাকড়াও করে জল্লাদেরা তৎক্ষণাৎ তার বুদ্ধিবোঝাই পাকা মাথাটা কেটে ফেলল। কী শোচনীয় পরিণতি! তখন থেকে আমি ঐ বেদেদের কাছেই আছি। রহিম কয়েদে বন্দী হয়ে আছেন জানতে পেরে আমি ওঁর জন্য রুটি, বাদাম আর আঙুর এনে দিতে লাগলাম।... আমি ওকে লেখার ব্যাপারে সাহায্য করতাম।..."

"তুমি নিজেই ত তাড়া খেয়ে চলতে, তা সত্ত্বেও ওকে সাহায্য করতে?"

"প্রতি তিন দিন অন্তর অন্তর আমি কয়েদে গিয়ে ওকে খাবার দিয়ে

আসতাম। রুটির সঙ্গে হাজি রহিমকে কয়েক টুকরো সাদা কাগজও দিতাম, আর তিনি তিন দিনে স্মৃতি কথার যে ক'টি পৃষ্ঠা লিখেছেন সেগুলো গোপনে আমাকে দিতেন। নিজের তাঁবুতে বসে সেগুলো নকল করে নিয়ে আমি আবার হাজি রহিমকে ফেরত দিতাম, তিন দিন বাদে খরেজমের ওপর মোঙ্গল অভিযানের কাহিনীর আরও নতুন নতুন পৃষ্ঠা পেতাম।... এই ভাবে কয়েদে বসে হাজি রহিম যে কিতাব লেখেন তার সঙ্গে সঙ্গে ঐ একই কিতাবের আমার হাতে লেখা পাতা একে একে আমার কাছে এসে জমা হয়। আমাকে যিনি লিখতে শিখিয়েছিলেন সেই মির্জা ইউসুফের স্মৃতি আল্লাহের আশীর্বাদধন্য হোক!..."

"তুমি একটা বিরাট কাজ করেছ," তুগান বলল। "দুষ্টবুদ্ধি ইমামরা যদি হাজি রহিমের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়েও দেয় তাহলেও আমাদের কাছে তার নকল থেকে যাবে। আমাদের পৌত্র ও প্রপৌত্ররা চেঙ্গিজ খানের কুকীর্তি সম্পর্কে হাজি রহিমের লেখা বিবরণ পড়ার সুযোগ পাবে।..."

তারা খরস্রোতা ঘোলা নদীর তীরে এসে পৌঁছুল। এখানে দাঁড়িয়ে ছিল বেদেদের ঝুলকালিমাখা পশমী তাঁবুগুলো।

বুড়ো বট গাছের গোড়ায় একটা ছেঁড়া আসনের ওপর বেন্ত জানকিজা কাগজের তাড়া রাখল। সমরখন্দের ধ্বংসাবশেষের ওপর চাঁদ উঠেছে, তার উজ্জ্বল আলো হলদেটে পাতাগুলোকে আলোকিত করে তুলেছে, সেগুলোতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আছে ভাগ্যবিড়ম্বিত মুসাফিরের কাহিনী।

বেন্ত জানকিজা আসনের ওপর বসে পড়ল, পাতাগুলো গোছগাছ করতে করতে বলল:

"কয়েদের যে ঠাণ্ডা খাঁচাটিতে হাজি রহিম বন্দী ছিলেন তা কস্মিনকালেও গরম হত না। ওখানে থেকে থেকে হাজি রহিম অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেও ভেঙ্গে পড়েন নি, নিজের অগ্নিগর্ভ ভাবনা-চিন্তায় তিনি যেন জ্বলতেন।... শেষের দিকে লিখতে তাঁর কষ্টই হত।... দেখতে পাচ্ছ এই সারিগুলোতে তাঁর অক্ষর কেমন কাঁপা কাঁপা আর ছাড়া ছাড় হয়ে গেছে! শেষ পৃষ্ঠায় হাজি রহিম কী লিখেছেন শোন।..."

বেন্ত জানকিজা জড়ানো আরবী অক্ষরে লেখা কাগজের পৃষ্ঠা তুলে নিয়ে পড়তে লাগল:

"...আমার ক্ষয়িত কলম আমাদিগের জন্মভূমির সমৃদ্ধ উপত্যকায়

নৃশংস মোঙ্গলদিগের আক্রমণ কাহিনীর শেষ পংক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছে।... উৎসাহের অগ্নিকণায় উদ্দীপিত এই গ্রন্থের রচয়িতার অভিলাষ ছিল যাহারা নির্বিরোধী জনসাধারণের নির্মম উচ্ছেদকারীর বিরুদ্ধে, বর্বর চেঙ্গিজ খানের বিরুদ্ধে সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে পারে নাই খরেজমের সেই সকল কাপুরুষ ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে আরও অধিক কিছু লিপিবদ্ধ করে।...

"...খরেজমের সকল অধিবাসী যদি দৃঢ়তা সহকারে, ঐক্যবদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসার তরবারি উত্তোলন করিত, যদি আপন আপন প্রাণের মায়া পরিত্যাগপূর্বক মাতৃভূমির শত্রুবর্গের উপর আক্রমণ করিত তাহা হইলে উদ্ধত মোঙ্গলগণ এবং তাহাদিগের লোহিতশ্মশ্রুধারী অধিপতি ষন্মাসও খরেজমে তিষ্ঠিতে পারিত না, তাহাদিগকে চিরকালের জন্য আপন স্তেপভূমিতে পলায়ন করিতে হইত।...

"...মোঙ্গলগণ যে বিজয় অর্জন করে তাহার কারণ উহাদিগের বক্র তরবারির শক্তি ততটা নহে যতটা হইল প্রতিপক্ষের মধ্যে মতভেদ, তাহাদিগের নমনীয় মনোভাব এবং ভীরুতা।... শৌর্যবান জালাল উদ-দিন প্রমাণ করিয়াছেন যে দুঃসাহসী অশ্বারোহীদিগের ক্ষুদ্র বাহিনীও মোঙ্গলদিগের দলবলকে বিপর্যস্ত করিতে সক্ষম।...

"...কিন্তু আমার অসাড় অঙ্গুলি হইতে লেখনী স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। ...মুসাফির দরবেশের শক্তি নিঃশেষিত প্রায়, দিনগুলি দ্রুত ধাবিত হইতেছে, তামাম শুদের দিন আগতপ্রায়।... কেবল শায়েরের* কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করিয়া তাঁহার জবানীতে বলিতে পারি:

> যৌবন হারায়েছি মম,
> বসন্তের বায়ুসম হায়,
> শরতের বরিষণ সম।
>
> কারাভানে সাজায়ে পসরা
> দলপতি হাঁকে সাজো সাজো।
> জীবনের পথে দিশাহারা
> দল ছাড়া পড়ে রব আজও?...

---

* আবু আলি ইবন সিনা (একাদশ শতক)।

"বিদায়বেলায় আমার অজ্ঞাত পাঠকবর্গের প্রতি আরও একটি কথা: 'অহঙ্কৃত ইমাম আর পদমর্যাদাস্ফীত আলিমের দল রটনা করে যে আমি অবিশ্বাসী! বিদ্বেষপ্রসূত ও অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন তাহাদিগের অদূরদর্শিতা! আমার এই অবিশ্বাস সহজ ও শূন্যগর্ভ নহে।' নির্বোধ জল্লাদের উপর শৃঙ্খলিত চিন্তাবিদের বিজয়ে, বর্বর অত্যাচারীর উপর নির্যাতিত মেহনতীর বিজয়ে, মিথ্যাচারের উপর জ্ঞানের বিজয়ে আমার বিশ্বাসের তুল্য দৃঢ় ও জ্বলন্ত বিশ্বাস আর কাহার আছে?.. আমি জানি এমন এক সুসময় আসিবে যখন সত্য, মানুষের প্রতি যত্নবোধ এবং মুক্তি আমাদিগের মাতৃভূমিকে সর্বব্যাপী স্বাচ্ছন্দ্য ও আলোকের পথ প্রদর্শন করিবে!.. সেই দিন আসিবে, অবশ্যই আসিবে!"

বেগু জানকিজা তিনটি রূপোর আংটিতে শোভিত তার তামাটে ছিপছিপে তর্জনী ঠোঁটের ওপর রাখল, ভ্রূধনু বাঁকিয়ে একটু ভেবে নিয়ে সযত্নে পৃষ্ঠাগুলো ভাঁজ করল, এক টুকরো রঙিন কাপড়ে জড়িয়ে রাখল। উজ্জ্বল কালো চোখ জোড়া তুগানের দিকে তুলে সে বলল:

"এখন আমি বেদেদের দল থেকে তিনটি সাহসী ছোকরাকে পাঠাব।... তুমি হাজি রহিমকে বাঁচানোর জন্য গর্তের কাছে চলে যাও। রাত সত্যিই দীর্ঘ, আর এখনও তা শেষ হয় নি! আমরা ওঁকে অবশ্যই বাঁচাব!"

১১০৯

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন

১৭, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

